১৩২৭ সালের

শ্রাবণ মাস হইতে আশ্বিন সংখ্যা "সাহিত্য-সংহিতার"

সূচীপত্র।

সাহিত্য-সভার উদ্দেশ্য।

১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি সাধন।

২। সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতাদি ভাষাসমূহের চর্চ্চা অনুশীলন এবং ঐ সকল ভাষায় লিখিত প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, মুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা ও ইংরাজী প্রভৃতি দেশীয় নব্য প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্দ ও ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাবসমূহের লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ, এবং প্রচার।

৩। ইতিহাস ভুগোলবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন।

৪। নানাউপায়ে স্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা ও সাহিত্যানুশীলনে উৎসাহ প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, তত্তৎ উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও অর্থসাহায্য প্রদান।

৫। উপর উক্ত উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির রচনা, প্রচার বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদি সংগ্রহ এবং তত্তৎ উদ্দেশ্য সাধনপযোগী অন্যান্য উপায় অবলম্বন।

শ্রীচুনীলাল বসু
সাহিত্য সভার অবৈতনিক সম্পাদক।

সাহিত্য-সভা পুস্তকালয়।—

প্রাতে সাত ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং বৈকালে পাঁচ ঘটিকা হইতে রাত্রি আট ঘটিকা পর্য্যন্ত সর্ব্ব সাধারণের জন্য খোলা থাকে। এখানে বসিয়া পাঠ করিবার জন্য ভাল চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও আলোর সুবন্দোবস্ত আছে। সম্প্রতি অনেকগুলি নুতন উপন্যাস ক্রয় করা হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত কতকগুলি পুস্তক ও উপহার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সাহিত্য সভার সভ্যগণকে এবং সর্ব্ব সাধারণকে পুস্তকাদি পাঠ করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।—

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন।
লাইব্রেরীয়ান।

সাহিত্য-সভা-কার্য্যালয়।

৩৬।১নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১লা চৈত্র, ১৩২৬।

সবিনয় নিবেদন,—

সাহিত্য-সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্, এ, পি, আর, এস্ মহাশয়ের পরলোক গমণে শোকপ্রকাশার্থ গত ২৯শে বৈশাখ ১৩২৬ সাল, "সাহিত্য-সভায়" তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার জন্য একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে সাহিত্য-ক্ষেত্রে পণ্ডিতপ্রবর শাস্ত্রী মহাশয়ের পুণ্য-স্মৃতি জাগরুক রাখা বিধেয় বলিয়া একটী প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটী স্মৃতি রক্ষা-সমিতিও গঠিত হইয়াছে। সাহিত্য-সভার সভ্য বৃন্দ এবং হিতৈষীগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই পুণ্য-স্মৃতি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। তদনুসারে আপনার নিকট সভা সাহার্য্য প্রার্থী হইতেছেন। আশাকরি, আপনি যথোচিত সাহায্য দানে স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের পুণ্য-স্মৃতি রক্ষা বিষয়ে সাহিত্য-সভাকে সহায়তা করিবেন। যে পরিমিত অর্থ সংগৃহীত হইবে, তদনুসারে স্মৃতি-চিহ্ন অনুষ্ঠিত হইবে।

বশম্বদ

শ্রীচুণীলাল বসু

সম্পাদক।

সাহজাদিদের খাস কামরা।

দেওয়ানি খাস।

১৩২৭ সালের

বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত সাহিত্য-সংহিতায়

সূচীপত্র।

জুম্মা মস্‌জিদ।

জুম্মা মস্‌জিদ।

কুতবমিনার্‌।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবপর্য্যায়, ৯ম খণ্ড] ১৩২৭ সাল, বৈশাখ,—আষাঢ়, [১ম—৩য় সংখ্যা

দিল্লীর স্থূল দৃশ্য।

দিল্লীর বাণিজ্য ও অন্যান্য বিবরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে দিল্লীর ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট বিস্তৃতি ও উন্নতি হইয়াছে। এই নগরীটি ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান (East Indian) Oudh & Rohilkhand এবং North western রেল লাইন পরিবেষ্টিত। এই সমস্ত লাইন যমুনা নদী অতিক্রম করিয়া পশ্চিম পঞ্চনদ ও রাজপুতানার রেল লাইনের সহিত মিলিয়াছে অধিকন্তু উত্তরে সিমলা লাহোর, করাচি ও দক্ষিণে বোম্বাই পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। সুন্দর রাজবর্ত্ম ও নানাবিধ কল কারখানায় নগরীর সমৃদ্ধি ও শোভা আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বৈদ্যুতিক ট্রাম চলিতেছে এবং এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোক ও পাখা দিল্লী নগরীকে বেশ নবীন বেশে সজ্জিত করিয়াছে। যমুনার উপর যে সেতু প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহা দৈর্ঘে ২৬৪০ ফিট। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে সর্ব্ব সমেত ১৬৬০৩৫৫ টাকা খরচ হইয়াছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে এই সেতুটির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়।

দিল্লী নগরীর একটী সুন্দর বর্ণনার সারাংশ আমরা London Times হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

"দিল্লী নগরীকে কোন মতেই প্রাচীন বলা যাইতে পারে না কারণ প্রথম চার্লসের মৃত্যুর সময় ইহা নির্ম্মিত হয় কিন্তু স্থানটী বহু শতাব্দীর লুপ্ত সাম্রাজ্যের অতীত স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কেন হিন্দুস্থানের মধ্যে এই স্থানটী হিন্দু ও মুসলমানগণ রাজধানীর জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন সে প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতে পারে না। একাদশ শতাব্দী হইতে দিল্লীর ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে একাদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বেও এস্থানে বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল।

বর্ত্তমান দিল্লী এখন যে স্থানে স্থাপিত সে স্থানে অন্ততঃ আরও ৬টি নগর ইতিপূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোনও পর্য্যটক যদি দিল্লী ভ্রমণে যান তাহা হইলে এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কারণ (আজমীর গেট্) (Ajmere Gate) হইতে বাহির হইলে অনেক দূর ব্যাপি এত ভগ্ন প্রাচীর ও প্রস্তর স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে পর্য্যটকের মনে যে শুধু এই দৃশ্য যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে তাহা নহে পরন্তু এই ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল করিয়া দেয় যে এস্থানে বহু রাজন্যবর্গ অগণিত প্রাসাদমালা রচনা করিয়া সাম্রাজ্যের সৃষ্টি, প্রচার ও গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। প্রত্যেক নূতন রাজবংশ নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সুতরাং পুরাতন রাজধানীর সঙ্গে ২ শোভা সৌন্দর্য্য ও মন্দির ইমারতাদি সমস্তই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইজন্য প্রাচীন দিল্লীর ভগ্নপ্রাচীর বৃক্ষলতাবেষ্টিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া পর্য্যটককে আশ্চর্য্যান্বিত করে। কয়েক মাইল দূরে দীর্ঘ ও খুলামণ্ডিত এক রাজবর্ত্মের উপর পৃথিবীর সর্ব্বাশ্চর্য্য দুর্গ এবং মুসলমানের ভারত বিহারের প্রকৃষ্ট ঐতিহ্য প্রসিদ্ধ "কুতুব মিনার" এখনও সগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার নিকটেই তোগলগাবাদ নগর এক আশ্চর্য্য অসম্পূর্ণ কল্পনার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহার সুদৃঢ় ভিত্তি এবং নিপুণ নির্ম্মাণ কৌশল কালের করাল ধ্বংস হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার সুদৃঢ় প্রাচীর দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে ও আনন্দে স্তব্ধ হইয়া থাকে। পৃথিবীর ক্ষুদ্র ২ আশ্চর্য্য বস্তুর মধ্যে তোগলগাবাদও অন্যতম কিন্তু অনেকেই ইহা লক্ষ্য করেন না, যদিও ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে দিল্লীর অন্যান্য অনেক দ্রষ্টব্য বিষয়াপেক্ষা ইহা অধিক দর্শনোপযোগী। ইহার ফটকের সম্মুখে চতুষ্কোনাকার

সমাধিমন্দিরাপেক্ষা ক্ষুদ্র দুর্গবৎ এই নগরের স্থাপয়িতা তোগলগখাঁর সমাধি মন্দির দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

দিল্লী নগরীর এই ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া অনায়াসেই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা যাইতে পারে। দিল্লী হইতে একদিনের পথেই ভারতের ভবিষ্যৎ বারংবার নির্ণিত হইত। এই দিল্লীর নিকটে পাণিপথে ক্রমান্বয়ে তিনবার এরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল যে তাহা পৃথিবীর ভীষণ যুদ্ধের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। তৎপর উত্তরাংশে প্রসিদ্ধ রিজ (Ridge) নামক শিখর দৃষ্টি হয়, যেখানে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ রাজত্ব সিপাহী বিদ্রোহের হাঙ্গামায় টল টলায়মান হইয়াছিল, শুধু যে ঘটনাচক্রে সিপাহীরা ঐ প্রস্তরময় শিখরদেশে তাহাদের যুদ্ধ সজ্জা করিয়াছিল তাহা নহে পরন্তু তাহারা জানিত যে দিল্লীর ধ্বংসের উপর ভারতে ইংরাজ রাজত্ব নির্ভর করে এবং যতক্ষণ ইংরেজগণ পশ্চাৎ হটিয়া সেই শৈল শিখরে নীত হইয়াছিল ততক্ষণ সিপাহীরা বিজয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহারা আক্রমণ করা অপেক্ষা আক্রান্তই বেশী হইয়াছিল। দিল্লীর রিজ নামক শিখরটীর প্রান্তদেশ প্রায় ওয়াটারলোর (Wâterloo) মত সমান ঢালু, কিন্তু পর্য্যটকের মনে প্রথম দৃষ্টিতে একটা নৈরাশ্য আসে। যাহা ইতিহাসে এমন বৃহৎভাবে বর্ণিত হইয়াছে সেই শৈলশিখর মাত্র উচ্চতায় ৬০ ফিট, ইহা দেখিয়া পর্য্যটকের মনে বিস্ময় ও নিরাশ আসিবে তাহাতে কি আশ্চর্য্য থাকিতে পারে! Mutiny Memorial কিম্বা বিদ্রোহ স্মৃতি স্থানের নিকটবর্ত্তীর স্থানটুকু নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সুন্দর।

দিল্লী নগরীর দক্ষিণ অংশটী মোগল রাজত্বের স্মৃতি চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে; আর উত্তরাংশে বৃটিশ রাজত্বের ঐতিহাসিক চিহ্নগুলি ইতঃস্তত: বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ঠিক Flagstaffএর নীচে Circuit house অবস্থিত। এইস্থানে আমাদের মহামহিমান্বিত সম্রাট দরবারের সময় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। (ক) ইহার ২ মাইল দূরবর্ত্তী Amphitheatreএ মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং সম্রাট এডওয়ার্ডের রাজ্যভার গ্রহণের ঘোষণা বাণী প্রচার করা হয়। নগরের উত্তর প্রাচীরে এখনও বিদ্রোহীর আক্রমণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ভগ্ন স্থান গুলি এখনও স্পষ্ট বাহির করা যায়; এই আক্রমণে কাশ্মীর গেট প্রায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল। যেখানে সেনাপতি নিকলসনের মৃত্যু হইয়াছিল

সে স্থানটীর কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই; লর্ডমিণ্টোর শাসন সময়ে তাঁহার একটী প্রতিমূর্ত্তি সহরের সদর প্রান্তে গঠিত হইয়াছে। দিল্লী ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজত্বের কীর্ত্তি কাহিনী যেরূপ ঘোষনা করিতেছে সেইরূপ ইংরেজ রাজত্বেরও একটী পবিত্র স্থান বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সেনাপতি Lake বিজয়ী বীরের মত দিল্লী নগরীতে অশ্বারোহণে প্রবেশ করিয়াছিলেন; ইহার সিংহদ্বারে ইংরাজ রাজত্বের সৌভাগ্য নির্ণীত হইয়াছিল; ইহার প্রাচীর রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের সাম্রাজ্ঞী পদ লাভের ঘোষণা প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল; ইহারই দ্বারদেশে সমগ্র ভারতে প্রথম বৃটিশ সম্রাটের অভিষেক ঘোষণা তোপের মুখে মুখরিত হইয়াছিল এবং এই নগরের মধ্যেই ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গ প্রথম ইংরেজ রাজের নিকট, যিনিই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার এশিয়ার রাজ্য-পরিদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার জন্য একত্রিত হইয়াছিলেন। ইংরাজদের এইরূপ মহিমাময় কীর্ত্তিও গৌরব কাহিনী আর কোন নগরেই এইরূপ বিঘোষিত হয় নাই।

দিল্লীর শ্লাঘা করিবার বিষয় প্রসিদ্ধ দুর্গেরপরিদৃশ্যমান শোভা-একটী অনন্ত দৃশ্য। ইহার লোহিতাভ প্রাচীর গুলি তরুরাজি বেষ্টিত. অতি বিশাল এবং সুন্দর এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ মস্‌জিদ প্রসিদ্ধ জুমা মস্‌জিদের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী। এই দুর্গটী পূর্ব্বে শাজাহানের রাজ প্রাসাদ ছিল এবং সুন্দর সুন্দর কত গুলি অট্টালিকাও বাগানে পরিবেষ্টিত। পৃথিবীর মধ্যে কোন সম্রাটেরই এইরূপ আবাস স্থান নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহার প্রবেশ দ্বার অতি উচ্চ ভজনালয়ের প্রবেশ দ্বারের অনুরূপ। মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গনটীর বিস্তৃতি লণ্ডন স্কোয়ারের বিস্তৃতি অপেক্ষা কম হইবেনা। যদিও দুর্গের মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি স্থাপত্য কার্য্য যুদ্ধের জন্য কতকটা অযত্নের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে তথাপি এখনও বহু রত্ন খচিত কারুকার্য্য সমন্বিত সুন্দর সৌধ মালা অভগ্ন অবস্থায় মোগল স্থপিতির গৌরবময় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দেওয়ানী আম কিম্বা বাদশাহার সহিত সাধারণের দর্শন করিবার স্থান একটী অতি সুন্দর রক্তবর্ণের প্রস্তরের স্তম্ভ বিশিষ্ট এবং কারু কার্য্য খচিত সৌধ। এখানে বাদশাহ তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। একটী মার্ব্বেল প্রস্তর মণ্ডিত প্লাটফরমের উপরে প্রসিদ্ধ ময়ুর সিংহাসন অবস্থিত ছিল। নাদিরশাহ দিল্লীকে

বিধ্বস্ত ও জনশূন্য করিয়া এহ সুন্দর সিংহাসনটী পারস্যদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় ময়ুর-সিংহাসনের চতুস্পার্শ্বে যে অসামান্য রত্ন ছিল তাহা দস্যু তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে; বর্ত্তমানে সেই গুলির চিহ্ন মাত্র নাই। লর্ড ফাইল যখন টেহারান দর্শন করেন তখন ময়ুর-সিংহাসনের অস্তিত্ব দেখিতে পান নাই। দুর্গ মধ্যে অত্যন্ত রমনীয় দৃশ্য, দেওয়ানী খাস কিম্বা সম্রাটের নিভৃত সাক্ষাতের স্থান। ইহার মধ্যে তাবুর মধ্যস্থিত সুদৃশ্য সুন্দর একটী প্রাঙ্গন আছে এবং তাহার চতুস্পার্শ্বে সুচিকণ স্তম্ভের উপরে এক একটী ডোম রহিয়াছে। শ্বেত মার্ব্বেল প্রস্তর মণ্ডিত প্রাঙ্গণ সুকল্পিত সুদৃঢ় আর্চ (arch) সমন্বিত এবং স্বর্ণমণ্ডিত স্তম্ভ বিশিষ্ট এই দেওয়ানি খাস যেন কোন এক স্বপ্নরাজ্যের অপূর্ব্ব কল্পনা বস্তুতন্ত্র তায়ে পরিণত করিয়াছে। ইহার প্রাচীর গাত্র হইতে অবশ্য আজ রত্ন গুলি অপহৃত হইয়াছে কিন্তু ইহার দৃশ্য যে গৌরবময় বিস্মৃত অতীত কাহিনীর কথা মনে জাগাইয়া দেয় তাহা অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় এবং অভাবনীয়। পঞ্চ নদের শৈত্যের মত শীতাধিক্যের সময় ইহা ব্যবহৃত হইত না পরন্তু মে এবং জুন মাসে অসহ্য উত্তাপের সময় সম্রাট তাঁহার রঙ্গমহলে মহিলাগণের সহিত চিত্ত বিনোদন করিতেন। ইহার সৌন্দর্য্য এখনও নষ্ট হয় নাই এবং এমন কেহ নাই যিনি নাকি এ স্থানটী দেখিয়া উল্লাসের সহিত ইহার উপরিভাগে খোদিত বাক্যের প্রতিধ্বনি করিবেন না যে যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে তাহা হইলে "এই স্থানে, এই স্থানে, এই স্থানে।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দিল্লী নগরীর তিন দিক সুবৃহৎ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সাধারণতঃ এই সমস্ত সাজাহানের রাজত্ব কালেই প্রস্তুত হইয়াছে, তবে ইংরেজদের আমলেও ইহার কিছু কিছু সংস্কার হইয়াছে। পূর্ব্ব দিকে নগরী নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই প্রাচীর পরিধি প্রায় ৫৷৷৹ মাইল হইবে। সেখানে আরও ১৪টী দরজা (Gate) ছিল, ইহার মধ্যে কয়েকটী ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে উত্তরে কাশ্মীর ও মোরী গেট (Mori Gate), পশ্চিমে, কাবুল ও লাহোরী গেট, দক্ষিণে আজমীর, দিল্লী গেট এবং কলিকাতা গেটই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই কলিকাতা গেট ইহার সমস্ত লোক Grand Trunk Road এ যাতায়াত করে।

মোগল রাজপ্রাসাদ পূর্ব্ব দিকের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার কুইন

দেড় মাইল ব্যাপী এবং নগরীর ন্যায় তিন দিক বৃহদাকার প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, অপর দিক নদীর দিকে উন্মুক্তাবস্থায় অবস্থিত। দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে পশ্চিমে লাহোরী গেট ও দক্ষিণে দিল্লী গেট অতিক্রম করিতে হয়। নগরীর মধ্যভাগে বর্ত্তমানে অট্টালিকাদি প্রায়ই নাই, কেবল মাত্র মোগল রাজ-প্রাসাদের কয়েকটী ধ্বংশাবশেষ আছে। এই স্থানে এখন ইয়োরোপীয় সৈন্যগণ বাস করে। সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে নগরের বহির্ভাগ হইতে প্রায় ৩০০ গজ স্থান অট্টালিকা শূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

উত্তর পশ্চিম কোনে সেলিম সাহ কর্ত্তৃক "সেলিম গড়" স্থাপিত হইয়াছে এবং এই স্থান হইতে যমুনার উপরে একটী সুন্দর ও সুদৃঢ় সেতু অতিক্রম করিয়া রেলওয়ে দিল্লী নগরী প্রবেশ করে। উত্তর পূর্ব্ব কোনে কাশ্মীর গেটের নিকটে টাকশাল জেলা বোর্ড এবং অন্যান্য আফিস্ অবস্থিত এবং এই সমস্তের দক্ষিণে গির্জ্জা, টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট আফিস স্থাপন করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। নগরীর উত্তর পশ্চিমাংশে ছোট একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের লাইন গিয়াছে, ইহাই রিজ (Ridge) নামে অভিহিত, ইহাই বিস্তৃতি যমুনা পর্য্যন্ত। নগরীর বহির্ভাগে পশ্চিমে ও উত্তর পশ্চিম কোনে কয়েকটী বাজার আছে, তন্মধ্যে "সিবাজি মন্দির" বাজারই সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ। সদর বাজার, তিশিয়ারা এবং পারেগঞ্জ নামে আরও কয়েকটী বাজার আছে।

নগরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর মন্দির, জুমা মসজিদ। সম্রাট সাহজাহানের (১৬২৭—৫৮) সময় নির্ম্মিত এবং কথিত আছে যে ইহার নির্ম্মাণ কল্পে ১০,০০,০০০ দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহা রক্ত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, বৃহৎ আঙ্গিনা বিশিষ্ট, এবং আঙ্গিনার পশ্চিম পার্শ্বে মসজিদটি দণ্ডায়মান রহিয়া পর্য্যটককে বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত করিয়া ফেলে। মসজিদটির আকৃতি দীর্ঘ চতুরাংশ ২০১ ফিট দৈর্ঘে এবং ১২০ ফিট প্রস্থে। ইহার তিন দিকে শ্বেত মার্ব্বেল নির্ম্মিত এবং তামার উপর সোনার পাত মোড়া সুন্দর ৩টি গুম্বুজ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে শ্বেত মারবেল ও লোহিত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত প্রায় ১৩০ ফিট উচ্চ একটি মিনার আছে, সেখান হইতে দিল্লীর সমস্ত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা চাদনী চকের দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

১৩৫১ খৃষ্টাব্দে তুর্কমান গেটের নিকটে ফিরোজসাহ কর্ত্তৃক 'কালাম মসজিদ' নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার এখন ধ্বংসাবস্থা।

দুর্গের মধ্যে কতগুলি সুন্দর ২ অট্টালিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। দুর্গের প্রবেশ দ্বার লাহোর গেট রক্তপ্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। বর্ত্তমানে এ স্থানে ইউরোপীয় সৈন্যগণের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদির বাজার বসে। লাহোর গেটের নিকটেই দেওয়ানী আম্ ইহার মধ্যে উত্তর দিক বন্ধ কিন্তু অন্য তিন দিক খোলা একটি প্রকাণ্ড কক্ষ রক্তপ্রস্তরের স্তম্ভের উপর অবস্থিত। নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানে "দেওয়ানী খাসের" অত্যুজ্জ্বল এবং দুর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। দেওয়ানী খাসের নিকটেই "মতি মসজিদ" অবস্থিত। ইহাও প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত এবং ইহা সম্রাট ও পরিবারবর্গের ব্যবহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইহার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

জুম্মা মসজিদের অনতিদূরে লালা হরকুমার সুকন চাঁদ কর্ত্তৃক ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জৈনদের একটি অতি সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

নগরীর বহির্ভাগে ও অন্তর্ভাগে অনেক সুন্দর সুন্দর উদ্যান আছে। সম্রাট সাহজাহনের কন্যা জাহানারা বেগমের আদেশে রেলওয়ে ও চাঁদনি চকের মধ্যে অর্থাৎ সহরের ঠিক মধ্যস্থলে রাণীর বাগান নির্ম্মিত হয়। নগরীর বহির্ভাগে কাশ্মীর গেটের নিকট কুডসিয়া বেগম কর্ত্তৃক কুডসিয়া উদ্যান নির্ম্মিত হয়। নিকটেই জন নিকলসনের প্রতিমূর্ত্তি সহ নিকলসন পার্ক অবস্থিত, সবজিখণ্ডি এবং খালের মধ্যবর্ত্তী স্থানে রোসেনারা এবং সিরহিন্দি উদ্যান অবস্থিত। বর্ত্তমানে এই বাগানটিই বৃহৎ এবং সুন্দর। সাজাহানের অন্যতম কন্যা এবং সম্রাট আরঙ্গজেবের প্রিয়া ভগ্নী রোসেনারা বেগমের মন্দির এখানে অবস্থিতি রহিয়াছে।

দিল্লীর ১১ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে কুতুবমিনার অবস্থিত। এই সুন্দর মসজিদটি ১২০০ খৃষ্টাব্দে কুতুবউদ্দিন কর্ত্তৃক আরব্ধ হইয়া ১২২০ খৃষ্টাব্দে আলটামাস কর্ত্তৃক নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। "কুতুব মিনার" উচ্চে ২৩৮ ফিট ১ ইঞ্চি, ব্যাস ৪৭ ফিট ৩ ইঞ্চি এবং উচ্চের ব্যাস প্রায় ৯ ফিট হইবে।

স্তম্ভদণ্ডটি পঞ্চতল বিশিষ্ট ও নানারূপ কারুকার্য্য খচিত। ইহার স্তম্ভগুলি রক্তবর্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত। নিম্নতলগুলি যথাক্রমে ৫০ ফিট ৮½ ইঞ্চি ৪০ ফিট ৩½ ইঞ্চি এবং ২৫ ফিট ৪ ইঞ্চি। এই ত্রিতলের মধ্যে

সর্ব্বনিম্নতলাটির অর্দ্ধ বৃত্তাকৃতি, দ্বিতীয়টির কোন বিশিষ্ট ও তৃতীয়টি সম্পূর্ণ গোলাকৃতি। প্রতি গৃহে অনেক খোদিত প্রস্তর লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে গুম্বুজটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে সমস্ত স্তম্ভগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। পুনরায় এই সমস্ত মেজর রবার্ট স্মিথের উদ্যোগে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাঁহারই চেষ্টায় ভগ্ন গুম্বুজটির পার্শ্বে একটি অতি সুন্দর "মোগল পটমণ্ডপ" স্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইহার সর্ব্বোচ্চ চূড়াটি লৌহ রেলিংএ পরিবেষ্টিত। এই স্তম্ভের ৪২৫ ফিট উত্তরে আলাউদ্দিনের অসম্পূর্ণ মিনার অবস্থিত। ইহা ১৩১১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। বোধ হয় নির্ম্মাণের সময় ইহাকে কুতুবদ্দিনের মিনারাপেক্ষা। দ্বিগুণ উচ্চ করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ৮৭ ফিট উচ্চ করিবার পরে, কি কারণে বলা যায় না, নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ হয়।

"কুতুবমিনারের" নিকটবর্ত্তী স্থানে রাজা ধবের অত্যাশ্চর্য্য একটি মনুমেণ্ট দৃষ্ট হয়। এই স্তম্ভটি ২৩ ফিট ৮ ইঞ্চি দৈর্ঘে, এবং বেড় ২০ ফিট ২ ইঞ্চি, ইহার মধ্যে ১৮½ মৃত্তিকার উপরে। যদিও স্থানে স্থানে ইহার অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয় তথাপি সেই সুদূর অতীতকালে এরূপ একটি আশ্চর্য্যজনক মনুমেণ্ট নির্ম্মাণ হিন্দু জাতির পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নহে। ইহার পশ্চিম পার্শ্বে ছয় ছত্রে সংস্কৃতে লিখিত একটি প্রস্তরফলকে ইহার ইতিবৃত্ত খোদিত হইয়াছে। মিঃ জেমস্ প্রিন্সেপ এই শিলালিপির উদ্ধার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ইহাতে রাজা ধবের কীর্ত্তি কথা লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে আরও লিখিত আছে যে রাজা ধব স্বীয় বাহুবলে পৃথিবী বিজয় করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন।

কুতুবমিনারের অপর পার্শ্বে ১৩১০ খৃষ্টাব্দে "আলাই দরওজা" অথবা আলাউদ্দিনের "দরওজা" নির্ম্মিত হয়। প্রাসাদটি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট ভিতরের ৩৪½ ফিট ও বাহিরের ৫৬½ ফিট পরিধি। কোন গুলি খিলান করা। ইহার প্রত্যেক পার্শ্বেই উচ্চ দরজা আছে এবং ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ ও উত্তরের দরজা দুইটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত "দরওজা" বহু মূল্য সজ্জায় সজ্জিত এবং প্রত্যেক দরওজার তোরণ গুলি অশ্বের পায়ের খুরের (নালের) ন্যায় খিলান করা হইয়াছে। কুতুবমিনারের নিকটেই কিলা রায় পিঠোরার নামে একটি হিন্দু দুর্গ আছে।

কুতুবমিনার এবং দিল্লী নগরীর মধ্যস্থলে সম্রাট আহাম্মদ শাহের উজির শাফদার জঙ্গের স্তম্ভ অবস্থিত। এই স্তম্ভটী বর্ত্তমান দিল্লী নগরী যেখানে অবস্থিত তাহা হইতে ৫ মাইল দূরে এবং প্রকাণ্ড একটী বাগানের মধ্যস্থলে কতগুলি খিলান কক্ষ বিশিষ্ট একটী উচ্চ বেদীর উপর অবস্থিত। ইহার ছাদটী একটী মার্ব্বেল গম্বুজ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত। এবং চতুষ্কোণ উন্মুক্ত মার্বল তাম্বু কর্ত্তৃক রক্ষিত। বাগানটীর ক্ষেত্রফল প্রায় ৩০০ গজ এবং প্রত্যেক কোণে অষ্টভুজ উচ্চ প্রাসাদ অবস্থিত ও প্রত্যেক পর্দ্দাগুলি লালবর্ণের প্রস্তরের দ্বারা আবৃত। ইহার কিঞ্চিৎ উত্তরে তিনটী গম্বুজ বিশিষ্ট একটী মসজিদ এবং লালবর্ণের পাথরের নির্ম্মিত তিনটী খিলান প্রবেশ দ্বার আছে। উচ্চ বেদীর উপরে অবস্থিত গম্বুজটী উচ্চে ৯০ ফিট এবং নীচের মৃত্তিকায় ১০ ফিট স্থান নিয়া অবস্থিত। বেদীর মাঝে সাফদার জঙ্গের কবর। কবরের উপরের অট্টালিকাটী ৬০ ফিট জায়গার উপর অবস্থিত এবং উচ্চতায় ৯০ ফিট হইবে। ইহার মাঝে ২০ ফিট জায়গায় নানারূপ চিত্রের সহিত সুন্দর একটী মনুমেণ্টসহ একটী হর্ম্ম্য অবস্থিত। এই সুন্দর হর্ম্ম্যটীর চতুর্দ্দিকে ৮টী কুঠরী; তন্মধ্যে ৪টী চতুষ্কোণ এবং অবশিষ্ট ৪টী অষ্টকোণ। মধ্যবর্ত্তীর কুঠরীটী ৪০ ফিট উচ্চ এবং ছাদের ভিতর দিকটা একটী সমতল গম্বুজের ন্যায় গঠিত। ছাদের মাঝে গোলাকার মার্বেলের একটী গম্বুজ। গম্বুজের ৪টী দরজা বেশ সুন্দরভাবে গঠিত। এখানে একটী জলের ফোয়ারা আছে। উহা একটী পাথর দ্বারা আবৃত রহিয়াছে এবং পাথরটী অপসারিত করিলেই গম্বুজের মাঝখানে জল দেখা যাইতে পারে।

দিল্লী নগরী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে কুতুব মিনার হইতে দিল্লীতে যাইতে হইলে রাস্তার ডান পার্শ্বে-"জান্তার মন্তর" দেখিতে পাওয়া যাইবে! জয়পুরের সাম্রাজ্য স্থাপয়িতা জ্যোতির্ব্বিং জয়সিংহ কর্ত্তৃক ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে মহাম্মদ শাহের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে এই জান্তার মন্তর" (Jantar Mantar) নির্ম্মিত হয়। কিন্তু ইহার নির্ম্মানকারীর মৃত্যুতে এবং সাম্রাজ্যের গোলমালের দরুণ নির্ম্মান কার্য্য শেষ হয় নাই। যাহাও শেষ হইয়াছিল তাহাও জাঠগন কর্ত্তৃক নষ্ট হইয়া গিয়াছে তথাপিও নির্ম্মান কারীর গুন গরিমা প্রকাশ পাইতেছে। বৃহৎ সূর্য্যঘড়িটি (Equinoctidal Dial) এখনও সম্পূর্ণ আছে, কিন্তু কাটাটী ও বৃত্তাকারের পরিধী অনেক স্থানে ক্ষতি হইয়াছে। ঘড়ির কাটাটী দৈর্ঘ্যে ১১৮

ফিট ১০৪ এবং উচ্চতায় (perpendicular) ৫৬ ফিট হইবে। ঘড়ির কাটাটি ব্যতিরেকে ছোট স্কেলের পর অন্য দুইটী কাটা আছে এবং সমস্তই দেওয়ালের গাত্রে সংবদ্ধ আছে এবং পূর্ব্ব অথবা পশ্চিম দিকে শায়িত আছে। ইহাতে দিক নির্ণয় সহজ। ঐ সূর্য্যঘড়ির ঠিক দক্ষিণে দুইটী অট্টালিকা (Buildings) আছে। ইহাদ্বারা নক্ষত্রের দিক নির্ণয় করা হয়। ইহাতে প্রত্যেকটীতে জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণের জ্ঞান গরিমা প্রকাশ পাইতেছে। দিল্লী গেটের বহির্ভাগে মথুরা রোডের নিকটে একটী বৃহৎ ব্যূহ আছে, ইহা ফিরোজশাহের লাট নামে খ্যাত। ইহা পূর্ব্বে ফিরোজের নগর কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ছিল এবং জনশূন্য হইয়া ধ্বংশমুখে পতিত হইয়াছে। অপরিষ্কৃত প্রস্তরখণ্ড সূচি ঘন ক্ষেত্রাকার অট্টালিকার উপরে বালুকাময় একটি ৪২ ফিট উচ্চ প্রস্তর স্তম্ভ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৩৫ ফিট পর্য্যন্ত শৃঙ্গটী খুবই সুন্দর, অবশিষ্ট বড়ই অপরিস্কার, উপরের পরিধি ২৫ ইঞ্চি এবং নিম্নের পরিধি ৩৮ ইঞ্চি হইবে। প্রস্তরের বর্ণ শুষ্ক পুষ্পের ন্যায় এবং দেখিতে বালুকা প্রস্তরের ন্যায় কুৎসিৎ। মগধের রাজা অশোকের পৃথিবীব্যাপি ক্ষমতা প্রকাশের জন্য তাঁহার আদেশে ইহা নির্ম্মিত হয়—ইহাই ইহার প্রধান বিষয় বলিয়া মনে হয়। তাঁহার আর একটী আদেশ ইহাতে খোদা আছে যে ইনি খৃষ্টের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাস করিতেন। মথুরা রোডের দূরে পূর্ণ কালিয়া অথবা কোরাদ্রপথ"। ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে ইহাই দিল্লির প্রাচীন অংশ। হুমায়ুনের পুত্র আকবর পূর্ণকালিয়ার সংস্কার করিয়া দিলপাশা" নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু অল্পদিনেই ইহা পরিত্যক্ত হয়। এবং পুনরায় এই দুর্গটি পূর্ণকালিয়া নামে অভিহিত হইতে থাকে। উপরে লিখিত রাস্তার কিঞ্চিৎ দূরে হুমায়ুনের সমাধিস্তম্ভ। এই সমাধিস্তম্ভ ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে ১০ লাক টাকাব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। হুমায়ুনের সমাধি ভিন্ন অনেক পরিবারের সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কবর মোগল বংশের বংশ পরম্পরায় সমস্ত সম্রাটের কবর বলিয়া খ্যাত করা যাইতে পারে। শিপাহী বিদ্রোহের সময় দিল্লী অবরোধের পর এই স্থানই শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ ব্রিটিশ শাসন কর্ত্তাদের নিকট আত্মসমর্পন করেন এবং তাঁহার চক্ষের সম্মুখে হডসন (Hodson) কর্ত্তৃক তাঁহার ছেলে ভ্রাতুস্পুত্র প্রভৃতিকে সরাসরি বিজয়পূর্ব্বক গুলি করত মারা হয়। হুমায়ুনের সমাধি-স্তম্ভ

যমুনার নিকটে অবস্থিত। পশ্চিমে এবং দক্ষিণে আরও দুইটী উচ্চ স্তম্ভ আছে এই স্তম্ভ মার্বেল এবং লাল পাথর কর্তৃক নির্ম্মিত। বাগানের মধ্যস্থলে ২০ ফিট উচ্চ ও ৪৫ ফিট চতুর্ভুজ বিশিষ্ট একটি মঞ্চ ও ৫ ফিট উচ্চ ও ১০০ গজ চতুর্ভুজ একটী মঞ্চকে অতিক্রম করিয়া উচ্চে অবস্থিত রহিয়াছে। উচ্চ মঞ্চের মধ্যে হুমায়ুনের কবর ও অন্যান্য মোগল রাজাদের কবর রহিয়াছে। এই সমস্ত কবরের উপর কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহার মধ্যের কোঠাটীর ক্ষেত্র ৪৫ গজ হইবে। ইহা লাল পাথরে নির্ম্মিত ও মার্বল শৃঙ্খল দ্বারা সজ্জিত। প্রধান কবরের আকৃতি চতুষ্কোন এবং কোনগুলি অষ্ট কোনের ন্যায়, ইহার ৪টী পার্শ্ব ছোট অপর ৪টী লম্বা। অন্যান্য কোঠাগুলির কোন গির্জ্জার ন্যায় আকৃতি। কিন্তু স্তম্ভের নীচের আকৃতি চতুষ্কোন এবং একটী তাম্রনির্ম্মিত শৃঙ্গসহ মার্বেলগম্বুজ দ্বারা অলঙ্কৃত। গম্বুজগুলিতে ২টী তালা উপরের তালায় গম্বুজগুলির এবং মধ্যস্থানের কোঠায় একটী সরু উচ্চ মঞ্চ (Gallery) আছে। ছাদটী গোলাকার ও ৪০ ফিট উচ্চ এবং গম্বুজাকৃতি। অর্থাৎ স্তম্ভটী নিচে ৪০ ফিট জায়গায় অবস্থিত এবং ৭২ ফিট শৃঙ্গ পর্য্যন্ত উচ্চ। স্তম্ভের ভিতর ২৪ ফিট এবং একটী প্রবেশ পথ আছে। স্তম্ভটী লাল ও ধূসর বর্ণ বিশিষ্ট বালুকাময় প্রস্তরের নির্ম্মিত। হুমায়ুনের সমাধি স্তম্ভের কিঞ্চিৎ দূরে নিজামুদ্দিনের সমাধিস্তম্ভ। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৮½ এবং প্রস্থে ১৯½ এবং এই প্রাচীরের ভিতরে আকবরের কন্যা এবং রাণীদের কবর। ইহার বাম পার্শ্বেও প্রথম উর্দ্দু কবি খসরুর সমাধিস্তম্ভ।

সুলতান আলতামাসের কন্যা রাণী রিজিয়া কেবল দিল্লীতে একমাত্র স্ত্রীলোক রাজত্ব করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি অতি সুন্দরী ও শিক্ষিতা রমণী ছিলেন। যাহা হউক তাঁহার সৌন্দর্য্যে ও শিক্ষায় শীঘ্রই তাঁহার সুখ রবি অস্তমিত হইল। কতগুলি আফগান মনে করিয়া ছিল যে তিনি একজন দাস আবিসিনিয়ান যুবাকে দয়া দেখাইয়াছেন—এই সংকল্পে আসিয়া তাহারা তাঁহাকে নিহত করে।

ঐ একই রাস্তার উপরে ওখোলা (okkla) এবং the canal head worles. এই স্থানটী বনভোজন এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদের জন্য আজকাল ব্যবহৃত হয়। স্থানটি বড়ই মনোরম। যমুনা সেতুটী ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সেতু।

মথুরা রোডের কিছু দূরে এবং দিল্লী হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে গিয়া তোগলকবাদের দুর্গ। উচ্চ পাহাড়ের উপর এবং অনেক সঙ্কীর্ণ পথে পরিবেষ্টিত। ইহার প্রাচীর খুব পুরু পাথর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কিন্তু এক্ষণে ইহা ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীপ্রমোদকৃষ্ণ দেব বি, এ, (কুমার বাহাদুর)

ছায়া।

(নাটক)

মুখবন্ধ।

ফরাসী ইতিহাসের জোয়ান্ অব্ আর্কের গল্প অবলম্বনে এই নাটকখানি লিখিত। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দিতে ইংরেজরা ফরাসীদেশ জয় করেন। ফরাসী দেশের উত্তরার্দ্ধ অধিকার করিয়া ইংরেজসেনাপতি অর্লিন্স দুর্গ অবরোধ করেন। এই দুর্গ অধিকার করিতে পারিলে ফরাসী দেশের দক্ষিণার্দ্ধ সহজেই ইংরেজের পদানত হয়। এই সময় জোয়ান্ অব্ আর্ক নাম্নী কোন কৃষকবালিকা ইংরেজ-বিজিত ফরাসী দেশের দুর্দ্দশাকাহিনী নিয়ত চিন্তা করিতেন। সহসা কোন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবমূর্ত্তি তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে ফরাসী দেশ উদ্ধার করিতে বলেন। অর্লিন্স দুর্গ উদ্ধার করিয়া রীম নগরে গিয়া ফরাসীরাজকে অভিষেক করিবে এই মাত্র জোয়ানের প্রতি দেবাদেশ ছিল। জোয়ান ফরাসীরাজের নিকট এই অদ্ভুত কাহিনী বিবৃত করিলেন,—ফরাসীরাজ জোয়ানকে সৈন্যভার দিলেন। জোয়ান অবিলম্বে অবরুদ্ধ অর্লিন্স নগর উদ্ধার করিলেন। তাহার পর জয়ের পর লাভ করিতে করিতে বিজয় ফরাসী সৈন্যসহ রীম নগরে উপনীত হইলেন। রাজার অভিষেকান্তে দেবাদেশ পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া জোয়ান রাজার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু রাজা এবং রাজার আমাত্য ও অনুচরবর্গ কেহই জোয়ানকে বিদায় দিতে চাহিলেন না। সকলের নিবর্ন্ধাতিশয্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোয়ান আবার সৈন্যভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ করিতে আর তাঁহার প্রতি দেবাদেশ নাই এই চিন্তায় তিনি মনের বল হারাইলেন। ইহার অল্প পরেই তিনি ইংরেজ হস্তে বন্দিনী হন। ডাকিনী বলিয়া ইংরেজ তাহাকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যা করিল।

ফরাসীবাসীর প্রাণে জোয়ান যে অদমনীয় সাহস উৎসাহ ও বলের সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাঁহার এই ভীষণ শোচনীয় পরিণামে তাহা নষ্ট হইল না। ইংরেজকে বিদূরিত করিয়া ক্রমে ফরাসীগণ দেশ স্বাধীনতা লাভ করিল। বস্তুতঃ জগতের ইতিহাসে জোয়ান অব্ আর্কের জীবনী অপেক্ষা অদ্ভুত ঘটনা আর দেখা যায় না। পৌরাণিক যুগে এরূপ ঘটনা হইলে এ আখ্যান মিথ্যা কল্পনাপ্রসূত বলিয়া সকলে অগ্রাহ্য করিতেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। এইরূপ অদ্ভুত কাহিনী সম্বলিত নাটক চিত্তাকর্ষক হইতে পারে, এই আশায় এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই নাটকের নায়িকা 'ছায়া'ই ফরাসী ইতিহাসের জোয়ান।

প্রাচীন ইরাণ বা পারসিক জাতি এবং কাশ্মীরের হিন্দুর মধ্যে কোন কাল্পনিক যুদ্ধ নাটকের ঘটনাবলীর কেন্দ্র স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রাচীন ইরাণী জাতির ধর্ম্ম, সমাজ ও আচার ব্যবহার প্রভৃতি বঙ্গীয় সাধারণ পাঠকের অজ্ঞেয়। নাটকের মধ্যে প্রাচীন ইরাণীদিগের ধর্ম্ম ও সমাজ প্রসঙ্গে কোন কোন উক্তি বঙ্গীয় পাঠকের দুর্ব্বোধ্য হইতে পারে, তাই সে সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটী কথা লিখিত হইল।ঃ—

হিন্দু ও ইরাণী যে প্রাচীন আর্য্য জাতির দুইটি অতি নিকট শাখা এবং ভারতে আর্য্যবসতির অব্যবহিত পূর্ব্বে যে এই দুই শাখা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল, ইহা বিজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের সূক্ষ্ম গবেষণা ও সিদ্ধান্তের ফলে একরূপ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত।

দেবপূজক হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ এবং অসুরপূজক ইরাণীর ধর্ম্মগ্রন্থ জেন্দ আবেস্থার ভাষা, ধর্ম্মতত্ত্ব ও উপাসনা-প্রণালী প্রভৃতি তুলনা করিলে অতি আশ্চর্য্য নৈকট্য অনুভূত হইবে। হিন্দু ও ইরাণীর মধ্যে দেব পূজা ও অসুর-পূজা লইয়া ঘোর বৈষম্য ও বিবাদের আভাস ঐ সব প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই বৈষম্য ও বিবাদই হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থে বিবৃত দেবাসুর যুদ্ধের কল্পনার মূল, অনেক পণ্ডিত এইরূপ অনুমান করেন। প্রাচীন ইরাণের ধর্ম্মগুরুর নাম জরাথুস্ত্র (Zoroaster)। ইহাঁর প্রণীত গাথা নামক স্তোত্রাবলী ইরাণীর ধর্ম্মগ্রন্থের প্রধান ও মূল অংশ। উপাসনাপ্রণালীও বৈদিক যজ্ঞের অনুরূপ এবং 'যজ্ঞ' বলিয়াই কথিত। ইরাণী ধর্ম্মের প্রধান উপাস্য "অহুর মজদেও"

বৈদিক 'অসুরমেধস্' শব্দের রূপান্তর। এই অহুর মজদেও নাম ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া অহুর অর্ম্মজদ্ এবং সর্ব্বশেষে অর্ম্মজদ্' নামে পরিণত হইয়াছে।

প্রাচীন ইরাণ বা পারস্যদেশে মুসলমান বিপ্লব উপস্থিত হইলে ধর্ম্মরক্ষার্থ বহু ইরাণী ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান পার্শীসম্প্রদায় ইঁহাদেরই বংশধর। ইঁহারা এখনও প্রাচীন ইরাণীধর্ম্ম অনুসারে অর্ম্মজদের উপাসক। অগ্নিতে আহুতি দান ইঁহাদের উপাসনার প্রধান অঙ্গ। তাই অনেক তাঁহাদিগকে অগ্নি-উপাসক বলেন। বৈদিক হিন্দুগণও এই হিসাবে অগ্নির উপাসক।

দেবপূজা ও অসুরপূজা লইয়া বৈষম্য ও বিবাদ বিচ্ছেদের পর এই উভয় জাতির ধর্ম্ম বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হিন্দুর ধর্ম্ম বেদ ও উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিশ্বরূপ ও বিশ্বময় ব্রহ্মবাদে পরিণত হয়। কিন্তু ইরাণী ধর্ম্মে সম্পূর্ণ পৃথক ও নূতন একটী ভাবের বিকাশ হয়। জগতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়েরই অস্তিত্ব ও প্রভাব দেখিয়া ইরাণী ধর্ম্মগুরু জরাথুষ্ট্র ধর্ম্মের আধারস্বরূপ প্রধান উপাস্য অহুর-মজদেও হইতে উদ্ভূত ধর্ম্মদেব বহোমানের শক্তির বিরোধী এবং অধর্ম্মের আধার-স্বরূপ অংগ্রিম্যান্ বা অহ্রিমান্ নামক কোন শক্তির কল্পনা করিয়া তাহাতে ব্যক্তিত্বের আরোপ করেন। এই উভয় শক্তির বিরোধই ধর্ম্মাধর্ম্মের বিরোধ বলিয়া তিনি ব্যাখ্যা করেন। ইরাণের সমীপবর্ত্তী প্রাচীন খল্‌দিয়া (Chaldea) য়িহুদিধর্ম্মের উৎপত্তি স্থল। পরস্পর সংস্পৃষ্ট য়িহুদি, ঈশায়ী (খৃষ্টান) ও মুসলমান ধর্ম্মের 'শয়তান' বাদ সম্ভবতঃ ইরাণীধর্ম্মের অধর্ম্মশক্তি 'অহ্রিমান্' বাদ হইতে উদ্ভূত।

নাট্যোল্লিখিত ইরাণ দেশীয় ব্যক্তিগণের নাম প্রাচীন ইরাণের ইতিহাস হইতে সংগৃহীত। এই নাম গুলি হইতে প্রাচীন ইরাণী ও হিন্দুর ভাষাগত সাদৃশ্যও পাঠকবর্গের পরিলক্ষিত হইবে।

গ্রীক ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত ইংরেজী ইতিহাসে কতিপয় ইরাণী নামের রূপান্তর আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

বিস্তাস্প (Hystaspes), ক্ষয়র্ষ (Xerxes), কুরুষ (Cyrus), রোক্ষণা (Roxana), অমিতা (Amytis)। ইরাণ দেশে ধর্ম্মযাজক গণ 'মঘ'

নামে অভিহিত। ইংরেজি Magus বা magi নাম এই 'মঘ' নামের রূপান্তর ।*

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত, এম্, এ।

*বাইশ বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে এই নাটকখানি রচিত হয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে ইহাই আমার প্রথম চেষ্টা। স্বর্গীয় সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক উৎসবে মাদারীপুরে স্থানীয় আদি বান্ধব নাট্য সমাজ ইহার অভিনয় করেন।

ছায়া।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

—:*:—

পুরুষ।

মুকুলদেব	...	কাশ্মীররাজ।
বীরবল	...	সেনাপতি।
সপ্তপাল	...	সাবণ দুর্গরক্ষক।
বামদেব	...	রাজপুরোহিত।
হলধর	...	বৃদ্ধ কৃষক।
সুবজ	...	হলধরের পালিত।
দামোদর	...	মন্ত্রী।
বিস্তাস্প	...	ইরাণরাজ।
ক্ষয়র্ষ	...	ঐ পুত্র ও সেনাপতি।
কুরুষ	...	ইরাণের সহকারী সেনাপতি—ক্ষয়র্ষের বন্ধু।
কবাধ	...	ইরাণ রাজমন্ত্রী।
গোমত	...	প্রধান ইরাণীয় মঘ বা পুরোহিত।

ভৃত্য, প্রহরী, সৈনিকগণ, বন্দিগণ, ব্রাহ্মণগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

কাশ্মীরের রাজলক্ষ্মী।

উর্ম্মিলা	...	কাশ্মীর মহিষী।
ছায়া	...	হলধরের কন্যা।
রোক্ষণা	...	ইরাণরাজের পালিতা বন্ধুকন্যা।
অমিতা	...	ঐ সখী।

দেবদাসীগণ।

ছায়া।

—:*:—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পার্ব্বত্য বনভূমি।

ছায়া।

(গান)

একা বনপাশে কাঁদি বসে নিতি
শূন্য আকাশে ওঠে প্রাণের হাহাকার
সারা প্রাণময় দারুণ জ্বালায়
প্রাণ গলে বয় নয়নে ধার!
প্রাণের হাহাকার শূন্যে মিলায়,
নয়নের ধারা বিজনে শুকায়,
এমনি কি প্রাণ বিফল রোদনে
যাবে ফুরাইয়ে বয়ে মিছে ভার!
থাক যদি কেহ দেবতা গগনে,—
এই হাহাকার এ ধারা নয়নে
দিগ্‌দিগন্তে যাও নিয়ে যাও—
জাগাও সবার প্রাণে হাহাকার—
নয়নে নয়নে এ নয়নধার।

(রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব)

(গান)

কে রে—কে রে—আজ জাগালি আমায় !
দারুণ পীড়নে ব্যথিত পরাণে মৃতসম পড়ে আছিনু হেথায় !
ত্থাথ্ চেয়ে ত্থাথ্ মায়ের হৃদয়—
সন্তান-শোণিতে দ্যাখ্ ভেসে যায়,—
নয়ন সলিলে পরাণ শুকাল তবু এ শোণিত ধুয়ে নাহি যায় !
সরল প্রাণের আকুল রোদনে
জাগালি কে আশা নিরাশ পরাণে,—
বুকে এই ভার বহিতে পারিনে, তুলে নে তুলে নে বাঁচারে আমায় !

ছায়া।—একি, একি ! কে মা তুমি ! দেবতা মানুষ
কিবা ? কেন মা হেথায় ? কি দুখে মা আঁখি
ভাসে জলে ? কেন বহে বুকে রক্তস্রোত ?

রাজলক্ষ্মী।—বলিতে বিদারে বুক, অভাগিনী আমি
কাশ্মীরের রাজলক্ষ্মী ! তুষার মণ্ডিত
ওই অভ্রভেদী উচ্চ গিরিচূড়ারাজি
উঠিয়াছে সুনীল গগনে, নিম্নে ওই
শ্যামশোভা উপত্যকা সুজলা সুফলা,—
ভূতলে স্বরগ যেন সোনার কাশ্মীর !
হায়, সে স্বরগ আজি বিধির লিখনে
ইরাণী দানব পদে দলিত লাঞ্ছিত !
স্বর্গচ্যুতা লক্ষ্মী আমি অনাথিনী আজ
কেঁদে ফিরি একা বনে বনে। প্রাণময়
দারুণ জ্বালায় প্রাণে গলে অবিরল
বহে আঁখিজল। ইরাণীর খড়্গাঘাতে
শত শত সন্তান নিহত, ভাসিতেছে
অভাগী জননী বক্ষ সেই রক্তস্রোতে।

দুর্ব্বিসহ ভার প্রাণে বহিতে না পারি'
ছিনু হেথা অবসন্ন প্রায়। আজ তোর
সরল বেদনাময় আকুল আহ্বানে
বিধির আশ্বাসবাণী প্রাণে অনুভবি,
বিধির ইঙ্গিতে আপনারে তোর কাছে
করিনু প্রকাশ। বিধির নিয়তি তুই
কাশ্মীর স্বরগে পুন অধিষ্ঠিত করি'
মোরে ঘুচাইবি দুখভার! ওঠ্ বালা,
যালো ত্বরা, কর্ সে নিয়তি পূর্ণ।

ছায়া।— মাগো
জানি আমি ছারখার সোনার কাশ্মীর
দুরন্ত ইরাণী দস্যু দারুণ পীড়নে।
জানি মা কাশ্মীরলক্ষ্মী রাজরাজেশ্বরী
তুমি কাশ্মীর স্বরগচ্যুতা অভাগিনী
দীনা কাঙ্গালিনী! নিভৃত এ বনপাশে
এ দুঃখ কাহিনী একা চিন্তি মনে মনে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া চাহি আকাশের পানে,
ডাকি দেবগণে, প্রাণের বেদনা যত
জানাই তাঁদের,—দীন বালিকার এই
কাতর রোদনে প্রসন্ন দেবতা কেহ
যদি চান ফিরে' করুণা নয়নে এই
শত্রুপদ বিদলিত কাশ্মীরের পানে!

রাজ।—বিধাতা আপনি তাই করুণা নয়নে
চেয়েছেন কাশ্মীরের পানে। স্বদেশের
দুঃখে যার প্রাণ গলি' বহে অশ্রুধার,
বিধি নিজে দ্রব হয়ে সেই অশ্রুধারে
নিয়োজিত করেন তাহারে সাধিবারে
স্বদেশ কল্যান।

ছায়া ।— মাগো, জ্ঞানহীনা দীনা
আমি কৃষক বালিকা, বনপ্রান্তে হেথা
গোচরণে কাটাই জীবন। রাজনীতি,
রণনীতি কিছু নাহি জানি। মহাবল
কাশ্মীরভূপতি, প্রাণপণে অরিসনে
যুঝি নিরন্তর, পারেনি সাধিতে যাহা,
কেমনে, কি শক্তি বলে সাধিব তা আমি?
অসাধ্য এ ব্রতে মম বিধির বিধান
কিছু বুঝিবারে নারি।

রাজ ।— বিধির বিধান
বিধি বোঝেন আপনি। জানেন বিধাতা
নিজে—কোথা কোন্ সূত্রে ইচ্ছা তাঁর
ধরায় হইবে পূর্ণ। সে ইচ্ছা পূরণে
নিমিত্ত মানবে যোগ্য শকতি বিধান
আপনি করেন বিধি। বিধির আদেশ
তোরে জানাইনু বালা। ছাড়ি, দ্বিধা ভয়
ভক্তি ভরে দেবাদেশ নে লো শিরে তুলি!
দেবতা দেবেন শক্তি, দেখাবেন পথ
মঙ্গল বাসনা তাঁর পুর্ণ করিবারে।

ছায়া ।—লইলাম শিরে তুলি' দেবতা আদেশ।
আজি হতে জীবনের একমাত্র ব্রত
মম স্বদেশের উদ্ধার সাধনে, মাগো,
পুণ্য ইচ্ছা বিধাতার ধরায় পূরণ।
শক্তিদাতা নেতা মম বিধাতা আপনি,—
ভয় কি আমার? কিসেরি বা ভয় আর?
স্বদেশ কল্যাণ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি যার
জীবনের, স্বদেশের মঙ্গলামঙ্গল
মাত্র জীবনের মঙ্গলামঙ্গল তার।

রাজ।—ধন্য ধন্য বালা! ধন্য আমি ভাগ্যবতী
তোমা হেন অতুলন সন্তান রতনে।
ছায়া।—জননী জনমভূমি মূর্ত্তিমতী দেবী
তুমি, লহ নমস্কার! জনমে জনমে
দাসী আমি ও চরণে। যাচি আশীর্ব্বাদ.
জীবনে মরণে শক্তি না হারাই কভু
তোমার সেবায়।
রাজ।— দেবতা বাঞ্ছিত রত্ন
তুমি এ ধরায়। শক্তিমতী চিরদিন
দেব শক্তি বলে সাধ কার্য্য দেবতার।
জীবনে মরণে রাখুন দেবতা কোলে
যতনে তোমায়।
ছায়া।— আশু কি আদেশ মাগো
কোথা যাব কি করিব, জানাও দাসীরে।
রাজ।—ইরাণী সমরে বারবার পরাজিত
ভাগ্যহীন কাশ্মীর-ভূপতি কাশ্মীরের
প্রান্তভাগে লাঞ্ছিত জীবনভার বহে
কোন মতে। ভগ্নোদ্যম ক্লান্ত রাজসেনা
রহিয়া সারণ দুর্গে রক্ষিছে রাজায়।
জয়মদে উন্মত্ত ইরাণীর করে
সারণ পতিত প্রায় সে দুর্গ পতনে,
হায়, সমগ্র কাশ্মীর হবে চিরতরে
ইরাণীর করকবলিত। অবিলম্বে
যাও, বালা, কাশ্মীর নৃপতি পাশে,
জানায়ে রাজারে রাজলক্ষ্মীর আদেশ—
লয়ে সৈন্যভার উদ্ধর সারণ দুর্গ।
তারপর কাশ্মীরের রাজকুলাবাস
চিরপুণ্য রাজধানী করি' অধিকার,

মুক্ত পিতৃ সিংহাসনে বিলুপ্তশ্রী-লঙ্ক
রাজে অভিষেক কর পুন। ভগ্নোদ্যম
নিরাশ নির্জ্জীব রাজা, রাজ সেনাচয়;
সঞ্চারিয়া সঞ্জীবনী শকতি নূতন,
তাদের সে শক্তিহীন নিরাশ নির্জ্জীব
প্রাণ কর পুন জাগরিত। তারপর
কঠোর পুরুষ করে করি সমর্পণ।
কঠোর সমর ভার, বিজন আবাসে
এই শান্তিময় বনপাশে আয় ফিরে,
কাটাইতে শান্তিময় পবিত্র জীবন।
রক্তে পুন আর করিস্‌না কলঙ্কিত
কোমল রমনীকর। একবার যদি
নবোৎসাহে, নূতন আশায়, জাগরিত
হয় প্রাণ, নিয়ে নিজ সেনাগণ, রাজা
সাধিবে আপন কাজ। ত্যজি' লজ্জা ভয়
নির্ভীক্ হৃদয়ে বালা হ'লো অগ্রসর
দেবাদিষ্ট পথে! চাস্‌নি পশ্চাতে ফিরে'
ক্ষুদ্র কোনো স্বার্থ আশে! থাকে যদি প্রাণে
কোনো লুকান বাসনা, দেবতার দ্বারে
বলিদান করিয়া তাহারে, আত্ম সুখ
আত্মচিন্তা ভুলিয়া সকল, পাল্‌ বালা
এক মনে দেবতা আদেশ। (অন্তর্দ্ধান।)

ছায়া—　　　　　　　　একি! একি!
একি হল! কই, কোথায় গেলেন দেবী?
ছিনু কি স্বপনঘোরে, সহসা জাগিনু?
বিস্ময়ে আপন হারা—ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধি
কোথায় গিয়েছে ছুটে! ভাবিতে ভাবিতে
ইন্দ্রাণীপীড়নে কাশ্মীরের দুঃখ যত,

বুঝি মাথা ঘুরে' গেল—বিকারে রোগীর
মত দেখিনু এ আশ্চর্য্য স্বপন! আমি
ক্ষুদ্র কৃষক বালিকা—মোরে কেন দেবে
দেখা কাতর কাশ্মীরলক্ষ্মী! ক্ষণিকের
উন্মাদমোহের ঘোরে নিশ্চয় আছিনু,
নহিলে কেন বা——

(নেপথ্যে ইরাণীর জয়ধ্বনি।)

এ কি! এ কি! ইরাণীর—
জয়ধ্বনি এ যে! সর্ব্বনাশ! কোথা যাব?
কোথায় পালাব? কোথা পিতা? সুবজ্র বা
কোথা? একা যে অবলা আমি, কে রক্ষিবে
মোরে!

(পুনঃ জয়ধ্বনি।)

রাজলক্ষ্মী! কোথায় মা রাজলক্ষ্মী!
সত্য যদি দেখা দিয়েছিলে, আরবার
দাও দেখা! বল দাও এ বিপত্তি কালে!

(পুনঃ জয়ধ্বনি।)

(বেগে আহত হলধরের প্রবেশ)

হল—ছায়া! ছায়া! আছিস্ হেথায়?

ছায়া— পিতা, পিতা!
কেন? এ কি, এ কি! রক্ত কেন এত?
কি হয়েছে!

হল— ছায়া, আহত হয়েছি আমি!
এসেছে ইরাণী—লুঠিছে নগর তারা,
ঘরে ঘরে দিয়াছে আগুন! বাল বৃদ্ধ
নারী নর পাইছে যাহারে, পাঠাইছে
শমন আগারে। ওই শোন্ ঘন ঘন
উঠিতেছে ঘোর জয়নাদ! কোন মতে

তায় অস্ত্রাঘাত, সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা
বয়, চলিতে কি পারি! কিন্তু ছায়া, তুই
মোর স্নেহের পুতলী, জীবনের আলো
হেথা রহিয়াছিস্ একা! শত বাজী বল
তাই পাইনু এ দেহে—আসিনু ছুটিয়া!
দেহ অবসন্ন প্রায়—শকতি ফুরায়ে
আসে, এখনো ইরাণী লুঠে মত্ত, এই
বেলা কোথাও লুকাব চল্।

ছায়া— পিতা, কোথা
লুকাইব বল? এসেছে ইরাণী যবে,
যেথাও লুকাব—আজ হক, কাল হক,
পড়িব তাদের হাতে।

হল— এখন সময়
নয় সে কথা ভাবিতে,—সম্মুখে দাঁড়ায়ে
মৃত্যু, কি হবে দুদিন পরে ভাবিবার
এই কি সময়? চল্ যেথা পাই পথ
কি হবে দুদিন পরে কে পারে বলিতে?

ছায়া—চল তবে যেথা যাবে চল। কিন্তু, কই
পিতা, সুরজ কোথায়?

হল— গিয়াছে ছুটিয়া,
—যদি মেলে, যান অন্বেষণে। বৃদ্ধ আমি
আহত শরীর, তুই দুর্ব্বল বালিকা
শক্তি নাই দ্রুত পলায়নে। আসিবে সে
এই দিকে। পায় কি না পায় যান, মোরা
হই অগ্রসর। অবসন্ন হয়ে আসে
দেহ, এরপর নারিব চলিতে।

(উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গিরিপথ।

(ছায়া ও হলধরের প্রবেশ।)

হল—ছায়া! আরতো চলিতে নারি। আয় বসি
এইখানে।

(উভয়ের উপবেশন।)

ছায়া— পিতা, পিতা! কি হবে উপায়!
সুরথ তো এখনো এল না? নিরাপদ
কোন স্থানে কেমনে বা নিয়ে যাব তোমা?
নিকটে ইরানী—একজনো আসে যদি
রক্ষা নাই আর।

হল— উঃ! বড় তৃষ্ণা!
বড় তৃষ্ণা! বুক যে শুকায়ে যায়! ছায়া,
দ্যাখ্ যদি ঝরণা কোথাও মেলে। প্রাণ
বাঁচা জল দিয়ে।

ছায়া— যাই দেখি। পাব না কি?
পাহাড় পর্ব্বতে ঘেরা দেশ, ঝরণা কি
কোথাও নাই?

(প্রস্থান।)

হল— আঃ আহত এ বৃদ্ধ দেহ
কত আর পারি? যা কিছু আছিল বল
যেন একেবারে সঞ্চিত হইল দেহে
ছুটাইয়া আনিয়া হেথায় মোরে, যেন
একেবারে গেল ফুরাইয়া। নাই আর
দেহে ক্ষুদ্র পিপীলিকা বল, বুঝি—বুঝি
মরণ নিকট। হ'ক তাই হ'ক, ভয়

কি আমার তাহে ? জেনে শুনে মন্দ কায়ো
করিনি কখনো। দুঃখেরি বা কোন্ কথা,—
এতদিন খাটিনু সংসারে—বৃদ্ধকাল—
খাটীতে পারি না আর। মরণে বিশ্রাম
পাব চিরদিন তরে। এক চিন্তা—ছায়া,
আমি গেলে কি হবে তাহার ! কিন্তু আছে
তো স্বরূপ, সে কি মোর ছায়ারে ভাসিয়ে
দেবে ? পুত্র সম পেলেছি তাহারে, মনে
ভেবেছিনু তার হাতে স্নেহের পুতলি
মোর ছায়ারে সঁপিয়ে মিটাইব শেষ
আশা, জীবনের কর্ত্তব্য করিব শোধ।
হায়, এখনো আসিত যদি————

(ছায়ার প্রবেশ।)

ছায়া—　　পিতা, পিতা !
এই যে পেয়েছি জল। এই টুকু খাও—
তারপরে আরো জল এনে ক্ষত সব
দেবো ধুয়ে।

হল—,　　ছায়া, এখন আসনে কোথা ;
বস্ কাছে, স্থির হ'য়ে শোন্ কথা। ছায়া,
এ বিশ্ব জগতে তুই মোর একমাত্র
স্নেহের বন্ধন। সে বন্ধন ছিঁড়ে যেতে
প্রাণ কাঁদে। কিন্তু তবু যেতে হবে। আমি
যাই ছায়া ?——

ছায়া—　　পিতা, কোথা যাবে পিতা !
মোরে ছেড়ে কোথা যাবে পিতা ! যেতে আমি
দেবনা তোমারে ! তুমি চলে গেলে পিতা
কি হবে উপায় মোর ?

হল— ছায়া, কেঁদনা মা,
বৃদ্ধ আমি, কত দিন বাঁচিতাম আর ?
দুদিনের আগু পিছু—কিবা আসে যায়
তাতে ? ভয় কি মা ? সুরথ রয়েছে, তোরে
সেই তো রক্ষিবে ।

ছায়া— কোথায় সুরথ, পিতা ?
এখনো তো এলনা সে । বুঝি—বুঝি—
সেও বুঝি——

হল— চুপ কর্, চুপ কর্ ছায়া !
দুর্ব্বল করিস্‌নি মোরে আর । মৃত্যুকালে
কাঁদাস্‌নে মোরে । যা আছে কপালে, হবে ।
অদৃষ্টে যা আছে লেখা, কে পারে খণ্ডাতে ?
লঙ্ঘিবে কে ইচ্ছা দেবতার ? চলিলাম
আমি তাঁহারি ইচ্ছায় । যদি তাঁর ইচ্ছা
হয়ে থাকে—সুরথও——না, না, ছায়া !
নিশ্চয় সে আসিবে হেথায় । কথা শোন্
ছায়া,—ছি ছি, কেঁদে আর কাঁদাস্‌নে মোরে ।
ছায়া,—ছায়া ! স্থির কি হবিনে ? মৃত্যুকালে
দুটো কথা ব'লে যাব তোরে, শুনিবি না ?
রাখিবি না মৃত্যুকালে শেষ অনুরোধ
মোর ?

ছায়া— কি বলিবে বল পিতা বল । বুক
বাঁধিনু পাষাণে । বল পিতা, স্থির হ'য়ে
শুনিব সকল ।

হল— মাথার উপরে ছায়া
আছেন দেবতা, সবার রক্ষক তিনি ।
তাঁহার ইচ্ছায় পেয়েছিনু তোরে । এত
দিন রক্ষক আছিনু তোর—তাও তাঁরি

ইচ্ছা। আজ তিনি নিলেন আমারে; তাঁর
বাছা রাখিবেন তিনি। ভয় কি মা? আজ
হ'তে দেবতা রক্ষক তোর, যেই দিকে
চালাবেন তিনি, সহায় জানিয়া তাঁরে
সেই দিকে চলিবে সদাই। কোন ভয়
নাই ছায়া। লোকে বলে মরণের চেয়ে
বড় বিপদ নাহিক আর। সেটা ভুল—
বড় ভুল। যে জীবন পাপে কলঙ্কিত
শত গুণে মৃত্যু ভাল সে জীবন হতে।
অমঙ্গল ফেরে যার পশ্চাতে পশ্চাতে
মৃত্যু তার মঙ্গল নিদান। আর কথা—
নাহি সরে মুখে,—চক্ষে দেখি অন্ধকার।
ছায়া—ছায়া! যাই আমি——মৃত্যুকালে
পিতার এ শেষ কথা গুলি রেখ মনে——

(মৃত্যু।)

(মৃতদেহের উপর পতিতা ছায়ার রোদন।)

(রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব।)

গান।

কাঁদিস্‌নে বালা কাঁদিস্‌নে—
আর কাঁদিস্‌নে, আর কাঁদিস্‌নে—
মুছে ফেল আঁখিজল।
হোথা ওই দেবলোকে রহিবে সুখে
দেব সম পিতা তোর, কাঁদিস্‌নে।
দ্যাখ্‌ চেয়ে কতজন হারায়ে হৃদয় ধন
ভাসিছে আঁখিজলে তোরি মতন,—
সেই আঁখিজল
মুছাইতে—

দেবতা ডাকে তোরে ওই,—
চল্ চল্ চল্!
(অন্তর্দ্ধান।)

ছায়া।—সত্য কাঁদিব না আর। দেবতা ডাকেন
মোরে দেব কাজে, নিজ দুখে কাঁদিবার
এ নহে সময়। কেন বা কাঁদিব? পিতা
মোর দেব সম ছিলেন জীবনে; ছেড়ে
এ মাটির দেহ দেবলোকে রহিবেন
সুখে চির। রাজলক্ষ্মী! মাগো রাজলক্ষ্মী!
যে সান্ত্বনা দিলে মোরে, কভু না ভুলিব।
আত্ম দুখে সুখে তব আজ্ঞা অবহেলা
আর না করিব। সাক্ষী দেবগণ, সাক্ষী
তুমি সর্ব্বসাক্ষী তপন জগত প্রাণ,—
ইরাণীর অত্যাচারে প্রাণহীন হেথা
পিতৃদেহ মম। পরশি তাদের এই
নিষ্ঠুরতা নিদর্শন করিনু শপথ—
আজি হ'তে জীবনের মূলমন্ত্র মোর
দেবতা আদেশ এই। আজি হতে অন্য
চিন্তা নাই মোর, নাই অন্য কাজ। দিব
প্রতি রক্তবিন্দু আছে যা এ ক্ষুদ্র দেহে
নিবারিব নিদারুণ এই অত্যাচার—
উদ্ধারিব স্বদেশ আমার!

তৃতীয় দৃশ্য।

—:*:—

(রাজোদ্যান।)

ফুলবালাগণের প্রবেশ।

গান।

চল্‌লো নেচে নেচে সবে চল্,
ফুল বনে ফুল চয়নে
চল্‌লো নেচে নেচে সবে চল্ ॥
সই, ভোরের বেলা ভরে ডালা
তুলে ফুল গাঁথবো মালা,
(তাই) চল্‌লো নেচে নেচে সবে চল্ ॥
ফুরাল আঁধার নিশা—ওই রাঙা হাস হাস্‌ছে উষা,
ওই উঠ্‌ছে রবি রাঙা ছবি—
চল্‌লো নেচে নেচে সবে চল্।
পিউ পিয়া পিউ গাইছে পাখী
(তারা) গানের ছন্দে সুধা ঢালে—
চল্‌লো নেচে নেচে সবে চল্।
মলয় ঢলে ঢলে' খেল্‌ছে ফুলে—আন্‌ছে ফুলের বাসে,
সেই সুখ সুবাসে সবাই হাসে,—
চল্‌লো নেচে নেচে সবে চল্।

(প্রস্থান)

(রাজার প্রবেশ)

রাজা।—সুখের উষায় এই সত্য সুখী সবে!
ছিল একদিন, যবে উষার আলোকে
দূরে যেত হৃদয়ের যা কিছু আঁধার।
হাসিতাম উষার হাসিতে, সঞ্জীবনী
উষার পরশে অবসাদ ঘুম ঘোর

কোথা যেত ছুটে। জাগিতাম নব বলে
নবীন জীবনে। মাতাইত হৃদি মন
কি যেন কি নবীন মাতান ভাবে। কিন্তু
আজ! আজো তো এসেছে সেই একি উষা;
সেই একি হাসি আজো তো হাসিছে; সেই
তার সঞ্জীবনী শক্তি সমান রয়েছে।
তবে কেন হাসে না জাগে না প্রাণ? নব
ভাবে নব আশে মাতে না হৃদয়! ছিল
প্রাণ ফুলবনসম; ফুলবনসম
হাসিত যে উষার হাসিতে; ফুলে ফুলে
গুঞ্জরিত অলি, বিহগ কাকলী
কত বা উঠিত! বহিত মলয় সুখে,
ফুল চুমি' ছড়াইত সুবাস চৌদিকে।
সেই ফুল বনে হিমাচল যেন আজ
রয়েছে চাপিয়া। সর্ব্বসঞ্জীবনী উষা—
জীবন্ত জাগ্রত দিবা—বিরামদায়িনী
সন্ধ্যা শ্রান্তিবিনাশিনী—নিদ্রিত আঁধার
নিশা,—সকলি সমান! ভারক্রান্ত হৃদি
হাসি হীন প্রাণ হীন শান্তি হীন সদা।
দীন ফুলবালাগণ উষার হাসিতে
হাসিমাখা মুখে নেচে গেয়ে চলে গেল
কুসুম চয়নে। ভিখারিণী তারা ধনী
হাসি ধনে। রাজা আমি হাসির কাঙ্গাল!
উষার হাসিতে খেলিছে তাদের মুখে
যেই সুখ হাসি, ইচ্ছা হয় লই ভিক্ষা
মেগে সেই হাসিটুকু ভিখারী হইয়া!
ধিক্ ধিক্ এ জীবনে! কেননা মরিনু
মনে!

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী।—মহারাজ!

রাজা।—　　　　কে ও! মহারাণী? কেন
প্রিয়ে, এত শীঘ্র ভাঙ্গিল কি ঘুম? এত
ভোরে কেন উঠে এলে?

রাণী।—　　　　নাথ, যতক্ষণ
পাশে তুমি থাক, ততক্ষণ নিদ্রা মোর।
উঠে গেলে তুমি কি যেন আতঙ্কে ঘুম
ভেঙ্গে যায়! মহারাজ, না ডেকে আমায়
কেন উঠে এলে?

রাজা।—　　　　প্রিয়ে, হৃদয় জুড়িয়া
মোর দুশ্চিন্তা ফণিনী; বিষাক্ত দংশনে
জরজর সদা।—সুখ শয্যা বিষময়
মম। নিদ্রা নাহি কাছে আসে ভয়ে। সারা
নিশি উঠে বসে কাটানু শয্যায়। এই
উঠে' এনু। সুখময় নিদ্রাদেবী কোলে
দেখিনু রয়েছ সুখে, হতভাগ্য আমি
নিদ্রাহীন, সে নিদ্রা ভাঙ্গিতে না সরিল
মন।

রাণী।—　　মহারাজ! ভেবে ভেবে এত বল
শরীর ক'দিন রবে? দাসীর মিনতি
অত ভেবে শরীর করো না ক্ষয়।

রাজা।—　　　　প্রিয়ে,
কি কাজ শরীরে আর? কাপুরুষ আমি
কলঙ্ক ক্ষত্রিয় কুলে। ক্ষত্রিয় যে হবে
রণে সে জিনিবে অরি,—নয় সমর্পিবে
দেহ শত্রুর অসিতে। বিজয়ী শত্রুর
ভয়ে পলায় যে দেহ লয়ে, শাস্তি তার

এই মত দেহের বিনাশ। যে শোণিত
না পিয়িল শত্রু কর অসি—শুষে নিক
সে শোণিত দুশ্চিন্তার কীট দিন দিন
বিন্দু বিন্দু করে। কি সুখে রাখিব দেহ
রাণি! ক্ষত্রিয় সন্তান আমি রণে দেহ
না করে নিপাত, বিজয়ী শত্রুর ভয়ে
দিন দিন যেতেছি পলায়ে। যশ গেছে,
রাজ্য যায়। অকলঙ্ক বীরবংশ জাত
ক্ষত্রিয় সন্তান যেই—সে কি কভু পারে
বহিবারে কলঙ্কিত ভিখারী জীবন?

রাণী।—নাথ, জানে দাসী বীরত্ব ক্ষত্রিয় প্রাণ।
ক্ষত্রিয় বীরত্ব হীন মৃতদেহ সম
অসার ঘৃণিত। কিন্তু নাথ ভেবে দেখ,
রণে শুধু প্রাণ দান মাতি রণমদে—
পাশব বীরত্ব সেই সাজে কি রাজায়?
সমগ্র কাশ্মীর বাসী যত নারী নর
শুভাশুভ তা সবার ন্যস্ত তব করে।
একদিন সম্মুখ সমরে লয়ে যত
বীরগণ প্রাণ যদি দিতে, কীর্ত্তি তব
অক্ষয় রহিত সত্য এ বিশ্ব জগতে,—
বীর লোকে লভিত বিশ্রাম সত্য প্রাণ
চিরতরে। কিন্তু ফলে তার বদ্ধ হত
সোণার কাশ্মীর চিরতরে ইরানীর
দাসত্ব-শৃঙ্খলে। বীরশূন্য এ কাশ্মীরে
না রহিত আশা, কোন দিন এ শৃঙ্খল
করিতে মোচন। হারায়েছ জানি দেব
বীর কীর্ত্তি সম্মান গৌরব, বহিতেছ
জানি দুখ ক্লান্ত দুঃসহ জীবন ভার;—

কিন্তু জেনো মহারাজ, রাজপদ নহে
কুসুম কোমল স্নিগ্ধ শান্তির নিদান ;
কঠোর তপস্যা ইথে কর্ত্তব্য পালন।
যে দিন হয়েছ রাজা, সেই দিন হতে
সর্ব্বথা প্রজার তুমি, নহ আপনার।
দেহ প্রাণ ধন মান বীরত্ব গৌরব
প্রজার মঙ্গলে সব দিয়ে বিসর্জ্জন—
রাজধর্ম্ম করিবে পালন,—বিধাতার
ইহাই বিধান। জেনে শুনে কেন ভোল ?
কেন প্রাণ আকুলিত আত্ম অভিমানে ?
প্রাণ ভয়ে রণ হতে এসনি পলায়ে।
পদে পদে পরাজিত তবুও যুঝিছ
নির্ভিক অটল প্রাণে অরাতির সনে
কিছুমাত্র রাজ্য রক্ষা আশা যত দিন,
তত দিন যুঝিবে এমনি। ফুরাইবে
আশা যবে, রাজার কর্ত্তব্য শেষ,—প্রাণ
দিতে শেষ রণে—নিজে আমি সাজাইয়া
পাঠাইব তোমা।

রাজা— প্রিয়ে, প্রিয়ে, রাজা যদি
আমি,তুমি মোর রাজশক্তি তাই আমি
রাজা। দুর্ব্বল হৃদয়ে মোর একমাত্র
বল তুমি। তুমি আছ তাই এ দুর্দ্দিনে
এখনো রয়েছি বেঁচে। দুর্ব্বল মানব
আমি, পৃথিবীর যশোমান তরে ওঠে
মাঝে মাঝে হৃদয় আকুল হ'য়ে। দেবী
তুমি সঞ্চারিয়া দেবশক্তি তব, যবে
হয় হৃদয় দুর্ব্বল, দুর্ব্বলতা ক'রো দূর।
সহি যত ক্লেশ অপমান, প্রাণ হতে

প্রিয় যেই মান, সেই মান বলি দিয়ে
পালিতেছি রাজধর্ম্ম কর্ত্তব্য আমার—
এ সান্ত্বনা চিরদিন রবে মোর প্রাণে।

(বেগে বামদেবের প্রবেশ)

বাম— মহারাজ, মহারাজ, আর ভয় নাই
হবে রাজ্য রক্ষা!

রাজা— ঠাকুর, প্রণতি লহ
হয়েছে কি? অসময়ে এ ভাবে হেথায়
কেন?

বাম— মহারাজ, আর ভয় নাই! হবে
রাজ্যরক্ষা। মায়ের সেবক আমি, জেনো
মহারাজ, এতদিন বৃথায় সেবিনি
মায়। কাল নিশাশেষে সেবকেরে করে
দয়া, স্বপ্নে মা দেছেন দেখা। জানিয়াছি
ইঙ্গিতে আদেশ তাঁর। মায়ের আদেশ
লয়ে' আসিয়াছি ছুটে' আর ভয় নাই!
জেনো স্থির মহারাজ, আর ভয় নাই!
হবে রাজ্য রক্ষা!

রাজা— স্বপ্নে মা দেছেন দেখা!
হয়েছে আদেশ তাঁর!—অসম্ভব কথা!
ভাবিতে ভাবিতে বুঝি হারায়েছ জ্ঞান,
তাই আর্য্য এই তব উন্মত্ত প্রলাপ!

বাম—
উন্মত্ত প্রলাপ! নহে মহারাজ মোর
উন্মত্ত প্রলাপ এই! অসম্ভব? কি সে
অসম্ভব মহারাজ? বিশ্বের জননী
আদ্যাশক্তি ইচ্ছাময়ী যিনি, তাঁর কাছে

অসম্ভব কি বা? ইচ্ছা যদি হয় তাঁর
অসম্ভব হইতে সম্ভব কতক্ষণ
লাগে? পিতৃ পিতামহ হতে চিরদিন
সর্ব্বত্যাগী মায়ের সেবক মোরা, হেন
সেবকের অহোরাত্র আকুল প্রার্থনা,
তায় কতদিন নীরবে রবেন মাতা?
নাশিয়া দানবকুল স্থাপিলেন শান্তি
যিনি এ তিন ভুবনে; দানব দলনী
মাতা—ভক্ত রক্ষা হেতু কেন তাঁর ইচ্ছা
হইবে না দলিবারে ইরানী দানবে?
মহারাজ, করিওনা অবিশ্বাস মার
ক্ষমতায়!—অবিশ্বাসে বিনাশ নিশ্চয়!

রাজা — অবিশ্বাস কখনো করিনি আর্য্য, মার
ক্ষমতায়। কি হয়েছে সবিশেষ বল
খুলে সব। কিছুই না বুঝিবারে পারি।

বাম—জান মহারাজ দেশের উদ্ধার আর
ইরানী বিনাশ হেতু কতদিন ধরে
পূজিতেছি মায়। কাল ত্রিযামা রজনী
পূর্ণাঙ্গে পূজিয়া মায়ে জানিতে আদেশ
তাঁর নিশাশেষে ধ্যানস্থ পড়িয়াছিনু
মার পদতলে। ভাবিতে ভাবিতে মনে
কাল বৈশাখীর ঘোর ঘন ঘটাসম
ভয়ঙ্করী ভৈরবী মুরতি মার, হল
নিদ্রাবেশ। দেখিনু স্বপন—চারিদিকে
ঘোর অন্ধকার। একে অমানিশা, তায়
প্রলয়ের কালমেঘ যেন ঘিরিয়াছে
বিশ্ব চরাচর। ঘোর রবে মুহুর্ম্মুহু
গরজিছে ভয়ঙ্কর ঘোর ঘনঘটা,

জ্বলিছে অশনি ভীম, ক্ষণিক আলোকে
তার ধাঁধিয়া নয়ন—আবার ডুবায়
বিশ্ব দ্বিগুণ আঁধারে। ভয়ঙ্করে আরো
ভয়ঙ্কর—আঁধারে আঁধার সম-দেখি
চেয়ে নৃত্য করে ভৈরবী মুরতি ভীমা!
পদক্ষেপে যেন রসাতলে যায় ধরা!
খলখলে অট্টহাসি করাল বদনে!
প্রলয়ের কালানল তিনটী নয়ন
যেন ত্রিভুবন নিমিষে ভস্মিতে চায়!
বিদারি বিশাল উচ্চ গগনমণ্ডল,
কাঁপায়ে অনন্ত বিশ্ব, বিশ্ববাসিজন,—
মাঝে মাঝে ভীমনাদে ছাড়িছে হুঙ্কার।
শত সিংহ গরজন সম মহাঘোর
গড় গড় নাদ সহসা পশিল কর্ণে,
থর থর কাঁপিল মেদিনী পৃষ্ঠ, ঘোর
অগ্নিশিখা গর্জ্জিয়া উঠিল ভেদি তায়!
দেখিনু করালী করে সুন্দর কুমারী!
ভীম রবে ছাড়িয়া হুঙ্কার নিক্ষেপিলা,
তারে মাতা অগ্নিশিখা মাঝে। দাউ দাউ
উঠিল গর্জ্জিয়া অগ্নি গ্রাসিতে গগন!
ত্রাসে মুদিলাম আঁখি, কিন্তু বহুক্ষণ
নারিনু রহিতে। ভয়ে ভয়ে আঁখি মেলি
দেখিলাম পুন—যেন সে অনল পাশে
অগণিত অনিকিনী ইরাণ রাজার।
দেখিতে দেখিতে তারা শুষ্ক তৃণ ক্ষেত্রে
হল পরিণত, মুহূর্ত্তে হইল ভস্ম
সেই কালানলে। আবার মুদিনু আঁখি
ভয়ে। সহসা পশিল কর্ণে সুমধুর

দিব্য তান। বিস্ময়ে খুলিনু আঁখি পুন—
দেখিনু চাহিয়া কোথা ছুটে গেছে সেই
ঘোর অন্ধকার, আঁধারে আঁধার সম
ভয়ঙ্করী ভৈরবী মূরতি সেই, সেই
কালানল, সেই ভস্মরাশি। উঠিয়াছে
চাঁদিমা গগনে। জোছনায় ভাসিয়েছে
ধরা, হাসিতেছে ফলে ফুলে। ফুলে ফুলে
গুঞ্জরিছে অলি, কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিতেছে
বিহগ কাকলী। সহসা ত্রাসিত হিয়া
পুলকে উঠিল নেচে,—ভাঙ্গিল স্বপন।
(রাজা ও রাণীর স্তব্ধভাবে অবস্থিতি।)
নীরবে রহিলে কেন রাজা? বুঝিলে কি
স্বপ্নের বারতা? বুঝিলে কি কিসে তুষ্ট
হবেন ভবানী?

রাজা— না না বুঝি নাই, চাহি
না বুঝিতে নিজে। তুমি কি বুঝেছ বল?

বাম— চান মহামায়া কোন কুমারী আহুতী।

রাজা—কুমারী আহুতী!

রাণী— অঁ্যা! কুমারী আহুতী!

বাম—হাঁ হাঁ কুমারী আহুতি! কুমারী আহুতি!
যজ্ঞকুণ্ডে পূর্ণাহুতি সুন্দরী কুমারী!
অভিনব পূজা—ছাগ নয় মেষ নয়
নহেক মহিষ—নয় এবে খড়্গাঘাতে
বলিদান,—উত্তপ্তরুধির পান।—
যজ্ঞানলে পূর্ণাহুতি সুন্দরী কুমারী!
তবে তো হইবে তুষ্টা রুষ্টা মহামায়া,
তবে তো হইবে নষ্ট ম্লেচ্ছ সেনাচয়,
তবে তো কাশ্মীরে পুনঃ শান্তি বিরাজিবে।

রানী—অসম্ভব! অসম্ভব কথা দয়াময়ী
জগত জননী যিনি করুণারূপিণী
তিনি চান যজ্ঞানলে কুমারী আহুতি!
জীবন্ত শরীর অনলে হইবে দগ্ধ—
নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর হত্যা! নিষ্ঠুর হত্যায়
হেন নিজ সন্তানের হইবে মায়ের
তুষ্টি! অসম্ভব অসম্ভব কথা!

বাম—অসম্ভব কথা? কিসে বল অসম্ভব!
শুনেছ তো স্বপ্ন বিবরণ? ইথে আর
বুঝিতে কি বাকি থাকে বাসনা মাতার?

রাণী— স্বপ্ন বিবরণ! দিক! বিজ্ঞ তুমি, বৃদ্ধ
তুমি, তোমারে কি বুঝাইব আমি? স্বপ্ন
যে অলীক চিন্তা শিশুরাও জানে।

বাম— জানি
স্বপ্ন যে অলীক চিন্তা। কিন্তু সব স্বপ্ন
নয়। দেবতা মানবে দেখা এসংসারে
একমাত্র স্বপ্ন রাজ্যে হয়। পাপময়
জগত সংসার, হেথায় হয়না কভু
দেব আগমন। দয়া হলে স্বপ্নে এসে
জানান দেবতা নিজ মনন মানবে।
নারী তুমি অল্পবুদ্ধি, তুমি কি বুঝিবে
বল দেবতা রহস্য!

রাণী— নারী অল্পবুদ্ধি!
হক নারী অল্পবুদ্ধি তবু নারী নয় কভু
হৃদয়বিহীনা। বুদ্ধি জ্ঞান অভিশাপ
নির্দ্দয় হৃদয়ে—শত পাপ মূলাধার—
বিনাশের হেতু এই মানব সমাজ।

রাজা— ছি ছি রাণী! চুপ কর! কুল পুরোহিত

ইনি ব্রাহ্মণ তনয়, হেন কটুভাষা
বলো না ইঁহারে। ব্রাহ্মণের অভিশাপে
বাড়ায়োনা অমঙ্গল আর।

রাণী।— ক্ষমা কর
মহারাজ ! অবলা রমণী সহে ক্লেশ
নীরবে সতত, কিন্তু নিষ্ঠুরতা নারে
সহিবারে। বুদ্ধি জ্ঞান হীনা হই, নারী
মোরা জননীর জাতি। একমাত্র জানে
নারী সন্তানের তরে কত স্নেহ বুকে
জননীর। সামান্য মানবী মোরা, মোরা
না সহিতে পারি সন্তানের ক্লেশ, আর
দেব দেবেশ্বরী জগত জননী যিনি
পূর্ণ স্নেহময়ী করুণারূপিনী; তাঁর
কি সহিবে কভু জ্বলন্ত অনল মাঝে
সন্তান দাহন ! জেনো স্থির মহারাজ,
সন্তানে যাতনা দিলে শতগুণে মার
বুকে বাজে সে যাতনা। জননী সম্মুখে
জননীর তুষ্টি হেতু সন্তান বিনাশ
আবার তা তাঁহারি আদেশে ! মহারাজ,
শুধু নয় দুঃখ মর্ম্মভেদী–মাতৃ নামে
দারুন কলঙ্ক এ যে ! কোন্ মাতা এত
পারে সহিবারে ? অবলা কোমল প্রাণা
ভীরু যে রমনী, এ কলঙ্কে সেও জেনো
সাহসে সিংহিনী হয় হিংসায় শার্দ্দুলী !
মহারাজ, দয়াময়ী বিশ্বমাতা তিনি,
দিওনা দিওনা তাঁরে মর্ম্ম ভেদী ব্যাথা
জ্বালায়োনা কভু বিশ্বের ঈশ্বরী বুকে
বিশ্বদাহী ঘোর ক্রোধানল।

(প্রস্থান।)

শ্যাম— মহারাজ,

বীর তুমি, অচল অটল হয়ে রহ
সদা বীরের মতন। পুরুষ হইয়া
রমনী বচনে কভু হয়োনা চঞ্চল।
অবহেলা করিওনা ভৈরবী আদেশ।

রাজা— ঠাকুর, কর্ত্তব্য স্থির এখনো করিতে
নারি। অস্থির হৃদয় মম। মাগি পদে
বিদায় এখন। শুনিবে মন্ত্রণা গৃহে
স্থির যাহা হয়।

শ্যাম— যাও বৎস, সুমতি
হউক তব ভবানী-কৃপায়।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(ফুলবালাগনের পুনঃ প্রবেশ)

গান।

সইলো সই ভরিয়ে ডালা,
ফোটা ফুল তোলা খেলা ভোরেরি বেলা।
গেঁথেছি গাঁথবো মালা ভুবনভোলা
করে যতন মোহন মনহরা।
মনহরা এই মালায় লো সই হয়ে মন হারা—
নাগরী নাগর মিলে খেলবে ফুল খেলা।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজ অন্তঃপুর।

রাণী ও মন্ত্রী।

রাণী— ঠাকুর, প্রণাম করি, দাও পদধূলি।

মন্ত্রী— রহ সুখে দেবি! সৌভাগ্য শালিনী হও
পতি পুত্র যশোমানে। কি আর বলিব
মাগো, হৃদয় হইলে পূর্ণ, মুখে ভাষ
নাহি আসে। শুনুন দেবতা কানে বৃদ্ধ
ব্রাহ্মণের অন্তরের আকুল প্রার্থনা।
মা'গো, নারী তুমি বয়সে নবীনা। কিন্তু
বুদ্ধি জ্ঞান, কার্য্য কুশলতা, সূক্ষ্মদৃষ্টি,
মন্ত্রণা চাতুর্য্য আর ধীরতায় তব
বৃদ্ধ যে পুরুষ আমি, আমি পাই লাজ।
মন্ত্রী আমি এ রাজ্যের, কিন্তু তুমি মন্ত্রী
আমার উপরে। তাই সকল সংবাদ
লয়ে আগে আসি তোমার নিকটে মাগো
মন্ত্রনা লইতে। আজো আসিয়াছি তাই।

রাণী—আর্য্য! কেন লজ্জা দাও মোরে? কি সংবাদ?

মন্ত্রী— সারণ বিপন্ন বড়; সত্যপাল তাই
পাঠায়েছে দূত। অল্প সেনা লয়ে, আর
সে যুঝিতে নারে অসংখ্য ইরানী সনে!
আর সেনা না পাঠালে দুর্গ রক্ষা হবে
অসম্ভব। মরিতে প্রস্তুত তারা, কিন্তু
সে দুর্গ পতন হলে রক্ষা নাই আর।

রাণী— মন্ত্রীবর, নাহি দেখি উপায় ইহার।
ক্ষুদ্র বল নিয়ে প্রবল অরাতি সনে
এই মত যোঝা যুঝ কত দিন চলে?
ভাল, অল্প হক এদিকে যে সেনা আছে
পাঠালে সকল, দুর্গ রক্ষা হয় না কি?

মন্ত্রী— অরক্ষিত একেবারে রহিবে এদিক
তাহে। তারপর ইরানীর ব্যূহ ভেদি
যদি তারা সারণে পশিতে নারে, যদি

নষ্ট হয় বিফল চেষ্টায়, কি হইবে
উপায় তখন ?

রাণী— আর্য্য, একবার তবে
শেষ চেষ্টা করে দেখি। রক্ষা হয় ভাল,
নয় এক সঙ্গে রণে প্রাণ বিসর্জ্জিব
সবে। দেখিবে জগত, ভীরু কাপুরুষ
নয় কাশ্মীরের রাজা; জানে রণে প্রাণ
দিতে। বহু দিন ইরানীরা অবরোধ
করেছে সারণ দুর্গ, এখনো পারেনি
নিতে। কত যে দুর্ব্বল মোরা তাহা নাহি
জানে। জানাও ইরান রাজে অর্দ্ধ রাজ্য
দেব বলে' সন্ধির প্রস্তাব। যদি তাহে
মত হয় তার, দিয়ে তারে অর্দ্ধ রাজ্য
যুদ্ধ কর শেষ। রহুক অর্দ্ধেক রাজ্য,
যুদ্ধ ক্লিষ্ট দেশে আসুক ফিরিয়া শান্তি।
তারপর দেশ সবল হইলে পুন
যুঝিয়া সে অর্দ্ধ রাজ্য করিব উদ্ধার।

মন্ত্রী— যদিও দুরাশা তবু একমাত্র পন্থা
আছে এই। বুঝায়ো রাজারে তুমি। পারি
যতদূর মন্ত্রগৃহে আমিও বুঝাব
সবে। আর এক কথা,—সমস্ত নগরে
জনরবে নানাভাবে হয়েছে প্রচার
ব্রাহ্মণের স্বপ্ন বিবরণ। বামদেবে
জানি ভাল মতে,—মত্ত হক, ভণ্ড নয়
কভু। পূজক ব্রাহ্মণ কেমনে হইবে
দৈব বলে রাজ্যোদ্ধার ভাবিতে ভাবিতে
দেখিবারে পারে এই অদ্ভুত স্বপন।
কিন্তু প্রমত্ত ব্রাহ্মণ তাহে একেবারে

উঠেছে ক্ষেপিয়া,—সমস্ত নগরবাসী
ক্ষেপায়ে তুলেছে। বড় ভয়ঙ্কর মাগো
ধর্ম্মের মত্ততা অন্ধ। সার কি অসার
হক প্রাণের আবেগময় বচনের
খরস্রোতে চিন্তাহীন প্রাণ তৃণ সম
যায় ভেসে। জানিনা ব্রাহ্মণ ঘটাবে কি
পরমাদ। দুঃসময়ে দুর্ব্বল প্রজার!
তাতে রাজা। যদি বামদেব একবার
করে উত্তেজিত প্রধান প্রকৃতি বর্গে,—
জেনো মা নিশ্চয় এ নিষ্ঠুর নারী হত্যা
হবে না হবে না বন্ধ রাজ ক্ষমতায়।

রাণী— জানি আমি রাজার হৃদয়। এ নিষ্ঠুর
অনুষ্ঠানে সহজে সম্মত তিনি কভু
না হবেন। যদি সবে বাধা করে তাঁরে,
প্রজাগণ মাতৃসম শ্রদ্ধা করে মোরে,—
বলিও তাদের আর্য্য, যজ্ঞানলে যদি
হয় কুমারী আহুতি, আপনি পশিব
আমি সে অনলে আগে।

(প্রস্থান।)

মন্ত্রী— ধন্য মা জননী!
ধন্য তুমি! সত্য তুমি এ জগতে রাণী।

(প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্ত্রগৃহ।

রাজা, মন্ত্রী ও বীরবল।

বীর— সন্ধির প্রস্তাব! থাকিতে শোণিত দেহে

অর্দ্ধ রাজ্য দানে সন্ধি ইরানীর সনে—
ধিক্ ধিক্ মন্ত্রী!

মন্ত্রী— দিওনা ধিক্কার মোরে
অকারণে। বুঝে দেখ—এ ছাড়া এখন
উপায় নাহিক আর।

বীর— শত গুণ মৃত্যু
ভাল ঐ হীন উপায় হতে। এর চেয়ে
আছি যত জন, খুলিয়া শাণিত অসি
নির্ভিক হৃদয়ে পড়ি গিয়ে ধেয়ে সবে
শত্রু সেনা মাঝে। নাশিতে নাশিতে অরি
করি দেহ বিসর্জ্জন ইরানী শোণিতে
সিক্ত পুণ্য রণক্ষেত্রে—বীরত্ব গৌরবে
নাশি কাশ্মীরের ঘোর কলঙ্ক আঁধার।

মন্ত্রী—স্থির হও বীরবর! অন্ধ বীরমদে
হয়োনা উন্মত্ত। সেনাপতি তুমি, হবে
ধীর স্থির বুদ্ধি। সতত প্রস্তুত রবে
হতে অগ্রসর কিম্বা ফিরিতে পশ্চাতে
সময় বুঝিয়া। বীরত্ব প্রকাশে নহে,
শত্রুজয়ে সুনিপুণ সৈনিক চালনে
শক্তি যাঁর সেনাপতি সেই। শত্রু নাশ
সম্মুখ সমরে সাধ্য কি অসাধ্য তাহা
বুঝিবে সুস্থির হয়ে আগে। সাধ্য হলে
কেশরী বিক্রমে পড়িবে শত্রুর মাঝে
নাশিবে তাদের। অসাধ্য যদিস্যা হয়,
ধূর্ত্ত শৃগালের মত সুযোগ বুঝিয়া
লাঞ্ছিয়া তাদের, ক্ষিপ্রগতি লুকাইবে
পুন। নিজে নাহি দিয়ে ধরা, পদে পদে
নির্য্যাতন করিবে তাদের। সেনাপতি

তুমি, অন্ধ বীরমদ—সামান্য সেনার
গুণ সাজে কি তোমারে কভু? অবিমৃষ্য
মূঢ় সেই সেনাপতি, নিষ্ফল বীরত্বে
নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে সৈন্য লয়ে ঝাঁপ
দেয় যেই।

বীর— হে ব্রাহ্মণ! তুমি কি বুঝিবে
বল অপমানে ক্ষত্রিয় হৃদয়ে জ্বলে
কি অনল? অনলে ভষ্ম হবে হয়
বিশ্ব, নয় নিজপ্রাণ। কাপুরুষ নাম,
স্বার্থভয়ে অবনতি শত্রু পদতলে—
অসহ্য ক্ষত্রিয় প্রাণে। সম্মুখ সমরে
ক্ষত্রবীর জানে প্রাণ দিতে, নাহি জানে
স্বার্থের কৌশল।

মন্ত্রী— বীরত্বে ক্ষত্রিয় কুল
অতুল জগত মান্য জানি বীরবল!
কিন্তু তারা নাহি জানে যুদ্ধের কৌশল।
যদি তা জানিত, সিন্ধুনদ পার হতে
আজো নাহি পারিত ইরানী আক্রমনে
দেশ যবে প্রবল অরাতি, আবাহন
করে তারে কোন মূর্খ সম্মুখ সমরে?
জয় পরাজয় রণে কত হয় দৈব-
ঘটনায়, দৈবাধীন সম্মুখ সমরে
হেন একটী দেশের ভাগ্য একেবারে
সঁপে দেওয়া কি মূঢ়তা কহিতে না পারি।
মত্ত ক্ষত্রকুল তাই বিদেশীর করে
দিন দিন শক্তিহীন হতেছে ভারতে।
হায় কি কহিব! যুদ্ধের আরম্ভে যদি
গ্রাহ্য হত এ মন্ত্রনা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের

ক্ষত্রিয় প্রধান রাজ মন্ত্র সভামাঝে—
তেজস্বী সে বৃদ্ধ বীর কাশ্মীর ভূপতি
—(মহারাজ পুণ্যস্মৃতি জনক তোমার—)
কাশ্মীর মুকুটমণি বীরগণ সহ
একেবারে নাহি হ'ত নিহত সমরে,
দাঁড়াত না কাশ্মীরের বক্ষপরে আজ
বিজয় পতাকা তুলি গর্ব্বিত ইরানী।

বীর— কূট তর্ক নাহি বুঝি। বাক্য বিশারদ
মন্ত্রী! বাক্ যুদ্ধে নারিব তোমার সনে।
মহারাজ, সুধাই তোমারে, ক্ষমা কর
প্রগল্‌ভতা মোর,—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই
সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত কি হইয়াছ
তুমি? রণে প্রাণ নাহি দিয়ে, দিন দিন
যেতেছ পলায়ে, কলঙ্কে পূরেছে ধরা।
হায় শত্রু পদানত— অৰ্দ্ধরাজ্য দিয়ে
সন্ধি মেগে বাড়াবে কি কলঙ্কে কলঙ্ক?
অকলঙ্ক ক্ষত্রকুলে একেবারে দেবে
কালী? মহারাজ, দাসের মিনতি রাখ,
ডুবায়োনা বীরনাম কলঙ্ক সাগরে
চির। এখনো সময় আছে সেই নাম
করিতে উদ্ধার। বীরদর্পে চল দেব
শেষ এ সমরে; ক্ষত্রিয় বীরের মত
রণে প্রাণ দিয়ে বীরনাম উদ্ধারিবে
চল।

রাজা— শান্ত হও বীরবল! শোন কথা।
নহি আমি কাপুরুষ ক্ষত্র তেজোহীন।
—ই ভীরু কাপুরুষ, ঘৃণা করো
— নাম ঘৃণার দৃষ্টান্ত

হয়ে ফেরে মুখে। যেন মোর নামে
অভিশাপ আনে ঘরে ঘরে। বীরবল,
ক্ষত্রিয় সন্তান আমি—প্রাণ দিতে কভু
না কুণ্ঠিত। হায় যদি রাজা না হইয়া
জন্মিতাম দরিদ্র কুটীরে, দেখাতাম
কত বীর্য্য কত তেজ আছে এ হৃদয়ে,
হয় রণে জিনে মরি নয় প্রাণ দিয়ে।
ক্ষত্রিয়ের প্রাণ চেয়ে শতগুণে বড়
মান, কিন্তু বীরবল, সে মানের চেয়ে
লক্ষ গুণে বড় মোর প্রাণে কাশ্মীরের
মঙ্গল কামনা। রাজা আমি সর্ব্বোপরি
কর্ত্তব্য আমার যশোমান বিসর্জ্জিয়ে
প্রজাকুল মঙ্গল সাধন। আপনার
যশোমান-স্বার্থের মন্দিরে বলি দিতে
প্রজাকুল হিত, মন না সরিল মন।
বিসর্জ্জিয়ে সব তাই, ধরিয়া মস্তকে
কলঙ্কের ডালি কত কষ্টে যুঝিতেছি
হতভাগ্য কাশ্মীর বাসীর তরে। জেনো
বীরবল ; এ সমর শুধু মোর নহে
আপনার। তা যদি হইত, এতদিনে
যা হয় হইত শেষ, হয় জয় নয়
মৃত্যু !

(বামদেবের প্রবেশ)

বাম— মহারাজ ! ভবানী আদেশ লয়ে
আসিয়াছি তোমার নিকটে। অনুমতি
কর মায়ের আদেশ মত মার পূজা
করিতে সাধন।

রাজা— নৃশংস এ নারী হত্যা

নয় মার পূজা ; তাই আর্য্য, অনুমতি
নাহি দিতে পারি।

বাম— কি বলিছ মহারাজ !
ভাল করে ভেবে দেখ। মায়ের আদেশে
মার পূজা, তায় তুমি অনুমতি নাহি
দিতে পার ? গর্ব্বিত রাজন্ ! রাজ্যমদে
একেবারে ভুলেছ আপন ? রাজা তুমি
ক্ষুদ্র মানব সমাজে। জগত ঈশ্বরী
তিনি কোটী গুণে তোমার উপরে। চাও
যদি হিত, অবহেলা করিওনা তাঁরে।
বিপদ সাগরে তুমি ভাসিতেছ কূল
হারাইয়া ভুবন ঈশ্বরী দয়া করে
নিজে এসে দেখালেন নিস্তার উপায়।
সাবধান ! অবহেলা করিয়া তাঁহারে
চিরতরে ডুবাওনা অতলে !

রাজা— ডুবি যদি
চিরতরে ডুবিব অতলে, কিন্তু তবু
পাপের আশ্রয় করে, উঠিবনা কূলে।

বাম— পাপ ! ভবানী আদেশে ভবানীর পূজা
পাপ ! অবিশ্বাসী নাস্তিক পাষণ্ড
জেনো এই পাপে তব বিনাশ নিশ্চয়।
মহারাজ ! ব্রাহ্মণের রাখ এ মিনতি
দেবাদেশ অবহেলা করি' দেব শাপে
আনিওনা চির অমঙ্গল।

বীর— মহারাজ
এ দীন দাসের তব শোন নিবেদন—
যোদ্ধার সন্তান আমি, বাল্যকাল হতে
শিখিয়াছি যুদ্ধ বিদ্যা শুধু ; ধর্ম্মতত্ত্ব

নাহি জানি। কিন্তু দেব, আপনি ভবানী
এসে জানালেন বাসনা তাঁহার, কেন
কর অবহেলা তায়? ইরানী সমরে
অন্য সনে কত শত মরিছে কুমারী,—
একটী কুমারী প্রাণে যদি তুষ্ট হন
মহামায়া, রক্ষেন সবারে, কিবা ক্ষতি
তায়? একের বিনাশে যদি রক্ষা পায়
শত শত প্রাণ, কিবা পাপ বল সেই
একের বিনাসে?

রাজা- ক্ষান্ত হও বীরবল!
মানিলাম একের বিনাশে যদি রক্ষা
পায় বহু প্রাণ, পাপ নাই সেই স্থলে
একের বিনাশে। কিন্তু বলিতে কি পার
যজ্ঞানলে দিলে এই কুমারী আহুতি
দেশ রক্ষা হবে এ ঘোর বিপদে দৈব বলে
দেশোদ্ধার, প্রমত্ত ব্রাহ্মণ দেখিয়াছে
অদ্ভুত স্বপন। সে স্বপনে মনে মনে ক'রে
দেবতা আদেশ—মানুষ যে হয়, সে কি
পারে কভু সাধিবারে এই মহাপাপ,—
অগ্নিকুণ্ডে দহিবারে অবলা বালায়?
নৃশংশ এ ঘোর মহাপাপ কভু নয়
দেবতা আদেশ। পুণ্যময়ী দয়াময়ী
জগত জননী, তিনি রাক্ষসী কভু ও
নন।

বাম— মূর্খ নর! তুমি কি বুঝিবে বল
গূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব—গূঢ় দেবতার লীলা?
তাই মানবের নীতি দৃষ্টে বুঝাইছ
দেব নীতি। যাক তর্কে নাই প্রয়োজন।

মায়ের আদেশ লয়ে এসেছি হেথায়
বলে দাও মাতা পাবে কি না পাবে পূজা
নিজের আদেশ মত! মায়ের সেবক
আমি ফিরে যাই মার পায়, আশীর্ব্বাদ
রেখে গিছে কিম্বা অভিশাপ!

রাজা— যাও ফিরে
আশীর্ব্বাদ অভিশাপ যাহা ইচ্ছা রেখে;
থাকিতে জীবন দেহে নারীহত্যা পাপে
করিব না কলঙ্কিত মায়ের দুয়ার!

বাম—যাও অধঃপাতে! দেব অভিশাপ ফেরে
যেন চিরদিন পশ্চাতে পশ্চাতে তব
পিশাচের মত। নিদ্রা, জাগরণে, কার্য্যে
কি বিশ্রামে, কভু যেন সঙ্গ নাহি ছাড়ে,
নাশে শান্তি সর্ব্ব কার্য্যে আশ!

(প্রস্থান)

রাজা— যাও মন্ত্রী!
যাও বীরবল। ভীত হয়ে রহিওনা
উন্মত্ত প্রলাপে। জানাও আদেশ মোর
সাধারণ মন্ত্রগৃহে অমাত্য সকলে,
ভাল করে বুঝায়ো সকলে, কেন চাই
সন্ধি করিবারে। করহ প্রস্তুত দূত
পাঠাইতে ইরাণী শিবিরে।

বীর ও মন্ত্রী— যথা আজ্ঞা
মহারাজ।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মন্দির।

দেবী প্রতিমা সমক্ষে উপবিষ্ট বামদেব।

বাম— মা! মা! মহামায়া! একি লীলা,
একি মায়া তোর? পাষাণ মূরতি তোর—
কিন্তু ও পাষাণ মাঝে নাহি কি পরাণ?
কিম্বা তোর ওই পাষাণ মূরতি সম
পরাণো কি পাষাণে গঠিত? সেবকের
আকুল ক্রন্দনে গলে নাকি ও পাষাণ?
হেলা অপমানে জ্বলে নাকি ও পাষাণে
ঘোর ক্রোধানল নিমিষে ভস্মিতে এই
বিশ্ব চরাচর? সেবক আমি যে তোর—
তোর সেবা একমাত্র ব্রত জীবনের,
তোর তুষ্টি একমাত্র জীবনের সুখ;
মহিমা প্রচার তোর জীবনের মাত্র
এক সাধের বাসনা। হেন সেবকেরে
কেন দিলি এই মনস্তাপ? অপমান
সহাইলি কেন তোর জীবন থাকিতে?
তাপে তপ্ত দ্রব প্রাণ তপ্ত অশ্রুরূপে
পড়িছে চরণে। পাষানি! পাষানি! কেন
তায় গলে না পাষাণ? যে দানবকুল
দেবাতীত বলবীর্য্যে জিনি দেবগণে
করেছিল আলোড়িত ত্রাসিত ত্রৈলোক,—
তেজস্বিনী মহাশক্তি তুই নাশ করে
দানব সংহতি সেই, স্থাপিলি মহিমা
তো এ তিন ভুবনে। কোথা আজ তোর
সেই শক্তি সেই তেজ? সামান্য মানব

অবহেলা করে তোরে—তবু কি পাপিনী
পাষাণের মত রবি নিস্পন্দ নিশ্চল?

(বীরবলের প্রবেশ)

বীর— ঠাকুর, প্রণতি লহ। কি হেতু ডেকেছ
মোরে?

বাম— কি হেতু ডেকেছি?
চেয়ে দেখ ওই দিকে! কি দেখিতে পাও
বল?

বীর— কি আর দেখিব আর্য্য? আছে শুধু
দাঁড়াইয়া পাষাণ মূরতি মহামায়া।

বাম—শুধু পাষাণ মূরতি মহামায়া? অন্ধ
নর! ভেবেছ কি পাষাণ মূরতি ওই
সত্য প্রাণ হীন? ভেবেছ কি ও পাষাণ
পাষাণের মত রবে নিস্পন্দ নিশ্চল—
ক্ষুদ্র মানবের এই গর্ব্বিত হেলায়?
দেখ চেয়ে দেখ ভাল করে; দেখ চেয়ে
নিশ্চল পাষাণ—তবু মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর
কিবা! দেখ কিবা ভয়ঙ্করী উলঙ্গিনী
এলোকেশী সমর রঙ্গিনী। দেখ কিবা
করাল বদনে ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে
তিনটী নয়ন,—যেন তিন অগ্নি শিখা
বাহিরিছে ভস্মিবারে এ তিন ভুবন!
দেখ, রুধির পায়িনী মুখে দুই ধারে
সৃক্কনী বহিয়া বহিছে রুধির ধারা!
বিকট দশনাবলি রুধিরে রঞ্জিত।
দেখ লক লক রুধিরে রঞ্জিত লোল
দুলিছে রসনা! দেখ উত্তেজিত করে
রুধিরে রঞ্জিত খড়্গ— তায় খণ্ড খণ্ড

করিয়া দানব দেহ পরিয়াছে অঙ্গে
আভরণ! দেখ —— দেখ চেয়ে! দুঃসাহসী
নর! কেন জ্বালাইতে চাও ক্রোধানল
ওঁর নিমিষে হইতে ভস্ম? ভেবেছ কি
পাইবে নিস্তার—একবার উঠে যদি
ক্ষেপে ওই ভয়ঙ্করী ভৈরবী মূরতি!

বীর—কি করিব আর্য্য? রাজা বাদী, আজ্ঞাবাহী
দাস আমি। আজ্ঞা তাঁর লঙ্ঘিব কেমনে?

বাম— রাজদাস তুমি——নহ কি মায়ের দাস?
রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘিতে ডরাও, কি সাহসে
লঙ্ঘিবে মায়ের আজ্ঞা?

বীর— সাহস ভয়ের
কথা ভুলোনা ব্রাহ্মণ! নির্ভিক হৃদয় মম
কোন কার্য্যে কাহারে ও না ডরাই কভু।

বাম— তবে কেন নাহিক সাহস বিচারিতে
রাজাদেশ ন্যায় কি অন্যায়? লঙ্ঘিবারে
সে আদেশ অন্যায় হইলে? ধিক তোমা!
কিসে কর এত বীর গর্ব্ব? কার্য্যে যার
নাহি আছে ভালমন্দ জ্ঞান, সেতো পশু——
মানুষ কে বলিবে তাহায়?

বীর— চিরদিন
রাজবংশ অধীন আমরা, রাজসেবা
ব্রত জীবনের। পিতৃ পিতা মহগণ
প্রাণদিয়ে পেলেছেন রাজার আদেশ
শিশুকাল হতে তাই আমিও শিখেছি।
রাজার সেবক হতে পেয়েছি যে দেহ
শিখিয়াছি রাজার সেবায় সেই দেহ
করিতে নিপাত। ভীরু বলে কেন এই

তিরস্কার—কেন এ বিদ্রূপ আর্য্য? প্রাণ
দিতে সদা যে প্রস্তুত ভয় কোথা তার?
ভয়ে নাহি পালি রাজাদেশ। জানি তাঁর
আদেশ পালন জীবনের সর্ব্বোপরি
কর্ত্তব্য আমার। প্রভু আজ্ঞাবাহী দাস
পালিবে প্রভুর আজ্ঞা। ন্যায় কি অন্যায়
সে বিচারে তার নাই অধিকার।

বাম— ধন্য
বীরবল! ধন্য তব রাজভক্তি! কিন্তু
ভেবে দেখ শত শত রাজার উপরে
একমাত্র রাজ্ঞী সেই ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরী।
যে রাজার দাস তুমি সেই রাজা নিজে
তাঁর দাস। শুধু রাজা নয়, রাজা প্রজা
সমস্ত ভুবনবাসী ভুবন ঈশ্বরী
সেই ভবানীর দাস। রাজাদেশ পালা
কর্ত্তব্য তোমার সত্য; কিন্তু তার চেয়ে
শতগুণে কর্ত্তব্য তোমার ভবানীর
আদেশ পালন। বীরবল, ভাল করে'
বুঝে' দেখ; সেনাপতি তুমি, সেনাগণ
আজ্ঞাবাহী রয় রাজার বিধানে।
যতদিন রাজ আজ্ঞা তব আজ্ঞা রবে
অবিরোধী, তত দিন শুধু সেনাগণ
আজ্ঞাবাহী অধীন তোমার। পরস্পর
বিরোধী হইলে, অবহেলি তব আজ্ঞা
সেনাগণ রাজ আজ্ঞা করিবে পালন।
তেমতি জানিও—রাজার——রাজত্বপদ
তাঁহারি বিধানে। তোমরা যে আজ্ঞাবাহী
রাজার সেবক, তাঁহারি বিধান তাও।

একদিকে রাণী—[illegible]—[illegible]

অন্যদিকে দেখ রাজার উপরে রাজা

অভ্রান্ত দেবতা। পরস্পর বিপরীত

দোঁহার আদেশ। কেন তবে বীরবল,

পালিবে না মায়ের আদেশ, অবহেলি

রাজার আদেশে? কেন দেবতার কোপে

ইহকালে পাবে বল বিনাশ নিশ্চয়—

পরকালে অনন্ত নিরয়?

বীর— সত্য, যাহা

কহিলে ঠাকুর। দেবতা আদেশ পালা

সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য সবার। কিন্তু মার

এ আদেশ মোর প্রতি নয়। মহামায়া

রাজারে দেছেন আজ্ঞা। এ আজ্ঞা পালন

কর্ত্তব্য তাঁহার। আপনার শুভাশুভ

আপনি সবাই বোঝে ভাল। অবহেলি

মার আজ্ঞা যদি হয় বিনাশ রাজারে—

বিনাশ পাইতে সঙ্গে প্রস্তুত সতত

আমি।

বাম— বীরবল! প্রভুর হিতার্থীনয়

হেন ভৃত্য নয় কি পাষণ্ড?

বীর—অদ্ভুত এ প্রশ্ন! কে না তারে বলিবে পাষণ্ড?

বাম— ভাল,

প্রভু যদি অজ্ঞান উন্মত্ত হয়ে যায়

ঝাঁপ দিতে জলন্ত অনলে, কি করিবে

প্রভুর হিতার্থী ভৃত্য? বলে কি কৌশলে

তাঁরে বাধা দিবে—কিংবা প্রভুসনে নিজে

গিয়ে পড়িবে অনলে?

বীর— রাখিতে প্রভুর প্রাণ,

রক্ষা না করিয়া, মরে—মূর্খ কেবা তার মত ?

বাম—   বীরবল ! প্রভুর হিতার্থী

নয়, পাষণ্ড যদি সে ভৃত্য—— সে পাষণ্ড

তবে তুমি ! থাকিতে রক্ষার পথ, রক্ষা

না করিয়া মরে প্রভুর সনে, হেন ভৃত্য

মূর্খ যদি হয়, সেই মূর্খ তবে তুমি !

মোহে অন্ধ অজ্ঞান উন্মত্ত রাজা ধায়

ঝাঁপ দিতে ভৈরবীর ঘোর ক্রোধানলে,

প্রভুর হিতার্থী ভৃত্য বুদ্ধিমান্ তুমি——

বাধা নাহি দিয়ে তারে বলে কি কৌশলে

পশিবারে তার সনে চাহ সে অনলে ।

বীর—   সত্য আর্য্য, কর্ত্তব্য আমার রক্ষা করা

নৃপতিরে, থাকিলে রক্ষার পথ ।   কিন্তু

জান, সড়ই বিরোধী রাজা ভবানীর

আদেশ পালনে ।   অধীন এ দাস বাধ্য

তাঁরে করিবে কেমনে ? আছে কি উপায়

কোন ?

বাম—   আছে ! কিন্তু হইবে না বলে ।

বল ও কৌশল দুই প্রয়োজন ?

বীর—   বল

খুলে আর্য্য ! জানিও নিশ্চয় নৃপতির

মঙ্গল সাধনে সর্ব্বস্ব সঁপিতে দাস

সতত প্রস্তুত ।

বাম—   সন্ধির প্রস্তাব রাজা

পাঠায়েছে ইরাণী শিবিরে ।   সন্ধি যদি

হয়, অসাধ্য হইবে তবে বাধ্য করা

নৃপতিরে ভবানীর আদেশ পালনে ।

কিন্তু যদিযুদ্ধ ঘটে——

বীর— ঠাকুর! ঠাকুর!
কেমনে জানাব তোমা আকাঙ্ক্ষা এ ক্ষুদ্র
হৃদয়ের —— যুঝিবারে ইরানীর সনে
কত যে আকুল আমি ক্ষত্রিয় বীরের
মত সম্মুখ সমরে? মরমে মরিয়া
আছি—ইরানীর সনে আর্য্য, হীন এই
সন্ধির প্রস্তাবে।

বাম— সন্ধির প্রস্তাবে এই
ইরাণী সম্মত হলে যুদ্ধঘটা হবে
অসম্ভব। যুদ্ধ না হইলে কভু রাজা
বাধ্য না হইবে।

বীর— নাহি কি উপায় কোন?

বাম—আছে।

বীর— কি উপায়?

বাম— কৌশলে ঘটাবে রণ!

বীর— কি কৌশল বল আর্য্য খুলে। জেনো স্থির
সতত প্রস্তুত আমি রণে।

বাম— শোন তবে!
গোপনে পাঠায়ে দূত ইরাণী শিবিরে
জানাব ইরাণ রাজে, যুদ্ধে অসমর্থ
রাজা সন্ধি মাগে। যুদ্ধ হলে ইরাণের
করগত হইবে কাশ্মীর। এ সংবাদে
সন্ধিতে সম্মত নাহি হইবে ইরাণী।
যুদ্ধ হবে অনিবার্য্য। যুদ্ধ হলে, সবে
মিলে করিব রাজারে বাধ্য। যুদ্ধকালে
সকলের উত্তেজনা এড়াইতে রাজা
নাহি হইবে সাহসী। জেনো বীরবল,
ভবানী আদেশ মত যজ্ঞানলে যদি

হয় কুমারী আহুতি, নিশ্চয় হইবে
রণে শত্রুর বিনাশ।

বীর— সুকৌশল বটে,
কিন্তু———

বাম—। কিন্তু! কেন এই দ্বিধা বীরবল?
উদ্দেশ্য ও কার্য্যফলে কার্য্যের বিচার।
গোপনে পাঠায়ে দূত ইরানী শিবিরে
ব্যর্থ করা রাজার মানস—লাগে বটে
আততায়ী মত। কিন্তু উদ্দেশ্য মোদের
নৃপতির মঙ্গল সাধন। পরিণামে
কার্য্যফল (ও) হইবে তাহাই। তবে কেন
দ্বিধা বীরবল? কেন এ আশঙ্কা মিছে?
দেশ বৈরী বিধর্ম্মী ইরাণী সনে গুপ্ত
এ মন্ত্রণা হীন——মায়ের সেবক আমি—
সাজে কি আমারে? কিন্তু রাজারে রক্ষিতে
এছাড়া এখন নাহিক উপায় আর।
তাই হেন হীন কার্য্যে প্রবৃত্তি আমার।
চল তবে বীরবল, করি আয়োজন
গোপনে পাঠাতে দূত ইরাণী শিবিরে।

বীর— (জানু পাতিয়া)
মহামায়া! জান তুমি হৃদয় আমার!
ভূপতির হিত ছাড়া অহিত সাধন
জান তুমি স্বপ্নেও ভাবিনি কভু। জান
তুমি রাজহিতে প্রাণ দিতে এ অধীন
প্রস্তুত সতত। সাক্ষী তুমি, সাধিবারে
রাজার মঙ্গল—রক্ষিতে রাজারে তব
ক্রোধানল হতে—আজি এই হীন কার্য্যে
হইনু প্রবৃত্ত। জীবনে প্রথম আজ

রাজার বিশ্বাস ভাঙ্গি' মাখিনু হৃদয়ে
কালী চিরকাল তরে। এই পাপে মৃত্যু
যদি হয় শাস্তি—মরিতে প্রস্তুত আমি।
কিন্তু মাতা রক্ষিও রাজারে। চল আর্য্য,
কোথা যাবে চল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত, এম্ এ
সম্পাদক—"বালক"।

ঝটিকাময়ী নিশাবসানে

(১)

কি অমল ঊষা—উরসে অরুণ
নব নীল বাসে সোনালি ডুরে,
লঘু মেঘ কনা—কাপাস তরুণ
অলস গমনে গগনে ঘুরে।

(২)

বাতাসের আর নাহিক সে বল
ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পড়িছে ঢুলে
এ সুযোগে চুমি সোহাগে কেবল
ফুলটি জাগায় পথের ফুলে।

শ্রীরসময় শাহা।

কর্ম্মবীর ভূতনাথ পাল

—:(০):—

আমরা বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং নিকট হইতে স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত সংকলিত একখানি পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছি ও "সাহিত্য-সংহিতার" মুদ্রণের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আমরা স্থানাভাব বশতঃ সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। উহার সারাংশ সংকলন করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। ইতি—

সম্পাদক

সাহিত্য-সংহিতা।

শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি—জাতীয়অভ্যুদয়ের মূল ভিত্তি। এই সমুদয় বিষয়ে সমধিক উন্নতি সাধিত না হইলে যে কোন জাতিই সমৃদ্ধি, সভ্যতা ও গৌরবের চরম শীর্ষে আরোহন করিতে পারে না তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ভারতের অতীত কাহিনীও এই সত্য সম্যকরূপে প্রতিপাদন করে। দীর্ঘ সুষুপ্তির পর আবার ভারতে জাগরণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। রাজনীতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য—সকল ক্ষেত্রেই নূতন চৈতন্যের সাড়া প্রতীয়মান হইতেছে। কায়, মন অথবা বাক্যেও যাঁহারা এই নব অভ্যুদয়ের সহায়তা করিয়াছেন কিম্বা করিতেছেন তাঁহারা ধন্য। আর তাঁহাদের প্রশংসা আরও অধিক যাঁহারা দেশকে বিদেশীয় বাণিজ্য দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন—পরলোকগত ভূতনাথ পাল এই শ্রেণীর অন্যতম পথ প্রদর্শক ছিলেন।

আজকাল যে বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানির নাম বিশ্ববিশ্রুত তাহার জন্ম অতি দীন অবস্থাতেই হইয়াছিল। স্বনামধন্য বটকৃষ্ণ পাল শিবপুরে এক প্রাচীন গন্ধবণিক বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। অবস্থাবৈগুণ্যে তাঁহাকে কিন্তু অল্প বয়সেই কলিকাতা বেণিয়াটোলায় মাতুলালয়ে আসিয়া বাস করিতে হয়। বালক বটকৃষ্ণ প্রথম অবস্থায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইয়াছেন। কিছুদিন পরে তিনি নূতন বাজারে এক বেণের দোকানে সামান্য মাহিনায় একটি চাকুরী পান। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যে। এই সময়ে দেশের শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা বিশেষ উন্নত নহে। অনেক দেশীয় শিল্প মুমূর্ষু অবস্থায়। বিদেশীয় বিপণিসম্ভার অধিক পরিমাণে আসিয়া বাজার অধিকার করিতেছে। বিদেশীয় ঔষধ সমূহ, যাহা এক্ষণে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা সে সময়ে দুষ্প্রাপ্য ও তাহার ব্যবহার ধনীগণের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু বটকৃষ্ণ পাল তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিদেশীয় চিকিৎসা প্রণালী ক্রমশঃ এতদ্দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে এবং তৎসঙ্গে বিদেশীয় ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য, ডাক্তারী অস্ত্র ও আনুসঙ্গিক নানা দ্রব্যাদির বিক্রি অচিরেই প্রভূতমাত্রায় বৃদ্ধি লাভ করিবে। সে সময়ে সাহেব সওদাগরের

চাস হইতে বিলাতী ঔষধ ক্রয় করিতে হইত। তাহাতে মূল্য অধিক দিতে হইত।
জিনিষও অল্পমাত্রায় পাওয়া যাইত। বটকৃষ্ণ পাল বুঝিলেন যে ইহার একমাত্র প্রতীকার
প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকট হইতে এক সঙ্গে অধিক মাত্রায় সাক্ষাতভাবে ঔষধ
আমদানি করা। সিদ্ধান্ত ঠিক হইলেও কার্য্যটা অতিসাহসিক। পুরুষসিংহ বটকৃষ্ণ পাল
তাহাতে কিন্তু হতোদ্যম হইলেন না। দুই একটি বন্ধুর সাহায্যে তিনি উক্ত প্রকারেই প্রচুর
পরিমাণে ঔষধ আমদানি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ১৮৫৯ সালে তাঁহার খোঙ্গরাপটির
দোকান প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাই বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানীর সূত্রপাত। সামান্য অবস্থা হইতে
খোঙ্গরাপটির দোকানের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ১৮৬৬ সালে বেণিয়াটোলায় ভূতনাথ পালের জন্ম হয়। বলা বাহুল্য যে পিতার
তদানীন্তন অবস্থায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভূতনাথকে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার উপায় ছিল না। তিনি
তখন অন্য সহায় ব্যতিরেকে খোঙ্গরাপটীর বর্ত্তমান কর্ম্ম চালাইতেছেন। সাহায্যের বিশেষ
আবশ্যক। সেইজন্য ষোড়শবর্ষেই ভূতনাথকে পিতার সহিত কার্য্যে যোগদান করিতে হয়।
মেধাবী ভূতনাথ কর্ম্মে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রেই তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত দোকানের
কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন ও অল্প দিনের মধ্যে কর্ম্মদক্ষ হইয়া উঠিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে অথবা বিশেষ বিশেষ কার্য্যে উন্নতি প্রারম্ভের যে একটা সময় আছে তাহা
সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে ইহাকে 'পড়তা' বলে। বস্তুতঃ বটকৃষ্ণ পাল
কোম্পানীর উন্নতির সূত্রপাত ভূতনাথ পালের কর্ম্ম প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই। ইহা যে কিছু
আকস্মিক তাহা কেহ মনে করিবেন না। কারণ যে সমুদয় গুণে বাণিজ্য ব্যাপারে সমৃদ্ধির উচ্চ
সীমায় আরোহণ করা যায় সে সমুদয় গুণ তরুণ ভূতনাথে নিহিত ছিল। কালক্রমে সে সমুদয়
গুণ যেমন বিকশিত হইয়াছে তেমনই কারবারের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

অতি অল্প দিবসের মধ্যেই ক্রয় বিক্রয় এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে খোঙ্গরাপটীর দোকানে
আর স্থান হয় না। তখন সন্নিহিত ৭নং বনফিল্ডস্ লেন লওয়া হইল। ক্রেতার সংখ্যা
ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইল। এখন আর বিদেশীয় দুই চারিটী কোম্পানীর নিকট
ঔষধ লইয়া চলে না। দূরদর্শী ভূতনাথ পাল বুঝিলেন যে ইউরোপ আমেরিকায় যত বড়
ঔষধ বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারক আছেন সকলের সঙ্গেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে।
এতদ্ভিন্ন কেবল ঔষধ নহে, আধুনিক সভ্য জগতের প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতাগণ যেরূপ ঔষধ
ব্যতিরেকে নানাবিধ দ্রব্যাদি, যেমন গন্ধ দ্রব্য, ফটোগ্রাফের সরঞ্জাম, প্রসাধন দ্রব্যাদি ক্রেতৃ-
গণের সুবিধার্থ রাখেন সেইরূপ দ্রব্যাদিও প্রচুর পরিমাণে আনাইতে হইবে। মতলব ঠিক
কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে যথেষ্ট মূলধন আবশ্যক। সে সময়ে কোম্পানীর যথেষ্ট মূলধন
ছিল না, কিন্তু ভূতনাথ একবার সংকল্প করিলে কার্য্যে নিরত হইবার লোক ছিলেন না।
নিজের যথেষ্ট অর্থ না থাকিলেও দুই একজন ধনীর সাহায্যে ভূতনাথ সংকল্পমত অতি বিস্তৃত
মাত্রায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। উদ্যোগী পুরুষের নিকট লক্ষ্মী স্বয়ংই আসেন

...তাহাই হইল। বঙ্গদেশ ছাড়াইয়া প্রদেশান্তরেও কোম্পানীর মাল সুলভতা ও ...র জন্য সমধিক পরিমাণে বিক্রীত হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ আমদানি, রপ্তানি ও ...বারের প্রসার এত বৃদ্ধি হইল যে এবং বন্‌ফিল্ডস্ লেনেও আর স্থান সংকুলান হয় না ...বারকে এইরূপ সমৃদ্ধির পথে উন্নীত করিয়া পিতা বটকৃষ্ণ পাল ১৮৯৩ সালে ব্যবসায় ...তে অবসর গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতেই বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানীর শনৈঃ প্রসারশালী ...বারের ভার উপযুক্ত পুত্র ভূতনাথ পালের স্কন্ধে আরোপিত হইল।

...গত বৎসরে বটকৃষ্ণ পালের স্মৃতি সভায় জগদ্বিখ্যাত রসায়ন তত্ত্ববিৎ সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ...লিয়া ছিলেন যে, "That European Druggists seek favour and patronage at the ...ds of the proprietors of B. K. Paul & Co. is a source of Pleasure to me in view the fact that Indians generally seek favour of Europeans, and the departed ...thy reversed that order in the same way as the Indian Capitalists of Bombay ...e done."

ভূতনাথ পালের অসাধারণ কর্ম্ম কুশলতা সম্বন্ধে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিলাম। ...ণে তাঁহার ব্যক্তিগত সম্বন্ধে দুই চারিটী বিষয় উল্লেখ করিব। এত বৃহৎ কারবারের ...ালকতা করিয়া সামাজিক ব্যাপারে যোগদান করার তাঁহার অবসর খুব কমই ছিল। তথাপি ...নি তাঁহার স্বজাতি গন্ধবণিকগণের উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। গন্ধবণিক ...তির মধ্যে এমন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি কমই আছেন যিনি ভূতনাথ পালের নিকট কোন না কোন ...কার উপকৃত হন নাই। নিজে উচ্চশিক্ষা লাভ না করিলেও শিক্ষার আবশ্যকীয়তা তিনি ...সম্যক্‌রূপে বুঝিতেন। তাঁহার জন্মভূমি শিবপুরে উচ্চ ইংরাজী স্কুল ও বেণিয়াটোলায় বালক বালিকাদিগের জন্য দুইটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় তাঁহারই উদ্যোগে ও অর্থ সাহায্যে ...পিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেক দুঃস্থ ছাত্রও তাঁহার নিকট সাহায্য লাভ করিয়া বিদ্যার্জ্জনে ...র হইয়াছে।

...সাধারণ পরিশ্রম ফলে ইদানীন্তন তিনি কিছু ক্লান্তি বোধ করিলেও, তাঁহার স্বাস্থ্য এমন ...খারাপ হয় নাই। পরিজন ও বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই আশা করিতেছিলেন যে স্থান ও ...পরিবর্ত্তনে তিনি অচিরাৎ সবল হইয়া উঠিবেন। ভাগ্যে কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না—৭ই ...শুক্রবার সন্ধ্যায় সুস্থদেহে আহারের পর দুইবার বমন করিয়াই তাঁহার জীবন লীলা সাঙ্গ ...ল।

ভূতনাথ পাল ধরাধাম হইতে চলিয়া গেলেন কিন্তু তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাঙ্গালীর হৃদয়ে ...জাগরূক থাকা উচিত। বর্ত্তমান কর্ম্ম সমস্যার দিনে তিনি যে স্বাধীন জীবিকার পথ ...র করিয়া গিয়াছেন সে পথে যদি ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় দেশবাসীগণ অনুগমন করেন ...হইলে আমাদিগের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ নাই। শিল্প বাণিজ্য ...বিষয় উন্নতি সাধনের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে। ইহাতে আমাদের জাতীয় জীবনে ...নূতন চৈতন্য সঞ্চার হইয়াছে তাহা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু শত বক্তৃতা দান করিলেও

কিছু হইবে না, যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে স্বাধীন বৃত্তির স্পৃহা না জন্মায়। সেরূপ স্পৃহায় অনুপ্রাণিত হইলে চাকরীর মোহ কাটিয়া যাইবে এবং আমরা নূতন নূতন পন্থায় গমন করিতে পারিব। ভারতের শ্রম শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধে এখনও কিছুই হয় নাই। বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্র এখনও কর্ম্মীর অপেক্ষায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার অধ্যবসায় শ্রম সহিষ্ণুতা ও আত্মবিশ্বাস অপরে যদি কিছু মাত্রায়ও প্রাপ্ত হন তবে দেশের ব্যবসায়িক পুনর্গঠনের পথ অনেক পরিমাণে প্রশস্ত হইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে আমরা দেশ মধ্যে নব নব ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইব।

মধু নাম।

প্রাণের গভীর হতে
উঠিতেছে গান।
দিবানিশি শুনি তাতে
বাজে তব নাম॥ ১

সকল বাদ্যের তার
অনাহত ধ্বনি—
গগন ভরিয়া তাকে
উঠে প্রতিধ্বনি॥ ২

তোমা ছাড়া কারো নামে
পারিব না প্রভু
হৃদয়ের পূজা দিতে
এ জীবনে কভু॥ ৩

আমার প্রাণের কথা
তুমি জান একা
মরমে কেমন সদা
চাহি তব দেখা॥ ৪

যে গান উঠিছে প্রাণে—
তা-ও দেছ তুমি।
তাই দিয়ে পূজি তোমা—
তব পদে নমি॥ ৫

বুঝেছি জেনেছি পিতা—
সঙ্গীত আমার
পশেছে শ্রবণে তব—
আনন্দ অপার॥ ৬

দুঃখ কষ্ট সবি তাই
গিয়েছে ঘুচিয়া।
আনন্দ সাগরে তাই
রয়েছি ডুবিয়া॥ ৭

তোমার নামেতে প্রভু
কি যে প্রাণ করে!
দেখে কেবা—কার প্রাণ
কাঁদে এত করে॥ ৮

আশীর্ব্বাদ কর দেব
তব মধু নাম
দেহে মনেমোর যেন
করে নিত্যধাম॥ ৯

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি, এ,
সম্পাদক "তত্ত্ব-বোধিনী-পত্রিকা"

সর্ব্বজয়ী।

কাব্য জিনেগো শাস্ত্রে তাহার মধুর পদ বিন্যাসে।
সঙ্গীত জিনে কাব্যে স্বর, তান, ঢালি হরষে॥
রমনী চরণ নূপুর ধ্বনি জিনে সঙ্গীতে ধীরে।
উদরের ক্ষুধা জিনেগো সবায় উপজি আনন তীরে॥

শ্রীকালী প্রসন্ন পাইন।

বর্ণনা বিভ্রাট।

যদি পটল চেরা চোখ হত আর বাঁশীর মত নাক।
দেখে সবার সুনিশ্চয়ই লেগে যেত তাক॥
যদি লক্ষ সর্প শিশুর মত হত মাথার চুল।
দেখে আঁতকে উঠত সবাই যে, নাইক তাতে ভুল॥
যদি সোনার মত রং হত আর চাঁদের মত হাসি।
অবাক হয়ে থাকত সবাই নিশ্চয় দিবানিশি॥
কাঁদিলে যদি চক্ষু হতে ঝরিত মুক্তাফল।
মুক্তায় ভরি যাইত নিশ্চয় গরীবের গৃহতল॥
কোকিলের মত হত যদি কভু কাহারও কণ্ঠস্বর।
কুহু কুহু ধ্বনি উঠিত সদাই প্রতিদেশে ঘর ঘর॥
যদি হত অঙ্গুলি চম্পককলি কুসুম গন্ধগায়।
নিশ্চয় সেটা হইত একটা আশ্চর্য্য এ ধরায়॥
হত যদি ভ্রূ অবিকল ওগো বাসবের চাপসম।
ঠিক নয় কভু নিশ্চয় সকলে বলিত একটা ভ্রম॥
আজানুলম্বিত হত যদি বাহু সিদ্ধান্ত বীরের আকার।
নিশ্চয় তাহা হইত যে আহা কিম্ভূত কিমাকার॥
যদি করিবর সম গজেন্দ্র গমনে চলিত সুন্দরী নারী।
ঘর দ্বার সবই হত কম্পিত শুধু পদ ভরে ওগোভারি॥

শ্রীকালী প্রসন্ন পাইন।

সাহিত্য-সভার অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী।

একত্রিংশ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশন।

১৯শে বৈশাখ ১৩২৭ সাল। ২রা মে ১৯২০ সাল।

রবিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা।

উপস্থিত সভ্যগণের নাম,—

১। শ্রীযুক্ত কালীধন চন্দ; ২। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু; ৩। নগেন্দ্র নাথ নাগ; ৪। রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার; ৫। সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষন; ৬। কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাবিনোদ ইত্যাদি; ৭। রায় ডাঃ চুনীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি; ৮। অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়; ৯। হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; ১০। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; ১১। কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ; ১২। কুমার প্রকাশকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ; ১৩। অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু এম এ; ১৪। ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ১৫। রাখালচন্দ্র দাস; ১৬। গোবিন্দচন্দ্র মল্লিক; ১৭। প্রবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

২। শ্রীযুক্ত রায় ডাক্তার চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, মহাশয়ের প্রস্তাবে ও কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ, মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতি ক্রমে শ্রীযুক্ত নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

৩। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও পরিগৃহীত হইল।

৪। তদনন্তর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু এম,এ, মহাশয় বংশানুক্রমতত্ত্ব সম্বন্ধে চতুর্থ বক্তৃতা প্রদান করেন। বিষয়,—আমাদের সমাজ ও ও আধুনিক বিজ্ঞান।

৫। রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সমর্থনে নিম্নলিখিত শোক প্রকাশক মন্তব্য দুইটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি, মহাশয়ের পরলোক গমনে রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু মহাশয় বলেন—মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত আমি ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ছিলাম। তিনি সংস্কৃত ইংরাজি পালি, ও বঙ্গভাষায় অসাধারণ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি

বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ গবেষনা করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও অজাত শত্রু ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে সাহিত্য সভা বিশেষ উপকৃত। তিনি বহু প্রবন্ধ এই সাহিত্য সভায় পাঠ করিয়াছিলেন। এ ছাড়াও তিনি এসিয়াটীক্ সোসাইটি ও সাহিত্য পরিষদের জন্যও যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাবটী তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।

(ক) সাহিত্য সভা, স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি, মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করিতেছেন। সাহিত্য সভা অতি গভীর দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতেছেন যে, এই সভার তিনি বহুকাল হইতে অন্যতম সভ্য ছিলেন। সংস্কৃত, সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অনন্য সাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিনয় সর্ব্বজন বিদিত। সভায় অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে এই সভা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।"

(খ) রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলেন, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় কিরূপ কৃতি, কিরূপ বিদ্বান, কিরূপ অসাধারণ বিনয়ী ছিলেন তাহা সর্ব্বজন বিদিত। তিনি আমার কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ছিলেন। তাঁহার ন্যায় একাধারে ইংরাজী, সংস্কৃত, পালি, বাঙ্গালা ও অন্যান্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন লোক খুব কমই আছে। তাঁহার ন্যায় উদার ও সদাহাস্যপূর্ণ, নির্ম্মল প্রকৃতি ব্যক্তি আর পাইবনা।

(গ) শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু এম, এ, মহাশয় বলেন যে, মহামহোপাধ্যায় আমার সমবয়স্ক ও বিশেষ আন্তরিক বন্ধু ছিলেন। তিনি দলাদলির মধ্যে থকিতেন না। তিনি স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল সাহিত্য সভা নহে, কেবল বঙ্গদেশ নহে, সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

(ঙ) সভাপতি মহাশয় বলেন যে, স্বর্গীয় রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল, মহাশয় প্রায় "সাহিত্য সভার" সৃষ্টির প্রথম সময় হইতে সংসৃষ্ট ছিলেন এবং সভার উন্নতির জন্য অকৃত্রিম ভাবে আন্তরিকতার সহিত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহার জন্য আমরা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি।

(ক) রায়বাহাদুর ডাঃ চুনিলাল বসু মহাশয় বলেন মণ্ডল মহাশয় "বেনাভেলেণ্ট সোসাইটী" ও "সাহিত্য সভার" হিসাব পরীক্ষা করিতেন ও একনিষ্ঠভাবে উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। তাঁহার জন্য আমরা বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছি। তাঁহার শোক প্রস্তাবটী নিম্নে লিখিত হইল।

"সাহিত্য-সভা, স্বর্গীয় রামেশ্বর মণ্ডল বি,এল, মহাশয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বহুদিন যাবৎ এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য এবং আয়ব্যয় পরীক্ষক ছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনে সভা বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের এক খণ্ড প্রতিলিপি তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজন বর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

(খ) রায় সাহেব হিরালাল সরকার বলেন, মণ্ডল মহাশয় আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমি একজন বিশেষ বন্ধু হারাইয়াছি। তাঁহার জন্য আমি আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছি।

৭। "হরিদাস" নামক গ্রন্থ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন পাইন প্রণীত, উপহার দাতা শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয় কে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৮। অতঃপর ১৩২৭ সাল কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্ব্বাচনের ফল যাঁহারা অধিক সংখ্যক (২৫ জন) ভোট প্রাপ্ত হইয়াছেন। নির্ব্বাচিত সভ্যগণের নাম ও তাঁহার প্রত্যেকে যত মত পাইয়াছেন তাহার সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১। শ্রীযুক্ত রায় ডাঃ চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, ৪৯; ২। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু ৪৮; ৩। কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ, ৪৮; ৪। কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এম, এ, ৪৭; ৫। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ৪৬; ৬। কুমার প্রকাশকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ ৪৫; ৭। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ ৪৫; ৮। কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ, ৪৪; ৯। সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন, এম, এ, ৪৪; ১০। মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা ৪১; ১১। অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস, সি, ৪১; ১২। কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাবিনোদ ইত্যাদি ৩৯; ১৩। মহারাজ ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ৩৬; ১৪। কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন ভিষগরত্ন ৩৪; ১৫। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু এম, এ, ৩৪; ১৬। যতীন্দ্রনাথ দত্ত ৩১; ১৭। সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ, ৩১,

১৬। অধ্যাপক জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল ২৯ ; ১৯। পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী ২৯ ; ২০। পণ্ডিত কৈলাশচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব ২৮ ; ২১। ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ এম, বি, ২৭ ; ২২। রায় মতিলাল হালদার বাহাদুর ২৫ ; ২৩। ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, ২৫ ; ২৪। রসময় লাহা ২৫ ; ২৫। ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২২ ;

৯। অতঃপর কলিকাতা করপোরেশনের লাইব্রেরী সংক্রান্ত পত্রও (condition) পঠিত হইল। এবং পত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে ওয়ার্ড কমিশনার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র বি, এ, মহাশয়কে পত্রিকা সমিতির সভ্য করা হইল এবং করপোরেশনকে এই পত্রের উত্তর প্রদান করা হইল।

১০। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী রায় বাহাদুর মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার বিষয় আলোচিত হইল এবং উপস্থিত সভ্য মহোদয়গণ চাঁদার খাতায় স্বাক্ষর করিলেন।

১১। সমালোচনা প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয় বলেন—এই বক্তৃতাটী সমাজ সম্বন্ধে ও ব্যক্তির সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয়। অনেক রোগ সম্বন্ধে "বংশানুক্রমতত্ত্ব" স্বীকৃত হয় না। উপদংশ রোগ বংশানুক্রমিক কিন্তু যক্ষ্মারোগ বংশানুক্রমিক নয়, উহা সংক্রামক। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সবল ব্যক্তিকে সহসা যক্ষ্মারোগ আক্রমণ করিতে পারে না। দুর্ব্বল ব্যক্তিকেই আক্রমণ করে। আমি মন্মথবাবুকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

১২। তদনন্তর সভাপতি মহাশয় বলেন যে মনুষ্য দ্বারা সৃষ্টি কার্য্য বৃদ্ধি করিবার নিয়ম করিয়াছেন, তাহার প্রাকৃতিক বিবরণ জানা দরকার। রোগ বংশানুক্রমিক না হইয়া যদি বিদ্যা বংশানুক্রমিক হয় তাহা হইলে ভাল হয়। এই বিষয়টা আমরা বিশদভাবে আরও শুনিতে ইচ্ছা করি। আমরা অদ্যকার বক্তৃতাটী শুনিয়া তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

১৩। যথারীতি সভাপতি মহাশয়ের ধন্যবাদের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়— শ্রীঅমৃতলাল বসু—
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি।

সাহিত্য-সভার

একবিংশ বার্ষিক দ্বিতীয় অধিবেশন।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ সাল। ২৯শে মে ১৯২০ সাল।

শনিবার, অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা।

১। নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন—

১। শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাবিনোদ, কাব্যভূষণ ইত্যাদি ২। অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়; ৩। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু; ৪। বঙ্কুবিহারী ধর; ৫। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু এম্. এ; ৬। সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ; ৭। যতীন্দ্রনাথ দত্ত; ৮। ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৯। কুমার প্রকাশকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ, ১০। নগেন্দ্রনাথ নাগ; ১১। কবিরাজ কমলাকান্ত রায়; ১২। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; ১৩। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ স্কেয়ার; ১৪। রামময় লাহা; ১৫। গিরিশচন্দ্র লাহা এম, এ; ১৬। হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; ১৭। শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়; ১৮। পণ্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য বেদান্ততীর্থ; ১৯। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ, ২০। গোবিন্দ লাল মল্লিক; ২১। প্রবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

২। সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ, মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কুমার প্রকাশকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ, মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সভাপতির আসনগ্রহণ করেন।

৩। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরনী পঠিত বলিয়া পরিগৃহীত হইল।

৪। তদনন্তর বাবু ভূতনাথ পাল মহাশয়ের মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপক নিম্নলিখিত মন্তব্যটি সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হইল :—

(ক) "সাহিত্য-সভা, স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল মহাশয়ের অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। অসাধারণ ব্যবসায় বুদ্ধি ও একনিষ্ঠ কর্ত্তব্য পালনের ফলে তিনি তাঁহার স্বনামধন্য পিতার অতুল কীর্ত্তি বিশাল ঔষধ ব্যবসায়ের যে উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাহা কেবল বাঙ্গলায় নহে, পরন্তু সমগ্র

ভারতের গৌরবের বিষয়। তিনি সাহিত্য-সভার একজন অনুরাগী সভ্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সভা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন। এই প্রস্তাবের একখণ্ড প্রতিলিপি তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

(খ) উপস্থিত সভ্যগণ মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মানার্থ দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

৫। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ৫টী শূন্য পদে নিম্নলিখিত সভ্যগণ নিযুক্ত হইলেন—

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ; ২। ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্. এম্. এস্; ৩। কবিরাজ কালীভূষণ সেন; ৪। পণ্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য বেদান্ততীর্থ; ৫। ক্ষেত্রভূষণ বসু;

৬। তদনন্তর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্. এ. মহাশয় আমাদের সমাজ ও আধুনিক সৌজাত্য বাদ শীর্ষক বংশানুক্রমতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার পঞ্চম বক্তৃতা করেন।

৭। সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ. মহাশয় বলেন সৌজাত্য বাদের আলোচনা এ দেশে খুব কমই হইয়াছে, অথচ অভিব্যক্তিবাদের মূল সূত্র গুলি প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিত গণের গ্রন্থে যেরূপ পরিব্যক্ত হইয়াছে, এমন কোন দেশেই হয় নাই। তবে পাশ্চাত্য দেশে ইহার ব্যাখ্যা প্রভূতভাবে হইয়াছে ও হইতেছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে নীহিত এই মূল সূত্রগুলি ধরিবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত। বিবাহ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন ঈজিপ্টে ও আধুনিক শ্যামদেশে সহোদর সহোদরার মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল ও আছে। কিন্তু তাহাতে সুফল ফলিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। Irish দের মধ্যে কাছাকাছি বিবাহের জন্য অনেক দোষ সংঘটিত হইয়াছে। গুণ অপেক্ষা দোষ বেশী সংক্রামিত হয়। মোটামুটী এই বলা যায় যে, ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া কার্য্য করিলে সমস্ত গোল দূর হয়।

৮। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন,—বিষয়টি গভীর হইলেও বক্তা অতি প্রাঞ্জলভাবে ইহার বিবৃতি করিয়াছেন। শুনিলে মুগ্ধ হইতে হয়। এ বিষয়ে ইহাঁর গবেষণা বিশেষ প্রশংসনীয়। বাইবেলেও বিজাতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এরূপ বিবাহ সকল সময়ে অনিষ্টকর কিনা তাহা বলা যায় না।

এই সমস্ত আলোচনা আমাদের দেশে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম্মই সকলের মূল—শাস্ত্রপাঠ হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে কর্ম্ম এবং কর্ম্ম হইতে চরিত্র গঠিত হয়।

৯। কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয় বলেন—এইরূপ প্রবন্ধে বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি হইবে। বক্তা মহাশয়ক্রমাগত পাঁচটি বক্তৃতায় জ্ঞান, তর্ক ও যুক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদান করিয়াছেন। মনুসংহিতায় সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। য়ুরোপেও ottoman রাজাদিগের মধ্যে নিকট বিবাহে অনেক রোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপ বিবাহ জাত সন্তান প্রতিভা প্রভৃতিতে হীন হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই মতের সমর্থন করেন। এ সম্বন্ধে মতভেদ অনিবার্য্য। সমস্ত রোগ বংশানুক্রমিক নহে। অভিব্যক্তিবাদ ও সুপ্রজনন বিদ্যা সম্বন্ধে আয়ুঃশাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ ও স্মৃতি পুরাণাদিতে যে সমস্ত কথা দেখা যায় তাহা হইতে বুঝা যায় যে, এই বিদ্যা য়ুরোপে আবিষ্কৃত হইবার বহু পূর্ব্বে আমাদের দেশে সুধীগণের পরিজ্ঞাত ছিল।

১০। তদনন্তর সভাপতি মহাশয় তাঁহার পুত্রকল্প মন্মথবাবুর পাণ্ডিত্যে আনন্দ ও গৌরব প্রকাশ করিয়া বলেন, আমরা বাগানের জন্য মালী রাখিতে হইলেও তাহার বীজ ও কালাদি সম্বন্ধে জ্ঞান আছে কি না তাহার পরীক্ষা করি, কিন্তু মানুষের উৎপত্তির জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি না। পূর্ব্বে এ বিষয়ের চর্চ্চা ছিল, তাই আমরা আজও বাঁচিয়া আছি। কৌলীন্যের সৃষ্টি আদর্শ বা type রক্ষণ করিবার জন্য। ক্রমে সেই উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া আমরা অনিষ্ট ঘটাইয়াছি। সজীব জাতিরা অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখিলে পুরাতন হাঁড়ি ত্যাগ করিয়া নূতন হাঁড়ি ব্যবহার করে। আমাদের দেশে এ বিষয়ে উপদেশ দিবার লোক নাই। একটা ঢিল ছুঁড়িতে যে ভাবনা ভাবি, একটা পুত্রের জন্ম সম্বন্ধে সে ভাবনাও ভাবি না। এরূপ বক্তৃতা সাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রচলিত হওয়া দরকার।

১১। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচুনীলাল বসু—
সম্পাদক।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—
সভাপতি।

সাহিত্য-সভার

একবিংশ বার্ষিক তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

২৭শে আষাঢ় ১৩২৭ সাল ; ১১ই জুলাই ১৯২০ খৃঃ।

রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকা।

১। নিম্নলিখিত সভ্য মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন —

১। শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর এম, এ ; ২। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ ; ৩। কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাবিনোদ ; ৪। কবিরাজ বসন্তকুমার গুপ্ত ; ৫। রায় ডাঃ চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি ; ৬। অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় ; ৭। আশুতোষ ঘোষ ; ৮। সতীশচন্দ্র দাস ; ৯। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ১০। রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; ১১। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল ; ১২। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু ; ১৩। জগবন্ধু মোদক ; ১৪। কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ ; ১৫। ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; ১৬। রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার ; ১৭। যতীন্দ্রনাথ দত্ত ; ১৮। কবিরাজ কেদারনাথ কাব্যতীর্থ ; ১৯। মন্মথনাথ রায় এম, এ, বি, এল ; ২০। কৃষ্ণদাস বসাক ; ২১। গোবিন্দলাল মল্লিক ; ২২। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, ২৩। প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

২। শ্রীযুক্ত রায় ডাঃ চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম, এ, বি, এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

৩। সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত হইল।

৪। রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয় স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর সেন মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করিয়া নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাবটী সভার সমক্ষে উপস্থাপিত করেন এবং উহার একখণ্ড প্রতিলিপি স্বর্গীয় সেন মহাশয়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক, ইহাও প্রস্তাব করেন।

(ক) সাহিত্য-সভা, স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন মহাশয়ের পরলোক গমনে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তিনি এই সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন এবং কয়েকটি বক্তৃতাও প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত "ভূ প্রদক্ষিণ" গ্রন্থখানি সর্ব্বজন বিদিত। তিনি শেষ জীবনে পরলোকতত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা করিতেছিলেন। তিনি সুবক্তা, সুপণ্ডিত ও উদার প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে এই সভা একজন ইতিহাসজ্ঞ ও দার্শনিকের অভাব অনুভব করিতেছেন এবং তজ্জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

(খ) শ্রীযুক্ত নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন—চন্দ্রশেখর সেন মহাশয়ের লিখিত "ভূ-প্রদক্ষিণ" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছিলাম। এরূপ সুন্দর ও সুরচিত গ্রন্থ আমি খুব কমই দেখিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে একজন প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তির তিরোধান হইল।

(গ) তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, সেন মহাশয়ের সহিত আমি ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ছিলাম। তিনি একজন সুযোগ্য চিন্তাশীললেখক ও বক্তা ছিলেন। তাঁহার অভাবে সাহিত্য জগৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ও সরল প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। আমি এরূপ উদার প্রকৃতির লোক খুব কমই দেখিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে আমি আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। সভার সকলে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া শোক প্রকাশ গ্রহণ করিলেন।

৫। নিম্নলিখিত গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়—

গ্রন্থের নাম—	উপহার দাতার নাম—
১। পঞ্চি করণ ম্	সারদামঠের শঙ্করাচার্য্য।
২। ব্রহ্ম মীমাংসাস্তর্গত চতুঃসূত্রী	ঐ
৩। বিবাহ মীমাংসা	ঐ
৪। বেদান্ত পরিভাষা	ঐ
৫। শ্রীতত্ত্বসূত্র	শ্রীযুক্ত সাতকড়ি সিদ্ধান্ত ভূষণ
৬। প্রাচীন নদীয়ার অবস্থিতি মীমাংসা	ঐ
৭। ভক্তি বিনোদ জীবনী	ঐ
৮। A glimpse into the life of Thakur Vakti Vinode	ঐ

৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর নাথ ঠাকুর এম, এ, মহাশয় নূতন সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৭। অতঃপর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ কবিভূষণ মহাশয় "মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৮। প্রবন্ধ সমালোচনা উপলক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর এম, এ, মহাশয় বলেন যে, তিনি প্রবন্ধ পাঠক মহাশয়ের যুক্তির সারবত্ত্বা কতদূর, তাহা বলিতে পারেন না। কালিদাস সমুদ্র গুপ্তের আশ্রিত হইলে সমুদ্র গুপ্তের নাম কালিদাসের গ্রন্থ মধ্যে ভুরিঃ ভুরিঃ থাকিত, কিন্তু তাহা নাই। আলঙ্কারিকগণ ঋতু সংহার হইতে কোন বচন অধ্যাহার করেন নাই।

অনেকের মতে ঋতু সংহার কালিদাসের গ্রন্থই নয়। যদি বা ঋতু সংহার কালিদাসের কাব্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও মালববাসীগণের ঋতু বর্ণনার অভ্যাস আছে; তিনি মালবের লোক ছিলেন। সমালোচক পাটনায় বহু দিন ছিলেন তথায় বৈশাখ মাস হইতেই বর্ষারম্ভ হয়। কালিদাস নানা দেশের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সকল দেশবাসীই তাঁহাকে নিজ দেশবাসী বলিতে পারে। তালিবন বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যান্য দেশেও আছে। "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" এই পাঠ ঠিক নহে; "আষাঢ়স্য প্রশম দিবসে" পাঠই বোধ হয় ঠিক। প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ের যুক্তি ও প্রমাণ সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীর।

৯। শ্রীযুক্ত ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে তিনি মালব দেশে বিক্রমাদিত্যের বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশ ছাড়াও তালীবন অন্যান্য স্থানেও অনেক আছে।

১০। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন—প্রবন্ধ পাঠক মহাশয় যে কালিদাসকে বাঙ্গালী করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। এইরূপ আলোচনা বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয়। ইয়ুরোপে সেক্‌সপীয়ার প্রভৃতি বড় বড় কবিগণের জন্মস্থান নির্ণয় সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া থাকে।

১১। তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, এরূপ গুরুতর বিষয়ের প্রবন্ধের সমালোচনা শ্রবণ মাত্রেই করা উচিৎ নহে। প্রবন্ধ লেখক কালিদাসের জাতি সম্বন্ধে নূতন প্রণালীর সমালোচনা করিয়াছেন। য়ুরোপে সেক্‌সপীয়ারের গ্রন্থ

আলোচনা করিবার জন্য পৃথক সমিতি এবং গ্রন্থাগার আছে। সেক্স্পীয়ার সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা পুস্তক বাহির হইয়াছে তৎসমস্ত ঐ গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক মহাশয় স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কতকাংশে সঙ্গত হইলেও, ন্যায় শাস্ত্রে যাহাকে বিনিগমক যুক্তি বলে, ঐ গুলি তাহা নহে। এ বিষয়ের আলোচনা সমগ্র পণ্ডিত মণ্ডলী সমবেত হইয়া ধারাবাহিকরূপে করিলে ভাল হয়। ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। তাঁহার মতে "সাহিত্য সভা" বা "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" কর্ত্তৃক "কালিদাস সমিতি" নামক একটী পৃথক সমিতি গঠিত হইয়া ঐ বিষয়ের আলোচনা হইলে সুফল লাভ হইবার সম্ভাবনা। অতঃপর প্রবন্ধ লেখককে তিনি ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

১২। রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রস্তাব উপলক্ষে বলেন যে উপস্থিত সকলেই সভাপতি মহাশয়ের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। সাহিত্য দর্শন ও ইতিহাসে তিনি যেরূপ পণ্ডিত তাহাতে এরূপ প্রবন্ধ পাঠের সভায় তিনিই সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। সমালোচনা উপলক্ষে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। প্রবন্ধ লেখক মহাশয় স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার জন্য কালিদাসের লেখা হইতেই তৎকালীন সামাজিক দেশের আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ, ঋতুপর্য্যায় বর্ষারম্ভ, বৃক্ষ ও প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার এই চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। কালিদাস অনেক দিন চলিয়া গিয়াছেন। এতদিন পরে তাঁহার জাতি সম্বন্ধে বিশ্বাস্য বাহ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা বড়ই সুকঠিন। এখন যাহা কিছু পাওয়া যাইবে, তাহা আভ্যন্তরিক প্রমাণ হইবে; প্রবন্ধ লেখক মহাশয় তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য যথেষ্ট অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতেছেন। কালিদাস জগৎ পূজ্য কবি; তিনি যদি বাঙ্গালী বলিয়া প্রমাণিত হয়েন, তাহা হইলে তাহা বাঙ্গালী ও বাংলা দেশের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। একটী বিশেষ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া এ বিষয়ের নিরপেক্ষভাবে আলোচনা হওয়া উচিত। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ লেখক মহাশয়কে যে ধন্যবাদের প্রস্তাব করিয়াছেন, তিনি সাহিত্য সভার পক্ষ হইতে তাহার সমর্থন করিতেছেন।

১৭। যথারীতি সভাপতি মহাশয়ের ধন্যবাদের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচুণীলাল বসু— শ্রীবিহারীলাল সরকার—

সম্পাদক। সভাপতি।

সাহিত্য-সভার

১৩২৭ সালের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ।

সভাপতি :—

শ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে, সি, আই, ই।

সহ-সভাপতিগণ :—

১। শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী কে, টি, সি, এস্, আই, এম. এ. ডি, এল ইত্যাদি ; ২। শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী এম. এ, এল, এল, বি, বার-এট-ল ; ৩। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, সি. এস. আই ; ৪। স্যার ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ কে, টি, এম, এ, ডি. এল. সি, এস, আই ; ৫। কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এম এ ; ৬। মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বি, এ ; ৭। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ; ৮। রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী ; ৯। কুমার প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ; ১০। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। ১১। মাননীয় বিচারপতি সি, সি, ঘোষ স্কোয়ার ; ১২। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু।

সভ্যগণ—

১। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম্, এ, এল, এম, এস ; ২। মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ ; ৩। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজকবিসম্রাট যাদবেশ্বর তর্করত্ন ; ৪। মহারাজ ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (নসীপুরাধিপতি ;) ৫। কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব

বাহাদুর বি, এ ; ৬। অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু এম, এ ; ৭। কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন ভিষগ্‌রত্ন ; ৮। যতীন্দ্রনাথ দত্ত ; ৯। সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ ; ১০। অধ্যাপক জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল ; ১১। পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী ; ১২। ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ এম, বি ; ১৩। ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; ১৪। পণ্ডিত সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ ; ১৫। রায় মতিলাল হালদার বাহাদুর ; ১৬। ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এল, এম, এস ; ১৭। পণ্ডিত কৈলাশচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব ; ১৮। কবিরাজ কালীভূষণ সেন কবিরত্ন ; ১৯। পণ্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য বেদান্ততীর্থ ; ক্ষেত্রভূষণ বসু ; ২১। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ; ২২। মন্মথনাকান্ত দে এম, এ, বি, এল, সি, ২৩। পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

অবৈতনিক সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত রায় ডাঃ চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, এফ, সি, এস, আই, এস ও রসায়নাচার্য্য।

সংযোগী সম্পাদকগণ—

১। শ্রীযুক্ত কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ ; ২। সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ ; ৩। কুমার প্রকাশকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।

সহকারী সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস, সি।

ধনাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ,

সাহিত্য-সংহিতার সম্পাদকদ্বয়—

শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর দর্শন-নিধি।

শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ।

পুস্তকালয়াধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ ইত্যাদি।

আয়ব্যয় পরীক্ষক :—

শ্রীযুক্ত রসময় লাহা।

ভাষা-তত্ত্ব।

ব্রজ ভাষার তব্‌ শব্দের স্থানে বাঙ্গলা ভাষায় তো হয়। ব্রজ ভাষায় ব কারকে ওকাররূপে উচ্চারণ করে। সুতরাং তব্‌ স্থানে তো লেখাই সঙ্গত। চিরকাল তাহাই বলা ও লেখা হইত।

যথা :—আমি তো জানিনা, তোরাই তো শিখালি সে তো তেমন লোক নয়, বুঝালে তো সে থাকিবে না, ইত্যাদি ইদানীং দেখিতেছি যে তো স্থানে কেবল 'ত' লেখা হয়। ইহা ব্যুৎপত্তি হীন এবং ভ্রম জনক। অতএব ইহা দুষ্য এবং পরিহার্য্য।

দৃষ্টান্ত।

গিরিজা ত যাবে না। গনি ত আসিয়াছে। ইত্যাদি বাক্যে ত শব্দ পূর্ব্ব শব্দ সহ মিশিয়া ভ্রম জন্মাইতে পারে। অথচ তো শব্দাৎ ত শব্দ মিষ্ট নহে। বিনা লাভে শব্দ ব্যত্যয় করা অনুচিত। অতএব তো স্থানে ত প্রয়োগ দূষ্য।

শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল।

ক্রমশঃ।

দৌত্য।

ভাবিয়াছিলাম কভু কবি যথা মেঘে করি দূত
পাঠাইলা প্রনয়িনী পাশে তারে ভাবি' মজবুত।
আমিও তেমনি মেঘে দৌত্যপদে অভিষিক্ত করি'
পাঠাতাম-কিন্তু কোথা? অনমনে উঠিনু শিহরি'।
পদাঙ্কে পাঠিয়েছিল গোপবালা শ্যামের সকাশে
আমিয়ে পাঠাব কোথা? ভাবি বুক অশ্রুজলে ভাসে।
বায়ুকেও বলা বৃথা অঠিকের ঠিকানা করিয়া—
কে যাইবে অভাগার হৃদয়ের বেদনা বুঝিয়া
বুঝিয়াছি বৃথা মোর অন্বেষণ পাঠিয়ে অপরে
নিজে যাব আর কারে পাঠাব না খুঁজিবার তরে॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবপর্য্যায়, ১ম খণ্ড } ১৩২৭ সাল, শ্রাবণ,—আশ্বিন, { ৪র্থ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

দিল্লী নগরীর প্রধান স্থান সমূহ।

৪র্থ পরিচ্ছেদ।

গোলাপ রক্তিম প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর সমন্বিত দুর্গটীতে "লাহোরী" নামক তোরণ দ্বারের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। এই দ্বারের উপরি-ভাগের কামরা গুলি প্রাসাদ রক্ষীদিগের কাপ্তেন খৃঃ ১৮৫৭ সনের মে মাসে অধিকার করেন। এই স্থানেই কাপ্তেন, কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট, ধর্ম্মযাজক ও তাঁহার কন্যা এবং অল্প বয়স্কা একটী মহিলা বন্ধুর হত্যা সংসাধিত হয়। এই সঙ্গে এক জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকেও হত্যা করা হয়, কথিত আছে তিনি চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। এই স্থানটী পার হইলেই খিলানাচ্ছাদিত একটী পথ। উহার উভয় পার্শ্বেই কতকগুলি কামরা রহিয়াছে—নিশ্চয়ই মোগলদিগের সময় রক্ষিগণের বাসের জন্য এইগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এই পথ দিয়া বাহির হইতেই সম্মুখভাগে 'নক্করখানা' বা গীতিমঞ্চ। অধুনা এই স্থানটী জাদুঘরে পরিণত করা হইয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার পাঁচদিন পরে এই খিলানাচ্ছাদিত প্রবেশ পথের উত্তর পার্শ্বে যে একটী বিশাল বৃক্ষ ছিল তাহারই নীচে বহুসংখ্যক দরিদ্র লোক একত্রিত হয়। উহারা আত্মসমর্পণ করে। 'কৃষ্ণসর্পকে নির্য্যাতনকর ক্ষতি নাই কিন্তু আফগাণকে নির্য্যাতন করিও না' এই প্রবাদ বাক্যটী বিস্মৃত হইয়া বধ করা হইবে না এই আশ্বাস প্রদানে উহাদিগকে প্রাসাদ মধ্যে নেওয়া হয়। কিন্তু

বস্তুতঃ অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই প্রাণ রক্ষা করা হইয়াছিল এবং ইহারাই রাজ দরবারে বিচারকালে লোমহর্ষণকারী ঘটনাটী আদ্যোপান্ত বিবৃত করে।

দেওয়ানীয়াম—পূর্ব্বে দ্বারদেশে যে গীতিমঞ্চটী রহিয়াছে তাহার নীচে সকলকেই হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে অথবা শিবিকা রোহণে দেওয়ানীয়াম নামক জন সাধারণের প্রাসাদে যাইতে হইত। বর্ত্তমানে ঐ গীতিমঞ্চটীকে এড়াইবার জন্য রাস্তাটী খানিকটা বাঁকিয়া গিয়াছে। এই বিরাট প্রাসাদটী হিন্দু গঠন প্রণালীতে নির্ম্মিত। ইহার প্রশস্ত প্রস্তর খণ্ড নির্ম্মিত ছাদ সুদীর্ঘ কড়ির সাহায্যে ষষ্টি সংখ্যক রক্তবর্ণের প্রস্তরময় স্তম্ভ মস্তকোপরি বহন করিতেছে। এক সময়ে আগরা নগরীর জনসাধারণের প্রাসাদের অনুকরণে এই স্তম্ভগুলিতে অতি সুন্দর ভাবে কলি ফেরান হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে উহা নষ্ট হইয়াছে এখন ইহার দৃশ্য অনেকটা মলিন হইয়া পড়িয়াছে। কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। সাহজাহান আর ঔরঙ্গজেব ও নাই আর এই স্থানের শোভা ও সমৃদ্ধিও নাই। কোথায় আজ সেই গীতিমঞ্চ ও এই প্রাসাদেরই মধ্যবর্ত্তী জাহাজের মাস্তলের মত অত্যুচ্চ স্তম্ভরাজি দ্বারা সংরক্ষিত পুষ্পচিত্রে চিত্রিত বস্ত্রে প্রস্তুত মনোহর তাঁবু! এখন আর সেই দৃশ্য নাই। সেইদিন অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, যেই দিন সম্মুখস্থিত রাজসভা সুশোভন রাজন্যবর্গ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত। পূর্ব্বে সম্রাট স্বয়ং ময়ুর সিংহাসনে উপবেশন করিতেন আর ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে রাজদূতগণ আগমন করতঃ অত্যুৎকৃষ্ট উপঢৌকন দানে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন—সে এক অপূর্ব্ব নয়নাভিরাম দৃশ্য, কিন্তু এখন সেইরূপ প্রাণস্পর্শী দৃশ্য আর এখানে দৃষ্টিগোচর হয় না। মোগল সম্রাটদের সময়ে রাজধানীর অতুল বৈভব ও অশ্রুত পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি দর্শনাভিলাষে অনেক লোক কৌতুহলপূর্ণ হইয়া লক্ষ লক্ষ মাইল দুর হইতে চলিয়া আসিতেন। রাজা প্রথম জেমসের (King Jemes the first) সময়ে ড্যান করিয়াট নামধেয় এক ব্যক্তি অধিকাংশ পথ পদব্রজে চলিতে হইলেও কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! এখন মোগল রাজগণের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে আর হিন্দু রাজন্যবর্গের ভস্মরাশি পর্য্যন্ত গঙ্গা আর যমুনার জলে নিজেদের অস্তিত্বটুকু সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করিয়াছে, ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির সাহ

ময়ুর সিংহাসনটীকে পারস্যদেশে নিয়া যান আর দিল্লীর শেষ রাজা কারারুদ্ধ অবস্থায় রেঙ্গুন নগরীতে মানব লীলা সম্বরণ করেন। এই প্রাসাদগুলিও আমাদের গভর্ণমেণ্ট যদি কোনও প্রকার যত্ন না নিতেন তাহা হইলে কাল প্রভাবে ধূলিসাৎ হইত। দিল্লী রাজগণের বংশধরগণকে আজ (জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য) খাটিয়া খাইতে হইতেছে !

পশ্চাৎভাগের দেয়ালের গায়ে কারুকার্য্য খচিত মর্ম্মর প্রস্তরে খোদিত একটী উন্নত সিংহাসন। ইহার পিছনে দেয়ালের খোদলে কতকগুলি ছবি রহিয়াছে—এইগুলি অল্পদিন হয় দক্ষিণ কেনসিংটনের জাদুঘর হইতে প্রত্যানয়ন করা হইয়াছে। এইরূপ আরও কতকগুলি মহামতি লর্ড কার্জ্জনের অনুমত্যানুসারে পুনঃসংস্থাপিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার নিজ ব্যয়ে ফ্লরেন্স্ হইতে একজন ইতালী দেশীয় চিত্রকর আনয়ন করতঃ এই কার্য্যটী সুসম্পন্ন করিয়াছেন। সিংহাসনের পাদদেশে একটী আসনে প্রধান মন্ত্রী উপবেশন করিতেন, অবশ্যই সম্রাটের নিকট আবেদন পত্র পেষ করিবার জন্য তাঁহাকে সময় সময় উঠিতে হইত।

এই সিংহাসনটীকে প্রসিদ্ধ ময়ুর সিংহাসন বলিয়া মনে করিলে ভ্রম করা হইবে। ময়ূর সিংহাসন বিস্তৃত একখানা মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত শয্যার ন্যায় দেখাইত স্থান হইতে স্থানান্তরিত করা যাইত এবং উহা বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদি দ্বারা খচিত ছিল। টেজরনিয়র নামধেয় ফরাসীদেশীয় একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত ইহার মূল্য দশ কোটী সত্তর লক্ষ (১০,৭০,০০,০০০) রৌপ্য মুদ্রা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে মহামতি লর্ড কর্জ্জন বলেন যে এই অত্যাশ্চর্য্য সিংহাসনটী আর এখন বর্ত্তমান নাই।

সিংহাসনের ডান ধারে দুইটী দরজা আছে, অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তীটি দ্বারা সিড়ি বহিয়া সিংহাসনের পশ্চাৎভাগে দেয়ালের খোঁদলে যাওয়া যায় আর নিকটবর্ত্তীটির ভিতর দিয়া বেসরকারী (প্রাইভেট) বাগান গুলিতে যাওয়া যায়। পূর্ব্বে ভিতরের দিকের একটী প্রাঙ্গনের দেয়ালে প্রাসাদের উত্তরের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী দ্বার ছিল। এই প্রাঙ্গন মধ্য দিয়া একটু বক্র পথ অবলম্বন পূর্ব্বক বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত লোক সমূহ অসাধারণের জন্য নিযুক্ত প্রাসাদের (Hall of Private awdience) নিকটবর্ত্তী প্রাঙ্গনে যাইতে

পারিতেন। যে দ্বারটি এখন ব্যবহৃত হয় সেই পথ দিয়া "ইমটিয়াজ মহলে" যে ভাগ মহিলাদের জন্য, তথায় যাওয়া যাইত। বাগান গুলির আবার পুনঃসংস্কার চলিতেছে কিন্তু যখন সুন্দরী মহিলাগণ বিচিত্র সাজসজ্জায় পরি-শোভিত হইত ও তাঁহাদের মধুর হাসি দ্বারা সেই নির্জ্জন স্থানটীকে মুখরিত করিয়া তুলিত তখনকার সেই দৃশ্য আর পরিদৃষ্ট হইবে না। গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে দুর্গের ভিতরের ভাগ চটকদার দৃশ্য ও মলিনতার সংমিশ্রণের পরিচয় দিত। রাজার পক্ষে তাঁহার ১৩ লক্ষ টাকা আয়ের উপরে ব্যয় বহন করা অতীব কঠিন হইয়াছিল এবং রাজার সভাসদগণ অতি অল্প বেতনই পাইতেন। বিদ্রোহের পরে অনেক গুলি দালান খালি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং দুর্গ রক্ষক সৈন্যদের জন্য ছাউনি তৈয়ার করা হইয়াছিল। আজ কাল ঐ ছাউনির এক ভাগে শ্বেতাঙ্গ পদাতিক সৈন্য ও অন্যভাগে গোলন্দাজ সৈন্য থাকে।

দেওয়ানীখাস—অসাধারণ জনের জন্য যে রম্য প্রাসাদটী আছে অন্তর প্রকোষ্ঠ গুলির ভিতরে উহাই একমাত্র অমাত্যবর্গ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সকল ও রাজদূত গণের সাদর অভ্যর্থনার জন্য ব্যবহৃত হইত। ইহা নদীর একবারে ধারে অবস্থিত। ইহার সম্মুখভাগ মর্ম্মর প্রস্তর মণ্ডিত কতকটা সচিত্র আবার কতকটা বা খোদিত কারুকার্য্য খচিত, চতুর্দ্দিকে বহুমূল্য চন্দ্রাতপ বিস্তৃত এবং মেঝের উপর পারস্য দেশের গালিচা আঁটা রহিয়াছে কি সুরম্যই বা তাহার শোভা। বস্তুতঃ মধ্যস্থলবর্ত্তী কামরাটীর শেষ ভাগের খিলানের উপরি ভাগে যে সংক্ষিপ্ত প্রশংসা লিপি লিখিত রহিয়াছে এই প্রাসাদের শোভা ও সমৃদ্ধি তাহার যথার্থতা সম্পাদন করিয়াছে যাহা লিখিত রহিয়াছে তাহা এই—যদি পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য থাকিয়া থাকে তবে তাহা এই তাহা এই তাহা এই'।

এক সময় ময়ূর সিংহাসন এই প্রাসাদাভ্যন্তরে ছিল ঐ সিংহাসন স্থানান্তরিত হইলে রাজচ্ছত্র সমন্বিত সুবর্ণ ফলক দ্বারা মণ্ডিত একটী কাষ্ঠময় সিংহাসন এখানে সংস্থাপিত হয়। ইহাও সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় বলিয়া সকলের বিশ্বাস। এখানে আরও একটী স্থুল স্ফটিকময় সিংহাসন ছিল, তাহা বর্ত্তমান উইন্‌সরে আছে। বোধ হয় দিল্লী নগরীর কয়েক মাইল দক্ষিনে অবস্থিত আরঙ্গপুর হইতে আনীত হইয়াছিল; ওখানে এখন একটী মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত আসন পড়িয়া রহিয়াছে।

স্নানাগার—দেওয়ানী খাসের উত্তর প্রান্তে শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি স্নানাগার রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে নদীর এক ধারে ধারেই একটী কামরায় শীতল জল আর অপর দুইটীতে উষ্ণ জলের নীচে অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তদ্বারাই জল উষ্ণ করা হয়। মেঝের উপর ও ভিত্তিপট্ট নানাবিধ কারুকার্য্য খচিত দেখিতে অতীব মনোরম। সচিত্র দেয়ালের উপরিভাগ ও ছাদ পূর্ব্বে যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা আর এখন নাই কারণ কলি ফিরাইয়া সমস্ত চিত্র নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

মুক্তামসজিদ—Pearl muszid স্নানাগারের পরেই একটী মসজিদ বর্ত্তমান, উহা মুক্তামসজিদ নামে পরিচিত। ওরাঙ্গজেব তাঁহার নিজের ও পুরমহিলাদের (বেগম) ব্যবহারের জন্য এই উপাসনাগার প্রস্তুত করান। মেঝের উপরিভাগ উপাসনা কালীন ব্যবহৃত গালিচার নমুনায় বসান মর্ম্মর প্রস্তর খণ্ড দ্বারা মণ্ডিত, ঐ প্রস্তরগুলি এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট যে কে কোথায় দাঁড়াইয়া উপাসনা করিবে যেন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে উপাসনা করিতে যাইবার পূর্ব্বে গাত্রাদি প্রক্ষালনের জন্য একটী ঝরণা রহিয়াছে। এই মস্‌জিদের দ্বারটী পিতল নির্ম্মিত, ইহার সম্মুখবর্ত্তী সোপান পথে দেয়ালের উপরিভাগে উঠাযায় ঐ স্থান হইতে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে যদিও দেয়ালের বহির্ভাগে স্নানাগার ও অন্যান্য সৌধরাজির সহিত সমভাবে একশ্রেণীতে দণ্ডায়মান তথাপি ভিতরের দিকটি এমন ভাবে প্রস্তুত যে উহা ঠিক মক্কার দিকে মুখ করিয়া রহিয়াছে। মর্ম্মর প্রস্তরের নির্ম্মিত গম্বুজ যদিও দেখিতে অতীব স্থূল তথাপি গিল্টি করা তাম্রদ্বারা প্রস্তুত গম্বুজগুলি সরাইয়া ফেলিয়া উহাদিগকেই সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং ঐগুলিকে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের অবরোধের পরে নিলামে বিক্রয় করা হয়। অকটগেল টাওয়ারের উপরিস্থ গম্বুজ ও দেওয়ানী খাসের ছোট ছোট গম্বুজগুলিরও সেই একই অবস্থা হইয়াছিল। উহাদের সকলগুলিই গিল্টি করা তাম্রফলকে নির্ম্মিত ছিল।

এই সৌধ রাজীর উত্তরে ও দক্ষিণে মাঝে মাঝে কয়েকটী মাত্র অট্টালিকা এখন ও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সাহ বুরুজ হইতে স্নানাগার গুলি পর্য্যন্ত এবং রংমহাল হইতে ওয়াটার গেটের নিকটবর্ত্তী আসৃড্‌ বুরুজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে সৌধরাজী বিরাজ করিতে ছিল তাহাদের মধ্যে সাহ বুরুজের নিকট মাত্র

একটী, বাগান বাটীর ভিতরে তিনটী ও নদীর ধারে একটী বা দুইটী মাত্র অট্টালিকা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

সুবর্ণ মস্‌জিদ—দিল্লী নগরীর তোরন দ্বারের বহির্ভাগে অতি সুন্দর একটী ছোট মস্‌জিদ আছে। উহার অগ্রভাগ সোনার পাতে মোড়ান। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে অবরোধের পর অনেক প্রাসাদ মস্‌জিদই ধ্বংসীকৃত হইয়াছিল কিন্তু এই সুবর্ণ মস্‌জিদ সেই সময় ধ্বংসের হাত হইতে অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। ইহার দক্ষিণে দারিয়া গঞ্জ অঞ্চল অবস্থিত তত্রস্থ জিনাতুল মস্‌জিদ, নামক একটী মস্‌জিদের অত্যুচ্চ চূড়াদ্বয় দূর হইতে দৃষ্টি পথে পতিত হয়। পূর্ব্বে দুর্গ ও দারিয়া গঞ্জের মধ্য দিয়া রাজা ঘাট পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাস্তা ছিল এবং মস্‌জিদের ধারে থাকিবার জন্য ডাক্ বাংলা ছিল বাংলাতেই সেই দিন সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয় সেই দিন প্রাতঃকালে দুইজন অজ্ঞাত নামা কর্ম্মচারীর মৃত্যু হয়।

জমা মস্‌জিদ—জমামস্‌জিদ পর্য্যন্ত যে রাস্তা উহা হাতীর আস্তাবল গুলিকে বাম পাশে রাখিয়া ও বাজার ও চকের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন পার্শ্ববর্ত্তী আস্তাবল ও বাজার প্রভৃতি না থাকায় ঐ সুরম্য মস্‌জিদের শ্রীযেন অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মস্‌জিদটী জুজুলা পাহাড় নামক একটী পাহাড়ের গায়ে খুব উচুতে প্রতিষ্ঠিত। এই জমা মসজিদ মুসলমানদিগের নিকট সমগ্র ভারতবর্ষের ভিতর প্রধান উপাসনার স্থান। এখানে শুক্রবার সকলে উপাসনার জন্য একত্র সমবেত হয়। আর অন্যান্য দিনে স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মস্‌জিদে যাইয়া উপাসনা করা হয়। জমা শব্দে একত্রীকরণ বুঝায় অতএব জমা ও জুমা (যাহার অর্থ শুক্রবার) এই দুইটী এক নহে। বাড়ীতে বসিয়া উপাসনা করিলে যদি এক গুণ ফল হয় জমা মসজিদে উপাসনার ফল তাহার ২৫ গুণ আর মক্কা নগরীতে কবরে যাইয়া উপাসনা করিলে তাহার শত সহস্র গুণ ফল হইয়া থাকে। রমজানের সময় শুক্রবার দিবস বেলা দেড় ঘটিকার সময় অনেক লোকের সমাগম হয়। উপাসকগণ যখন প্রবল বাত্যাতাড়িত শস্যের মত একবার উঠিতে থাকে আবার পড়িতে থাকে আবার কখন বা এ পাশে ও পাশে দোলিতে থাকে তখনকার দৃশ্য অতীব চিত্তাকর্ষক। সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে অবশ্য পালনীয় উপবাসের

পরিসমাপ্তি নির্দ্দেশক দুইটী বোমা ছাড়িলে পর মোয়াজিনগণ কর্ত্তৃক মস্জিদের চূড়া হইতে উপাসনার জন্য সকলের আহ্বান এবং সান্ধ্য গগনে যখন অন্ধকার ঘনাইতে থাকে তখনকার উপাসনার ধ্বনি ও মস্জিদ মধ্যে তাহার প্রতিধ্বনি আরও চিত্তাকর্ষক।

প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে দেহাদি প্রক্ষালন জন্য একটী জলাশয় আছে, তিনটী গোলাকার গম্বুজ সমন্বিত মস্জিদের প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ অংশটী বরাবর পশ্চিম পাশে রহিয়াছে। এবং চতুর্দ্দিকস্থ স্তম্ভ শ্রেণীর এক কোণে একটী কামরা আছে। তথায় মহাআমমুম্মদ ও অন্যান্য পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণের স্মৃতিচিহ্ন যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে। মস্জিদের একটী স্তম্ভে পৃথিবীর পুরাতন একটী মানচিত্র খুদিয়া রাখা হইয়াছে।

শ্রীপ্রমোদকৃষ্ণ দেব, বি, এ,

সংস্কৃত-সংলাপ কাব্যম্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

সংস্কৃতম্।

১০। এবং চতুর্থে মহীপতিকাণ্ডে ষড়ধ্যায়ী পরিমিতে কস্যচিদ্ রাজর্ষেঃ প্রশ্নানা মুত্তরপ্রদান চ্ছলেন—

বিজ্ঞেয়ং য নৃপতিভি, স্তৎসর্ব্ব মুপবর্ণিতম্।

যথা, যুশস্কামৈ নৃপতিভিঃ, প্রজাঃ পাল্যাহি কীদৃশ,

মিত্যভিপ্রেত্য কস্যচিদ্রাজর্ষেঃ কিংনাম পালন মিতি প্রশ্নস্য প্রতিবাক্যম্।

গীতিছন্দঃ।

তদেব পালন মুক্তং

বলবৎ প্রহরিণ ইব নগরস্য নিশি।

মাতৃবদ্দবল সুতানাং
সৎপরি রক্ষণ মতিশয় যত্নেন
ইত্যাদিঃ॥

অনেন শ্লোকেন—রাজ্ঞঃ প্রজাপালনস্য, বলবৎ প্রহরিণঃ নিশি সুষুপ্ত-নগরীস্থ নগর পরিরক্ষণেন, মাতুশ্চ শিশু তনয় পরিরক্ষণেন সম মুপমানো পমেয় ভাব বর্ণনেন—

যদ্ যদাবশ্যকং তাসাং, সাধয়িত্বা হ্যখিলং হিতৎ।
অপ্রমত্তৈ রণলসৈঃ প্রজাঃ পাল্যা নরেশ্বরৈ রিত্যুপদিষ্টম্॥

অনুবাদ।

১০। অনুকাব্যের চতুর্থ কাণ্ডের নাম মহীপতি কাণ্ড। মহীপতি কাণ্ড ছয় অধ্যায়। কোনও একজন রাজর্ষির প্রশ্ন সমুদয়ের উত্তর প্রদান ছলে মহাত্ম নৃপতিবর্গের যে সকল বিষয় অবশ্য নিজ্ঞেয়, সেই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

যথা যে সকল মহাত্মা নৃপতি নৃপোচিত যশঃপ্রার্থী তাঁহাদের প্রজা সকলকে কিরূপভাবে পালন করা উচিত, এই অভিপ্রায়ে কোনও এক রাজর্ষি, এক উপাধ্যায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পালন কাহাকে বলে।

উপাধ্যায় উত্তর দিতেছেন।

তদেব পালন মুক্ত মিত্যাদি। উপরি লিখিত।

ব্যাখ্যা।

(ক) রাত্রিকালে নগরের মনুষ্যমাত্রেই সুষুপ্ত। সুখে নিদ্রা যাইতেছে। বলবান্ অর্থাৎ বিপন্নিবারণে সমর্থ, প্রহরীর চক্ষে নিদ্রা নাই। সে কি করিতেছে। কোথায় কে কাহার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত, নিরন্তর তাহারই অনুসন্ধান করিতেছে। এবং যাহাতে কেহ কাহারও অনিষ্টাচরণ করিতে না পারে সেই বিষয়েই ধৃত-ব্রত। অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে তাহারই চেষ্টা করিতেছে। (খ) দুর্ব্বল শিশুগণ স্বীয় শরীর সঞ্চালনেও অসমর্থ। কি করিতে হইবে, কি খাইতে হইবে, কোথায় যাইতে হইবে, কোথায় থাকিতে হইবে, কিছুই জানে না। কেবল খেলার সময় খেলিতে

জানে, আর ক্ষুধা লাগিলেই কাঁদিতে জানে। তাঁহাদের জননীগণ কি করিতেছেন, ঐ সকল শিশু সন্তানগণের যাহা কিছু কর্ত্তব্য, ভোক্তব্য, গন্তব্য, অধিষ্ঠাতব্য ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েরই সুশিক্ষা দিতেছেন। এবং তাহাদের যাহা কিছু আবশ্যকীয়, সমস্ত বস্তুর সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন। এরূপ ভাবে রক্ষা ও পালন আর কেহই কাহাকে করিতে পারে না। এইজন্য ঐ উভয়কে অর্থাৎ প্রহরী এবং মাতাকে উপমানরূপে ধারণ করিয়া বর্ণিত হইতেছে যে] যে নৃপতি, নিশাকালে সুখে নিদ্রিত নগরীস্থ জনগণকে বলবান্ প্রহরীর ন্যায়, কিংবা স্বকীয় নিতান্ত অবোধ ও বলহীন শিশু সন্তানগণকে তাহাদের জননীর ন্যায়, নিরন্তর নিজের প্রজাবর্গকে পরিরক্ষণ করেন। তাঁহার সেই-রূপ পরিরক্ষণকেই শাস্ত্রে পালন কহে। ফল কথা। যে রাজার রাজ্যে প্রজারা কোনওরূপ দুষ্ট চৌরাদি বা হিংস্র ব্যাঘ্র ভল্লকাদি, বা অন্য কোনও রূপ বিপদের কারণ হইতে বিপদ্‌গ্রস্ত না হয়। এবং অভিলষিত বস্তু সকল অনায়াসেই প্রাপ্ত হয়। সেই রাজাই প্রকৃত রাজা। এবং তাঁহার সেইরূপ প্রজা রক্ষণের নামই, প্রকৃত প্রজা প্রতিপালন। শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনুকাব্যের চতুর্থ কাণ্ডে দ্রষ্টব্য।

তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা।

এই শ্লোক দ্বারা—বলবান্ প্রহরীর নিশাকালে (যে সময় নগরীস্থ জন মাত্রেই সুষুপ্ত) নগর পরিরক্ষণের সহিত, এবং জননীর শিশু তনয়গণের পরিপালনের সহিত, নৃপতিগণ কর্ত্তৃক প্রজা প্রতিপালনের উপমান উপমেয় ভাব বর্ণন করিয়া এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যে, যাঁহারা স্বকীয় নরেশ্বর নাম সার্থক করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা প্রজাবর্গের যে সকল বস্তু আবশ্যক, তাহা সমুদয় সাধন করিয়া দিয়া প্রমাদ ও আলস্য বিহীন হইয়া প্রজা সকলকে প্রতিপালন করিবেন। মহীপতি কাণ্ডের প্রথম শ্লোক সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইল।

বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনুকাব্যের চতুর্থ কাণ্ডে দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃতম্।

১১। তথা, পঞ্চমে সামাজিককাণ্ডে ২ধ্যায় ষট্‌ক সুশোভমানে,

ইদানীন্তনানাং সামাজিকানাং হৃদয়ে নিরন্তরমেব যাদৃশাঃ প্রশ্নাঃ।

প্রস্ফুরন্ত, স্ব স্বেচ্ছানুসারেণ তৈঃ কৃতস্য তাদৃশ প্রশ্ন সমূহস্যোত্তর প্রদান চ্ছলেন—"জ্ঞেয়াঃ সন্দিগ্ধ বিষয়া অনেকে স্থ সমাহিতাঃ"।

যথা, কথ মিহ হি নিষিদ্ধা জ্ঞানিনোঽপ্যর্থচিন্তে তি জিজ্ঞাসায়াং প্রতি বচনম্।

গীতি চ্ছন্দ।

জ্ঞানি জনানপি কুপথং
কদর্থ চিন্তা বলাৎসমানয়তি।
কদলী বন মিব করিণী
বন্ধন ভূমিং মদোৎকটংকরিণ
মিত্যাদয়ঃ॥

অনেন শ্লোকেন—ধার্ম্মিক জ্ঞানি জনানাং মদোৎকট করি-স্বরূপত্বং, কুৎসিত বিষয় চিন্তায়াঃ করি ধারণেচ্ছু পুরুষ বশীভূত করিণী স্বরূপত্বং, কুপথত্বেনা ভিহিতস্য বিষয়স্য করিগণ বন্ধনভূমি- কদলী কানন স্বরূপত্বং, এবং করিণ্যাঃ মদোৎকটস্যা পি করিণঃ প্রলোভনেন বন্ধন স্থান প্রাপকত্বমিব বিষয় চিন্তায়াঃ ধার্ম্মিক জ্ঞানি নোঽপি জনস্য দুঃখকুক নিবাস ভূমি বিষর প্রাপকত্ব প্রাপকত্ব মিত্যভিধায় (মিতি প্রকাশ্য), করিণাং মদোৎকটতা পেক্ষয়া করিণ্যা সহ আসক্তি র্যথা বলীয়সী, তথা ধার্ম্মিক জ্ঞানি জনস্য ধর্ম্ম জ্ঞানাদ্যপেক্ষয়া বিষয় সম্বন্ধযুক্তা বিষয়চিন্তা বলীয়সী। এবং কদলীকাননং ভোজনস্থানত্বেঽপি বন্ধনস্থানতয়া যথা করিণাং হেয়ম্। তথা আপাততো রমণীয়োঽপি বিষয়ঃ বহুদুঃখ জনকত্বেন ধার্ম্মিক জ্ঞানি পুরুষাণাং হেয়ঃ। অত স্তৎ প্রাপ কত্বেন বিষয় চিন্তা ন কর্ত্তব্যেতি প্রতি পাদিতম্। অত এবোক্তং মহাত্মভিঃ—

দূরেঽস্ত বিষয়, স্তস্য, চিন্তাঽপি দুঃখ দায়িনী তি॥

অনুবাদঃ।

১১। অণুকাব্যের পঞ্চম কাণ্ডের নাম সামাজিক কাণ্ড। এই কাণ্ডটি ও ছয়টি অধ্যায়ে সুশোভমান। এই কাণ্ডে আধুনিক সামাজিক অর্থাৎ সভ্যাদিগের হৃদয়ে যে সকল জিজ্ঞাসা নিরন্তরই প্রস্ফুরিত হয়। সামাজিক সমূহ স্ব স্ব

ইচ্ছানুসারে সেই সকল প্রশ্ন করিতেছেন। এবং অধ্যাপকগণ ও আপন আপন বুদ্ধ্যনুসারে সেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। এইরূপ ছল করিয়া অনেকানেক সন্দিগ্ধ বিষয়ের সু সমাধান করা হইয়াছে।

যথা, যাঁহারা অজ্ঞানী তাঁহাদের প্রতি বিষয় চিন্তা নিষেধ করা ন্যায় সঙ্গত বটে। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহাদের জন্য ও বিষয় চিন্তা নিষিদ্ধ হয় কেন। অর্থাৎ তাঁহারা নিজের জ্ঞানের বলেই আপনাকে আপনি রক্ষা করিবেন। কোনও একজন সভ্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কোনও একজন অধ্যাপক উত্তর দিতেছেন।

শ্লোক। গীতিছন্দে বিরচিত।

জ্ঞানি জনানপি কুপথ মিত্যাদি। সংস্কৃতে লিখিত।

ব্যাখ্যা—ধার্ম্মিক নির্দ্দোষ জ্ঞানি জনের প্রতি ও বিষয় চিন্তা নিষেধের কারণ এই। বিষয় অতি কুৎসিত বস্তু। তাহার সম্বন্ধ বশতঃ তদ্বিষয়ক চিন্তা ও কুৎসিতা। সেই কুৎসিৎ চিন্তার সহিত সম্বন্ধ ঘটিলে সেই কুৎসিত চিন্তা ধার্ম্মিক ও নির্দ্দোষ জ্ঞানি জনকেও ক্রমশঃ আয়ত্ত করিয়া বল পূর্ব্বক কুৎসিত পথে (অর্থাৎ যে পথে যাইলে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় সেই পথে) লইয়া যায়। সে কিরূপ। যেমন হস্তিনী যে সকল লোকে হস্তি ধারণ করে তাহাদের বশীভূতা হইয়া অরণ্যস্থ নিরপরাধ মদমত্ত হস্তীকেও প্রেমাসক্ত করত প্রলোভনে ভুলাইয়া তাহাকে তাহার বন্ধন স্থান কদলী কাননে লইয়া যায়, সেইরূপ। অণুকাব্যের অন্তর্গত সামাজিক কাণ্ডের প্রথম শ্লোক সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইল। বিস্তৃত ব্যাখ্যা উক্ত কাব্যের পঞ্চম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। এই শ্লোকটিতে—ধার্ম্মিক জ্ঞানি জনকে মদোৎকট করি স্বরূপ, কুৎসিত বিষয়চিন্তাকে করিধারণেচ্ছু পুরুষগণের বশীভূত করিণী স্বরূপ, এবং করিণী যেমন মদোৎকট করীকেও প্রলোভন দেখাইয়া বন্ধন স্থানে লইয়া যায়। বিষয় চিন্তা ও সেইরূপ ধার্ম্মিক জ্ঞানি জনকেও দুঃখ সমুদয়ের নিবাসভূমি বিষয়ে লইয়া যায়। এই সকল প্রকাশ করিয়া, করীর মদোৎকটতা অপেক্ষা করিণীর সহিত আসক্তির যেমন বল

অধিক, সেইরূপ ধার্ম্মিক জ্ঞানিজনের ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদি অপেক্ষা, বিষয় সম্বন্ধ যুক্ত বিষয় চিন্তার বল অধিক। এবং কদলীকানন ভোজন স্থান হইলেও বন্ধন স্থান বলিয়া করি গণের যেরূপ হেয়। সেইরূপ বিষয় আপাততঃ রমণীয় হইলেও বহু দুঃখের আকর ভূমি বলিয়া ধার্ম্মিক জ্ঞানিজনের হেয়। বিষয় চিন্তা সেই হেয় বস্তুর প্রাপিকা এই হেতুক জ্ঞানিজনের ও বিষয় চিন্তা কর্ত্তব্য নহে, ইহাই প্রতি পাদন করা হইয়াছে। সেই হেতুক মহাত্মগণ বলিয়াছেন।

বিষয় দূরেতে থাক, বিষয় ভাবনা।
সেও দেয়, জ্ঞানীদের অশেষ লাঞ্ছনা॥ ইতি।

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীসীতারাম ন্যায়াচার্য্য, শিরোমণি।

দ্বিতীয় অঙ্কের দৃশ্যাবলী।

ছায়া।

প্রথম অঙ্কের সংক্ষিপ্ত গল্পাংশ। ইরাণীরা কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। কাশ্মীর রাজ্যের অনেকাংশ অধিকার করিয়াছে, সারণ দুর্গও অবরুদ্ধ। বিজেতা ইরাণী, দেশবাসীদের উপর অত্যাচার করিতেছে। ইরাণীদের অত্যাচারে বৃদ্ধ কৃষক হলধর মৃত্যুমুখে পতিত হইল। হলধরের কন্যা ছায়া শোকে মুহ্যমান, এমন সময়ে দেবী রাজলক্ষ্মী ছায়াকে প্রত্যাদেশ করিলেন যে "তুমি ইরাণীদের অত্যাচার থেকে দেশকে রক্ষা কর, প্রতিশোধ নেও, দেশকে শত্রু-মুক্ত কোরে স্বাধীন কর। এ কাজ তোমার দ্বারাই সুসম্পন্ন হবে।" তখন ছায়া রাজার নিকটে যাইবার জন্য ধাবিত হইল। এদিকে রাজা রাজ্য রক্ষার জন্য চিন্তাক্লিষ্ট। বুদ্ধিমতী রাণী তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন, এমন সময় পুরহিত বামদেব আসিয়া তাঁহার স্বপ্ন বিবরণ বলিলেন যে মহামায়া একটী সুন্দরী যুবতী কুমারীকে জ্বলন্ত অনলে জীবন্ত আহুতি দিতে আদেশ করিয়াছেন। রাজা ও রাণী ইহাতে অসম্মত হইলেন। রাণী মন্ত্রীকে বলিলেন যে যদি এরূপ নৃশংস হত্যা কার্য্য হয় তবে আমি নিজে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিব। রাজা ইরাণীদের নিকট অর্দ্ধরাজ্যদিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। সেনাপতি বীরবল সন্ধির প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করিলেন। এদিকে পুরহিত বামদেব বীরবলকে নানা যুক্তি জালে বশীভূত করিয়া ইরাণীদের নিকটে লোক প্রেরণ করিলেন যে রাজা যুদ্ধে অক্ষম, সেইজন্য সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছে, তোমরা এ প্রস্তাবে সম্মত হইও না। বামদেব জীবন্ত কুমারীকে আহুতি দিবার জন্ম সচেষ্ট রহিলেন।

ছায়া।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রোক্ষণার কক্ষ।

রোক্ষণা।

(গান)

সে যে প্রাণের মরম বোঝেনা,
প্রাণ ঢেলে দিলে পায় ফিরে চায় না।
আকুল পরাণ চায়
তারি হ'য়ে তার পায়,
প্রাণ দিয়ে নেয়—
প্রাণে প্রাণে মিশে রয়।
কেন মেটেনা আশা মেটেনা সাধ
প্রাণে প্রাণ পায়না।

(নেপথ্যে গান ও অমিতার প্রবেশ)

(গান)

যারে প্রাণ দিছিস্ লো ঢেলে,—
সেত সই দিল ধরা প'ড়ল বাঁধা প্রেম শিকলে,
(ওলো) মিলেছে নাগর—
সে তার তোর মোহন মনচোর—
তবে সই কাঁদিস্ কেন হইয়া বিভোর?
তোর সে রসিক নাগর—
সোহাগ ভরে বুকে ধ'রে ক'রেছে আদর—
ফেল ফেল চোখ্ মুছে ফেল
হাসো সুখে দুঃখ ভুলে।

রোক্ষ।—

সই! সই!
মিছে কেন দিস্ আশা বাড়াস্ পিয়াসা!
সেকি মোরে দেছে প্রাণ দেছে
ভালবাসা?

অমি।—

হেরেছে ও রূপরাশি
হাসি ও নয়নে যেই
ভুলিতে সে পারে কিলো সই?

রোক্ষ।—

ধিক্ সই রূপ রাশি
ধিক্ সে নয়নে হাসি
মনচোরা মনে পশি
প্রাণ চুরী যদি না করিল?

সই! সই! সত্য কি রূপসী আমি?
সত্য কি নয়নে মোর খেলে হাসি
ভুবন বিজয়ী?
মিছে কথা, মিছে কথা সই!
দর্পণে হেরিয়ে ছায়া
সে আমার আত্মতোষী
অলীক কল্পনা সুধু!

ক্ষুদ্র চাটুকার সম আরসী আমারে,
রূপসী বলিয়ে মোরে করে সম্ভাষণ,
বাড়াইতে রূপের গরিমা মোর
মরমে মরিতে শেষে
উপেক্ষায় তার।
সই! সই!
মিছে আর রূপসী বলিয়ে মোরে
দিস্‌নালো জ্বালার উপরে জ্বালা।
রূপ ধন অতুল জগতে—
সেই ধনে যদি আমি হইতাম ধনী
মিলিত লো সে অমূল মণি।

অলি।—

মিলিয়াছে সে অমূল মণি,
কিন্তু শুধু রূপ ধনে নয়।—
রূপ ধন জগতে অতুল নয়;—
শুধু তার সাধ্য নাই—
কিনিবারে পরাণ অমূল মণি।

অমূল রতন দানে,
অমূল রতন মিলে।
সই! রূপরাশি অতুল তোমার,
তায় প্রাণ প্রেমের আধার।
রূপে সই ধঁধেলো নয়ন —
নেশায় মাতাল ক'লে ভুলায় আপন,
তাহে প্রাণ প্রেমময় প্রাণ যদি মোহে,
সেই মোহ রয় চিরন্তরে।
সই! হাসিমাখা এইরূপ রাশি—
জোছনায় ফুল্ল ফুল হাসি,
বুকে প্রেম উছলিয়া—
নয়নে অমিয়া বয়;—
যবে মিলে নয়নে নয়ন,
সে অমিয়া নয়নের পথে গিয়া
পরশে পরাণ।
স্বভাব মধুর ভাষ,
প্রেমের আবেশে তায় মধুরে মধুর।
সে মধুরতানে
বাজে তান পরাণ জুড়িয়া।
সই, এত যাদু এত মধুরিমা—
মুগ্ধ প্রাণ আপনি প'রেছে ধরা।
তাই নিতি আসে যায়,
কত হাসে কত কথা কয়,
সোহাগে আদরে তোরে তুষিবারে চায়।

রোক্ষ।—

মিছে কথা, মিছে কথা, সই!
ভাল যে বেসেছে, সেই বোঝে
ভালবাসা।

সেই বোঝে
প্রাণ দিয়ে পেল কিনা প্রাণ।
তুই কি বুঝিবি বল্?
পিতৃবন্ধু স্নেহময় ইরাণ ঈশ্বর
বাল্যাবধি যতনে পেলেছে মোরে।
বাসনা তাহার একমাত্র পুত্র সনে
পরিণীতা করান আমারে।
সাহস শকতি নাই তার;
লঙ্ঘিবারে আদেশ পিতার;
তাই নিতি আসে যায়—
তুষিতে পিতার মন।

ভাল সেত বাসেনা আমারে।
সই,যার তরে প্রেমেতে বিভোর প্রাণ,—
হেরিলে তাহায়
আপনি ভাতিয়া উঠে নয়নে বয়ান।
দিন দিন হেরিলো তাহারে—
কই সই, তার সে বয়ানে
প্রেমের উচ্ছাস কই ?
কই সই সে নয়নে কই খেলে
প্রেমের বিজলী ?
দিন দিন শুনিলো তাহার কথা—
কই সই তায়—
ভাষার চাতুরী আছে—
প্রেমের আবেগ কই ?
প্রেমিকের প্রেম সম্বোধনে—
প্রেমিকা হৃদয়ে সদা
ঢালেলো আসিয়া ধারা।
প্রেম সম্বোধনে তার,
কই সই, ঢালে কই আসিয়া হৃদয়ে ?
কই সই, জুড়ায় হৃদয় ?
সই! সই! কেন গিছে চাস্
ভুলাবারে ?
প্রাণ নিছে কেড়ে
বিনিময়ে প্রাণ সেত দেয়নি আমারে।

অমি।—

প্রেমময় এইরূপ রাশি—
সুবাসিত ফুল্ল শতদল,—
প্রেমের উচ্ছ্বাস তায়
শতদলে শারদ জোছনা ভায়।
ইথে যার না মজে হৃদয়,—
হৃদয় নাহিক তার।
মানবত্ব মানবে হৃদয়—
সেই হৃদয় নাহিক যার,
কে তারে মানুষ বলে ?
জড়িত শোনিত মাংসে
কঠিন পাষাণ সেই
কেন সই মজিস্ পাষাণে ?
পাষাণ কি প্রাণের মরম জানে ?

শ্রোক্ষ।—

পাসাণ মানুষ কিবা জানেন বিধাতা।
পাসাণ মানুষ হ'ক
মজিয়াছে প্রাণ তায় ;
দাসী আমি তাহার চরণে।
সে চরণে যদি নাহি পাই স্থান,—
নিষ্ফল জীবন মোর।
না পাইলে তারে কেমনেলো
বহিব জীবন ভার ?

অমি।—

সই! সই! কেমনে জানাব সই,—
কত ব্যথা পাই প্রাণে
আঁখিজল হেরিলে তোমার!
শোন কথা আকুল হ'য়োনা এত।
পিতার আদেশ কভু
লঙ্ঘিবেনা যুবরাজ।
যবে হ'ক বিবাহ করিবে তোমা।
তার পর ক্রমে
বাসিতে শিখিবে ভাল।

এত প্রেমে অনাদর কে করিতে
পারে?
প্রেমেযে পাষাণ গলে সই।
রোক্ষ।—
একমাত্র আশা সেই।
কিন্তু ভবিষ্যৎ বিধাতার হাতে
কি আছে কপালে সই
কে বলিতে পারে?
অমি।—
শান্ত হও ভাবিওনা সই।
ফুলমালা দিয়া
পাষাণ বাঁধিতে যদি এত অভিলাষ,
সে বন্ধন ঘটাব ত্বরায়।
রোক্ষ।—
কেমনে ঘটাবি তুই বুঝিতে না পারি।
এবন্ধনে বদ্ধ হ'তে যদি সে চাহিত
এত দিন ফুলমালা বাঁধিত পাষাণে।
অশুভ ঘটনা কেহ
শীঘ্র নাহি চায় ঘটাইতে।
পারে যত দিন
রাখিবারে চায় দূরে।
তাই যুবরাজ
জানায়েছে বাসনা পিতায়
যতদিন যুদ্ধ শেষ নাহি হয়,
বিবাহ স্থগিত রবে।
অমি।—
সে চিন্তা তোমার কেন?
সাধ্য কি অসাধ্য মোর—
তোমা চেয়ে আমিই বুঝিব ভাল।
ভাল, চেনত কুরুষে?
রোক্ষ।—
ক্ষয়র্ষের প্রিয় বন্ধু
—যেন এক প্রাণ দুই দেহে—
তারে কি চিনিনা আমি?
অমি।—
সেটা নাকি ভালবাসে মোরে—
—শুনে হাসি পায়।—
ফেরে পায় পায় পায়ের বেড়ীর মত।
ছাই পাঁশ কত কিযে কয়—
হাড়ে হাড়ে জ্বালাল আমায়।
রোক্ষ।—
তলে তলে এত প্রেম খেলা—
সকলি অজানা মোর!
ধিক্ সই, এই কিলো ভালবাসা তোর?
অমি।—
প্রেমখেলা কোথা সই?
পুষিয়াছি কতটা বাঁদর,—
শিকলে রেখেছি বেঁধে।
এ পোড়া বাঁদর
সাধ ক'রে শিকল প'রেছে গলে।
শুনি কত কিচি মিচি—
কত হাসি দাঁতের খিঁচুনি হেরে—
ওঠ্ বস্ করাই তাহারে।
এই খেলা বাঁদরে মানুষে—
যদি হয় প্রেম খেলা;—
মজিয়াছি বাঁদরের প্রেমে।

রোক্ষ।—
মজ্ সই বাঁদরের প্রেমে।
আশীর্ব্বাদ করি
বাঁদরের হইয়া বাঁদরী
খেল সুখে চির দিন
বাঁদরের সনে।

অমি।—
আমি কিলো তোর মত সই ?
বাঁদর মানুষ হ'ক—
রাজা মহারাজ—
তোর মত আঁখিজলে ভাসিবারে,
প্রাণ আমি দেবনা কাহারে।
তার চেয়ে ভাল এই বাঁদরের
খেলা,—
বাঁদর পড়েছে বাঁধা আমি আছি
খোলা।

রোক্ষ।—
এত যদি ভয় সই বাঁধা পড়িবারে,
সাবধান!
খেলিতে খেলিতে যবে
ক্লান্ত হ'য়ে পড়িবি ঘুমায়ে,—
চতুর বাঁদর
সেই ফাঁকে যেনলো বাঁধেনা তোরে।
যাক্, সেকথায় নাই প্রয়োজন।
তোর সে বাঁদর—
সখীরে কি বেঁধে এনে দেবে ?

অমি।—
দেবে!

রোক্ষ।—
ভাল যদি পারে,
দুইজনে খেলিবলো দুইটী বাঁদরে।

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

ক্ষয়র্ব ও কুরূপ।

কুরু।—
দেখ সখা অপূর্ব্ব এ ছবি! ফুল ডোরে
দেখ বাঁধা দুরন্ত কেশরী।

ক্ষয়।—
দেখিব কি
ওর আর? ওত শুধু ছবি। দেখিয়াছি
কত জীবন্ত কেশরী আমি ফুল ডোরে
বাঁধা।

কুরু।—
ফুল ডোরে বাধা জীবন্ত কেশরী!
কোথায় দেখেছ সখা ?

ক্ষয়।—
হেথায় দেখেছি,—
এখনো দেখিছি তারে। কাছেই র'য়েছে
মোর ?

কুরু।—
কাছেই র'য়েছে! এখনো দেখিছ
তারে? বলখুলে সখা, হেঁয়ালী বুঝিতে
নারি।

ক্ষয়।—

ভাল হেঁয়ালী বুঝিতে নার, বল
দেখি কে আছে হেথায়।

কুরু।—

এক মাত্র আমি।
কই আর কারো দেখিনাত হেথা।

ক্ষয়।—　　তুমি
সে কেশরী তবে ফুল ডোরে বাঁধা।

কুরু।—

আমি
সে কেশরী তবে ফুল ডোরে বাঁধা! সখা
আবার হেঁয়ালী!

ক্ষয়।—

রমণীর আলিঙ্গন
কোমল মধুর সদা ফুল মালা সম;
রণক্ষেত্রে বীরত্বে কেশরী তুমি। গৃহে
পুন বীরত্ব বিক্রম সব ভুলে থাক
নিতি নব সে ফুল বন্ধনে।

কুরু।—

ওহো তাই
বুঝি রসিকা এ চিত্রকরী পাঠায়েছে
এই চিত্র মোরে। বচনে চাতুরী সখা
শুনিলে তোমার মনে হয় এজগতে
রসিক দ্বিতীয় নাই তোমার মতন।
ধিক, কেমনে বুঝিতে নারি, বুঝিলনা
এ রসিক রস সার নারীরস সুধা।

ক্ষয়।—

কেন এ ধিক্কার সখা? পাইতাম যদি
কারো মনের মতন. দেখাতাম তবে
চিনি কিনা চিনি আমি রমণী রতন।
মনোমত রসিকা পরশে শুষ্ক প্রাণে
রসের ফোয়ারা ছোটে। অভাবে তাহার
রস পারাবার প্রাণ হয় মরুময়।

কুরু।—

কেযে হবে মনোমত রসিকা তোমার
বুদ্ধির অতীব মম। এমন রোক্ষণা—
তায় যার না মজিল মন, মজাইবে
তারে কোথা আছে হেন নারী, আমি
না বুঝিবারে পারি।

ক্ষয়।—

মানি নারীকুলে রাণী—
রূপসী রোক্ষণা রূপে; জানি প্রাণ দিয়া
ভালবাসে মোরে। কিন্তু সখা, যার পাণে
আপনিনা প্রাণ ধায় কে পারে মজিতে
তায়?

কুরু।—

একে রূপে নারী কুলে রাণী, তায়
ভালবাসে প্রাণ দিয়ে। অতুল রতনে
হেন, আদরে না ধরে বুকে অবহেলে
যেই, অপূর্ব্ব রসিক বটে সেই।

ক্ষয়।—

তবে
দুই দিনে শুষ্ক হয় পীরিতি পরাণে
যার; নিতি নবনারী বিনা তৃপ্তি যার
নাই; রমণী মরম বোদ্ধা সেও বটে
অপূর্ব্ব রসিক।

কুরু।—

গন্ধরূপ রসহীন

শুকান কুসুমে সখা তোষেকার প্রাণ?
তাই পিয়াসু রসিক চায় নিতি
নব কুসুম রতন।

ক্ষয়।—

দু'দিনে ফুরায় যার
গন্ধরূপ রস, এছার কুসুমে হায়
মজে যার মন, ধিক্ তারে শত ধিক্
কে বলে রসিক তারে?

কুরু।—

ভাল, চিরদিন
রবে নব, নিতি নব কুসুমের মত,
হেন ফুল মেলে কি জগতে?

ক্ষয়।—

জেনো সখা
মজিবে হৃদয় যার, সে আমার রবে
নিতি নব; সামান্য ফুলের মত কভু
নাশুকাবে; মধু তার কভু না ফুরাবে।

কুরু।—

ভাল যত দিন নামেলে সে ফুল, পার
যদি হৃদয় বাঁধিয়া রাখ। ভালমন্দ
যাই বল, সখা, পিয়াসু হৃদয় মোর
সুখের লাগিয়া, চঞ্চল ভ্রমর সম
মধু আশে ফুলে ফুলে বেড়াই উড়িয়া
শুকাবেনা ফুরাবেনা মধু, পাই যদি
হেন ফুল এই মত উড়িতে উড়িতে—
তাকেই মজিয়া রব চির দিন তরে,
ফুলে ফুলে বেড়াবনা উড়ে।

ক্ষয়।—

এই মত—
ফুলে ফুলে বেড়ায় যাহারা; হেন ফুল
কচিৎ তাদের মিলে?

কুরু।—

কিবা ক্ষতি,—নাই
যদি মেলে? অবাধে মনের সাধে, ফুলে
নব নব চির দিন বেড়াব উড়িয়া।
সুখের পিয়াসু হিয়া—চিরদিন রবে—
মজে নিতি নব সুখে।

ক্ষয়।—

তৃপ্ত প্রাণ কভু
না হইবে তায়। না মিটিয়া দিন দিন
বাড়িবে পিয়াসা।

কুরু।—

যাক বেড়ে দিন দিন
পিয়াসা কে মিটাইতে চায়? ক্ষুধা তৃষ্ণা
যত যার, অন্ন জলে তৃপ্তি তত তার।
নিভাইতে নাহি চাই বাসনা অনল
প্রাণে, দিন দিন জ্বলুক দ্বিগুণ। ছুটে
গিয়ে ঝাঁপ দিই সুখ সুধা সিন্ধু মাঝে।
ডুবিয়া সে সিন্ধু মাঝে বিভোর হইয়া
রই—তল নাহি পাই।

ক্ষয়।—

কিবা ভয়ঙ্কর,
সখা, অন্ধ এই যৌবন-মত্ততা তব!
জান নাকি মায়া নিশা মদিরা নেশায়

যে যত বিভোর, প্রভাতে তাহার তত
ক্লান্ত দেহ অনুতপ্ত হিয়া ; এ মত্ততা
ছুটে যাবে যৌবনের সনে, পিছে রেখে
বিষময় স্মৃতি, করিতে যাতনা ময়
বার্দ্ধক্য তোমার।

কুরু।—

যৌবনের এ মত্ততা
জীবনের সুখ! বার্দ্ধক্যে যা হবে হ'ক
সে ভয়ে এ সুখে কেন রহিব বঞ্চিত!
প্রাবৃটের ঘন ঘটা ভয়ে হাসে নাকি
নিদাঘে চাঁদিমা? শীতের তুষার ভয়ে
ফোটে নাকি শারদ কুসুম? যাক্ সখা
তর্কে আর নাহি প্রয়োজন। ভাল মন্দ
অভিরুচি যাহার যেমন। ভাল, সখা
সুধাব একটী কথা ; তর্কে তর্কে গেছি
ভুলে। রোজ ভাবি সুধাইব, ভুলে যাই
কথায় কথায়। আজো প্রায় গিয়াছিনু
ভুলে।

ক্ষয়।—

কি এমন কথা সখা?

কুরু।—

ধীর স্থির
হ'য়ে চাও একবার হৃদয়ের পানে
আপনার!

ক্ষয়।—

ভাল হইলাম ধীর স্থির,
চাহিলাম হৃদয়ের পানে।

তারপর?

কুরু।—

দেখ দেখি তায় কোথাও প'ড়েছে কিনা
রোক্ষণার ছায়া? হ'ক ক্ষীণ,
অতি ক্ষীণ,
—দেখা যায় কিনা যায়। যদি
ছায়া প'ড়ে
থাকে, তবে হ'ক একদিন বিরাজিবে
সেই ছায়া হৃদয় জুড়িয়া।

ক্ষয়।—

আজ নয়
সুধু, বহুদিন ধ'রে সখা চাহিতেছি
এই মত হৃদয়ের পানে। রোক্ষণার
মত—কই কিছু সখা পাইনা দেখিতে।

কুরু।—

কেন তবে সখা এই প্রেম খেলা মিছে,
মজাইতে অবলা বালায়?

ক্ষয়।—

সখা! সখা!
অন্তরের কথা আজ ব'লেছ আমায়।
ওই একি চিন্তা বৃশ্চিকের মত দংশে
হৃদয় আমার নিতি। কি করিব কিছু
বুঝিতে না পারি। জান সখা সবি তুমি,
লঙ্ঘিব কেমনে বল আদেশ পিতার?

কুরু।—

পিতৃ আজ্ঞামত বিবাহ করিতে তারে
আছে কি মনন?

ক্ষয়।—

কেমনে বলিব সখা?

নিজের মনন নিজে পারি না বুঝিতে,
এঁকেছে এ চিত্র সখা সেই চিত্রকরী—
হ'ত ঠিক মোর ছবি যদিসে আঁকিত—
ফুলমালা নিয়ে কোন সুন্দরী কুমারী,
অগ্রসর বাঁধিতে কেশরী। বাঁধা তায়
পড়িতে বিমুখ—কেশরী পালায় দূরে,
কে যেন আসিয়া লোহার শিকলে বেঁধে,
কেশরীরে দিতে চায় কুমারীর

করে,—

ছিঁড়িতে শিকল সেই কেশরী না পারে।

কুরু।—

কুমারীর করে সেই লোহার বন্ধন—
কে বলিবে হইবে না বন্ধন ফুলের ?

ক্ষয়।—

অসম্ভব! এ লৌহ শৃঙ্খল সখা
বন্দী যারে করে একবার; চিরদিন
সে শৃঙ্খল বিষময় তার।

কুরু।—

যাই কর—

যাই ভাব সখা, কি করিছ একবার
স্থির মনে ভাল ক'রে দেখিও ভাবিয়া।
অবলার প্রেমময় সরল হৃদয়—
খেলার পুতুল সম হেলা খেলা তাই
নিয়ে; জান নাকি পরিণামে এ খেলায়
উঠিবে কি বিষ ?

ক্ষয়।—

সখা ব'লোনা, ব'লোনা
আর! শুনিতে হৃদয়ে বেঁধে বিষ মাখা
শত শর। স্রোতে ভেসে চলিয়াছি.

দেখি

ঘটনা তরঙ্গে মোরে উতরয়ে কুলে
কিম্বা ডুবায় অকুলে।

(প্রস্থান ও কুরুষের অনুগমন।)

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

কুরুষের প্রবেশ।

কুরু।—

কুরুষ, কুরুষ, তোমার বাহাদুরী বুঝি ফুরোল। এবার বাঁধা প'ড়েছ। কিন্তু প'ড়েছ ক্ষতি নাই উল্টে বাঁধতে পাল্লে হয়।

(অমিতার প্রবেশ)

অমি।—

কি বীর, যুদ্ধের সময় এখানে ঘুর ঘুর ক'চ্চো কেন? হিন্দুর বাণে কি এত ভয় ?

কুরু।—

হিন্দুর বাণের ভয় করি না। তবে হিন্দুদের একটা দেবতা আছে, তারই বাণে বড় জ্বালাতন ক'রে তুলেছে।

অমি।—

ইরাণী হ'য়ে হিন্দুর দেবতার বাণে এত অস্থির ? ধিক্!

কুরু।—

সে দেবতা বড় শক্ত দেবতা। তার

কাছে হিন্দু ইরাণী নাই। বড় বড় রাজা মথ সে বাণের খোঁচায় অস্থির পাগল হ'য়ে যান। কিন্তু তোমাকে যে সে বিঁধতে পারেনি এ বড় আশ্চর্য্য। পারতো যদি বুঝতাম দেবতার বাহাদুরী। ইরাণী হ'য়েও কতদিন সেই হিন্দুর দেবতার পূজো করতুম।

অমি।—

আমি খাঁটি ইরাণী, তাই সে বান আমাকে স্পর্শও ক'ত্তে পারেনি।

কুরু।—

তুমি পাষাণী তাই পারেনি।

অমি।—

তবে পাষাণে এত মাথা খোড়া খুড়ি কেন?

কুরু।—

বড় তৃষ্ণার সময় লোকে পাষাণেও মাথা খোড়ে।

অমি।—

তবে মর মিছে মাথা খুড়ে। এ পাষাণে জল নেই; ম'লেও পাবে না।

কুরু।—

মরি ম'রবো তবু এই পাষাণেই মাথা খুড়ব।

অমি।—

এ মিছে মাথা খোড়া কেন? নদী, খাল, বিল নাপাও, ডোবা পাণা পুকুর ত ঢের রয়েছে। আর ডুবতেও ত বাকী রাখনি কোথাও? এত ডোবাডুবির পরেও যদি আবার তেষ্টা পেয়ে থাকে, তাতেই গিয়ে আবার ডুবোও। যত পার জল খাও। সে সবত আর শুকিয়ে যায়নি?

কুরু।—

শুকিয়ে যায়নি সত্য তবে সে সব ময়লা জলে আর এ তেষ্টা যায় না। যত দিন যেত ডুবিয়েছি; পাষাণে মাথা খুড়তে আসিনি। এখন এই পাষাণ থেকে যদি ফুট ফুটে ঠাণ্ডা জল বেড়োয়, তবেই আমার তেষ্টা যাবে। নইলে যে মাথা খুড়ছি এই মাথা খুড়েই মড়ব।

অমি।—

আচ্ছা তবে মরো। (প্রস্থানোদ্যত)

কুরু।—

ওকি অমিতা, কোথায় যাও?

অমি।—

কেন আমার কি আর কোন কাজ নেই যে রাত দিন ব'সে বাঁদরের কিচি মিচি শুনব।

কুরু।—

কেন, বাঁদরের কিচি মিচি শুনতে কি তুমি ভাল বাসনা অমিতা? তবে অত বাঁদর পুষেছ কেন? এতট

যদি পুষেছ, তবে না হয় আর একটাই পুষ্‌লে।

অমি।—

বেশ্ পুষ্‌বো! আমার বাঁদর গুলো সব সিকলীতে বাঁধা আছে, তুমি তা পারবে? তাদের যখন নাচাই তারা নাচে, তুমি তাদের মত নাচ্‌বে?

কুরু।—

শিকলীতে বাঁধা আর কি বাকী রেখেছ অমিতা? তুমি রাত দিন নাচাচ্চ—আমি নাচ্চি! আর কি চাও?

অমি।—

বেশ বেশ! আহা, আমার এমন বাঁদর নাচা কেউ দেখ্‌লনাগা।

(গান)

তোরা বাঁদর নাচা দেখ্‌বি কেলো,
আয় চ'লে হেথায়।
(আমার) শিকলী বাঁধা গেছো বাঁদর
নাচেরে দুপায়।
বাঁদর পোষ মেনেছে বেশ।
শিকলী তে আছে বাঁধা নাইক দুঃখের লেশ।
ছেড়ে দিলেও শিকলী হাতে আপনি
তুলেদেয়।
বড় রসিয়া বাঁদর—
চোকে চোকে চাইলে পরে হ'য়লো সে
বিভোর,—
তালে তালে নাচে শুধু চোকের ইসারায়।

কুরু।—

অমিতা! অমিতা! সাধে কি বাঁদর বাঁধা প'ড়েছে। মধুলোভী বাঁদর এমন মৌচাকে যদি বাধা না পড়্‌বে, তবে আর কোথায় পড়্‌বে?

(গান)

মধুখেতে মৌচাকেতে চতুর বাঁদর যায়—
মৌমাছিরা মধু দিতে ব'স্‌ল উড়ে গায়—
মধুর হুলে খুঁচিয়ে ঢালে মধুসারা গায়,
প্রাণটী নিয়ে পালায় বাঁদর সে মধুর জ্বালায়।

কুরু।—

বাহাবা! বাহাবা! বেশ! থাম্‌লে কেন চলুক! ঢেউয়ের পরে ঢেউ উঠুক-আমাকে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যাক্।

অমি।—

ভাসিয়ে কোথায় নেবে?

কুরু।—

কেন রসের নদীতে রসের ঢেউ উঠেছে—রসের সাগরে ছাড়া আর কোথায় নেবে?

অমি।—

না মরুভূমিতে বালির ঢেউ উঠেছে। শুক্‌নো বালিতে শুকিয়ে মারবে। যদি নদী দেখে থাক সে মরিচীকা।

কুরু।—

হ'ক মরিচীকা। এই আশায় ঘুড়ে যদি

এই মরুভূমিতে মরি, তাও আমার সুখ।

অমি।—

কুরূষ!

কুরূ।—

কেন অমিতা!

অমি।—

তুমি কি চাও?

কুরূ।—

আমি কি চাই! কেন অমিতা, আজ একথা জিজ্ঞাসা ক'চ্চো কেন? আমি কি চাই তাকি তুমি জাননা?

অমি।—

না ব'ল্লে কি ক'রে জানবো? তুমিতো, কখনো বলনি তুমি কি চাও?

কুরূ।—

অমিতা, আমি জানি আমি অতি হেয়, অতি অপদার্থ। কিন্তু যতই কেন হেয় অপদার্থ হই না, কপট বা প্রবঞ্চক কখনো নই। তোমার কাছে সে সব কথা উল্লেখ করা উচিত নয়,—তবে এই পর্য্যন্ত ব'ল্‌তে পারি আমি আর কারেও কখনো ঠিক ভাল বাসি নাই। ভালবাসার ছলনা ক'রেও কখনো কারো ভুলাই নাই। ব'ল্‌তে সাহস পাই না, কিন্তু জীবনে তোমাকেই প্রথমে ভাল বেসেছি। ভাল বাসাও তোমাকেই জানিয়েছি। আমি জানি আমি তোমার মত রত্নের যোগ্য নই। কিন্তু অমিতা, যে মণি রাজ মুকুট শোভা করে, দরিদ্র ভিকারী কি মুগ্ধ হ'য়ে সে মণির দিকে চায় না। যে চাঁদ আকাশের শোভা, দুর্গন্ধ পঙ্কিল ডোবা কি তার ছায়া বুকে ধ'রে কৃতার্থ হয় না? আমি যতদূর হেয়, তার চেয়ে শতগুণ হেয় ব'লে আমায় মনে ক'রো। কিন্তু আমি নিতান্ত দুর্গন্ধ পঙ্কিল হ্রদে প'ড়ে আছি, তুমিই আমার একমাত্র উদ্ধারের উপায়। শুধু এইটুকু মনে ক'রে আমায় অনুগ্রহ কর। তুমি আমাকে বাঁদর ব'ল্‌ছো,—আমি সত্য সত্যই তোমার কাছে বাঁদর, তোমার একটা পোষা বাঁদরকে তুমি যেটুকু অনুগ্রহ কর, সেইটুকু আমায় কর।

অমি।—

ভাল রাজি। কিন্তু এক কথা, তোমার সঙ্গে একটা বুনো বাঁদর আছে,—রোক্ষণার সাধ যে সেটাকে পোষে। সেটাকে ধ'রে এনে দিতে পারবে?

কুব্জ।—

যদি পারি তবে তুমি এই পায় ধর। বাঁদরটাকে পায় রাখ্‌বেত ?

অমি।—

পায় কেন মাথায় রাখ্‌বো। বাঁদরী হ'য়ে বাঁদরের পায় থাকবো।

[প্রস্থান।

কুব্জ।—

বিষম সমস্যা! দেখি কি হয় ?

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্দির।

বামদেব পূজায় আসীন, পার্শ্বে বীরবল উপবিষ্ট।

দেবদাসী গণের গান।

ওমা কালী করালী!

নবঘোর ঘনঘটা রূপে ঘোরা কালী!

১। লক্ লক্ দুলিত লোল রসনা,
ধক্ ধক্ জ্বলিত নয়নে রোষণা,
সে নয়ন কোনে হাসি ঈষৎ উজলি।—

২। নরকর কপাল কটি গলভরা
খর অসি কপাল বরাভয় করা,—
রুধির ধারা গায় মেঘে বিজলী।—

৩। নাচিছে এলোকেশী শ্যামা সমরে—
উড়িছে কেশজাল ঝলাঝল ঝড়ে,
করিছে শবেশিব বুকে পা তুলি।

৪। শিব বুকে শোভিছে রাঙ্গা দুটী পদ,—
গঙ্গাজলে নব রাঙ্গা কোকনদ।
নূপুর বাজে যেন গুঞ্জরে অলি।

(দেবদাসীগণের প্রস্থান)

বাম।—

(পূজা সমাপনান্তে প্রণাম করিয়া)

মাগো!

সাধে কি সেবক তোর পদে রত এত অনুগত ? সেবকের বাসনা পুরাতে সদাকালী কল্পতরু তুই। কেনই বা না পুরাবি ? কেবা আমি ? কার এ বাসনা ?

অনন্ত অসীম এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড—
তোরিত মা লীলাময় রূপের বিকাশ।
সাগরে বুদ্বুদ সম উঠে পরে জীব ঃ—
তোরি লীলা লীলাময়ী॥ ইচ্ছাময়ী, তোর ইচ্ছামত—কোথা পূর্ণ পরকাস,—
কোথা মোহ অন্ধকারে মোহান্ধ নরস্ব লীলা।

মিছে ভাবি, মিছে করি আমার আমার।
তুই আমি ভিন্ন কভু নই। যেবাসনা ওঠে হৃদে—তোরিত বাসনা সেই, চলি যেই পথে পুরাইতে সেবাসনা, সেত তোরি পথ—তুই ব'লেযাস্ ত্রিগুণামা, পুরাইতে তোরিত বাসনা! মিছে করি ভয়—কিহয় কিহয়, পাষাণী পাষাণী, ব'লে মিছে দিই অনুযোগ তোরে।

মাগো,

তুই আমি ভিন্ন ভাব যে মোহ ঘটায় সেই মোহ কবে হবে দূর ? যে একত্ব নিত্য সত্য—সে একত্ব অনুভূতি মোক্ষ

মানবের। মাগো; সেই মোক্ষ পাবে
নাকি দাস?
(উঠিয়া)
বীরবল র'য়েছ হেথায়?

বীর।—
আর্য্য
প্রণতি করিও পায়। পূজায় নিবিষ্ট
ছিলে আসিনু যখন। পূজায় ব্যাঘাত
হবে, এই ভয়ে নিরবে র'য়েছি ব'সে।

বাম।—
জয় হ'ক-রহ সুখে করি আশীর্ব্বাদ!
বীরবল, শুনিয়াছ সকল সংবাদ।
ভবাণী কৃপায় অভীষ্ট হ'য়েছে সিদ্ধি,—
সন্ধিতে না সম্মত ইরাণী। ভবানীর
অনুগ্রহ বলে, রাজ্য রক্ষা করিবার
এই অবসর। সাবধান, বীরবল,
ভুলিওনা কভু, বচন চাতুর্য্যে এই
মোহান্ধ রাজার। একথা জানিও স্থির;
পূর্ণকামা ভবাণীর পূর্ণ তুষ্টি বিনা—
হীনবল অল্প সেনা ল'য়ে, নাশ ভিন্ন
জয়লাভ সাধ্যের অতীত রণে

বীর। আর্য্য,
রাজার বিশ্বাস ভাঙ্গি গোপনে পাঠায়ে
দূত যবন শিবিরে, ঘটায়েছি যদি রণ;—
যাতে হয় জয়লাভ—প্রাণপণে
সাধিব তাহাই। কিন্তু সুধাব একটী
কথা, কুমারী আহুতি বিনা ভবাণীর
তুষ্টি আর কিছুতেই হ'বে নাকি?

বীর।— কেন
এই প্রশ্ন বীরবল? দেখিনু স্বপনে
আপনি ভবাণী অর্পিলেন কুমারীরে
জ্বলন্ত অনলে; ইঙ্গিতে মা জানালেন
বাসনা তাঁহার। বাসনা পূরণ ছাড়া
কিসে আর তুষ্টি হবে তাঁর? বীরবল,
ছাড় দ্বিধা, বীর তুমি উদ্দেশ্য সাধনে
অচল অটল হও বীরের মতন।
জানিও নিশ্চয় কুমারী আহুতি বিনা,
রুষ্ট বই তুষ্ট মাতা কভুনা হবেন।
তুষ্টির অভাব যাঁর সর্ব্ব আশ নাশী,
রুষ্টি তাঁর ঘটাইবে কিসে সর্ব্বনাশ
বুঝিতে কি নাহি পার?

বীর।—
ভাল তাই যদি
হয়, মার কোপ হ'তে রক্ষিতে
রাজারে—
কুমারী আহুতি যদি একমাত্র পথ
যাতে রাজা বাধ্য হয়, তাহাই কর্ত্তব্য।
কিন্তু রাজা বড়ই বিরূপ—কিছুতেই—
যদি নাহি পারি—কি হবে তখন,
আর্য্য?

বাম।—
যদি নাহি পার! ধিক্ বীরবল! বীর
হ'য়ে হেন কথা কেমনে আনিলে মুখে?
'পারি' ছাড়া 'না পারি' বচন—বীর
যেই—
রসনা কলঙ্ক তার। কেন পারিবেনা?

রাজার সমীপে রাজ পানে না চাহিয়া—
মানস নয়নে হেরো ভবানী চরণ!
মনে রেখো ভবানী ভুবনেশ্বরী;—
রাজা
ক্ষুদ্র ইচ্ছা জীবী তাঁর, মনেরেখো তাঁর
বাসনা পুরণে তুষ্টি, একমাত্র পথ
তব প্রভুরে রক্ষিতে। মনেরেখো প্রভু
অজ্ঞান উন্মত্ত হলে—যেমনে যেভাবে
পারে,—বলে দি কৌশলে—প্রভুভক্ত
ভৃত্য
সাধে প্রভু হিত সদা। যুক্তিব্যর্থ হ'লে,
অনুরোধ উপরোধ মিনতি করিবে
পরে। তায় যদি নাহি হয়, দেখাইবে
বিদ্রোহের ভয়।

বীর।—

যা কহিলে সত্য আর্য্য
কর্ত্তব্য আমার। কিন্তু আর্য্য চিরদিন
রাজ অনুগত প্রাণ, হেরিলে তাঁহায়—
শুনিলে তাঁহার কথা, ভাল মন্দ ভুলে
যাই সব। ইচ্ছা হয় প্রাণ দিয়ে সাধি
শুধু তাঁহারি বাসনা। আশীর্ব্বাদ কর
দেব, ভবানী কৃপায় হৃদয় সবল
হ'ক যেন রাজ ভক্তি মোহে নাহি ভুলি
সাধিতে রাজার হিত।

বাম।—

দেবতার ইচ্ছা
পালিবারে, মাগে যেই কৃপা দেবতার
প্রার্থনা না ব্যর্থ হয় তার।

(দূরে মন্দির পাণে আগত ছায়া ও
সুরজকে দেখিয়া)

ওকি! ওকি!
কে আসে ও; হের বীরবল,
মন্দির বাহিরে!

বীর।—

একি আর্য্য, সহসা এ
ভাব কেন? উন্মত্ত হ'লে কি? কি
দেখিব
মন্দির বাহিরে? সঙ্গে যুবা আসিতেছে
কে এক বালিকা?

বাম।—

কে এক বালিকা? জান
নাকি কে—কে ও বালিকা?

বীর।— কেমনে জানিব
আর্য্য?

বাম।—

ওই সে কুমারী, স্বপনে দেখিনু
যারে করালীর করে।

ওই সে কুমারী!
হাঁ! হাঁ! ওই সে কুমারী! একইরূপ,
মূর্ত্তি! বীরবল এতদিন আমিও বুঝিনি
এত? ভেবেছিনু যে কোন কুমারী
হ'লে
হইবে মায়ের তৃপ্তি। কিন্তু ঠিক সেই
কুমারী যে আছে এই মহীতলে, নিজে
মাতা এনে তারে দেবেন সেবক করে—
এত বুঝি নাই।

(ছায়া ও সুরজের প্রবেশ)

উভয়ে।— প্রণতি চরণে দেব।

বাম।—

রহসুখে আশীর্ব্বাদ করি। কে তোমরা ?

সুর।—

আমরা কাশ্মীর বাসী, কাশ্মীর রাজার প্রজা। আসিয়াছি রাজার সমীপে।

বাম।— কেন

বল কিবা প্রয়োজন ?

সুর।— অবসর মত

আর্য্য, কহিব সকল। শুনিলাম মোরা, তুমি রাজ পুরোহিত, আসিয়াছি তাই আগে তোমার সমীপে। জানায়ে তোমারে

আগে সকল বারতা যাব রাজপুরে। আশ্রয় প্রার্থনা করি আজি এ মন্দিরে।

বাম।—

আচ্ছা তবে বিশ্রাম করগে। পথ শ্রান্ত ক্লান্ত দোঁহে। রামদীন !

(ভৃত্যের প্রবেশ)

অতিথি এ দোঁহে

ল'য়ে যাও রাখগে যতনে।

(ভৃত্যসহ ছায়া ও সুরজের প্রস্থান)

বীরবল,

ভাবিছ কি ?

বীর।—

কিছুনা কিছুনা আর্য্য ! বল কি কর্ত্তব্য ?

বাম।—

কর্ত্তব্য মা দেখালেন নিজে।

দোঁহে মোরা আজি রজনীতে সাধিব এ মহাযজ্ঞ বালিকারে দেব পূর্ণাহুতি।

বীর।—

জানাবেনা মহারাজে ?

বাম।—

কিবা প্রয়োজন ?

বীর।

তারপর ?

বাম।—

তারপর, যা হবে হউক !

রাজহিতে সাধিব মায়ের পূজা, মার আজ্ঞামত। না হয় যাইবে প্রাণ, কেন ভাব তায় ? প্রাণ দিতে এত কি কুণ্ঠিত?

বীর।—

কভুনা কভুনা আর্য্য ! বল কি করিব ?

বাম।—

এখন বিদায় হও, বিশ্বাস ভাজন কতিপয় অনুচরে বুঝায়ে প্রস্তুত কর। তাদের লইয়া এস রজনীতে। সাবধান ! আর যেন কেহ নাহি জানে, সহজে হইল কার্য্য—বৃথা আড়ম্বরে, কেন বাধাইব গোল ? বুঝায়ে সকলে, —সতর্ক করিয়া সবে আয়োজন আমি হেথা করিব যজ্ঞের।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজ অন্তঃপুর।

রাণী ও জনৈক দেবদাসী।

রাণী।—
সত্য কি কহিলে যাহা ?

দেব।— মিথ্যা ব'লে কিবা
প্রয়োজন ? কি সাহসে কহিব তোমার
কাছে, হেন মিথ্যা বল মহারাণি ?
আহা,
নিরীহ নির্দ্দোষ বালা আসিবে রাজার
কাছে, প্রয়োজন কি যেন আছিল।
তাই
আশ্রয় লইয়াছিল বিশ্বাসে মন্দিরে।
জীবন্তে দহিবে! ভাবিতে শিহরে প্রাণ।
ছার স্বপ্ন! একেবারে ক্ষেপেছে ব্রাহ্মণ।
মাগো, বালিকার তরে বড়ই বাজিল
প্রাণে; জানিমা তোমরা বাদী—এ ভীষণ
কুমারী হত্যায়; তাই ছুটে আসিয়াছি,
রক্ষা কর অভাগী বালায়।

রাণী।— ভয় নাই,
রক্ষিব তাহারে। বল কতজন কে কে
আছে সংস্পৃষ্ট ইহাতে।

দেব।— নিজে বামদেব,—
মন্দিরের সেবক যতেক; সেনাপতি
বীরবল আর এসেছেন কতিপয়
অনুচর ল'য়ে। মাগো, যা হয় সত্বর
কর। এতক্ষণ আরম্ভ হ'য়েছে যজ্ঞ।
সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে বিলম্ব করিলে।

রাণী।—
যাও তুমি, মহারাজ সনে যাব আমি
এখনি মন্দিরে; এ হত্যা করিব
বন্ধ।

দেব।—
পশ্চাতের গুপ্তদ্বার রাখিব
খুলিয়া;—
গোপনে মা যেও সেই পথে।
কি জানিনা,
জানা জানি হ'লে সম্মুখ দুয়ারে যদি
বাধা দেয় সবে—গোলযোগে কার্য্য সিদ্ধি
না হ'তেও পারে।

রাণী।—
সত্য বটে! মত্ত সবে
অন্ধ ধর্ম্ম মদে—অসাধ্য কিছুই নাই।
রেখ তুমি খুলিয়া পশ্চাত দ্বার; যাব
সেই পথে। একবার পশিয়া মন্দিরে
যদি পাই বালিকারে—কেড়ে নেবে সাধ্য
নাই কারো।

দেব।—
মাগো গোপনে এসেছি আমি,
জানে যদি বামদেব রক্ষা না থাকিবে।
মোর কথা ব'লো না কাহার কাছে।

রাণী।— কোন
ভয় নাই—যাও তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া।
(উভয়ের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মন্দির।

(বামদেব পূজায় আসীন। ছায়া,
বীরবল, সেবক ও অনুচরগণ)

ছায়া।—

মাগো রাজলক্ষ্মী, কোথা তুমি দেখা দেও
এ বিপত্তি কালে। আসিনু
আদেশে তব
যুঝিয়া ইরাণী সনে উদ্ধারিতে দেশ।
কিন্তু একি হ'ল ? এই কি মা মনে ছিল ?
দেশহিতে যজ্ঞে মোরে পূর্ণাহুতি চাস্
মহামায়া ! অভাগী সন্তানে চাস্ কিমা
আহুতি অনলে ? মা হ'য়ে অনল মাঝে
সন্তানে করিয়া দগ্ধ—ভষ্মে তার তৃপ্তি
কি হইবে তোর ? মাগো,
মা হ'য়ে রাক্ষসী
হেন হইবি কেমনে ? বাজিবে না প্রাণে
কি একটু ? ভাল, চাস্ যদি—এই যদি
মনে ছিল—কেন তবে দেব দেবেশ্বরী,
তুই, ত্রিজগৎ রাণী, কেন তবে বল,
এ ছলনা ক'রেছিলি দীন এ সন্তানে ?
একেবারে কেননা বলিয়াছিলি চাস্
তুই আহুতি আমারে, কেন কেন মানা
ব'লেছিলি কাশ্মীরের অমঙ্গল রূপা
আমি, মোর সনে হবে দগ্ধ কাশ্মীরের
যত অমঙ্গল। এ দীন সন্তান তোর
এতই কি হীন—আসিত না নিজে হেথা
সাধিবারে দেশের মঙ্গল ? কেন কেন
ছলে ভুলাইয়া আনিলি মা এ বিনাশে
সহচর করে তার অভাগা সুরজে ?

বাম।—

জয় মা ভবানী ! মনস্কাম পূর্ণ তোর
আজ ! ধন্য আজ অধম সেবক তোর।
ধন্যা আজ তুমিও কুমারী। দেশহিতে
আপনি ভবানী তোমা নিলেন আপন
পায়। তার তরে দুঃখ কেন ? কেন চিন্তা,
কেন ভয় ?

ছায়া।—

আপনার তরে কোন দুঃখ
চিন্তা ভয় নাহিক আমার আর্য্য। কিন্তু
মৃত্যুকালে অভাগীর একটী মিনতি ;—
কুমারী আহুতি যদি চান মহামায়া,
নেও মোরে, দুঃখ কিছু নাই। সহচর
ছিল যে যুবক মোর, দয়া ক'রে বল,
আর্য্য, সেত রক্ষা পাবে ? হই যদি আমি
কাশ্মীরের অমঙ্গল রূপা—দগ্ধ ক'রে
ফেল মোরে। কিন্তু সে অভাগা
সঙ্গে শুধু
এসেছিল মোর ; রক্ষা কর, মোর পাপে
নাশিও না তারে।

বাম।—

পাপ কিমা ? বহু পুণ্য
ক'রেছিলি। তাই ছার দেহ দানে আজ
তুষিয়া মায়েরে—সাধিলি দেশের হিত।
ভয় নাই রক্ষা পাবে সে যুবক। চান্
না তারিণী তারে।

ছায়া।—

জয়মা ভবানী! নিবি
যদি নে তবে আমারে; পূর্ণ হ'ক ইচ্ছা
তোর।

বাম।—

রামদীন! পূজা শেষ, প্রজ্বলিত
কর চিতা।

(রাজার প্রবেশ।)

রাজা।—

কিসের এ চিতা আর্য্য? কার
তরে হবে প্রজ্বলিত?

(রাণী ও রক্ষীগণের প্রবেশ, রাণী
কর্ত্তৃক ছায়াকে ধারণ)

বাম।—

একি! তুমি কেন
হেথা? আসিলে কেমনে? যাও যাও
ফিরে।
মার পূজা শেষ প্রায়—মঙ্গলে বাসনা
যদি, দিওনাকো বাধা। সাবধান রাণী!
উৎসর্গিত কুমারী মায়ের নামে; স্পর্শ
করিও না তারে! মার ক্রোধানলে দগ্ধ
যদি না হইতে চাও, ছাড়—ছাড় ওরে
মায়ের আদেশ।

রাণী।—

জীবন থাকিতে নয়।
মায়ের পূজার ছলে মায়ের সন্তানে
এ নিষ্ঠুর হত্যা আজ মায়ের মন্দিরে—
জীবন থাকিতে দেহে দেব না সাধিতে।

রাজা।—

বীরবল, তুমিও হেথায়? কি সাহসে
প্রবৃত্ত এ হেন কার্য্যে অজ্ঞাতে আমার?

বীর।—

প্রস্তুত সতত দাস তব হিতে প্রাণ
দিতে মহারাজ। তাই এ সাহস তার।
ভবানীর ক্রোধানলে মত্ত তুমি ঝাঁপ
দিতে হ'য়েছ উদ্যত; প্রভুভক্ত দাস
আমি—কি ভয়ে হইব ভীত, রক্ষিবারে
পারি তোমা বলে কি কৌশলে।

রাজা।—

ধিক্, ধিক্
বীরবল! তুমিও হ'য়েছ মত্ত, মত্ত
এই ব্রাহ্মণের সনে! করিলে অনলে
দগ্ধ অবলা বালায়, বিশ্বমাতা তুষ্ট
হ'য়ে সাধিবেন হিত. অসম্ভব হেন
কথা দারুণ নিষ্ঠুর;—তোমারো বিশ্বাস
ইথে?

বাম।—

মূর্খ তুমি! পাষণ্ড নাস্তিক তুমি!
তাই বল অসম্ভব, তাই তব নাহি
এ বিশ্বাস! লীলাময়ী মহামায়া, লীলা
তাঁর অন্তহীন। দেখ নাকি গৌরী যিনি
হর মনোরমা, গণেশ জননী যিনি
স্নেহ হাস্যময়ী, দয়াময়ী অন্নপূর্ণা
যিনি, বিতরেণ অন্ন সদা ভবরূপী—
ভবে; সেই তিনি কালিকা চণ্ডিকা তারা
সর্ব্ব-সংহারিণী। প্রকৃতি রূপিনী মাতা,

দেখ নাকি প্রকৃতিতে অনন্ত বিকাশ
মার অনন্ত রূপের ? স্নিগ্ধ সন্ধ্যা উষা,—
কৌমুদী বিধৌতা নিশা সুজলা সুফলা
ধরা সু শস্য শ্যামলা পুষ্পিত প্রফুল্ল
কুঞ্জে বিহগ কুজনে পূর্ণা ; সে প্রকৃতি
পুন ঝটিকা আবর্ত্তময়ী ভীম ঘোর
গরজনে ভীমা ; উপাড়য়ে মহীরুহ,—
উড়ায় অচল শৃঙ্গ, তরঙ্গ বিক্ষোভে।
ভাঙ্গে ধরণী সাগরাঞ্চলা ; প্রলয়ের
ধ্বংশ আনে, নাশে লক্ষ লক্ষ প্রাণ। তাই
বলি সাবধান ! মূর্খ তুমি বোঝ নাক—
মার লীলা এই।—পাষণ্ড নাস্তিক তুমি,
বিশ্বাস ভকতি নাই মায়ের ইচ্ছায়,—
বাদ সাধিও না তায়।

রাজা।—

ইচ্ছাময়ী,
তাঁর ইচ্ছা তিনিই জানেন। জীবনে মরণে
জননী মঙ্গলময়ী রাখেন সন্তানে
কোলে সাধেন মঙ্গল। অজ্ঞান মানব
মোরা কিসে কি বুঝিয়া মার কার্য্য মনে
ক'রে সন্তানের সাধিব নিষ্ঠুর হত্যা,—
অধিকার নাই আমাদের। যাক্, তর্কে
নাই প্রয়োজন প্রমত্ত ব্রাহ্মণ সনে।
যাও রাণি নির্ভয়ে চলিয়া যাও ল'য়ে
বালিকায়।

ছায়া।—

মহারাজ, একটী মিনতি
পায় দীন বালিকার। বুধা এক সঙ্গে
এসেছিল মোর ;এ মন্দিরে আছে বন্দী
কর আজ্ঞা মুক্তি তার।

রাজা।—

যাও বালা, কোন
ভয় নাই। মুক্ত ক'রে নিয়ে যাব তারে।

(ছায়া সহরাণীর প্রস্থানোদ্যম।)

বাম।—

বীরবল, দেখিছ কি দাঁড়াইয়া ? কেড়ে
নিয়ে যায় ওই মায়ের চরণ হ'তে
আকাঙ্খিত আহুতি মায়ের। হও যদি
মায়ের সন্তান মায়ের গৌরব রাখ ;—
নেও—নেও ফিরে কাড়িয়া উহারে।

রাণী।—

কেড়ে
নেবে ! সাধ্য কার কে নেবে কাড়িয়া
এস ;
সতী আমি মহিষী রাজার মাতৃসমা
সকলের ; মোর অঙ্গে স্পর্শ ক'রে কেড়ে
নেবে বালিকারে ? এস কে আসিবে
এস ?

বাম।—

যাও, ভুলনা কথায়। লও কেড়ে লও—
মায়ের আদেশে ?

(সকলের কাড়িবার উদ্যম)

রাণী।—

মহারাজ, রক্ষ,—রক্ষ।
মহিষীর মান ?

রাজা।—

ভয় নাই, ভয় নাই

দেবি! এস—এস কে আসিবে। দাড়াইনু
হেথা এই অসি ল'য়ে করে। কে আসিবে
এস। হান অস্ত্র রাজার হৃদয়ে—শিক্ত
কর আগে সবে রাজার শোনিতে ধরা।
তারপর মহিষীরে অবমানি নেও
বালিকায়।

(সকলের ক্ষান্ত হওন ও অস্ত্রত্যাগ।)

যাও দেবি! নির্ভয়ে চলিয়া।
পশ্চাতে আসব আমি।

(ছায়া সহ রাণী ও কতিপয় রক্ষীর প্রস্থান।)

বাম।—

কি!—কেড়ে নিয়ে
চ'লে গেল। দাঁড়ায়ে দেখিলি সবে! ধিক্
ধিক্ তোরা, হীন কাপুরুষ! এত যদি
ভীত তোরা—থাক্ কাষ নেই। নিজে আমি
আনিব কাড়িয়া,—দেখি কে নিবারে
মোরে। (প্রস্থানোদ্যম)

রাজা।—

রক্ষিগণ ধর, ধর, বাঁধ এ ব্রাহ্মণে।
নিয়ে যাও মন্দির বাহিরে।

(রক্ষিগণ কর্ত্তৃক বামদেবকে ধৃতকরণ)

বাম।—

ছাড়্, ছাড়্,
রাখ্ নরাধম! ব্রহ্মশাপে ভষ্মীভূত
হবি।

(বামদেবকে লইয়া রক্ষিগণের প্রস্থান।)

রাজা।—

বীরবল, যা ভেবে যাহাই কর।
দহিবারে অগ্নি কুণ্ডে অবলা বালায়,
উদ্যত হইয়াছিলে অজ্ঞাতে আমার।
রাজ আজ্ঞা বিরোধী যে কার্য্য সাধিবারে
তাই—মহিষীর অবমানে অগ্রসর
হ'য়ে ছিলে রাজার সমীপে। রাজদ্রোহী
তোমরা দুজনে আজ। অপরাধ বড়
গুরুতর। দোঁহে বন্দী আপাততঃ রহ
কারাগারে। বিচার করিব পরে।

(বন্দী বীরবল সহ রাজা ও রক্ষিগণের প্রস্থান।)

সপ্তম দৃশ্য।

রাজ অন্তঃপুর।

রাণী ও ছায়া।

ছায়া।—

কি জানি হয়, বড় ভয় হৃদয়ে মা
হয়। আমি ক্ষুদ্র কৃষক বালিকা—কিছু
নাহি জানি। নিজে মহারাজ—সহচর
বীরগণ আর—তাদের অসাধ্য যাহা
সাধিবারে তাই—রাজলক্ষ্মী নিয়োজিল

মোরে। মাগো, ভাবিতে আপনি
আমি, ক্ষণে
ক্ষণে বিশ্বাস হারাই। অদ্ভুদ বারতা
মোর বিশ্বাসের যোগ্য নয়। ভয় তাই
কিজানি সকলে যদি উন্মত্ত বলিয়া
মোরে উপহাস অবহেলা করে। কিম্বা
ভুলাতে এসেছি সবে মিথ্যা ছলনায়,
এই ভেবে দূর ক'রে দেয়বা তাড়ায়ে।

রাণী।—
কোন ভয় নাই মা তোমার।
ভাবিও না;
অবিশ্বাস কেহনা করিবে তোমা।
যেথা
স্বার্থ-দুষ্ট কলঙ্কিত সংসার বাহিরে,—
সরল প্রকৃতি কোলে খেলে নারীনর—
সরল প্রকৃতি শিশু—সেথাকার—হেন
শিশু তুমি। অসম্ভব ছলনা চাতুরী
তব। স্বভাব সরল প্রাণে যে মূরতি
সরলতাময়ী,—হেরিয়া মূরতি সেই
কে বলিবে আছে তায় ছলনা চাতুরী?
সরল সহজ বুদ্ধি নম্রতা ভূষিত
প্রতি কথা প্রকাশিছে যার; উন্মত্তকে
বলিবে তাহারে? তারপর অসম্ভব
কিছু নয় ইহা। মানবের শক্তি যত
দেব ইচ্ছাধীন;—কৃপা ক'রে দেন
যারে,—
শক্তি অধিকারী সেই মানব মানবী,—
দেব কার্য্য সাধে এ ধরায়।

ছায়া।—
মাগো, নারী
আমি—নারীর হৃদয় বোঝ। তুমি তাই
ভরসা আমার। অপমান বিড়ম্বনা
সহে শত শত মাগো, হীন কুলে জাত
যেই জন; নাহি ডরি তার তরে।
কিন্তু
রাজলক্ষ্মীর আদেশ অবহেলা ক'রে
যদি সবে;—অমঙ্গল ঘটে কিছু
তায়—তাই বড় ভয়।

রাণী।—
শুনেছেন সবি
মহারাজ। দেশ রক্ষিবার আশা কিছু
নাহি আর। দেবতা প্রেরিতা তুমি,
মাত্র
এক ভরসার স্থল,—হইয়াছে দৃঢ়
এ বিশ্বাস তাঁর। মন্ত্রীসনে পরামর্শ
ক'রে, সৈন্যভার দেবেন তোমায় আজ।
রহ মা নিশ্চিন্ত হ'য়ে—কি ভয়
তোমার?
স্বার্থ কিছু নাই তব—স্মুধু তাঁর হিতে
আসিয়াছ তুমি। নিজ হিতে কে করে মা
অবহেলা? অকুল সাগরে প'ড়ে—কেবা
ছাড়ে—যদি পায় উদ্ধারের ভেলা—
চল;
দেখিগে কি হ'ল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

অষ্টম দৃশ্য।

মন্ত্র গৃহ।

রাজা ও মন্ত্রী।

রাজা।—

দেখিলেত মন্ত্রী, সুধাইনু যত কথা—
যথাযথ করিল উত্তর—ধীর স্থির
সলজ্জ বিনম্র হ'য়ে। উন্মত্ত কভুনা
বালা। মূর্ত্তি তার সরলতা ময়ী, চেয়ে
তার মুখ পানে—হেরিয়ে নয়নে তার
সরল হৃদয় ছায়া···কে বলিবে জানে
বালা ছলনা চাতুরী?

মন্ত্রী।—

রাজায় রাজায়
যোঝে রাজ্য নিয়ে, সামান্য কৃষক
বালা
এগুরু ব্যাপারে কি সাহসে কিবা স্বার্থে
আসিবে ছলিতে৷ ছলনা চাতুরী কিছু
নহেক সম্ভব। বুঝিয়াছি আলাপনে
উন্মত্ত কভুও নয়। অসম্ভব কিবা
মহারাজ? জানেন দেবতা, নিজ কাজে
তার, সুযোগ্য নিমিত্ত কেবা;
বুঝিব কি
অজ্ঞান মানব মোরা? মহারাজ, আশা
কিছু নাই আমাদের। সন্ধির প্রস্তাব
করিয়াছে অগ্রাহ্য ইরাণী। শীঘ্র হবে
পতিত সারণ; তার সনে সব যাবে;—
কাশ্মীরে একাধিপত্য হবে ইরাণীর।
দৈবমাত্র সহায় মোদের, দৈবশক্তি
পেয়ে বালা আসিয়াছে দেবতা প্রেরিতা।
মহারাজ, দেও এরে সৈন্যভার। আশা
কিছু নাই আর—বিনাশ নিশ্চয়। দৈব
যদি রক্ষে ভাল, না রক্ষে ক্ষতি কি তায়?

রাজা।—

যা কহিলে সত্য মন্ত্রী, সব দিক ভেবে
চিন্তে—স্থির তাই আমিও ক'রেছি।

মন্ত্রী।—

তবে
আমাত্য প্রধানগণে ডাকাই ত্বরিতে
সমবেত হইবারে রাজসভা মাঝে।
বুঝায়ে সবারে সৈন্যভার দেও তারে।

রাজা।—

প্রয়োজন কিছু নাহি তার। রাজা
আমি—
দেব তারে সৈন্যভার নিজ ক্ষমতায়।
মন্ত্রি বড় ব্যথা পাইয়াছি বুকে। নিজে
বীরবল বিশ্বাস ভাঙ্গিল মোর! আর
কারে করিব বিশ্বাস। বিপন্ন রাজারে
মন্ত্রী কেহ নাহি ডরে; সম্মুখে সাহসী
হয়, আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে বলে।
কেবা জানে
কি আছে কাহার মনে? যত সুধাইতে
গেলে—যদি কেহ বাদী হয়, যদি বলে
বাধা দিতে চায় কেহ মোরে;—
কি করিব
তবে? বারবার নিবারিতে সাধ্য নাহি

হইবে আমার। তার চেয়ে যত দিন
আছি এ বিপদে; তুমি আছ—

আমি আছি

বুঝিব যা ভাল—নিজ ক্ষমতায় আমি
করিব তাহাই। ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায়,
নীরবে রহিবে সবে।

মন্ত্রী।—

তাই তবে কর

মহারাজ! কাজ নাই মিছে গণ্ডগোলে
আজ্ঞা কর এখনি সে বালারে ডাকাই।

রাজা।—

বলিয়াছি মহিষীরে আসিবেন হেথা
তারে ল'য়ে।

মন্ত্রী।—

এই যে মহিষী!

(রাণী ও ছায়ার প্রবেশ)

রাণী।—

মহারাজ,

মন্ত্রণা কি হইয়াছে শেষ? আসিয়াছি
বালারে লইয়া—দেও তারে সৈন্যভার,—
পাল রাজলক্ষ্মীর আদেশ।

ছায়া।—

মহারাজ,

জানায়েছি তোমা রাজলক্ষ্মীর আদেশ,
দেবতা প্রেরিতা আমি রক্ষিতে কাশ্মীর;
অনুমতি দেহ, যাই রণে সেনাগণে
ল'য়ে। উদ্ধারিয়া বিপন্ন সারণ দুর্গে
রাজধানী মাঝে গিয়া পিতৃ সিংহাসনে
তব অভিষেক করিব তোমায়। পূর্ণ
হ'ক দেবাদেশ কর্ত্তব্য আমার।

রাজা।—

দেবী

তুমি আসিয়াছ, দেবতার কৃপাদানে
বাঁচাইতে মুমূর্ষু কাশ্মীরে। লও দেবি,
সৈন্যভার। যুঝিয়া ইরাণী সনে রক্ষা
কর দেশ তব, পাল দেবাদেশ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত এম্, এ,

সম্পাদক—"মালঞ্চ"

দ্বিতীয় অঙ্ক সম্পূর্ণ।

মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন।*

উপক্রম।

আমাদের বাল্যকালে—অদ্য হইতে চল্লিশ বর্ষ পূর্ব্বে, ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধীয় যে সকল পাঠ্য পুস্তক ছিল, তাহাতে লিখিত ছিল—ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই ভারতবর্ষের লোকেরা ইতিহাস লিখিতে জানে না, ভারতবর্ষের লোকেদের ইতিহাস লিখিবার প্রতিভা (Critical Historical Scnce) নাই। পূর্ব্বে ভারতের ইতিহাস ইংরাজরাই লিখিতেন। কাজেই তাঁহারা আমাদের সম্বন্ধে এইরূপ উক্তিই করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ উক্তিতে অভিহত হইয়া সত্বরেই ভারতবর্ষের লোকেরা, নিজেদের পুরাতত্ত্ব নিজেরাই লিখিতে আরম্ভ করিল। এবং তাহার দশ পনের বর্ষ মধ্যেই, ভারতের ইতিহাস লিখিবার উদযোগ ও আরম্ভ করিয়া, তাহাদের কলঙ্ক কাহিনী মুছিয়া ফেলিল।

ভারতের পুরাতত্ত্বের আলোচনায়, যে সকল লোক জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, আমি ও তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র এক ব্যক্তি। আমি সংস্কৃতাধ্যায়ী ছাত্র, আমি কালিদাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কালিদাস সম্বন্ধে যে কোনও পত্রিকায় বা পুস্তকে, যখন যাহা কিছু কিছু লিখিত হইতে লাগিল, বা লিখিত হইয়াছিল, তাহা আমি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দেখিতে এবং আলোচনা করিতে লাগিলাম।

পূর্ব্বে ইউরোপীয় ঐতিহাসিক মহলে, কালিদাসের জন্ম সময় লইয়া বড়ই বিসম্বাদ চলিতেছিল। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দ হইতে, খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত, আট জন বিক্রমাদিত্যের আট জন কালিদাসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, এবং রঘুবংশ প্রণেতা কালিদাস যে কোন বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন, তাহার কিছুই ঠিক হইতে ছিল না। যে পুরাতত্ত্ববিদের প্রাণে যাহা আসিয়াছে তিনি সেই অব্দেই কালিদাসের জন্ম সময় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। পূর্ব্বে জন্ম সময় বাহ্য সাক্ষ্য হইতে গৃহীত হইত—প্রস্তর ফলক,

* সাহিত্য সভার মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

তাম্রফলক, সম সাময়িক কবিদের লেখা, পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকদিগের লেখা প্রভৃতি হইতে, কালিদাসের জন্ম সময় উদ্ধারের চেষ্টা করা হইত। তাহাতে বিফল মনোরথ হওয়ায়, তাঁহাদের মত হইল—কালিদাসের গ্রন্থের অভ্যন্তর ভাগ হইতেই আবিষ্কার করিতে হইবে, তিনি কোন বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

এই চেষ্টায়, জার্ম্মাণীর Dr. T. Bloch এবং বারাণসীর শ্রীযুক্ত রামাবতার শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয় যুগপৎ, অন্যোন্যের সহায়তা ব্যতীত রঘুবংশের অভ্যন্তর ভাগ হইতে আবিষ্কার করিলেন—রঘুকর কালিদাস, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দের সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহাদের আবিষ্কারের পদ্ধতিটা এইরূপ ছিল—

"আসমুদ্র ক্ষিতীশানাং"—সমুদ্র গুপ্ত হইতে যে বংশ ক্ষিতীশ বা ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন :

"তদন্বয়ে শুদ্ধিমতি প্রসূতঃশুদ্ধিমৎতরঃ।
দিলীপ ইতি রাজেন্দুঃ ইন্দুঃ ক্ষীর নিধাবিব॥"

"পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্ব দীধিতে রণু প্রবেশাদিব বালচন্দ্রমা"

এই উভয় শ্লোক হইতেই, সেই বংশে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সূচনা করিতেছে।

"আকুমার কথোদ্‌ঘাতং" এখানে কুমার গুপ্তের কথা উদ্‌ঘাটিত করিয়া—এই ভাব দ্যোতিত হইতেছে।

"তস্মৈ গোপ্ত্রে সভার্য্যায়" এখানে গুপ্ত বংশের রাজত্বের কথা বলা হইতেছে।

"ততঃ কুমারোপি কুমারবিক্রমঃ"—এখানে কুমার গুপ্ত বিক্রমাদিত্যকে বুঝাইতেছে। ইত্যাদি

এই পুরাতত্ত্বানুশীলনের অভিনব শৃংখলাটি অধ্যয়ন করার পর হইতেই, আমার মনে হইতে লাগিল,—যদি এই রূপেই, কালিদাসের গ্রন্থের অভ্যন্তর ভাগ হইতেই, কালিদাস কোন সময়ের লোক, তাহা যদি নির্ণয় করা যায়, তবে এইরূপ ভাবে, কালিদাসের গ্রন্থের অভ্যন্তর ভাগ হইতেই, মহাকবি কালিদাস কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা যায় কিনা?

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে, ১৩১৯ সালে আমার একদিন মনে হইল—"মহাকবি কালিদাস বোধ হয় বাঙ্গালী ছিলেন," তদবধি আমি এই আটবর্ষ ধরিয়া নানা স্থানে, নানা জাতীয় পণ্ডিতের সহিত, এই সম্বন্ধে একাগ্রচিত্তে আলোচনা করিয়া, যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছি, তাহাই আপনাদিগকে পর্য্যায়ক্রমে শুনাইতেছি।

আমি এ বিষয়ে "পৃথিবীর ইতিহাস" লেখক ও "চতুর্ব্বেদ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট হইতে, পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের বিজ্ঞান সম্মত রীতি কি, তাহার উপদেশ লইয়াছি। তিনি আমার অনুকূলে মত দিয়া, "সাহিত্য সংবাদ" নামক মাসিক পত্রিকায় এবং "পৃথিবীর ইতিহাসের" চতুর্থ সংখ্যায়, এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

আপনাদের নিকট আমার নিবেদন—আপনারা আমায় কেবলমাত্র অনুসন্ধিৎসু জানিয়া, আমার যুক্তিগুলি বিচার করিয়া, মীমাংসা ও সামঞ্জস্য করিয়া মত প্রকাশ করিবেন। আমাকে ক্ষুদ্র ব্যক্তি জানিয়া, অবজ্ঞা করিয়া, আমার অনুসন্ধান উড়াইয়া দিবেন না। ইহা একটি আবশ্যকীয় বিষয়, আপনাদেরও বিবেচনার বস্তু।

আমার এই আটবর্ষের আলোচনার ফলে, আপনাদের নিকট মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী হউন, মাদরাজী হউন, মধ্য দেশী হউন, হিন্দুস্থানী হউন, কাশ্মীরি হউন, যে দেশ বাসীই হউন, ইতিহাসের চক্ষুতে কালিদাসের বাস-ভবনের একটা মীমাংসা হইয়া গেলেই আমি অনুগৃহীত হইব।

খগোল, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, বস্তুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, কাব্যশাস্ত্র এবং মনস্তত্ত্ব—এই সকল বিদ্যার দিক দিয়াই, কালিদাস কোন দেশীয় লোক ছিলেন, তাহা অনুধাবন করা যাইতে পারে।

কারণাবলী।

১ম কারণ—(খগোল)—আমিজ্যোতিষী কাজেই জ্যোতিষের উপর দিয়াই আমার প্রথম কারণ উদ্ভূত হইয়াছে। এবং ইঁহাই আমার কালিদাসকে বাঙ্গালী বলিবার প্রধান কারণ।

মহাকবি কালিদাস যে পঞ্জিকা খানা ব্যবহার করিতেন, তাহা বাঙ্গালা পঞ্জিকা।

মহাকবি কালিদাস বড় জ্যোতিষী ছিলেন, তিনি জ্যোতির্বিদা ভরণ নামক গণিত জ্যোতিষের একখানি গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার ফলিত জ্যোতিষেও অসাধারণ অধিকার ছিল। তিনি রঘুবংশে রঘুর জাতচক্র পর্য্যন্ত দিয়াছেন। কাজেই তাঁহার জ্যোতিষে কোনও ভুল হয় নাই এবং তিনি পাঁজিও ঠিক রাখিয়া ছিলেন।

(১) **বর্ষারম্ভ**। বাঙ্গালায় বর্ষারম্ভ বা নববর্ষ গ্রীষ্ম ঋতু হইতে হয়; হিন্দুস্থানে বসন্ত হইতে হয়; মধ্য দেশ হইতে সিন্ধু দেশ পর্য্যন্ত হেমন্ত ঋতুতে বর্ষারম্ভ হয়; দ্রাবিড়ে বর্ষাঋতু হইতে বর্ষারম্ভ হয়, কর্ণাটে শরৎ ঋতু হইতে হয়, ইউরোপিয়গন শীত ঋতুতে বর্ষারম্ভ গণনা করেন। কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন, তিনি ঋতুসংহারে ও শকুন্তলায় গ্রীষ্ম ঋতু হইতে বর্ষারম্ভ করিয়াছেন। তিনি হিন্দুস্থানী হইলে, বসন্ত ঋতু হইতে গ্রন্থের আরম্ভ করিতেন, উজ্জয়িনীর লোক হইলে, হেমন্ত ঋতু হইতে গ্রন্থের প্রথম বর্ণনা ধরিতেন দ্রাবিড় হইলে বর্ষাকে প্রথম আসন দিতেন, কর্ণাটী হইলে,—শরৎ কালকেই মস্তকে ধরিতেন, আর তিনি ইউরোপীয় হইলে শীত কালের প্রথম উল্লেখ করিতেন তিনি খাটি বাঙ্গালী তাই গ্রীষ্ম কাল হইতে বর্ষারম্ভ গণণা করিয়াছেন।

(২) **মাসেরতারিখ**। তিনি বাঙ্গালীর মত সৌর মানে মাসের তারিখ দিয়াছেন তিনি ১লা আষাঢ় তারিখে মেঘদূত লিখিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন! তিনি রাম গিরি, রামগড়, বা উজ্জয়িনীর লোক হইলে, নিশ্চয়ই মালবাব্দ গ্রহন করিতেন। তিনি মালব নাথ বিক্রমাদিত্যের পঞ্জিকা গ্রহন করিলে নিশ্চই লিখিতেন আষাঢ় শুক্ল প্রতিপ্রদি। তিনি হিন্দুস্থানী জ্যোতিষী হইলে লিখিতেন মিথুন সংক্রান্তে গতাংশো ১দিনে, দাক্ষিণাত্যের লোক হইলে লিখিতেন মিথুন প্রথমদিনে। আষাঢ়ের ১ম দিন জোতিষের একটা গণ্ড-গোলের কথা, কোনও হিন্দুস্থানী ছাত্রকে "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে এই কথার ব্যাখ্যা করিতে দিলে সে কিছুতেই তাহা বুঝাইতে পারিবে না। কালিদাস

খাটি বাঙ্গালী ছিলেন, বাঙ্গালীর দুই কোটী হিন্দু নর নারীর যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সেই বলিবে "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" কথার অর্থ ১লা আষাঢ়।

কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন—এ সম্বন্ধে আর কারণ না দিলেও চলে। যেমন মুদ্রিত পুস্তকের আবরক পত্র দেখিয়া কে লিখিয়াছে এবং কোথা হইতে লিখিয়াছে, তাহা বুঝা যায়; যেমন পত্র পাইবামাত্র তাহার শিরোনামা দেখিয়া; বুঝা যায় যে এই পত্র কবে কোথা হইতে আসিতেছে, সেইরূপ ঋতু সংহারের প্রথম শ্লোক, শকুন্তলার ৩য় শ্লোক, মেঘ দূতের দ্বিতীয় শ্লোক পড়িয়াই বুঝা যাইতেছে—ইহা একজন বাঙ্গালীর লেখা। কারণ কুটে কার্য্য হয়, সাহচর্য্য কারণ ও আবশ্যক কাজেই কয়েকটী সাহচর্য্য কারণও দিতেছি। তাহা কেবল আমার প্রথম কারণের বা মুখ্য কারণের প্রতি পোষক মাত্র।

একজন বৈষ্ণব কিছুতেই পত্রের শিরোভাগে "শ্রীদুর্গা সহায়" লিখিবে না। একজন হিন্দুস্থানী তাহার দোকানের খাতায় বাঙ্গালায় বসিয়াও ১লা আষাঢ় দশ টাকা বিক্রয় করিলাম, একথা লিখিবে না। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের তারিখ রাখিবার নিয়ম—মিথুনম্ ১। মুসলমানদের সারর্ব্বাৎ। ইহাই আমার কালিদাসকে বাঙ্গালা বলিবার মুখ্যকারণ।

(৩) **ঋতুসাম্য।** কালিদাসের ঋতু সংহার পড়িলে বুঝাযায় তিনি কোনও ঋতুকেই প্রাধান্য দেন নাই। তাহার যে দেশ জন্মভূমি, সে দেশে ছয় ঋতুই বরনীয়। তিনি হিন্দুস্থানী হইলে শীত ঋতুকে প্রাধান্য দিতেন, মধ্যদেশ বা পশ্চিম ভারতের লোক হইলে গ্রীষ্ম ঋতুকে প্রাধান্য দিতেন, দাক্ষিণাত্যে চির বসন্ত বিরাজ মান কিন্তু তিনি বাঙ্গালার লোক এখানে ছয় ঋতু সমান ভাবে বরনীয়। বাঙ্গালায় কোনও ঋতুরই প্রাধান্য নাই। বাঙ্গালী কবি মাইকেল বলিয়াছেন—

"কি লজ্জা অধিক তারে, ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধনে লোভে সে রমণী।"

(৪) **বৈকাল বেলা।** তিনি গ্রীষ্মের অপরাহ্ন কে বলিয়া ছেন দিনান্তরম্য" "দিবসাঃ পরিনাম রমণীয়াঃ" এই গ্রীষ্মের দিনান্তরম্যত্ব, এবং পরিণাম রমণীয়ত্ব একমাত্র বাঙ্গালা দেশই সম্ভবে। ইহা হিন্দুস্থানে সম্ভবে না। সেখানে গ্রীষ্মের দিবসের পরিণামে "লু" চলে। বৈকালে আর

গৃহের বাহির হওয়া যায় না। রাজস্থান এবং পশ্চিম ভারত মরুভূমির দেশ, সেখানে গ্রীষ্মের অপরাহ্নে "লু" কেন আগুন জ্বলে। বিন্ধ্য দেশও পর্ব্বতের গাত্রেই অগ্নিনির্গত হয়। দক্ষিনাত্যে চিরবসন্তের দেশে গ্রীষ্মের অপরাহ্নে আর বৈচিত্রীই কি আছে? মধ্যাহ্নে কিঞ্চিৎ জ্বালা হইলে তবেইত তাহার জুড়াইবার প্রবৃত্তি হইবে, কবি তাহারই বর্ণণা করিবেন। দুঃখ থাকিলে তবে সুখের মাধুর্য্য, বৈচিত্রীই কাব্যের প্রাণ এবং তাহাই বর্ণনীয়, যদি গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে উষ্ণত্ব না আসে তবে তাহার অন্তে শৈত্যের জন্য প্রাণ কেন লালাইত হইবে? এবং কবি তাহার কি বর্ণণা করিবেন? অতএব দিনান্তরম্য বাঙ্গালার গ্রীষ্ম কালের বৈকাল বেলা।

সাগর সুধাংশু নিধি এই দুই বয়ে
তোমা দিয়াছেন বিধি,
তবু তুমি মধু বিলাসিনী।" মধুঃ।

(৫) গ্রীষ্মের উপভোগক্ষমত্ব। কালি দাস যে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন—সে দেশে উপভোগ ক্ষম গ্রীষ্মঋতু আছে। সে দেশে প্রচণ্ড ও অনুপভোগ্য গ্রীষ্ম নাই। কালি দাসের জন্ম ভূমিতে গ্রীষ্মের নামে গানবাঁধে মধু মাসের নামে গান বাঁধে না!!! সে দেশের লোক মধু মাস্ এল সজনি বলিয়া পথে পথে গাহিয়া বেড়ায় না। শকুন্তলা প্রণয়ণাবস্থা কলিদাস যে রাজার সভাসদ ছিলেন, তিনি মধু মাসের বা মধুৎ সবে'র বর্ণনায় লালায়িত। জগতের সমুদয় কবিরা বসন্ত কালকে উপভোগের সময় বলিয়া বর্ণণা করিয়াছেন, আলঙ্কারিক গনও বসন্ত কালকে উপভোগার্হ বলিয়া সময় প্রসিদ্ধি" বা অবশ্য বর্ণনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গ্রীষ্ম কাল যে উপভোগার্হ একথা শকুন্তলা ব্যতীত পৃথিবীর কোনও কবির গ্রন্থ হইতে বাহির করিতে পারিবেন না নীতি শাস্ত্রে পর্য্যন্ত লেখে—বসন্তে ভ্রমণং কুর্য্যাৎ—ইত্যাদি। বসন্ত কালে ভ্রমণ করিবে, ঘি দিয়ে ভাজিয়া কচি কচি নিমের পাতা খাইবে, যুবতী নারী সংসর্গ করিবে; এ যদি না করিতে পার তবে এমন প্রাণ আর রাখিও না, আগুনে পুড়িয়া মরিও। যে দেশে বসন্তের এমন আধিপত্য সে দেশে কিনা তিনি উপভোগক্ষম গ্রীষ্ম কালের উল্লেখ করিয়া, নিজে এক ছড়া কাটিলেন

এবং তাহার প্রিয়তমা নটীও গ্রীষ্ম সময় অধিকার করিয়াই এক গান গাহিলেন। এই অমার্জ্জনীয় দোষের জন্য কালি দাসের নাম কবি সমাজ হইতে কাটিয়া দেওয়া উচিত। অলঙ্কার শাস্ত্রের দোষ পরিচ্ছেদে, একথা বিশেষ ভাবে সমালোচিত হওয়া উচিত। কারণ তিনি "কবিসময়ের অপ্রসিদ্ধ বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালী—জগতের মতের বিরুদ্ধে কেবল মাত্র বাঙ্গালী বিদ্বৎ গনের পরিতোষ আকাঙ্ক্ষা করিয়া অচির প্রবৃত্ত উপভোগক্ষম গ্রীষ্ম কালের বর্ণণা করিয়াছেন।

(৬) সুভগ সলিলাবগাহাঃ পাটল সংসর্গ সুরভি বনবাতাঃ। প্রচ্ছায় সুলভ নিদ্রা দিবসাঃ পরিণাম রমণীয়াঃ !!"

এই শ্লোকটীতে আরও একটী রহস্য আছে। মহাকবি কালি দাস যে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, সে দেশে প্রচুর জল পাওয়া যায়, সে দেশের মেয়েরা সমস্ত দিন পকুরের" জলে গা ডুবাইয়া দিন কাটায়—সেটা "পকুরের" দেশ। সে দেশের কবি গাহিয়াছেন

"সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরং
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীং
ফুল্ল কুসুম দ্রুমদল শোভিনীং, সুহাসিনীং সুভাসিনীং মাতরং"

সে দেশের কবি আরও গাহিয়াছেন—

"বেলাযে পড়ে গেল জল্‌কে চল্‌"
পুরাণ সেই সুরে কে যেন গাহে দূরে
কোথা সে ছায়া সখি, কোথা সে জল
কোথা সে বাঁধা ঘাট অশথ তল।
ছিলাম আনমনে একলি গৃহ কোণে
কে যেন ডাকিল রে "জলকে চল" ॥
কলসী লয়ে কাঁখে পথ বাঁকা
বামেতে-মাঠ সুধু সর্ব্বদা করে ধূধূ
দখিণে বাঁশবন হেলায়ে শাখা
দিঘীর কাল জলে সাঝের আলো জলে
জটলা করে তীরে রাখাল এসে"—রবি।

সংস্কৃত ভাষা সেই দেশের নিজস্ব যে দেশের লোক "ঘর্‌কে চল" বলে—গৃহংগচ্ছ বলে—গৃহে গচ্ছ বলে না।

কালিদাস তাহার শ্লোকে এই কথাই বলিয়াছেন।* তাহার কাব্যের ছত্রে ছত্রে এই কথাই পাইবেন। তাহার পর পাটল ফুল বা পারুল ফুল, এই বাঙ্গালাতেই মাত্র পাওয়া যায়।

(৭) **শরৎ বর্ণনা।** কালিদাসের "শরৎ বর্ণনা" এবং রবীন্দ্রের "বঙ্গে শরৎ" শীর্ষক কবিতা একই ভাব দ্যোতক। আপনারা "হে মাত বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ তোমার বিমল প্রভাতে" ইত্যাদি রবিবাবুর কবিতা কালিদাসের "শরৎ বর্ণনা"র সহিত মিলাইয়া দেখিবেন, উভয়ে এক প্রকৃতিই চিত্রিত করিয়াছেন।

(৮) **কালিদাসের জন্মভূমির অঙ্কাংশ।** পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে "প্রবোধ প্রকাশ" নামক নর্ম্ম্যান ত্রৈবার্ষিকের এবং সাহিত্যের পাঠ্য পুস্তক ছিল, উদ্ভটচন্দ্রিকাতেও আছে তাহাতে "কালিদাসের বুদ্ধিমত্তা" নামক একটি বৃত্তান্ত লিখিত ছিল। তাহার ভাবার্থ এইরূপ—কালিদাস ভোজ বংশ প্রভব বা ভোজপুরীয়, (বিদর্ভ রাজ ভোজের ভগিনী ইন্দুমতী) কোনও রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহার ধন্বন্তরি ক্ষপণক প্রভৃতি আটজন শ্রুতিধর সভাসদ আছেন। তাঁহার সভায় কোনও শ্লোক বলিলেই, তাঁহারা আট জনেই বলেন ঐ শ্লোক আমাদের জানা আছে। কাজেই নূতন শ্লোকের অভাবে, কোনও পণ্ডিতই, তাঁহার সভা হইতে কোনও অর্থ লাভ করিতে পারে না। কালিদাস তাহা বুঝিয়া, সেই স্থানে গিয়া বলিলেন—"স্বস্তি শ্রীভোজ রাজঃ ত্রিভুবন বিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী পিত্রাস্তেমে গৃহীতা নব নবতি যুতা রত্নকোটি র্মদীয়ঃ।" ইত্যাদি—ইহার ভাবার্থ—তোমার পিতা আমার ৯৯ কোটি টাকা ধারেন এই আটজন পণ্ডিত সাক্ষী আছেন। পণ্ডিতেরা শ্রুতিধর—তাঁহারা এক বাক্যে বলিলেন—আমরা এ শ্লোক জানি। কাজেই ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী রাজা পিতৃঋণ শোধের জন্য ৯৯ কোটী টাকা দিতে বাধ্য হইয়া বলিলেন—৯৯ কোটী টাকা বড় কম নহে—আমি স্বভুজ বলে ভারতের সম্রাট হইয়াছি ইহা আমার পৈতৃক সম্পত্তি নহে, পিতার দেনার জন্য পিতৃ সম্পত্তি দায়ী। পিতার সম্পত্তির মধ্যে এক-

খানি তাম্র ফলক আছে তাহাই মাত্র পিতৃঋণ শোধার্থ আপনাকে দিতেছি। তাহাতে লিখিত আছে—

"আষাঢ় স্যান্ত্যদিবসে• মধ্যাহ্ন সময়ে তাল বৃক্ষস্য মস্তকে বহুতর ধনানি স্থাপিতানি।"

রাজা পূর্ব্বে তালবৃক্ষের মাথাটা খুজিয়াছিলেন কোনও ধন পান নাই। কালিদাস সেখানকার যত তালবৃক্ষের গোড়া খুড়িয়া বহুতর ধন উদ্ধার করিলেন।

এই বহু বিবুধ জন বিদিত গল্পের একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বিজ্ঞান সম্মত পুরাতত্ত্বানুশীলনে, এই গল্পের বিশেষ আলোচ্য বিষয় আছে। এই গল্প হইতে তিনটি তথ্য জানা গেল—ভোজ বংশীয় বিক্রমাদিত্য যেদেশে রাজধানী করিয়াছিলেন, সেখানে অনন্ত তালবন, সেখানে বাঙ্গালা পাঁজি ব্যবহার হয়, এবং সেখানে ৩২শে আষাঢ় তারিখে মধ্যাহ্ন কালে, সূর্য্যদেব সেই সকল তাল-বৃক্ষের সম সূত্রপাতে উপস্থিত হন। এই তালী বনশ্যাম কোন দেশ? কোথায় বাঙ্গালা পাঁজি ব্যবহার হয়? এবং কোথাকার অক্ষাংশ ২৩।২৭। ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "সাহিত্য" পত্রিকায় "রাঢ়ের পথে" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন—"রাঢ় তালীবন শ্যাম বা তাল পুকুরের দেশ" এই রাঢ়ের যেস্থানে ২৩।২৭ অক্ষাংশ পড়িয়াছে, সেই স্থানেই বর্ত্তমান নবদ্বীপ অবস্থিত। (ভোজরাজের ভগিনী ইন্দুমতীই কালি-দাসের পত্নী বিদ্যুন্মালা, ইন্দুমতি ও বিদ্যুন্মালা একার্থ বাচক। বিদর্ভাধি-পতি ভোজ) এবং তাহাই কালিদাসের বাসভূমি। এতক্ষণে খগোলের দিক দিয়া কালিদাসের বাসভবন তত্ত্ব শেষ হইল। দুইটি প্রধান কারণ এবং চারিটি আনুসঙ্গিক কারণ দিয়া, আমার খগোলিক কারণ শেষ করিলাম। আমার মতে আমার এই প্রথম কারণটি অখণ্ডনীয় কারণ। এই কারণ অতি সহজ বোধ্য, বাঙ্গালার অশিক্ষিতা রমণীরা পর্য্যন্ত, আজ কত তারিখ তাহা জানেন, কাজেই জ্যোতির্ব্বিদাভরণ প্রণেতার কোনও ভ্রান্তি হয় নাই। আমি এই এক যুক্তিতেই প্রমাণ করিলাম—কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন। অপর যুক্তির আর আবশ্যকতা নাই। তবে বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস উদ্ধারে, পূর্ব্ব বাক্য দৃঢ় করিবার জন্য বহু প্রমাণ দিতে হয়, কাজেই আর একটি কারণ বলিতেছি—

২য় কারণ। (ভূগোল)—কালিদাসের বাস ভবনটি ভৌগোলিক-বস্তু, কাজেই ভূগোলের পথেই আমার দ্বিতীয় কারণ নির্ণীত হওয়া উচিত। ভৌগোলিকের দৃষ্টিতে কালিদাসের জন্ম ভূমি সম্বন্ধে এইরূপ বুঝা যায় কালিদাস একজন অভ্রান্ত ভৌগোলিক ছিলেন। তাহার গ্রন্থপাঠে বুঝা যায় তিনি যে বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন তিনি গাঙ্গ্যরাষ্ট্র হইতে দিগবিজয় আরম্ভ করিয়াছেন এবং প্রাগ জ্যোতিষে সেই দিগবিজয় সমাপ্ত করিয়াছেন।

(ক) তাহার গ্রন্থের নায়ক রঘু, গাঙ্গরাষ্ট্র নিবাসী একজন রাজা ছিলেন। তিনি যদি অযোধ্যার রাজা হইতেন তাহা হইলে তিনি অযোধ্যা হইতে সসৈন্যে বহির্গত হইলেন—এই কথা লেখা থাকিত এবং প্রাক্‌জ্যোতিষ জয় করিয়া সসৈন্যে অযোধ্যার গৃহে ফিরিলেন, এই কথা লেখা থাকিত। কিন্তু রঘুবংশে অযোধ্যার নামোল্লেখ এরূপ অত্যন্ত আবশ্যকীয় স্থলেও নাই কেন? কবিরা সর্ব্বত্র তাহাদের কাব্যের নায়কদের বাসভবন বা রাজধানীর বর্ণনা করিয়া থাকেন। বাল্মীকি প্রথমেই "কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফাতো জনপদো মহান" ইত্যাদি পদে গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছেন। কালিদাস নিজেই "কুমারে" হিমালয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, মেঘদূতেও রামগিরির বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু রঘুবংশে অযোধ্যার কোনও বর্ণনা করেন নাই কেন! এমন কি প্রথম চারি সর্গের মধ্যে, রঘুর রাজ্য কোন দেশে ছিল তাহা বুঝিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই। রাজধানী, বা জনপদের বর্ণণা, কবিদের অগ্রেই অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা ভাবের পরিস্ফুট হইবে না। চিত্রকরের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে হইলে, যেমন পটাধারকে, নানাবর্ণে চিত্রিত করিতে হয়, তেমনই নায়কের রাজধানী উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত না করিলে, নায়ক চরিত্র পরিস্ফুট করাযায় না। কালিদাস নিজেও এ কথা জানিতেন, তিনি বিরহোন্মাদাবস্থায় পটাধার কেবল মাত্র শকুন্তলারই প্রতি কৃতি অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাব পর যখন সঙ্গা হইল, তখন তিনি বলিলেন 'কার্য্যাসৈকতলীন হংসমিথুন" ইত্যাদি অর্থাৎ ইহা এখনও সুন্দর হয় নাই, ইহার কাছে অনেক লতাপাতা আঁকিতে হইবে, তবে চিত্র পরিস্ফুট হইবে।

এই অবশ্য বর্ণণা বিষয় জানিয়া বর্ণণা না করাতে মনে হয়, কালিদাসের আশ্রয় দাতা বিক্রমাদিত্য, একজন অজ্ঞাত নামা দেশের অধিপতি, তাহার

রাজধানী প্রখ্যাত নামা নগর নহে। এইকথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—সগুপ্ত মূলঃ প্রত্যন্তঃ শুদ্ধ পার্ষ্ণি রয়ান্বিতঃ ষড়বিধং বলমাদায় প্রতস্থে দিগ জিগীষয়া।” গুপ্তমূলঃ—অজ্ঞাত নামা দেশোদ্ভবঃ সরঘুঃ প্রত্যন্তঃ প্রত্যন্ত দেশ বাসী, গুপ্ত বংশেররঘু তাহার ম্লেচ্ছ দেশীয় রাজধানী হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিগ বিজয়ে বহির্গত হইলেন। ইহাতে বুঝা গেল ম্লেচ্ছ জাতীর অধ্যুষিত কোনও অবিখ্যাত দেশে, গুপ্ত বংশের দিগবিজয়ী সম্রাটের মূল রাজধানী ছিল। তিনি সেখান হইতে সেই প্রত্যন্ত জাতিকে সমর পরায়ণ করিয়া দিগবিজয়ে বহির্গত হইলেন। প্রত্যন্ত দেশ হইতে তিনি পূর্ব্বদিকে বহির্গত হইলেন—পথে অনেক জন পদ জয় করিয়া, তিনি তালীবন শ্যাম সমুদ্রের উপকণ্ঠস্থিত দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন “ পৌরাস্ত্যানেব মক্রামং স্তান স্তান জনপদান জয়ী, প্রাপ তালীবন শ্যাম মুপকণ্ঠং মহোদধেঃ। কালি দাসের মত ভৌগোলিক, রাজস্তুতি গাহিতে বসিয়াছেন, এই সব বিজিত জন পদের নামোল্লেখ কেন করিলেন না? তিলকে তাল করিয়া বর্ণণা করাইত রাজস্তুতি, রাজপুতনার ভাটেরা যে যুদ্ধে রাজা হারিয়া গিয়াছেন, সেই যুদ্ধেও রাজা জিতিয়াছেন বলিয়া বর্ণণা করিয়া গিয়াছেন। তিনি জ্ঞাতসারে এই বর্ণনা না করায় বুঝা যাইতেছে প্রত্যন্ত দেশ ও পূর্ব্ব সমুদ্রের উপকণ্ঠস্থিত তালীবন শ্যাম দেশের মধ্যস্থলে কোনও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য গ্রাম বা নগর ছিল না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল।

প্রত্যন্ত দেশের পর ক্ষুদ্র জন পদ, তাহার পূর্ব্বে পূর্ব্বসাগর তীরবর্ত্তী তালীবন শ্যাম দেশ। তাহার পূর্ব্বে বেতবন সমন্বিত সুহ্মদেশ তন্নিকটেই বঙ্গদেশ।

এক্ষণে এই সুহ্ম দেশ কোথায় তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেই, কালিদাসের বাসস্থান নির্ণয় হইল। হিয়ান্ সাঙ্গের মতে পৌণ্ড্র বর্দ্ধন ও তাম্রলিপ্তির মধ্যস্থলে বহু বৌদ্ধ বিহার শোভিত সুমতাটা নগর। এই সমতটকে আমি সুহ্মদেশ মনে করিয়া বর্ত্তমান পাটুলি বা “পাড়ুব্রে” স্তুপকে সেই সমতটরূপে নির্ণয় করিলাম। সুহ্ম যে গঙ্গার চড়া তাহা সর্ব্ব ঐতিহাসিক বিদিত। কাল সোণার দক্ষিণ হইতে তমলুকের উত্তর পর্য্যন্ত এই সমুদায় স্থানকেই সমতট বলিয়া লইলে আর কোনও বিরোধ নাই।

এক্ষণে আমার আপত্তি—অযোধ্যা হইতে সুহ্মদেশ পূর্ব্ব নহে—দক্ষিণ, বা দক্ষিণ পূর্ব্ব। এই উভয় স্থানের মধ্যস্থলে অনেক প্রধান নগর ও রাজা ছিলেন, তাহারা অজের স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাদের নাম, যশো বর্ণনা ও শৌর্য্য বীর্য্য কালিদাস মুক্তকণ্ঠে করিয়াছেন। সেই সকল-দুর্দ্দান্ত রাজা ও সম্রাটগণের রাজ্য রঘু যখন জয় করিলেন, তখন তাহা কালিদাসের মত স্তুতি পাঠক বর্ণনা না করিয়া, সুহ্ম ও বঙ্গদেশের জয়ের বর্ণনা করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবে? যাহাদের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রতম অস্তিত্ব, কালিদাস ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভায় দেখান নাই, সেই দেশ জয়ের বর্ণনা উচ্চকণ্ঠে করিলেন, অথচ তদপেক্ষা মহা মহা সমৃদ্ধিশালী জনপদ জয়ের নামোল্লেখও তিনি করিলেন না, এ কথা হইতে পারে না।

এই ভিত্তির উপর আমার সিদ্ধান্ত—রঘুবংশের নায়ক রঘু, অযোধ্যার রাজা নহেন। অযোধ্যার রাজা হইলে, প্রথমেই মগধ, অঙ্গ, বিদর্ভ প্রভৃতি স্বয়ম্বরোক্ত দেশ সকল জয় করিয়া, সুহ্মদেশে আসিতেন এবং ইহাদের জয় কাহিনী ভট্ট কালিদাস কোটী কণ্ঠে করিতেন। তিনি যখন তাহা করেন নাই, তখন ইহা নিশ্চিত এবং ঐতিহাসিক সত্য যে—রঘুবংশের নায়ক বা রঘুর রাজধানী, বঙ্গদেশের নিকটবর্ত্তী, সুহ্মদেশের পশ্চিম, তালীবন শ্যাম দেশের পশ্চিম, ক্ষুদ্র জনপদের পশ্চিম—প্রত্যন্ত দেশ। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি রাঢ় তালীবন শ্যামদেশ বা ৺রামেন্দ্র সুন্দের ত্রিবেদীর ভাষায় ইহা "তালপুকুরের দেশ" তৎ পশ্চিমের ক্ষুদ্র জনপদ এবং তৎ পশ্চিমের লালমাটীর দেশেই রঘুর রাজধানী ছিল। এ কথা আমি আরও বিষদ করিতেছি। এই সকল স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি দেখিয়াছি—বেতবন সম্পন্ন সমতট শুভ্রবর্ণ মৃত্তিকা সম্পন্ন, তৎ পশ্চিমে হরিদ্রাবর্ণ মৃত্তিকাই তালীবন শ্যামদেশ, তাহারই পশ্চিমেই "বর্দ্ধমানের রাঙ্গামাটি (বুড়িকে ধরে খ্যাচ্ করে কাটী") এই রাঙ্গামাটীতে তালগাছ কম হয়। ইহাকে প্রত্যন্ত দেশ ও বলা যাইতে পারে, কারণ ইহা নতোন্নত দেশ (উঁচো চড়াও) ইহা পূর্ব্ববাঙ্গালার মত সমতল নহে, রাণীগঞ্জ হইতে বীরভূম পর্য্যন্ত এই রাঙ্গামাটি এবং নতোন্নত স্থান, পাকুড় ও তিনপাহাড়ীর নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, আমি এই সকল স্থানকেই প্রত্যন্ত দেশ বলিয়া মনে করি। প্রত্যন্ত শব্দে

পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থানও বুঝায়। এই স্থানের অধিবাসীরা সাওতাল বা হিন্দু ধর্ম্মের বহির্ভূত ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বীও বটে। কাজেই এই সকল স্থানের নিকটেই, গুপ্তবংশের রঘু—দিগবিজয়ী সম্রাট, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল।

(খ) রঘুর দিগবিজয় বাল্মীকির রামায়ণে নাই। ইহা কালিদাসের স্বকপোলকল্পিত। কালিদাস স্বীয় প্রভুর গৌরব বাড়াইবার জন্য, তাহার দিগবিজয় কাহিনী, রঘুর দিগবিজয় নামে প্রখ্যাত করিয়াছেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য যে দেশের পর যে দেশ জয় করিয়াছেন—ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ যাহা বিদিত আছেন—রঘুও সেই দেশের পর সেই দেশ জয় করিয়াছেন।

(গ) দিলীপের পিতার নাম যে কাকুস্থ এ কথ বাল্মীকি বা বেদব্যাস জানিতেন না। বাঙ্গালার ভাটেরা জানিতেন সেই ভাটেদের নিকট হইতে কবি কালিদাস ও বাঙ্গালী কাশীরাম দাস, কীর্ত্তিবাস প্রভৃতি বাঙ্গালী কবিরা জানিয়াছেন। ইহাও কালিদাসের বাঙ্গালীত্বের প্রমাণ। কালিদাস যে বাঙ্গালী কথকদিগের নিকট হইতে, রামায়ণের কথকতা শুনিয়া, বড় হইয়াছিলেন ইহা নিশ্চিত।

(ঘ) এখানে একটু ফলিত জ্যোতিষের কূট কথা আছে। শব্দবিদ্যার মতে যে যে কার্য্য করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে যে কোন কার্য্যই করুক না কেন, তাহার অত্যন্ত ব্যবহৃত শব্দগুলি অনাবশ্যক স্থলেও ব্যবহার করে। মহাকবি কালিদাস ফলিত জ্যোতিষেরও পণ্ডিত ছিলেন। কাব্য লিখিতে বসিয়াও অনাবশ্যক স্থলেও ফলিত জ্যোতিষের এককূট কথা বসাইয়া গিয়াছেন। "গ্রহৈস্ততঃ পঞ্চভিরুচ্চ সংস্থিতৈঃ" ইত্যাদি শ্লোকে তিনি রঘুর জন্মকালীন পঞ্চগ্রহ তুঙ্গীছিল, এই কথা বলিয়াছেন। বাল্মীকি বলিতেছেন রামের জন্মকালীন পঞ্চগ্রহ তুঙ্গী ছিল। রঘুর জন্ম হইতে রামের জন্ম সময়, একশত হইতে দেড়শত বর্ষ পরে ধরিলে, তখন পঞ্চ গ্রহ তুঙ্গী হয় না। একবার পঞ্চগ্রহ তুঙ্গী হইলে, আবার পঞ্চগ্রহ তুঙ্গী হইতে, অন্তত সাড়ে তিন হাজার বর্ষ সময় লাগে। ইহাতেও বুঝা যাইতেছে—কালিদাদের রঘু ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন, তিনি একজন কল্পিত ব্যক্তি।

(ঙ) জনপ্রবাদ অনুযায়ী চাঁদ সওদাগর যে পথ দিয়া বানিজ্য করিতে গিয়াছিল, কালিদাসের রঘু সেই পথ ধরিয়া দিগবিজয়ে বহির্গত হইয়াছেন। তাহা হইলে কালিদাসের রঘু, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য এবং চাঁদ সওদাগর একই ব্যক্তি। একথা আমি ১৩২৫ সালের মাঘের "সাহিত্য সংবাদ" পত্রে চাঁদ সওদাগর নামক প্রবন্ধে বিস্তৃত করিয়াছি।

(চ) কবিকঙ্কন চণ্ডীতে দেখা যায় শ্রীমন্ত সওদাগর যে পথে সিংহলে বানিজ্য করিতে গিয়াছিল সেই পথেই রঘু, চাঁদ সওদাগর ও চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য দিগবিজয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে শ্রীমন্ত সওদাগর রঘু ও চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য অভিন্ন ব্যক্তি বা বাঙ্গালী ছিল। এই কথা আমি ১৩২৫ সালের ফাল্গুন সংখ্যার "সাহিত্য সংবাদ" পত্রে বিবৃত করিয়াছি। শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তাহার "পৃথিবীর ইতিহাসে" লিখিয়াছেন—শ্রীমন্তের সময়ে, বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া সবডিভিসনের অধীন মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত উজানি—উজয়নী—বা উজ্জয়নী নামক নগরে, বিক্রমকেশরী নামক একজন সম্রাট ছিলেন। আমি বলিতেছি এই উজানির "বিক্রমকেশরী" উপাধি বিশিষ্ট রাজাই, ইতিহাস প্রসিদ্ধ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। মহাবংশ বর্ণিত সিংহবাহুরও ঐ পথ। সিংহবাহু বাঙ্গালার রাজপুত্র।

এতক্ষনে আমার ভৌগোলিক প্রমান শেষ হইল এবং আমি প্রমাণ করিলাম যে—রঘুকর কালিদাসের প্রভু মঙ্গলকোটের উজানিতে রাজ্য করিতেন। তিনি স্বজাতি বৎসল হইলে, কালিদাস বাঙ্গালী হইয়াও সভাসদ হইতে পারেন। আর যদি তিনি বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী জাতির মত, বিজাতি বৎসলই হন, তবে কালিদাস অবঙ্গ দেশের লোকওত হইতে পারেন। এইরূপ আপত্তির আশঙ্কায়, আমি আরও কয়েকটী ভৌগোলিক প্রমান উদ্ধৃত করিতেছি।

২১ কারণ। (ভূগোল) গঙ্গার এক স্থানের নাম হুগলি নদী। একথা পাঞ্জাবের লোক—বোম্বায়ের লোক—মাদ্রাজের লোক এবং ছত্রিশা গড়ের লোকেরা জানে না। এবং কখনও কোন সূত্রে জানিতে পারিলেও গঙ্গা নদীকে হুগলী নদী বলিয়া ডাকে না। গঙ্গার এক স্থানের নাম

ভাগীরথী, তাহা বোম্বায়ের লোক, মাদ্রাজের লোক, কাশ্মীরের লোকেরাও জানে না, যদি কখনও কোন সুত্রে টেরই পায়, তাহা হইলেও তাহারা কখনই গঙ্গাকে ভাগীরথী বলিয়া ডাকিবে না। ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বের লোকেরাই গঙ্গাকে হরিদ্বারে গিয়াও ভাগীরথী বলিয়া ডাকিবে, যমুনা জাহ্নবীতে ও তাহাকে ভাগীরথীই বলিবে, ছাপাঘাটীতেও সেই ভাগীরথী বলিবে এবং সাগর সঙ্গমেও সেই ভাগীরথীই বলিবে। তাহার অভ্যাস ভাগী-রথী বলা সে কখনও গঙ্গা বলিবে না।

কালিদাস ভাগীরথী তীরের লোক, তিনি ছাপঘাটার তীরে দাঁড়াইয়াও বলিয়াছেন—বভৌ হর জটা ভ্রষ্টা গঙ্গামিব ভাগীরথী এবং হিমাচলে গিয়াও বলিতেছেন—"ভাগীরথী শীকর নির্ঝরাণাং"

দক্ষিনানিল। দক্ষিনানিল বাঙ্গালা দেশেই বহিয়া থাকে, এই দেশেই ইহার মাধুর্য্য। মাদ্রাজে ইহা নিত্য, কাজেই মাধুর্য্যাভাব। হিন্দুস্থানে দক্ষিনালিল পহুছেনা। রাজস্থানে "লু" চলে!

চরংগঙ্গা। ভাগীরথীর মুখেই চঞ্চল বালুকার চড়া পাওয়া যায়। ইউরোপীয় নাবিকগণ বলেন "Calcutta is the most dangerous port in the world,"

গোপ-জাতি-দ্বয়। কালিদাসের স্বদেশে দুই জাতীয় গোপ ছিল পেলো গয়লা ও চাসা গয়লা। "হৈয়ঙ্গবীন মাদায় ঘোষ বৃদ্ধানুপস্থিতা এখানে পেলো গয়লা পাওয়া গেল, এবং "শালি গোপ্যো জগুর্যশঃ" এখানে চাসা গয়লা পাওয়া গেল। এই দুই জাতীয় গয়লা রাঢ় ব্যতীত ভারতের কুত্রাপি নাই। হিন্দুস্থানে গোপদের আহীর বলে, ঘোষ বলে না। সেখানে ঘোষ শব্দে স্তুতি পাঠক বুঝায়। আর "ঘোষ বৃদ্ধ শব্দটী প্রাদেশিক গয়লা বুড়ো" কথার সংস্কৃতানুবাদ। রাঢ়ে বুড়ো গয়লা বলে না। "গয়লাবুড়ো" বলে, কালিদাস তাহারই অনুবাদ করিয়াছেন। গয়লা বুড়ো বলিবার আরও একটি কারণ আছে। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দ পর্য্যন্ত, রাঢ়ের গয়লারা ষাট বর্ষে সাবালক হইত। ইহাদের আর একটী নাম "ভেমো গয়ালা"। রাঢ়ের ইহারা প্রাচীন অধিবাসী। আদম সুমারী হইতে জানা যায়, এই উভয় জাতি একত্রিত সমষ্টি, বাঙ্গালার যে কোনও জাতি হইতে অধিক

হইবে। রাঢ়ের সৎগোপেরা এক্ষনে বিদ্যা বুদ্ধি ও ধনেও সমুন্নত জাতি। অযোধ্যায় শালি ধানের চাসও নাই। সে স্থান ছাতু ভুট্যা ও মকাইর দেশ।

বিষ্ণুর গোপবেশ। ভারতের সর্ব্বত্র বিষ্ণুর রাজ বেশেই পূজা হইয়া থাকে। দাক্ষিনাত্যে শ্রীকৃষ্ণের রাজ বেশেই পূজা হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় কেবল শ্রীকৃষ্ণের গোপ বেশেই পূজা হয়। এখানে তিনি দ্বিভুজ মুরলীধর রাধানাথ। এই মূর্ত্তি বাঙ্গালীর নিজস্ব। কৃষ্ণোন্যঃ যদু সম্ভূতঃ যস্ত ব্রজেন্দ্র নন্দনঃ বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদ মেকং'ন গচ্ছতি।" একথা বাঙ্গালীর লেখা। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বৃন্দাবন ধাম আবিষ্কার করিয়া সেখানে রাধা কৃষ্ণের যুগল মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি রাজপুতনার যাবতীয় ভক্ত মন্দিরে, রাধাকৃষ্ণের যুগল মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ মছলি খাতাহায়" বলিয়া হিন্দুস্থানে ঘৃণিত, সেই মৎস্য-ভোজী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণই, রাজপুতনার যাবতীয় কৃষ্ণমন্দিরের পুজারি ব্রাহ্মন এখনও আছেন। একথা প্রবাসী" নামক পত্রিকাতে ও একজন আলোচনা করিয়াছেন। কালিদাসের সময়ের রাঢ়ীয় জনমণ্ডলী, শ্রীকৃষ্ণের রাজবেশ ছাড়াইয়া, তাহাকে ধরা চূড়া পরাইয়া রাখাল বেশে সাজাইতে ছিলেন। জয়দেব তাঁহাকে দোলমঞ্চে তুলিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁহাদের শ্রীবৃন্দাবনে রাস মণ্ডপে বসাইয়া আসিয়া ছিলেন।

বৈষ্ণব সাহিত্য। কালিদাসের সাহিত্য পরিবর্ত্তিত করিয়াই বৈষ্ণব সাহিত্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। জীব গোস্বামী প্রভৃতি প্রতিভান্বিত পুরুষেরা, কালিদাসকে ঘরের লোক জানিয়াই, তাঁহার গ্রন্থ পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। বৈষ্ণব নাটকে গ্রন্থকার নিজেই সূত্রধার। সূত্রধার নিজেই বলিতেছেন আমার বিরচিত বিদগ্ধ মাধব নাটক আমি অভিনয় করিতেছি। গ্রাম্য ছড়ায় দেখিতে পাই দামোদর সুতারের পো" পেট কো কালিদাসই সূত্রধার সাজিয়া ছিলেন এবং অভিজ্ঞান শকুন্তল অভিনয় করিয়াছিলেন।

তালীবন জয় না করা। নিজের স্বদেশ অন্য জাতি আসিয়া জয় করিল একথা কেহ কখনও বলিতে পারে না। কলিদাস সুহ্ম বা পাড়ুলে জয় করা লিখিলেন, বঙ্গ বা নবদ্বীপ জয় করা লিখিলেন, কিন্তু রঘু যে তালীবন শ্যাম দেশ বা রাঢ় জয় করিলেন, তাহা লিখিলেন না

কেন? পৌরস্ত্যানেব মাক্রামান, স্তাংস্তান জন পদান জয়ী। প্রাপ তালীবন শ্যাম মুপকণ্ঠং মহোদধেঃ।" তিনি অনেক জনপদ আক্রমণ করিয়া জয় করিয়া তালীবন শ্যাম দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তালীবন শ্যাম দেশ আক্রমনও করিলেন না এবং জয়ও করিলেন না। তালীবন শ্যাম-দেশে কি মানুষ ছিল না? তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জনপদে মনুষ্য ছিল, আর মধ্যবর্ত্তী জনপদে—তালীবন শ্যাম দেশে—মনুষ্য ছিল না—এইরূপ হইতে পারে না। তবে তিনি কি দিগ্বিজয়ী আলেকজ্যাণ্ডারের মত, মগধের দ্বারে আসিয়া মগধ জয় না করিয়া অন্য দেশ জয় করিতে চলিয়া গেলেন! এই তালীবন শ্যাম এই ছয়টি অক্ষরের মধ্যে কালিদাসের স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির, অনন্ত আত্মীয়তা ঢালা আছে।

৩য় কারণ। (সামাজিকতা) কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন একথা বলিলে বুঝাইল বাঙ্গালী একটি জাতি। "নিত্যানেক সমবায়িনী জাতি।" ইতর অপেক্ষা বিশেষত্বই জাতিত্ব।

কালিদাস ও তাহার কাব্যের নায়কগণ আচারে এবং ব্যবহারে বাঙ্গালী ছিলেন।

বেশ। পুরুষের আচার ব্যবহার সত্বর বিকৃত হয়,। কিন্তু স্ত্রীলোক আচার ব্যবহার সত্বর বিকৃত হয় না—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী জাতি বিলাতে না গিয়াও হাট কোট পড়িতেছে, কিন্তু সেই বাঙ্গালীর স্ত্রীলোকেরা এখনও সাড়ী পড়িতেছে। স্ত্রী জাতি ঘোরতর স্থিতিশীল, একথা অবিষম্বাদী সত্য। কালিদাসের সময়ের স্ত্রীলোকেরা কিরূপ বেশ পরিধান করিতেন এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাউক।

উমা ও রতি একখানা সাড়ী গাঙ্গ্য রাষ্ট্রের মেয়েদের মত করিয়া পরিতেন, যাহা সামান্য একটু উত্তেজনা হইলেই বেআবরু হইয়া যাইত। পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েদের মত নহে, তাহাদের আবরণ সহজে নষ্ট হয় না। চচাল বালা স্তন ভিন্ন বল্কলা" বিহ্বলা রতির অবস্থাত সহজেই—বসুধা লিঙ্গন ধূসর স্তনী" হইতে পারে, কিন্তু তিনি হিন্দুস্থানীদের মত কাঁচুলি পরা থাকিলে রতি "বসুধা লিঙ্গন ধূসর স্তনী" হইতেন না। এবং উমাও

"ইতো গমিষ্যাম্য ন বেতি ভাষিণী চচাল বালা স্তন ভিন্ন বল্কলা" হইতেন না। আর যদি উমা ও রতি বর্ত্তমান উজ্জয়িনীর মেয়েদের মত চৌদ্দ হাত কাপড় পড়িয়া কাছা দিতেন, তাহা হইলে তাহাদের এইরূপ অবস্থা হইলে কাপড় ইচ্ছা করিয়া ছিড়িয়া ফেলিতে হইত। উমাও রতি উভয়েই হিমালয় বাসিনী রমণী, তাহাদের শীতাবরক নাই, অলঙ্কারের দোষ পরিচ্ছেদে কালিদাসের নাম উঠা উচিৎ ছিল। ইহারই নাম "আত্মমত সেবা"। নন্দ নন্দন বাঙ্গালায় কোঁচা দিয়া কাপড় পরেন। যেমন হিন্দুস্থানে গিয়াছেন অমনি মাল-কোচা মারিয়াছেন। কবি ও চিত্রকরেরাও নিজের দেশের অনুরূপই চিত্র করিয়া থাকেন। শকুন্তলা যতদিন কণ্বের আশ্রমে ছিলেন তত দিন একখানি সাড়ীই পড়িতেন। তাহার পর তিনি যখন "ক্ষত্রিয়ানী" হইয়া রাজ সভায় চলিলেন, তখন "পরিধেহি ক্ষৌম যুগলং" একজোড়া কাপড় পরিলেন। লণ্ডনে যে অভিজ্ঞান শকুন্তলার অনুবাদের অভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে শকুন্তলা "গাউন" পরিয়াই রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রবিবর্ম্মার চিত্রে রমণীদের ও শকুন্তলার কাছা দেওয়া আছে।

আল্তা পরা। বাঙ্গালীর মেয়েরা অলক্তক রসে চরণযুগল রঞ্জিত করেন। ভারতের অন্যত্র এ ব্যবহার নাই। হিন্দুস্থানে মেহেদীর পাতা দিয়া হাত পা রঞ্জিত করা হয়।

"নিতন্ত লাক্ষারস রাগ রঞ্জিতা
নিতম্বিনীনাং চরনেষু নূপুরাঃ।"
"এলোচুলে বেনে বৌ, আলতা দিয়ে পায়,
নলোক নাকে কলসী কাঁকে জল আনতে যায়।"

কলসী কাঁকে। বেনে বৌত বাঙ্গালায় কলসী কাঁকে করিয়া জল আনিতে গেলেন, কিন্তু তিনিত হিন্দুস্থানে কলসী মাথায় করিয়া জল আনেন, কলসীর উপর কলসী তার উপর কলসী, তার উপর কলসী যেন ভোজ রাজ নন্দিনী ভানুমতী বাজি দেখাইতেছেন। বাঙ্গালার কলসীরা বড় ভাগ্যবান কবি কালীদাস তাহাদের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করিয়াছেন—

শ্লাঘ্যং নীরস কাষ্ঠ তাড়নং শতং শ্লাঘ্যং প্রচণ্ডাতপঃ
শ্লাঘ্যং পাকবিলেপনং পুনরিহ শ্লাঘ্যোতি দাহানলঃ।
যৎকান্তা কুচকুম্ভ বাহু লতিকা হিল্লোল লীলা সুখং
লব্ধং কুম্ভবর ত্বয়া নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে ॥

বাসর ঘর। বাঙ্গলা দেশে বিবাহান্তে একটি "বাসর ঘর" নামক চিরস্মরণীয় যামিনী আছে। বিবাহান্তে নব দম্পতি যখন তাঁহাদের নব বাসরে উপস্থিত হন, তখন সেই পল্লীর যাবতীয়া কুলাঙ্গনারা, সেই বাসরে উপস্থিত হইয়া, বরের সহিত নানাবিধ কৌতুক করিয়া থাকেন। ইহা একটি বাঙ্গালীর জাতীয় প্রথা, এই প্রথা ভারতের কুত্রাপিও নাই। কালিদাস "বাসর ঘরের" কৃত্রিম অনুবাদ করিয়াছেন "কৌতুকাগার"। কালিদাস কুমারের সপ্তম সর্গে-যে শিবের বিবাহের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পড়িলে যেন বাঙ্গালীর প্রাচীন যুগের বিবাহ প্রথা বলিয়া মনে হয়। পতি পুত্র বতী নারীদের প্রাধান্য, গায়ে হলুদ দেওয়ার পর লৌহ ধারণ— এক্ষণে কাজল-লতা, চারিটা কলার তের—তখন ছিল চারিটা স্তম্ভ। **শিলের উপর দাড় করাইয়া স্নান করান।** এয়োস্ত্রীরাই স্নান করাইবে। কাজল চোকে, কপালে তিলক, হাতে সূতা বাধা **দর্পণ ধারণ** এসমুদয় উমার বিবাহে হইয়াছিল। শিব যৌতুক পাইলেন বাঙ্গালীর মত রত্নাঙ্গুরী, অর্ঘ্য, মধুপর্ক ও বারানসীর জোর (ঘড়ি-ঘড়ির চেন তিনি গরিব বলিয়া পান নাই) শুভ দৃষ্টি হইয়া তবে হাতে হাতে বন্ধন হইল। কুষণ্ডিকায় তখন সপ্ত পদীর স্থানে ত্রিপদী গমন ছিল লাজ হোম, ধ্রুবতারা দর্শন, স্ত্রীআচার, পুরন্ধী-নাং প্রদীপ্তেতা গাঁগছড়া বাঁধা, বাসর-ঘর—ক্ষিতিবিরচিত শয্যা ত্রটী একটী বাঙ্গালার ভীষণ জাতীয় প্রথা,—মাটীতে শয্যা পাতিয়া বাসর-ঘর করা হইয়াছিল। নগরাজের অনেক সোণার খাট ছিল, এবং মণিরত্ন ও অনেক ছিল, **তবু তিনি বাঙ্গালীর মত মাটিতে বিছানা পাতিয়া শিবের বিবাহের বাসর ঘর করিয়াছিলেন।** এই এক কথায় কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন। তাহার প্রমাণ হইল। আমি বাঙ্গালী আমার বাপ চৌদ্দপুরুষ বাঙ্গালী, তবু

আমি জানিতাম না যে বাসর ঘরে মাটীতে বিছানা করিতে হয়। সোণার খাটে বিছানা করিতে নাই। এ অসাধারণ প্রথা একজন বৈদেশিকের জানার সম্ভাবনা নাই। "ক্ষিতি বিরচিত শয্যাং কৌতুকা গারমাগাৎ" এই এক চরণেই কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন প্রমাণ হইল।

ফুলশয্যা। "কদা কাণ্ডাগারে পরিমল মিলৎ পুষ্প শয়নে" "কুসুমান্ত বনে ক্লমাপহেত্র' নবকুসুমিতা চ্যুত লতিকা' ফুলশয্যাটা কালিদাসের কেন সকল বাঙ্গালীরই চির জীবনের জন্য মনে থাকে।

গর্ভ দোহাদ। বাঙ্গালীর মেয়েরা গর্ভাবস্থায় পাতলা খোলা খায়। ইহাও কোনও দেশেই নাই। পাহারে মাটিতে এইরূপ পাতলা খোলা হয় না। কে যুবতী রসবতী খোলানিবি আয় লো"

ইংরাজ-জায়ারা খড়ি খায়।

পাদ গ্রহন। পাদাভি বন্ধন ও বাঙ্গালীর নিজস্ব। ক্ষত্রিয়ের মাথা এত নিচু হয় না। ক্ষত্রিয়দের আচার দেখিয়া ব্রাহ্মণ শাসিত বাঙ্গালা বলিয়াছে "নমন্তি• ফলিনোবৃক্ষা নমন্তি গুনিণো জনাঃ শুষ্কো কাষ্ঠশ্চ বৃক্ষশ্চ ভিদ্যতে নচ নম্যতে।" শুষ্ক বৃক্ষস্বরূপ ক্ষাত্র শাসিত সমাজ নত হইতেই জানে না ভ্রাতৃ বধুর পাদ গ্রহণ একে বারে অসম্ভব।

এই আমার শেষ!!! কালিদাসের বাঙ্গালীত্বের পক্ষে, এই তিনটী কারণ যথেষ্ট। বস্তু-বিদ্যা শব্দ-বিদ্যা, কাব্য-শাস্ত্রে এবং মনস্তত্বের এই কয় শাস্ত্রের দিক দিয়া আরও পোনের রকম কারনাবলী বলিতে বাকী থাকিল বলিবার আর আবশ্যক মনে করি না। কালিদাসের গ্রন্থাবলীর এই আট বর্ষের আলোচনায় যে তত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই সম্পূর্ণ লিখিতে বা আমার আঠারটী কারণ লিখিতে ৩৬ ফর্মার একখানি ছাপান পুস্তক হইবে। কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন,—একথা প্রমাণ করিতে প্রথম তিনটী কারণই যথেষ্ট।

গ্রীষ্মঋতুতে বর্ষারম্ভ-সৌর মানে মাস গনণা, অযোধ্যার নাম উল্লেখ না করা, গাঙ্গ রাষ্ট্র হইতে দিগ্বিজয় যাত্রা ও আসামে প্রতিনিবৃত্তি, তালীবন জয় না করা ভাগীরথীর উল্লেখ গোপ জাতীয়ের দর্শন লাভ, এবং মাটীতে বাসর ঘর রচনা —বর্ণনা করায় আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি মহাকবি কালিদাস রাঢ় নিবাসী ভট্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন।

আপনারা সুবিচার করিয়া চিন্তা করিয়া আমায় ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞা না করিয়া মীমাংসা করিবেন। আপনারা বাদ নিরস্ত করিবেন, "বাদী নিরস্ত করিবেন না। কালিদাসের গ্রন্থে উক্ত পাদ গ্রহণ প্রথায় আমায় কারনানুসন্ধান নিবৃত্ত হইয়াছে। আমিও আপনাদের পদ গ্রহণ করিয়া আমার বক্তব্য হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

নিবেদক—

শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ।

শরৎলক্ষ্মী।

ইমন-কল্যাণ—দাদ্‌রা।

উরিছ বঙ্গে শরৎলক্ষ্মী
—জাগিছে মা নব ছন্দ সুর;
সুনীল অভ্র সুশ্যাম ক্ষেত্র,
—চিত্রে ভরিছে পরাণপুর।
শুভ্র পাপ্‌ড়ি লোহিত বৃন্তে
ফুটিল শেফালি পেরেছি চিন্‌তে
মধুর গন্ধ শত আনন্দ
—দেবলোক আজ নহে সুদূর।
কাশের চামর ঢুলে সর্ সর্
কুঞ্জ কুসুমে অগুরু বাস,
কনক-আঁচল করে ঝল্ মল্
—মা! তোর্ বদনে বিমল-হাস

অমল ইন্দু কিরণ-দীপ্তি
জ্বালে মণি দীপ প্রাণের তৃপ্তি
সুখের সদ্ম চরণ-পদ্মে
—ভকত-হৃদয় হতেছে চুর ॥

রচনা—শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

আস্থায়ী।

১ ০ ১ ০
II { র্সা র্সা র্সা। র্সা -া র্সা I মা না না। ধা -া ধা I
উ রি ছ ব ঙ্ গে শ র ত ল ক্ষ্ মী

১ ০ ১ ০
I পা পা পা। নাঃ ধাঃ ধা I পা -া ঋা। গা -া -া I
জা গি ছে মা ॰ ন ব ছ ন্ দ সু ॰ র্

১ ০ ১ ০
I রা গা রা। গা -া মা I গা রা রা। ন্া -রা সা I
সু নী ল অ ॰ ভ্র সু শ্যা ম ক্ষে ॰ ত্র

০ ১
সা -রা গা। ঋা ঋা ঋা I গা ঋা ধা। -পা -া -া } II
চি ॰ ত্রে ভ রি ছে প রা ণ পু ॰ র্

অন্তরা।

১´ • ১´ •

II { পা -া গা। পা -া ধা I র্সা র্সা র্সা। র্সা -া সা I

শু • ভ্র পা প্ ড়ি লো হি ত বৃ ন্ তে

১´ • ১´

I র্সা র্রা র্রা। র্রা র্রা র্রা I র্সা র্রা র্গা। র্গা -া র্গা } I

ফু টি ল শে ফা লি পে রে ছি চি ন্ তে

১´ • ১´ •

I র্গা র্পা র্পা। র্রা -া র্রা I র্সা র্রা র্সা। না -া ধা I

ম ধু র গ ন্ ধ শ ত আ ন ন্ দ

১´ • ১´ •

I পা ধা না। না না র্সা I ধা না র্রা। র্সা -া -া II

দে ব লো ক আ জ ন হে সু দূ • র্

সঞ্চারী।

১´ • ১´ •

II { পা গা গা। পা পা -ধা I র্সা র্সা -া। র্সা০ -০ র্সা০ -০ I

কা শে র চা ম র্ দু লে • স র্ স র্

১´ • ১´ •

I র্সা -া র্রা। র্রা র্রা র্রা I র্সা র্রা র্গা। র্গা -া -া I

কু ঞ্জ্ জ ফু ল যে অ গু রু বা • স্

১´ ● ১´
I গা´ পা´ পা´। র্রা´ র্রা´ -া I র্দা´ র্রা´ সা´। -না ধা -া I
ক ন ক আঁ চ ল ক রে ঝ ল্ ম ল্

১´ ● ১´ ●
I পা ধা -া। না না সা´ I ধা না র্রা´। সা -া -া } I
মা তো র্ ব দ নে বি ম ল- হা ০ স্

আভোগ।

১´ ● ১´ ●
I { গা গা গা। পা -া ধা I সা´ সা´ সা´। সা´ -া সা´ I
অ ম ল ইঁ ন্ -দু কি র ণ- দী প্ তি

১´ ০ ১ ●
I সা´ র্রা´ র্রা´। র্রা´ র্রা´ -া I সা´ র্রা´ গা। পা -া গা´ } I
আ লে ম ণি দী প্ প্রা ণে র তু প্ তি

১´ ০ ১´ ●
I গা´ পা´ পা´। র্রা´ -া র্রা´ I সা´ র্রা´ সা´। না -া ধা I
সু খে র স দ্ য চ র ণ- প দ্ মে

১´ ● ১´ ●
I পা ধা না। না সা´ -া I ধা না র্রা´। সা´ -া -া IIII
ভ ক ত- হৃ -দ য় হ তে ছে চু র্

সাহিত্য-সভার

একবিংশ বার্ষিক চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

১৬ই শ্রাবন ১৩২৭ সাল। ১লা আগষ্ট ১৯২০। রবিবার অপরাহ্ন ৬ঘটিকা।

১। উপস্থিত সভ্যগণের নাম :—

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ ২। কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাবিনোদ; ৩। যতীন্দ্রনাথ দত্ত; ৪। শশীভূষণ দাস; ৫। রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার; ৬। রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর এম. বি; ৭। মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ; ৮। অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়; ৯। নগেন্দ্রনাথ রায়; ১০। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; ১১। কৃষ্ণদাস বসাক; ১২। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়; ১৩। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন এম, এ; ১৪। ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; ১৫। দুর্গাদাস লাহিড়ী; ১৬। নগেন্দ্রনাথ নাগ; ১৭। গোবিন্দলাল মল্লিক, ১৮। প্রবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

২। শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের সমর্থনে এবং উপস্থিত সভ্যমহোদয়গণের অনুমোদনে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার সাহিত্য সুধাকর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

৩। সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পঠিত ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত গ্রন্থোপহার দাতা মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল :—

গ্রন্থের নাম	উপহার দাতার নাম
১। The Science Association and its founder.	Rai Dr, Chunilal Bose Bahadur I. S O. M. B. F. C. S.
২। Some Common Food stufls.	Do

৫। অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় রচিত "কালিদাস গীতি" শীর্ষক সঙ্গীত গীত হইল। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্তমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ কবিভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক "কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন" শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হইল।

৬। সমালোচনা প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু মহাশয় বলেন যে, বিশ্বাস্য বাহ্য প্রমাণের অভাবে কালিদাসের বাঙ্গালিত্ব আভ্যন্তরিক প্রমাণ দ্বারাই যতদুর সম্ভব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কালিদাসের গ্রন্থের ভাষা ও শব্দ ব্যবহার এই জাতীয় প্রমাণের একটী সহায়ক। অদ্যকার প্রবন্ধে কাব্যতীর্থ মহাশয় ভাষার আলোচনার দ্বারা তাঁহার মত প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন, সেই জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র তবে তাঁহার প্রমাণ সম্বন্ধে দুই একটি-কথা বলিবার আছে। তিনি কালিদাসের ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষায় যে সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন তাহা কোন্ সময়ের বাংলা ভাষা তাহা প্রথমে নির্ণয় করা উচিত প্রবন্ধ লেখক নিজেই বলিয়াছেন যে কালিদাস ৫ম শতাব্দীর লোক, কারণ আচার্য্য দণ্ডী তাঁহার প্রায় সমসাময়িক। প্রবন্ধ লেখক মহাশয় কালিদাসের সংস্কৃত শ্লোকের যে বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান মার্জ্জিত বাংলা কিন্তু কালিদাসের সময় বাঙ্গালা ভাষা এরূপ ছিল কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। বোধ হয় ৯ম শতাব্দীর পূর্ব্বের লিখিত বাংলা এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অতি প্রাচীন বাংলা বর্ত্তমান মার্জ্জিত বাংলা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সুতরাং প্রবন্ধ লেখক ভাষা সমতা হিসাবে যে প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার উপর অধিক আস্থা স্থাপন করা যায় না। বিশেষতঃ অনুস্বার ও বিসর্গই তুলিয়া দিয়া রামায়ণ, মহাভারত গীতা প্রভৃতি অনেকানেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেরই বর্ত্তমান মার্জ্জিত বাংলায় ভাষান্তরিত করিতে পারা যায়; কিন্তু সেই জন্য বাল্মিকী বেদব্যাস প্রভৃতিকে বাঙ্গালী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না। তাঁহার মনে হয় যে, এই প্রবন্ধ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিলে ভাল হয়, কারণ তাহা হইলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মনীষীগণ এ বিষয়ের আলোচনা এবং প্রমাণ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার সুবিধা পাইবেন।

৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন এম. এ, মহাশয় বলেন যে, কাব্যতীর্থ মহাশয় যে বিষয় আলোচনা করিতেছেন তাহা বাঙ্গালী জাতীর পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। অদ্য কেবল ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। আচার্য্য দণ্ডীর মতে কালিদাস তাঁহার রচনায় বৈদর্ভী রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, অথচ বিদর্ভ দেশবাসী ভবভূতির রচনা বৈদর্ভী রচনা নয়। কালিদাস বাঙ্গালী হইলে তাঁহার রচনার গৌড়ীর রীতি অনুসৃত হইত; ইহা তাঁহার মনে হয়।

৮। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় বলেন যে অতি অল্প কথায় এ বিষয়ের আলোচনা করা অসম্ভব। শ্রীযুক্ত পঙ্কোজকুমার চট্টোপাধ্যার মহাশয় "সাহিত্য" সংবাদে" প্রবন্ধ লেখকের প্রমাণ সমূহের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বেদের মন্ত্র ও অনেক সময় শব্দ পরিবর্ত্তন না করিয়া এইরূপ মার্জ্জিত বাঙ্গালায় অনুবাদ করা যায়, তা বলিয়া বেদের সহিত বাংলা ভাষার সমতা স্থাপন করিবার চেষ্টা সঙ্গত নহে। প্রবন্ধ লেখক কর্ত্তৃক উক্ত ধনকেতু রাজার ভিটা, যক্ষের স্থান প্রভৃতি বাঙ্গালা দেশ নবদ্বীপে অবস্থিত আছে বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও কালিদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন এরূপ সন্দেহ করিবার অবকাশ আছে। বহু পণ্ডিত যদি একত্রিত হইয়া ইহার গবেষণা ও আলোচনা করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। যদ্যপি কালিদাস বাঙ্গালী বলিয়া প্রমানিত হয় তাহা হইলে বাঙ্গালার বিশেষ গৌরব।

৯। তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলেন যে আমি প্রবন্ধ পাঠক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ব্রাহ্মণীতলায় যখন প্রথম এই বিষয়ের আলোচনার জন্য সভা হয়, তখন সভাপতি স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় অজিত-নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় এই প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন। স্বর্গগত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত অদ্বিতীয় পণ্ডিত যখন প্রবন্ধ লেখকের প্রমাণ সম্বন্ধে অনুকূল মতদিয়াছেন, তখন ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। ইউরোপে সেকস্‌পীয়ার সম্বন্ধে বহু আলোচনা চলিতেছে কিন্তু সেকস্‌পীয়ার সম্বন্ধে কেহ এখনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কালিদাস সম্বন্ধেও এইরূপ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। প্রবন্ধ পাঠক মহাশয় যেরূপ আন্তরিকতার

সহিত এরূপ আলোচনা করিতেছেন, সে জন্ত আমি বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বাঙ্গালা ভাষা হইতে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, এমত সমীচীন নহে। প্রবন্ধ পাঠক মহাশয় যে রূপ কালিদাসের কবিতার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ঐরূপ ভাবে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন ও কাব্য প্রায় সমস্তই বর্ত্তমান মার্জ্জিত বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে পারা যায়। কিন্তু কালিদাসের সমসাময়িক বাংলা ভাষার অবস্থা ঠিক জানিতে না পারিলে এ প্রমাণের বিশেষ কোন মূল্য নাই।

১০। অতঃপর সম্পাদক মহাশয় বলেন সাহিত্য সভার পক্ষ হইতে অদ্যকার সভার শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয়কে আমি আন্তঃরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি অসুস্থ শরীর লইয়াও যে সাহিত্য সভার প্রত্যেকে মাসিক অধিবেশনে যোগদান করেন; ইহা সভার প্রতি তাঁহার অনুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় এবং ইহার জন্য "সাহিত্য সভা" তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। সভাপতি মহাশয়ের রচিত "কালিদাস গীতি" নামক—সঙ্গীতের রচনার প্রশংসা করিয়া সম্পাদক মহাশয় গায়ক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় মহায়কে সভার পক্ষ হইতে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

১১। যথারীতি সভাপতি মহাশয়ের ধন্যবাদের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীচুণিলাল বসু। শ্রীঅমৃত লাল বসু।

সম্পাদক। ৫।৯।২০. সভাপতি।

সাহিত্য সভার একবিংশ বার্ষিক পঞ্চম মাষিক অধিবেশন।

২০শে ভাদ্র ১৩২৭ সাল সাল। ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ

রবিবার অপরাহ্ণ। ৫॥০ ঘটিকা।

১। উপস্থিত সভ্যগণের নাম ঃ—

১। শ্রীযুক্ত রায় ডাঃ চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি,।

২। পণ্ডিত রাম সহায় বেদান্ত শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ, ৩। নগেন্দ্রনাথ নাগ, ৪। অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়, ৫। রামলাল সরকার, ৬। কবিরাজ বসন্তকুমার গুপ্ত, ৭। রায় সাহেব বিহারী লাল সরকার, ৮। অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু, এম, এ, ৯। ললিত মোহন দাস গুপ্ত, ১০। কবিরাজ গিরিজা প্রসন্ন সেন

বিদ্যাবিনোদ ইত্যাদি, ১১। যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ১২। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু, ১৩। জগবন্ধু মোদক, ১৪। পুলীনবিহারী ভট্টাচার্য্য, ১৫। প্রবোধ কুমার রায়, ১৬। কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ, ১৭। কুমার প্রকাশ কৃষ্ণদেব বাহাদুর ১৮। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯। নন্দকিশোর মিত্র. ২০। সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, ২১। হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২২। প্রভাতচন্দ্র বসু, ২৩। কবিরাজ কালীভূষণ সেন, ২৪। যতীন্দ্রনাথ দত্ত, ২৫। গোবিন্দলাল মল্লিক, ২৬। প্রবোধ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

২। রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও কুমার প্রকাশ কৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ, মহাশয়ের সমর্থনে নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

৪। পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক গমনে শোকপ্রকাশ উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় বলেন—শাস্ত্রী-মহাশয়ের সহিত আমি ব্যক্তিগত ভাবে বিশেষরূপে পরিচিত ছিলাম। তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত—ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা ও কথোপ-কথন করিতে আমি অতি অল্পলোককেই দেখিয়াছি। তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য সর্ব্বজন বিদিত। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তির অভাব অনুভব করিতেছি।

৫। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলেন—শাস্ত্রী মহাশয় অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি কোদালিয়ায় বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য বংশ সম্ভূত ছিলেন। এই বংশ প্রায় ৮০ বৎসর যাবৎ ৺কাশী-ধামে বাস করিতেছেন। তিনি কাশীতে সংস্কৃত ভাষা ও দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি অতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স অত্যন্ত অল্প ছিল সেই সময়ে কাশীতে ইঁহার মতন পণ্ডিত ব্যক্তি খুব কমই ছিল। তাঁহার অভিভাবকগণ ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন তজ্জন্য তিনি কাশী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী শিক্ষা করেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষা বোর্ডের [illegible] শাস্ত্রের উপাধী পরীক্ষায় অতি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

তিনি সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় অনর্গল ভাবে বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার অশিতীবর্ষ বয়স্কা বহুগুণবতী মাতা-ঠাকুরাণী আজিও বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার দুঃখ অবর্ণনীয়। তাঁহার অসাধারণ মাতৃভক্তি সকলের অনুকরণীয়। যদিও তিনি অতি অল্প বয়সে পত্নী হারাইয়াছিলেন। তথাপি আর তিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই।

৬। রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলেন; আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত বহুকাল পরিচিত। তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য সর্ব্বজন বিদিত। অতঃপর তিনি নিম্নলিখিত শোকপ্রকাশক প্রস্তাবটী তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিজনবর্গের নিকট প্রেরিত হউক বলিয়া প্রস্তাব করেন।

শোকপ্রকাশ।

"সাহিত্য সভা—পণ্ডিত প্রবর হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বহুকাল সাহিত্য সভার সহিত বিশেষ ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি সাহিত্য সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন এবং এই সভার উন্নতির জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তিনি প্রথমতঃ বিস্পস্ কলেজে; তৎপরে সেণ্ট্‌জেভিয়ায় কালেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন এবং হাইকোর্টের পণ্ডিত জজ্ স্যার জন্ উড্রফের গৃহ শিক্ষক ছিলেন। তন্ত্র শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথোপকথন করিতে পারিতেন এবং তাঁহার সংস্কৃত আবৃত্তি অতি সুন্দর ও বিশুদ্ধ ছিল। তিনি সুন্দর সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তিনি "ভারতের শিক্ষিতা মহিলা" নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই প্রস্তাবের একখণ্ড প্রতিলিপি তাহার শোক সন্তপ্ত পরিজন বর্গের নিকট প্রেরিত হউক।

৭। অধ্যাপক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ, মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন উপলক্ষে বলেন—শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার বহুদিন পরিচয় ছিল। তিনি কাব্য ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি একবার

আমাদের কালেজের পণ্ডিতের পদ প্রার্থী হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি তাহাকে বরাবরই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম। আমি রায় বাহাদুর মহাশয়ের শোক প্রস্তাবের আন্তরিক সমর্থন করিতেছি।

৮। নিম্নলিখিত গ্রন্থোপহার দাতৃ মহাশয়গণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

পুস্তকের নাম	পুস্তক প্রণেতার নাম	উপহার দাতার নাম।
১। পল্লী-স্বাস্থ্য	শ্রীচুণীলাল বসু	শ্রীচুণীলাল বসু।
২। আত্মতত্ত্ব বিবেক ও মাতৃসঙ্গীত	শ্রীকৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীনারায়ণ চন্দ্র। বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। Bulletion	Univercity of Washington	(April 1920.)

৯। অতঃপর পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত রাম সহায় বেদান্ত শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ মহাশয় "আয়েষা ও তিলোত্তমা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

১০। সমালোচনা প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধটীর ভাষা যেরূপ সুললিত ও সুমার্জ্জিত, ভাব সৌন্দর্য্যও সেইরূপ পরিপুষ্ট। প্রবন্ধ লেখক মহাশয় অতি নিপুণ ও সূক্ষ্ম ভাবে "আয়েষা ও তিলোত্তমার" চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আয়েষাও তিলোত্তমা দুইজনে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দিক দিয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আয়েষার প্রণয় মানবের প্রণয়নয় তিনি প্রণয়ে দেবী। তিলোত্তমার আদর্শ সংসারে অনেক সময়ে মিলিতে পারে কিন্তু আয়েষার আদর্শ বিরল। যেরূপ নিজের সুখ ও স্বার্থ প্রেমাস্পদকে সুখী করিবার জন্য বলি দিয়াছিলেন, তাঁহার দৃষ্টান্ত জগতের প্রেমের ইতিহাসে দুর্ল্লভ। তাহার বৈচিত্র পূর্ণ কর্ম্ম জীবন চরিত্রের দৃঢ়তা এবং অলোক সামান্য কর্ত্তব্য নিষ্ঠা তাঁহার প্রেমকে স্বর্গের সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছিল। তিনি সাহিত্য সভার পক্ষ হইতে প্রবন্ধ লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়াছিলেন। হীরকাঙ্গুরী সম্বন্ধে তিনি বলেন, যে হীরক প্রকৃত বিষাক্ত পদার্থ নহে। তবে হীরকচূর্ণ কাচ খণ্ডের ন্যায় ধারাল বলিয়া উদরের মধ্যে আঘাত প্রদান করিয়া প্রাণনাশ করিতে পারে। জহর ও "জহওরয়ার" দুইটী শব্দ, প্রথমটীতে বিষ বুঝায় এবং দ্বিতীয়টী

হীরকের ন্যায় মূল্যবান মণি বুঝায়। এই শব্দের উচ্চারণ প্রায় একরূপ বলিয়া অনেক সময়ে অর্থ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে।

১১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ, মহাশয় বলেন—প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নহেন, তিনি একজন রসজ্ঞ ও কবি। লেখক নিজে একজন কবি। সেই জন্য তিনি কাব্যের রস বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিয়াছেন কিন্তু প্রবন্ধ পাঠক মহাশয় সংস্কৃত ও অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে এবং সংস্কৃত কাব্য হইতে উপমা দিয়া বঙ্কিম বাবুর চিত্রিত নায়িকা চরিত্রের সহিত ভারতীয় নায়িকার যে সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন তাহা অতি উপদেয় ও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা দ্বারা বোধ হয় বঙ্কিম বাবুর পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ করিবার কলঙ্ক ক্ষালন হইবে। প্রবন্ধের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পাঠ্য তালিকার অন্তর্গত সুতারাং এই প্রবন্ধটী ছাত্রগণ পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবে। আয়েষা চরিত্রের আর একটী বিশেষ সৌন্দর্য্য কর্ত্তব্য নিষ্ঠা। যখন পাঠান রাজত্ব অবসান হইবার উপক্রম যখন নবাব কওসু খাঁ মৃত্যু শর্য্যায় শয়নে সেই মহাবিপদের সময়েও তিলোত্তমার চরিত্রে যাহাতে কলঙ্ক না স্পর্শে সেজন্য মরণোন্মুখ পিতাকে অনুরোধ করিয়া জগৎ সিংহকে তিলোত্তমা যে সতী—তাহা বলাইয়াছিলেন। প্রেমের ইতিহাসে এরূপ উদারতা বিরল।

১২। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলেন—আজ একজন মহাকবির কাব্যের সমালোচন একজন পণ্ডিত করিয়াছেন, তদুপরি আজ সভাপতি মহাশয় একজন বিখ্যাত কবি, আজ প্রবন্ধ পাঠক মহাশয় যেরূপ আয়েষা ও তিলোত্তমার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে অনেকে বলেন যে বঙ্কিম বাবু "আইভান হো" হইতে "রেবেকা" চরিত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য প্রবন্ধ পাঠক মহাশয় সংস্কৃত কাব্য হইতে যাহা দেখাইয়াছেন তহোতে ঐ মত খণ্ডন করা হইয়াছে। অবশ্য বঙ্কিম বাবুও তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে তিনি ঐ গ্রন্থ লিখিবার পূর্ব্বে "আইভান হো" পাঠ করেন নাই। আমি বলি যদি তিনি "আইভান হো" পাঠ করিয়া থাকিতেন তাহা হইলেও বিশেষ কিছু দোষ হয় নাই। কারণ তিনি রেবেকা চরিত্র অপেক্ষা তাঁহার অঙ্কিত চরিত্র অধিকতর উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কারণ তিনি পাশ্চাত্য কবিগণের অপেক্ষা কম প্রতি

ভাশালী ছিলেন না বরং অধিক প্রতিভান্বিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবু বলিয়াছিলেন যে—অনূঢ়া কিশোরীর প্রেম আমাদের প্রাচীন ভারতে ছিল, কিন্তু আমি ঐ মত সমীচীন বলিয়া মনে করি না। হোমর টেনিসন্ মিলটন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণের কাব্য ও পরস্পর সাদৃশ্য মূলক।

১৩। অতঃপর; সভাপতি মহাশয় বলেন যে, এই প্রবন্ধটী অতি সুন্দর ও মধুর; ইহা কঠোর শুষ্ক প্রবন্ধ নয়; ইহা যেন একটী সুমধুর গান। তাঁহার বিবেচনায় এই প্রবন্ধের ভাষা সংস্কৃত মূলক হওয়াতে ইহা অতি মধুর হইয়াছে। এই উক্তি দ্বারা যাঁহারা কথোপকথনের ভাষা সাহিত্যে চালাইতে চাহেন; আমি তাঁহাদের মতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিতেছি না। যেমন আমাদের আট-পৌড়ে কাপড়ের ও প্রয়োজন আছে; কিন্তু স্থল বিশেষে পোষাকি কাপড় পরিবার ও দরকার হয়। আমি এই প্রবন্ধটীকে উদাহরণ স্বরূপ করিয়া বলিতে পারি যে; ইহা সংস্কৃত মূলক হইলেও অতিশয় সুন্দর ও মধুর হইয়াছে। অতএব এই ভাষা পরিত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই। অঙ্গুরীর মধ্যে বিষরক্ষা কিংবা অন্যপ্রকার আত্মরক্ষায় অস্ত্র সঙ্গে রাখা অতি প্রাচীন ভারতে কেবল ভারতে কেন; সর্ব্বদেশেই প্রচলিত ছিল। আয়েষার প্রেমে গাম্ভীর্য্য; সরলতা ও মধুরতা অতি সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর বিলাতী আদর্শ গ্রহণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে গোবিন্দ দাসের যাত্রা ও ইটালীয়ান্ অপেরা একই ভাবে রচিত হইলেও একটী অপরটীর অনুকরণে লিখিত হয় নাই। প্রায়ই দেখা যায় যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতীয় মধ্যে, বিভিন্ন ভাষায় যে সকল প্রতিভাশালী লেখক জন্মিয়াছেন তাহাদের চিন্তা স্রোতের গতি প্রায় একরূপ। তাঁহাদের রচনা অনেক সময়ে এক ভাবের রচনা বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যে কাহারও অনুকরণ করিয়াছেন তাহা বলা সঙ্গত নহে।

১৪। রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে সভার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইবার পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচুনীলাল বসু
সম্পাদক।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ
সভাপতি।

সাহিত্য-সভার ১৩২৭ সালের

শাখা সমিতি।

১। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস সমিতি।

সভাপতি ঃ—

পদ শূন্য।

সভ্যগণ ঃ—

শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,
সি, এস, আই

" দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল।

" কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এম, এ।

" " প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।

" চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ।

" কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

" সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ।

" অক্ষয়কুমার মৈত্র বি, এল।

" রমাপ্রসাদ চন্দ এম, এ।

" কবিরাজ মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ।

সম্পাদক ঃ—

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

২। গণিত ও বিজ্ঞান সমিতি।

সভাপতি ঃ—

শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
কে, টি, এম, এ, ডি, এল ইত্যাদি।

সভ্যগণ ঃ—

শ্রীযুক্ত মাননীয় স্যার আশুতোষ চৌধুরী কে, টি, এম, এ, এল্;
এল্, বি, বার-এট্-ল।

" ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী স্কোয়ার বার-এট্-ল।

" মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন
এম, এ, এল, এম, এস।

" কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন
এম, এ, এম, বি।

" ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ এম, বি।

" " যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এল, এম, এস ;

" অধ্যাপক গিরীশচন্দ্র বসু এম, এ।

" রজনীকান্ত দে এম, এ, বি, এস, সি।

" অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস, সি।

" ডাক্তার অমিয়মাধব মল্লিক এম, বি।

" পণ্ডিত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ।

" " সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ।

" কুমুদবিহারী বসু এম, এ, বি, এল, বি, এস, সি।

সম্পাদক ঃ—

শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি রসায়নাচার্য্য।

৩। পারিভাষিক সমিতি।

সভাপতিঃ—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

সভ্যগণঃ—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।
" " কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি।
এম, এ, এল, এম, এস।
" রায় ডাঃ চুনীলাল বসু এম, বি রসায়নাচার্য্য।
" কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।
" কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এম, এ, এম, বি।

সম্পাদকঃ—

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস, সি।

৪। বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য।

সভাপতিঃ—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

সভ্যগণঃ—

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস, সি।
" কিরণচন্দ্র দে কোয়ার সি, আই, ই, আই, সি, এস।
" নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু।
" পণ্ডিত কৈলাশচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব।
" মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি
এম, এ, এল, এম, এস।

শ্রীযুক্ত কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।
,, ,, প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।
,, পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত
,, সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ সাহিত্যাচার্য্য।
,, কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন ভিষগ্‌রত্ন।
,, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
,, চণ্ডীচরণ মিত্র।
,, কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ দর্শন-নিধি।
,, বিদ্যাবিনোদ কাব্যভূষণ, আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর।
,, রসময় লাহা।

সম্পাদক :—

শ্রীযুক্ত রায় ডাঃ চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি রসায়নাচার্য

৫। সংস্কৃতভাষা সমিতি।

সভাপতি :—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

সভ্যগণ :—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।
,, ,, কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি
এম, এ, এল, এম, এস
,, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এম, এ, এম, বি।
„ পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন।
„ সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ।
„ মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ।
„ পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
„ কবিরাজ শ্যামদাস বাচস্পতি মহামহাধ্যাপক।
„ পণ্ডিত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ।
„ „ চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।
„ „ দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।
„ „ বহুবল্লভ শাস্ত্রী।
„ „ জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।
„ কবিরাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন।
„ „ হেমচন্দ্র সেন ভিষগ্‌রত্ন।
„ „ কালীভূষণ সেন কবিরত্ন।
„ „ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর দর্শন-নিধি।
„ মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী (দ্রাবিড়)।
„ পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

সম্পাদক ঃ—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

৬। দর্শন সমিতি।

সভাপতি ঃ—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

সভ্যগণ ঃ—

„ কবিসম্রাট পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।
,, মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী (দ্রাবিড়)।
,, ,, কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি
এম, এ, এল, এম, এস।
,, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এম, এ; বার-এট-ল।
,, অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস, সি।

সম্পাদক ঃ—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

৭। ইংরাজি সাহিত্য সমিতি।

সভাপতি ঃ—

শ্রীযুক্ত স্যার ডাঃ রাসবিহারি ঘোষ কে, টি, সি, আই, ই।

সভ্যগণ ঃ—

শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
কে, টি, সরস্বতী ইত্যাদি
,, কিরণচন্দ্র দে স্কোয়ার সি, আই, ই, আই, সি, এস।
,, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,
সি, এস, আই।
,, রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এম, এ, বি, এল।
,, রায় প্রিয়লাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম, এ, বি, এল।
,, মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী এম, এ।
,, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী স্কোয়ার বার-এট-ল।
,, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন
এম, এ, এল, এম, এস।

শ্রীযুক্ত কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এম, এ।
" " প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।
" কুঞ্জবিহারী বসু, বি, এ।
" মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল।
" অতুলচন্দ্র ঘোষ বি, এ।
" প্রিয়লাল দাস এম, এ, বি, এল।
" দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল।
" সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ।
" পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।
" রায় দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর বি, এ।
" রায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর।
" দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু স্কোয়ার বার-এট-ল।
" রায় মতিলাল হালদার বাহাদুর।
" নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
" নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু স্কোয়ার বার-এট-ল।
" শীতলপ্রসাদ ঘোষ বি, এল।

সম্পাদক ঃ—

শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ।

৮। পত্রিকা-সমিতি।

সভাপতি ঃ—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

সভ্যগণ ঃ—

" রায় ডাঃ চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, আই, এস, ও।
" কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।

শ্রীযুক্ত কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।

কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাবিনোদ দর্শন-নিধি।

সম্পাদক ঃ—

শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, বিদ্যাবিনোদ,
দর্শন-নিধি, আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকর

সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ কাব্যরত্ন।

৯। গ্রন্থপ্রচার সমিতি।

সভাপতি ঃ—

শ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

সভ্যগণ ঃ—

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর বি, এ।
" রাজা হৃষীকেশ লাহা বাহাদুর সি, আই, ই।
" মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
কে, টি ইত্যাদি।
" মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।
" স্যার ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ কেটি।
" মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন।
এম, এ, এল, এম, এস
" কুমার প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।
" কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।
" " প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।
" সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন ভিষগ্‌রত্ন।
" রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী।
" কুমার রায় মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর।
" মাননীয় কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।
" রাজা শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর।
" অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস, সি।
" কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাভূষণ কাব্যভূষণ, দর্শন-নিধি, আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকর।
" কালীভূষণ সেন কবিরত্ন।

সম্পাদক ঃ—

শ্রীযুক্ত রায় ডাঃ চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি রসায়নাচার্য্য।

১০। পুস্তকালয় সমিতি

শ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে, সি, আই, ই।

সভ্যগণ ঃ—

শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কে, টি, সি, আই, ই।
" কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।
" " প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।
" " প্রকাশকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।
" সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ।
" নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু।
" সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
" অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ঘোষ বি, এ।

,, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

সম্পাদক ঃ—

শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাভূষণ,
কাব্যভূষণ, আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকর, দর্শন-নিধি

"সবার ভিতর আমি।"

লোকে যখন বড়ই মোটে বল্‌বে না
তখন কর্‌তে হবে আপনাকে সবার চেয়ে বড়।
কেহই যখন আমার কথা শুন্‌বে না
তখন কর্‌তে হ'বে সকলকে হেথায় ডেকে জড়
বল্‌বে লোকে যতই তুলে পঞ্চমে
তাদের গলা নেই আদপে আমার গানে প্রাণ;
ততই আমি তুল্‌ব গলা সপ্তমে
চিৎকারেতে বধির হবে সাধারণের কান।
বল্‌বে লোকে "নকল নবীশ একজনা"
সমালোচক কঠোর প্রাণে কর্‌তে মোরে চুর;
বল্‌ব আমি শুহুন আমার কল্পনা
সকল কবির বীণায় শুনি বাজ্‌ছে আমার সুর।
প্রাচীন কবি আদিম যুগের অন্তরে
বর্ত্তমান পড়্‌ছি যাহা জাগি দিবস যামী,
বল্‌ব আমি আমার বুকের মন্তরে
আমার ব্যথায় সব ভরপুর সবার ভিতর আমি।

আসানসোল
২৯শে ফাল্গুন ১৩২৩ সাল।
} ভারতী—শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ

১৩২৭ সালের

কার্ত্তিক মাস হইতে পৌষ সংখ্যা "সাহিত্য সংহিতার"

সূচীপত্র।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবপর্য্যায়, ৪র্থ খণ্ড] ১৩২৭ সাল, কার্ত্তিক—পৌষ [৭ম—৯ম সংখ্যা

নব্যন্যায়শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন। *

পূজ্যপাদ গৌতম মুনি ন্যায়-দর্শন প্রণেতা; তিনি প্রমাণ-চতুষ্টয়বাদী, ইহা "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি" এই সূত্র দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে; প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই প্রমাণ-চতুষ্টয়। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া মহামতি গঙ্গেশোপাধ্যায় পরিচ্ছেদ-চতুষ্টয়াত্মক নব্য ন্যায়ের প্রণয়ন করিয়াছেন; প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় অনুমান পরিচ্ছেদ, তৃতীয় উপমান পরিচ্ছেদ, চতুর্থ শব্দ পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষের লক্ষণ স্বরূপ প্রামাণ্যাদি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনুমানের লক্ষণ স্বরূপ প্রামাণ্যাদি, তৃতীয় পরিচ্ছেদে উপমানের লক্ষণ স্বরূপ প্রামাণ্যাদি, চতুর্থ পরিচ্ছেদে শব্দ-প্রমাণের লক্ষণ স্বরূপ প্রামাণ্যাদি নিরূপিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমিতির কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ; প্রত্যক্ষ শব্দ উভয়বিধ ব্যুৎপত্তি দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ প্রমিতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উভয়বিধ ব্যুৎপত্তি এই:—প্রতিগতং বিষয়প্রতিবদ্ধং বিষয়সন্নিকৃষ্টং অক্ষং ইন্দ্রিয়ং—এই এক প্রকার ব্যুৎপত্তি; প্রতিগতং বিষয়প্রতিবদ্ধং বিষয়সন্নিকৃষ্টং অক্ষং ইন্দ্রিয়ং যস্মিন্ জ্ঞানে তৎ—এই অপর ব্যুৎপত্তি; "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং প্রত্যক্ষং" এই সূত্রদ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিষয়সন্নিকর্ষ অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ দুইরূপ—লৌকিক সম্বন্ধ ও অলৌকিক সম্বন্ধ। অব্যবহিত সমীপস্থিত বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ, ঐ সম্বন্ধ লৌকিক: এই লৌকিক সম্বন্ধ ছয় প্রকার—সংযোগ,

* সাহিত্য-সভার মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত সমবেত সমবায়, কেবল সমবায়, সমবেত সমবায় ও বিশেষণতা। ঘট পটাদি দ্রব্য প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় সংযোগ সন্নিকর্ষ, দ্রব্যগতরূপাদি প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ, রূপগত রূপত্ব নীলত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় সংযুক্ত সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ, শব্দ প্রত্যক্ষে কেবল সমবায় সন্নিকর্ষ। শব্দ আকাশের গুণ, আকাশে গুণের সম্বন্ধ সমবায়; কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্ননভোভাগ শ্রবণেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়াবচ্ছেদে শব্দ উৎপন্ন হইলে শ্রবণ তাহাকে গ্রহণ করে, তাহাতে সন্নিকর্ষ সমবায়। কোন দার্শনিকের মতে শব্দ বায়ুর গুণ অর্থাৎ শব্দের প্রতি বায়ুই সমবায়িকারণ, আকাশ নহে। তাঁহাদের যুক্তি এই—নির্ব্বাতদেশে অভিঘাত হইলেও শব্দের উৎপত্তি হয় না। যদি আকাশ শব্দের সমবায়িকারণ হইত, তাহা হইলে, নির্ব্বাত দেশে আকাশের বিদ্যমানতা আছে, তথাপি তদ্দেশে শব্দানুৎপত্তির কারণ কি? বায়ু সমবায়িকারণ হইলে তদ্দেশে বায়ুরূপ সমবায়িকারণের অসত্ত্ব নিবন্ধনই শব্দানুৎপত্তি হইয়া থাকে। তাঁহাদের এই যুক্তি আপাততঃ রমণীয় হইলেও পরিণামে উহার ভ্রান্তিমূলকত্বের উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভ্রান্তির কারণ এই—এক সময়ে কোন একদেশে শব্দ উৎপন্ন হইয়া সেই শব্দমূলক দেশান্তরে শব্দধারা উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই স্থলে বলিতে হইবে প্রথম শব্দ দ্বিতীয় শব্দের প্রতি কারণ। যদি তাহাই হইল, তাহা হইলে প্রথম শব্দ যে দেশে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা তদ্দেশীয় বায়ুতেই উৎপন্ন হইয়াছে, দেশান্তরে যে শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা দেশান্তরীয় বায়ুতেই উৎপন্ন হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে; কারণ—এক দেশের বায়ু সেই দেশকে নির্ব্বাত করিয়া দেশান্তরে চলিয়া যায় না। এক্ষণে দেশান্তরীয় বায়ুতে দেশান্তরীয় শব্দ যদি না থাকে, তাহা হইলে দেশান্তরীয় শব্দ দ্বারা দেশান্তরীয় শব্দ কিরূপে উৎপন্ন হইবে; যেহেতু, কার্য্যাধিকরণে অপ্রত্যাসন্ন বস্তুর কারণত্ব সম্ভাবনা নাই। অপর আপত্তি এই,—শব্দ আশ্রয় নাশ নাশ্য নহে, বায়ু আশ্রয় হইলেও শব্দের আশ্রয় নাশ নাশ্যত্বের সম্ভাবনা নাই; যেহেতু আশ্রয়ীভূত বায়ুর বিদ্যমানতাবস্থাতেই তৃতীয়ক্ষণে শব্দে বিনষ্ট হইয়া থাকে; অতএব অগত্যা শব্দকেই শব্দের নাশক বলিতে হইবে, অর্থাৎ দ্বিতীয় শব্দের দ্বারা প্রথম শব্দের নাশ, তৃতীয় শব্দ দ্বারা দ্বিতীয় শব্দের নাশ, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু বায়ু শব্দের আশ্রয় হইলে ইহার অনুপপত্তি ঘটিবে; যেহেতু ধ্বংস ও প্রাগভাব ইহাদের প্রতিযোগি-সমবায়িদেশে বৃত্তিত্বই নিয়ম। এইরূপ নাশ প্রতিযোগিরূপের সমবায়ি-

দেশ ঘটেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার প্রতিযোগি-শব্দের সমবায়িদেশেই উৎপন্ন হইবে ; যদি বায়ু শব্দের সমবায়িদেশ হয়, তাহা হইলে দেশান্তরীয় প্রথমাদি শব্দের নাশক কিরূপে হইবে? ভিন্ন দেশীয় কার্য্যোৎপাদের কারণ ভিন্ন দেশীয় বস্তু কদাচ হইতে পারে না। নির্ব্বাত দেশে শব্দ না হইবার কারণ কি? এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধান নৈয়ায়িকগণ এইরূপ করিয়া থাকেন যে,—শব্দের সমবায়ি-কারণ আকাশ, নিমিত্ত-কারণ বায়ু সংযোগ না থাকায় শব্দ উৎপন্ন হয় না। পটের নিমিত্ত-কারণ তুরীবেমাদি না থাকিলে পটের সমবায়িকারণ সহস্রতন্তু থাকিলেও পটোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। এক আকাশ সমবায়িকারণ হইলে পূর্ব্বোক্ত অনুপপত্তিগুলিও সহজে নিবারিত হইবে ; কারণ আকাশ এক, সেই আকাশের সর্ব্বত্র একভাবেই বিদ্যমানতা আছে। কোন একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ঐ পূর্ব্বপক্ষের যেরূপ সমাধান করিতেন, সেই সমাধান এই—নির্ব্বাত দেশেও শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে, পরন্তু তদ্দেশে পরিচালক বায়ু না থাকা হেতু শ্রবণে পরিচালিত না হওয়ায় শ্রবণ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। এই সমাধান বিষয়ি-লোকের মনোরম হইলেও আমার সমীচীন বলিয়া মনে হয় না ; কারণ শব্দ গুণ, গুণ হইলে নিষ্ক্রিয়, নিষ্ক্রিয়ের কিরূপে পরিচালনার সম্ভাবনা? এই জন্যই শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে "শ্রোত্রোৎপন্নস্তু গৃহ্যতে", শ্রোত্রাবচ্ছেদে শব্দ উৎপন্ন হইলে শ্রোত্র দ্বারা উহা গৃহীত হইয়া থাকে ; যদি শব্দের পরিচালনার সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে "শ্রোত্রপরিচালিতস্তু গৃহ্যতে" এইরূপ লিখিত হইত। শব্দগত উৎকটত্বাদি বৈজাত্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না,—শব্দগত উৎকৃষ্টত্বাদি বৈজাত্য গ্রহণে সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ ; শ্রবণ সমবেত শব্দ, তৎসমবায় শব্দগত বৈজাত্যে আছে। ভূতলাদি দেশে ঘটাভাবাদির প্রত্যক্ষে বিশেষণতা সন্নিকর্ষ ; যে স্থলে লৌকিক সংযোগ সমবায়াদি সম্বন্ধের সম্ভাবনা নাই, সেই স্থলে অগত্যা বিশেষণ-তাই সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে ভূতলাদি দেশে ঘটাভাবাদি প্রত্যক্ষের উপায় নাই। প্রত্যক্ষের বিষয় মাত্রে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধের আবশ্যকতা ; যেরূপ ঘট প্রত্যক্ষের বিষয় ঘটে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সংযোগ সন্নিকর্ষ, সেইরূপ ভূতলাদি দেশে ঘটাভাব প্রত্যক্ষের যে বিষয় উহাতে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ বিশেষণতা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযুক্ত ভূতলাদি দেশে বিশেষণ ঘটাভাব। অতএব ইন্দ্রিয় সংযুক্ত ভূতলাদি দেশ নিরূপিত বিশেষণতাই ঘটাভাব প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ। এই বিশেষণতা অনেক প্রকার—

ইন্দ্রিয় সংযুক্ত বিশেষণতা, ইন্দ্রিয় সংযুক্ত সমবেত বিশেষণতা, ইন্দ্রিয় সংযুক্ত সমবেত সমবেত-বিশেষণতা, কেবল বিশেষণতা, বিশেষণ বিশেষণতা। ভূতলাদি দেশে ঘটাভাব প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় সংযুক্ত বিশেষণতা; ইন্দ্রিয় সংযুক্ত ভূতলাদি দেশ তাহাতে ঘটাভাবে বিশেষণ, উহাতে যে বিশেষণতা আছে উহাই ভূতলাদি দেশে ঘটাভাব প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ; ইন্দ্রিয় সংযুক্ত সমবেত বিশেষণতা ঘটীয় রূপে রসত্বাভাব প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ; ইন্দ্রিয় সংযুক্ত ঘট তৎসমবেতরূপ ইহার বিশেষণ রসত্বাভাব, ইহাতে যে বিশেষণতা আছে উহাই তাদৃশাভাব প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ। ইন্দ্রিয় সংযুক্ত সমবেত সমবেত-বিশেষণতা সংখ্যাত্বাদিতে রূপাভাব প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ। ইন্দ্রিয় সংযুক্ত দ্রব্য, তৎসমবেত সংখ্যা, উহাতে বিশেষণ রূপাভাব, উহাতে যে বিশেষণতা আছে উহা তাদৃশাভাব প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ। ইন্দ্রিয় সংযুক্ত বিশেষণ বিশেষণতা ঘটাভাবাদিতে পটাভাব প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ; ইন্দ্রিয়সংযুক্ত নির্ঘট দেশ, তাহাতে বিশেষণ ঘটাভাব, ইহাতে বিশেষণ পটাভাব, পটাভাবে যে বিশেষণতা আছে উহা তাদৃশাভাব প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ, এবং কেবল বিশেষণতা আকাশে শব্দাভাব প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ, কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্ন আকাশ শ্রোত্র পদার্থ, ইহাতে শব্দাভাব বিশেষণ, ইহাতে যে বিশেষণতা উহাই উক্তাভাব প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ। অভাব প্রত্যক্ষে যোগ্যানুপলব্ধি প্রমাণীভূত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহকারি-কারণ, অভাব প্রত্যক্ষে কতিপয় স্বতন্ত্র কারণ নাই। দার্শনিকগণ অভাব প্রত্যক্ষে অনুপলব্ধির স্বাতন্ত্র্যে প্রামাণ্য স্বীকার করেন, কিন্তু নৈয়ায়িকগণ তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা বলেন প্রত্যক্ষস্থলে প্রমাণ সহকারীর যদি স্বাতন্ত্র্যে প্রামাণ্য থাকে তাহা হইলে অনুমানাদি স্থলেও অনেক প্রমাণ সহকারী আছে, তুল্য যুক্তিতে তাহারাই বা স্বতন্ত্র প্রমাণ না হয় কেন? প্রমাণ সহকারী যে যোগ্যানুপলব্ধি উহাতে যোগ্যতা অনুপলব্ধির বিশেষণ, যোগ্যতাবিশিষ্ট অনুপলব্ধিই সহকারি-কারণ; অনুপলব্ধির বিশেষণ যোগ্যতা এইরূপ,—ভূতলাদি দেশে ঘটের অনুপলব্ধি ঐ দেশে ঘটাভাব প্রত্যক্ষে সহকারিতা সেই সময়ে লাভ করিবে, যে সময়ে অনুপলব্ধির প্রতিযোগি-উপলব্ধি ঘটাভাব-প্রতিযোগি-ঘটের বিদ্যমানতার আপাদন দ্বারা আপাদিত হইবে। আপাদন এইরূপ,—এই দেশে ঘট যদি বিদ্যমান হইত তাহা হইলে এই দেশ ঘটবান্ বলিয়া উপলব্ধির বিষয় হইত; এইরূপ আপাদিত উপলব্ধির অভাব যে অনুপলব্ধি উহাই অভাব প্রত্যক্ষে প্রমাণ সহকারী; এইরূপ

অনুপলব্ধির সহকারিতা স্বীকার না করিলে ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন যে দেশে ঘটের সত্তা নাই, সেই দেশে ঘটাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের আপাদন হইত, যে হেতু ঐ তিমিরাচ্ছন্ন দেশে যোগ্যানুপলব্ধি ব্যতীত ঘটাভাব প্রত্যক্ষের সকল কারণ বিদ্যমান আছে। কার্য্যের যে কয়েকটি কারণ, তাহাদের যে দেশে একত্র সমবধান হইবে, সেই দেশে কার্য্য অবশ্যই উৎপন্ন হইবে ইহাই নিয়ম ; ঐদেশে কেবল যোগ্যানুপলব্ধি নাই, যেহেতু ঐ তিমিরাচ্ছন্ন দেশে ঘট বিদ্যমান থাকিলেও আলোক সংযোগ না থাকায় ঘটের উপলব্ধি সম্ভাবনা নাই। ভাব প্রত্যক্ষেই আলোক সংযোগ কারণ, অভাব প্রত্যক্ষে নহে ; তাহা হইলে আলোক সংযোগাভাবের কোন কালেই প্রত্যক্ষ হইত না, আলোক সংযোগাভাব প্রত্যক্ষে আলোক সংযোগ অপেক্ষিত হইলে আলোক সংযোগের সত্ত্ব দ্বারা আলোক সংযোগাভাবের সত্ত্ব বিলুপিত হইত। দূরস্থ ও ব্যবহিত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ উহাই অলৌকিক সম্বন্ধ ; ঐ সম্বন্ধ তিন প্রকার, সামান্য লক্ষণা, জ্ঞান লক্ষণা ও যোগজ। সামান্য হইয়াছে লক্ষণ স্বরূপ যাহার এইরূপ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ বা প্রত্যাসত্তি সামান্য লক্ষণা সন্নিকর্ষ। একটী ঘট-ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ দ্বারা ঘটস্বরূপে সেই ঘটের প্রত্যক্ষ হয়, পরে জায়মান ঘটত্বরূপ সামান্য প্রত্যাসত্তি দ্বারা ব্যবহিত ও দেশান্তরীয় নিখিল ঘটের প্রত্যক্ষ হয়, সেইজন্য প্রত্যক্ষকর্ত্তা বলিয়া থাকেন 'ঘট এই রকম' অর্থাৎ এই জাতীয়। সামান্য প্রত্যাসত্তি দ্বারা ঘট জাতীয় সমস্ত ঘটের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এইজন্য কালে প্রত্যক্ষকর্তা দেশান্তরে গমনানন্তর দেশান্তরীয় ঘট দর্শন করিলে তাহাকে ঘট বলিয়া ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়। সংশয়ের নির্ব্বাহের জন্য সামান্য প্রত্যাসত্তি অবশ্য-স্বীকার্য্য ; পর্ব্বতে বহ্নির যে সংশয় হয় ঐ সংশয় পর্ব্বতে অপ্রত্যক্ষ বহ্নিরই বলিতে হইবে,—পর্ব্বতে লৌকিক সন্নিকর্ষ দ্বারা বহ্নির প্রত্যক্ষ হইলে নিশ্চয়ই হইত, সংশয় হইবে কেন ? যে অপ্রত্যক্ষ বহ্নির সংশয় হইয়াছে ঐ বহ্নি-সংশয়ের পূর্ব্বে সাধারণ জ্ঞানের বিষয় হওয়া আবশ্যক, সাধারণ জ্ঞানের বিষয় না হইলে সংশয়ে বিশেষণ কোটিতে কিরূপে প্রবিষ্ট হইবে ? জ্ঞানে বিশেষণ কোটিতে প্রবিষ্ট হইতে হইলে সাধারণ জ্ঞানের আবশ্যকতা ; সংশয় স্থলে ঐ সাধারণ জ্ঞানের সামান্য প্রত্যাসত্তি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, সামান্য লক্ষণার প্রত্যাসত্তির স্বীকার করিলে কোন একদেশে বহ্নির প্রত্যক্ষকালে জায়মান বহ্নিত্বরূপ সামান্য প্রত্যাসত্তি দ্বারা নিখিল বহ্নির সাধারণ জ্ঞান হইয়াছিল, সেই জ্ঞানবলে

কালে পর্ব্বতাদিতে অপ্রত্যক্ষ বহ্নির সংশয়ও নিপ্রত্যহ হইবে। প্রবাদ আছে, তার্কিকাগ্রণী মহামতি রঘুনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় অধ্যয়নচ্ছলে মিথিলায় গমন করিয়া পূজ্যপাদ পক্ষধর মিশ্রের সহিত সামান্য লক্ষণা খণ্ডন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে পক্ষধর মিশ্র শিরোমণিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "বক্ষোজপানকৃৎ কাণ! সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটং। সামান্য লক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে॥ অর্থাৎ হে স্তন্যপায়িন্! হে কাণ এক চক্ষুর্বিহীন! (শিরোমণির এক চক্ষু ছিল না) সংশয় জাগ্রত থাকিতে অকস্মাৎ সামান্য লক্ষণা কিরূপে অবলুপ্ত হইল?" এই প্রবাদ দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে সংশয় নির্ব্বাহের জন্য সামান্য লক্ষণার আবশ্যকতা। এবং প্রত্যক্ষে' দ্বিতীয় অলৌকিক সন্নিকর্ষ জ্ঞান লক্ষণা। 'জ্ঞান হইয়াছে লক্ষণ স্বরূপ যাহার,' এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা জ্ঞান স্বরূপ সন্নিকর্ষই দ্বিতীয় অলৌকিক সন্নিকর্ষ। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; অন্যথা, ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপায়ান্তর নাই। রঙ্গে রজতত্ব জ্ঞান ভ্রমাত্মক, যেহেতু তদভাবে তৎস্মৃতিই ভ্রম; যে বস্তু যে স্থানে নাই সেই স্থানে সেই বস্তুর জ্ঞান ভ্রম; রঙ্গে রজতত্ব নাই, সুতরাং রঙ্গে রজতত্ব জ্ঞান ভ্রম হইবে। ঐ প্রত্যক্ষ ভ্রমের বিষয় দুইটী, একটী রঙ্গ, অপরটী রজতত্ব;--রঙ্গে চক্ষুঃসংযোগরূপ লৌকিক সন্নিকর্ষ; রজতত্বে লৌকিক সন্নিকর্ষের সম্ভাবনা নাই, যেহেতু চক্ষুঃসংযুক্ত রঙ্গে রজতত্ব নাই। এদিকে, প্রত্যক্ষের বিষয় হইলেই সন্নিকর্ষের আবশ্যকতা, কারণ প্রত্যক্ষ বিষয়তা সন্নিকর্ষের ব্যাপ্য; যখন রজতত্বে লৌকিক সন্নিকর্ষ নাই, তখন অলৌকিক সন্নিকর্ষই স্বীকার করিতে হইবে, সেই অলৌকিক সন্নিকর্ষ রজতত্ব-জ্ঞান, উহাই জ্ঞান লক্ষণা সন্নিকর্ষ। কোনও এক সময় লৌকিক সন্নিকর্ষ দ্বারা রজতে রজতত্ব দর্শন হইয়াছিল, সেই দর্শন জন্য সংস্কার ছিল, কালে রঙ্গদর্শন হইলে রজতের সজাতীয় দর্শননিবন্ধন পূর্ব্বোৎপন্ন রজত[illegible]সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া রজতত্বের স্মৃতি হয়; সেই স্মৃতিরূপ জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষ দ্বারা রঙ্গে রজতত্ব প্রত্যক্ষ হয়, উহাই জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষের কার্য্য। অপর অলৌকিক সন্নিকর্ষ যোগজ। যোগিগণের যোগাভ্যাসজনিত অদৃষ্ট-বিশেষ জন্মে; সেই অদৃষ্ট দ্বারা যোগিগণ ব্যবহিত, দূরস্থ ও অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রত্যক্ষে সমর্থ হন। পূজ্যপাদ গৌতম মুনি নিজকৃত ন্যায় দর্শনে যে ভাবে প্রমাণাদি ষোড়শপদার্থের নির্ব্বচন করিয়াছেন, তাহাতে পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার আবশ্যক হয় না, সেই জন্য তিনি পারিভাষিক শব্দব্যবহার

করেন নাই, কিন্তু মহামতি গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভৃতি নব্যনৈয়ায়িকগণ যে ভাবে পদার্থ নির্ব্বচন করিয়াছেন, তাহাতে পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারের আবশ্যকতা; পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার না করিলে সেই ভাবে পদার্থনির্ব্বচনের উপায় নাই। সেই পারিভাষিক শব্দগুলি এইরূপ—প্রতিযোগিতা, নিরূপকতা, অবচ্ছেদকতা, অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতা, বিষয়তা, প্রকারতা, বিশেষ্যতা, সংসর্গতা প্রভৃতি অনেক পারিভাষিক শব্দ নব্যন্যায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঘটোনাস্তি এই প্রতীতির বিষয় ঘটাভাব, দ্রব্যংনাস্তি এই প্রতীতির বিষয় দ্রব্যাভাব, প্রমেয়ং নাস্তি এই প্রতীতির বিষয় প্রমেয়াভাব। এই স্থলে প্রথম জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ঘটো নাস্তি এই প্রতীতির বিষয় যে ঘটাভাব ঐ ঘটাভাব শব্দের অর্থ কি? যদি ঘট প্রতিযোগিকাভাব অর্থ হয়, তাহা হইলে তদ্‌ঘটোনাস্তি এই প্রতীতির বিষয় তদ্‌ঘটপ্রতিযোগিকাভাব, তদ্‌ঘটপ্রতিযোগিকাভাব হইলেই ঘটপ্রতিযোগিকাভাব হইল; এইরূপ দ্রব্যং নাস্তি এই প্রতীতির বিষয় দ্রব্যপ্রতিযোগিকাভাব, দ্রব্যপ্রতিযোগিকাভাব হইলেও ঘটপ্রতিযোগিকাভাব হইবে, যেহেতু ঘট দ্রব্যের অন্তর্গত; এবং প্রমেয়ং নাস্তি এই প্রতীতির বিষয় যদি প্রমেয় প্রতিযোগিকাভাব হয়, তাহা হইলে ঘটপ্রতিযোগিকাভাবও এই প্রতীতির বিষয় হইবে, যেহেতু প্রমেয়ের মধ্যে অন্তর্গত ঘট হইয়াছে। এইরূপ ঘটপ্রতিযোগিক অভাব যদি ঘটো নাস্তি এই প্রতীতির, দ্রব্যপ্রতিযোগিকাভাব যদি দ্রব্যং নাস্তি এই প্রতীতির, তদ্‌ঘটপ্রতিযোগিক অভাব তদ্‌ঘটোনাস্তি এই প্রতীতির, প্রমেয় প্রতিযোগিক অভাব যদি প্রমেয়ং নাস্তি এই প্রতীতির বিষয় হয়, তাহা হইলে ঐ সকল প্রতীতির বৈলক্ষণ্য কিরূপে নির্ব্বাহিত হইবে? বিষয়-বৈলক্ষণ্যই প্রতীতি-বৈলক্ষণ্যের নিয়ামক, অর্থাৎ বিষয়ের পার্থক্য না থাকিলে প্রতীতির আকারের পার্থক্য হয় না। আর একটী আপত্তি হইতে পারে; আপত্তি এই—ঘটপ্রতিযোগিক অভাব যদি ঘটোনাস্তি এই প্রতীতির বিষয় হয়, তাহা হইলে ঘটবদ্দেশে দেশান্তরীয় ঘটের অভাব থাকায় ঘটবদ্দেশেও ঘটো নাস্তি এই ব্যবহার না হয় কেন? এই স্থলে আরও একটী অনুপপত্তি হইতে পারে; অনুপপত্তি এইরূপ—ঘটবান্ এই বুদ্ধির প্রতি ঘটাভাব-নির্ণয় প্রতিবন্ধক, অর্থাৎ যে পুরুষের যে দেশে ঘটাভাব নির্ণয় থাকে, সেই পুরুষের সেই দেশে ঘটবত্তা বুদ্ধি অর্থাৎ ঘটবান্ এই প্রতীতি জন্মায় না। এক্ষণে ঐ ঘটাভাব যদি ঘটপ্রতিযোগিক অভাব হয়, তাহা হইলে তদ্দেশে দেশান্তরীয় ঘটাভাব-নির্ণয়বৎ-পুরুষের তদ্দেশে ঘট-

বস্তা বুদ্ধির প্রতিরোধ হয় না কেন? যেহেতু দেশান্তরীয় ঘটাভাবের যে নির্ণয় উহাও ঘটপ্রতিযোগিক অভাবের নির্ণয় মধ্যে সন্নিবিষ্ট। সুতরাং কতিপয় পারিভাষিক শব্দ স্বীকার করিয়াই ঘটাভাবাদি পদার্থের নির্ব্বচন করিতে হইবে; এই জন্যই নব্য-নৈয়ায়িকগণ কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, নব্যন্যায়ের কঠিনতা সম্পাদনের জন্ত নিষ্প্রয়োজনক দুর্ব্বোধ পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করেন নাই। (অনেকের কুসংস্কার আছে যে নব্যন্যায়ের কাঠিন্ত-সম্পাদনের জন্তই নব্যনৈয়ায়িকগণ কতিপয় নিষ্প্রয়োজনক অব্যাবর্ত্তক কঠিন শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের অত্যন্ত ভ্রান্তিমূলক।) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পদার্থ নির্ব্বচন করিতে হইলে পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সকল পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন দেখাইতে হইলে এই প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে, সেই জন্য কতিপয় পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন এই প্রবন্ধে দেখাইয়া প্রবন্ধ শেষ করিব; ইচ্ছা রহিল প্রবন্ধান্তরে অবশিষ্ট পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন দেখাইব। কতিপয় পারিভাষিক শব্দ এইরূপ—প্রতিযোগিতা, অনুযোগিতা, অবচ্ছেদকতা, অবচ্ছেদ্যতা, অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতা, নিরূপকতা, নিরূপ্যতা, আধেয়তা, আধারতা, বিষয়তা, প্রকারতা, সংসর্গতা ইত্যাদি। অভাব স্থলে প্রতিযোগি-শব্দের অর্থ প্রতিকূল, বিপক্ষতা, অর্থাৎ বিরোধী। যে দেশে ঘটের বিদ্যমানতা থাকে সেই দেশে ঘটাভাবের বিদ্যমানতা থাকে না। প্রতিযোগির যে ভাব উহাই প্রতিযোগিতা, এই প্রতিযোগিতা প্রতিযোগির স্বরূপ অতিরিক্ত পদার্থ নহে। নব্যনৈয়ায়িকগণ সপ্তপদার্থাতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন না; যে সকল দার্শনিক সপ্তপদার্থাতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে প্রতিযোগিতা অতিরিক্ত পদার্থ। অভাব প্রত্যয়ে প্রতিযোগ্যংশে ভাসমান ধর্ম্মই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক; ঘটো নাস্তি এই প্রত্যয়ে প্রতিযোগি ঘটাংশে ভাসমান ধর্ম্ম যে ঘটত্ব, উহাই ঐ প্রত্যয়ের বিষয় যে ঘটাভাব উহার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক। দ্রব্যং নাস্তি এই প্রত্যয়ে ঘটপটাদি দ্রব্যরূপ প্রতিযোগ্যংশে ভাসমান যে দ্রব্যত্ব, উহাই ঐ প্রত্যয়ের বিষয় যে দ্রব্যাভাব উহার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক। প্রমেয়ং নাস্তি এই প্রত্যয়ে ঘটপটাদি প্রমেয়রূপ-প্রতিযোগ্যংশে ভাসমান প্রমেয়ত্বই ঐ প্রত্যয়ের বিষয় যে প্রমেয়াভাব উহার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক। যে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম সেই প্রতিযোগিতা সেই ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছেদ্য বা অবচ্ছিন্ন; এই স্থলে অবচ্ছেদক শব্দের অর্থ—

ব্যাবর্ত্তক, অবচ্ছেদ্য ও অবচ্ছিন্ন শব্দের অর্থ ব্যাবর্ত্ত্য। ঘটে ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতি-যোগিতা, দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা, প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা আছে; ইহাদের পরস্পর ব্যাবর্ত্তক ঘটত্বাদি অবচ্ছেদক ধর্ম্ম। ঘটে যে ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতি-যোগিতা উহা দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন নহে, সুতরাং ঐ প্রতিযোগিতা ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতি-যোগিতা হইতে ভিন্ন। এইরূপ পরস্পরের ব্যাবর্ত্ত্য-ব্যাবর্ত্ত-ব্যাবর্ত্তক ভাবই অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদক ভাব পদার্থ। অভাবের সহিত প্রতিযোগিতার নিরূপ্য নিরূপক ভাব সম্বন্ধ আছে; এই নিরূপ্য নিরূপক ভাব ব্যবচ্ছেদ্য ব্যবচ্ছেদক ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রতিযোগিতার নিরূপক অর্থাৎ ব্যবস্থাপক অভাব, অভাব দ্বারা ব্যবস্থাপ্য প্রতিযোগিতা, অভাব দ্বারাই প্রতিযোগিতা ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। এক্ষণে পৃথক পৃথক অভাব যদি পৃথক পৃথক প্রতীতির বিষয় হইল তাহা হইলেই ঘটো নাস্তি, দ্রব্যং নাস্তি, প্রমেয়ং নাস্তি এই সকল প্রতীতির বিষয় বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন প্রতীতির বৈলক্ষণ্য নির্ব্বাহিত হইল। ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতি-যোগিতার নিরূপক অভাব ঘটো নাস্তি এই প্রতীতির বিষয়, দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন বা প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব ঐ প্রতীতির বিষয় নহে। দ্রব্যং নাস্তি এই প্রতীতির বিষয় দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব, ঘটত্বা-বচ্ছিন্ন বা প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব ঐ প্রতীতির বিষয় নহে। প্রমেয়ং নাস্তি এই প্রতীতির বিষয় প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব, দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন বা ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব ঐ প্রতীতির বিষয় নহে। সুতরাং বিষয়ের পার্থক্য থাকায় ঐ সকল প্রতীতির ও আকারের পার্থক্য ভাব নির্ব্বাহিত হইল, এবং পীতঘটবদ্দেশে নীলঘটাভাবের সত্তা নিবন্ধন ঐ দেশে ঘটোনাস্তি এইরূপ ব্যবহার হইবে না; কারণ, ঘটোনাস্তি এই প্রতীতির বিষয় কেবল ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব; নীলঘটাভাব নীলত্ব ও ঘটত্ব এই উভয় ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব, অভাব প্রত্যয়ে প্রতিযোগাংশে ভাসমান ধর্ম্মই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক; সুতরাং কেবল ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব। ঘটোনাস্তি এই প্রতীতির বিষয়, ও নীলত্ব ঘটত্ব এই উভয় ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব নীল ঘটো নাস্তি এই প্রতীতির বিষয়, এই বিষয়দ্বয়ের অত্যন্ত পার্থক্য থাকায় ঐ প্রতীতি-দ্বয়ের একের বিষয় দ্বারা অন্যের প্রতীতির প্রামাণ্যের সম্ভাবনা নাই; এবং ভিন্ন ভিন্ন

প্রতীতির বিষয় ভিন্ন ভিন্ন অভাব ব্যবস্থাপিত হওয়ায় প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধক ভাব নির্ব্বচনেরও কোন ব্যাঘাত হইবে না; যেহেতু ঘটাবত্তাবুদ্ধির অর্থাৎ ঘটবান্ এই বুদ্ধির প্রতি ঘটাভাববত্তা নিশ্চয়, অর্থাৎ ঘটবান্ এই বুদ্ধির প্রতি ঘটাভাববত্তা নিশ্চয় অর্থাৎ ঘটাভাববান্ এই নিশ্চয় প্রতিবন্ধক, এই স্থলে ঘটাভাববান্ এই নিশ্চয়ের বিষয় যে ঘটাভাব উহা কেবল ঘটত্বাবচ্ছেন্ন ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব স্বরূপ, সুতরাং ঘটোঽস্তি এই প্রতীতিতে দ্রব্যং নাস্তি প্রমেয়ং নাস্তি অথবা তদ্ঘটোনাস্তি এই নিশ্চয় প্রতিবন্ধক হইবে না এবং দ্রব্যমস্তি এই বুদ্ধির প্রতি ঘটোনাস্তি এই নিশ্চয় প্রতিবন্ধক হইবে না। দ্রব্যমস্তি এই বুদ্ধির প্রতি দ্রব্যং নাস্তি এই নিশ্চয় প্রতিবন্ধক; দ্রব্যং নাস্তি এই প্রতীতির বিষয় দ্রব্যত্বাবচ্ছেন্ন দ্রব্যনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাবস্বরূপ, ঘটত্বাবচ্ছেন্ন ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাবস্বরূপ নহে। এবং ঘটোনাস্তি এই প্রতীতিতে ঘটত্বের স্বরূপেই ভাণ হইয়া থাকে অর্থাৎ ঘটত্বের উপরি অন্য কোন ধর্ম্ম ভাসমান হয় না; কারণ জাতি অনুল্লিখ্যমান হইলে জ্ঞানে উহার স্বরূপতঃই ভাণ হইয়া থাকে; ঘট এই কথা বলিলে তজ্জন্য জ্ঞানে ঘটত্বের স্বরূপেতেই ভাণ হইয়া থাকে, ঐ জ্ঞানের বিষয় অপর ঘটত্বত্বাদি ধর্ম্ম হয় না। ঘটত্ব এই কথা বলিলে ঘটত্ব জাতি উল্লিখ্যমান হওয়ায় ঐ বাক্য জন্য জ্ঞানে ঘটত্ব ঘটত্বত্ব রূপেই অবগাহন করিয়া থাকে। এই জন্যই স্বরূপতঃ ঘটত্ব ভাণস্থলে ঘটোনাস্তি এইরূপই অভাব প্রতীতি হইয়া থাকে, অস্বরূপতঃ অর্থাৎ কিঞ্চিদ্ধর্ম্ম প্রকারে ঘটত্ব ভাণস্থলে ঘটত্ববান্ নাস্তি এই রূপই অভাব প্রতীতি হইয়া থাকে; এই উভয় প্রতীতির বৈলক্ষণ্য দেখা যাইতেছে,— অতএব অবশ্য এই উভয় প্রতীতিতে বিষয় বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে সেই বিষয় বৈলক্ষণ্য কিরূপে নির্ব্বাহিত হইবে? ঘটোনাস্তি এই প্রতীতির বিষয় ঘটত্বাবচ্ছেন্ন ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা নিরূপক অভাব, ঘটত্ববান্ নাস্তি এই প্রতীতির বিষয়ও ঘটত্বাবচ্ছেন্ন ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব, সুতরাং এই প্রতীতিদ্বয়ের বিষয়বৈলক্ষণ্য নির্ব্বাহের জন্য অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকরূপ অপর একটী পারিভাষিক পদার্থ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; তাহা হইলেই ঐ প্রতীতিদ্বয়ের বিষয়-বৈলক্ষণ্য নির্ব্বাহিত হইবে। ঘটোনাস্তি এই প্রতীতিতে ঘটত্ব স্বরূপতঃই ভাসমান হইবে; যেহেতু ঐ প্রতীতিতে ঘটত্ব অনুল্লিখ্যমান জাতি, অনুল্লিখ্যমান জাতির উপর কোন ধর্ম্মই ভাসমান হয় না; সুতরাং ঘটোনাস্তি এই প্রতীতির

বিষয়ীভূত অভাবের যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা ঘটত্বে আছে, তাহার অবচ্ছেদক অন্য কোন ধর্ম্ম হইবে না ; ঐ অবচ্ছেদকতা নিরবচ্ছিন্ন, অতএব কিঞ্চিদ্ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতাশ্রয় যে ঘটত্ব তদবচ্ছেদ্য ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব ঘটোনাস্তি এই প্রতীতির বিষয়। ঘটত্ববান্ নাস্তি এই প্রতীতিতে ঘটত্ব উল্লিখ্যমান হওয়ায় উহা ঐ প্রতীতিতে স্বরূপতঃ ভাসমান না হইয়া ঘটত্বত্বরূপেই ভাসমান হইবে ; সুতরাং ঐ প্রতীতির বিষয় যে অভাব উহার যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা ঘটত্বে আছে, ঐ অবচ্ছেদকতা ঘটত্বত্বাবচ্ছেদ্য। ঘটত্বত্ব দ্বারা ব্যাবৃত্ত ঘটত্বত্বাবচ্ছেদ্য অবচ্ছেদকতাশ্রয় যে ঘটত্ব, তদবচ্ছেদ্য অর্থাৎ তদ্দ্বারা ব্যাবৃত্ত ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব ঘটত্ববান্ নাস্তি এই প্রতীতির বিষয় ; সুতরাং উভয়-প্রতীতির বিষয়বৈলক্ষণ্য দ্বারা ঘটোনাস্তি ঘটত্ববান্ নাস্তি এই প্রতীতিদ্বয়ের বৈলক্ষণ্য নির্ব্বাহিত হইল এবং ঘটবান্ এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক ঘটোনাস্তি এই প্রতীতি ও ঘটত্ববান্ এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক ঘটত্ববান্ নাস্তি এই প্রতীতি, এইরূপ প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব নির্ব্বাচনেও কোন বাধা হইবে না। এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই উভয়ের বিষয় বিষয়িভাব সম্বন্ধ, জ্ঞেয় ঘটাদিতে জ্ঞানের সম্বন্ধ বিষয়তা, জ্ঞানে জ্ঞেয় ঘটাদির সম্বন্ধ বিষয়িতা, জ্ঞেয়মাত্রে জ্ঞানের বিষয়তা থাকে, সেই বিষয়তা কোন বিষয়ে প্রকারতা. কোন বিষয়ে বিশেষ্যতা, কোন বিষয়ে অবচ্ছেদকতা, কোন বিষয়ে অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতা, কোন বিষয়ে সংসর্গতা। সংযোগসম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট ভূতল, এই জ্ঞানে ভূতলে বিশেষ্যতা, ঘটে প্রকারতা, ভূতলত্বে ও ঘটত্বে অবচ্ছেদকতা, সংযোগে সংসর্গতা, এইরূপ বিলক্ষণবিলক্ষণ-জ্ঞানবিষয়তা জ্ঞানবিষয়ে অবশ্যস্বীকার্য্য। বিষয়মাত্রে একরূপ বিষয়তা স্বীকার করিলে ঘট-বিশিষ্ট ভূতল ও ভূতল-বিশিষ্ট ঘট এই প্রতীতিদ্বয়ের বৈলক্ষণ্য অসম্ভব হয় ; কারণ বিষয়-বৈলক্ষণ্যই প্রতীতি-বৈলক্ষণ্যের নিয়ামক। বিষয় মাত্রে একরূপ বিষয়তা থাকিলে ঘটবিশিষ্ট ভূতল এই জ্ঞানে ঘট ভূতলাদিবিষয়, ভূতলবিশিষ্ট ঘট এই জ্ঞানেও ঘট ভূতলাদি বিষয় ; এইরূপে বিষয়-বৈলক্ষণ্য না থাকায় ঐ জ্ঞানদ্বয়েরও বৈলক্ষণ্য হইতে পারে না, এবং ভূতল হইতে ঘটানয়ন-প্রবৃত্তির প্রতি ভূতলে ঘট নিশ্চয় কারণ ; যে পুরুষের ভূতলে ঘট নিশ্চয় আছে, সেই পুরুষই ভূতল হইতে ঘটানয়নে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; ঐ নিশ্চয়ই যদি ভূতল-ঘটবিষয়ক নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে ভূতলবিশিষ্ট ঘট এইরূপ বিপরীত নিশ্চয়

হইয়েও ভূতল হইতে ঘটানয়নে প্রবৃত্তি হইতে পারে, অতএব বিলক্ষণ বিষয়তা স্বীকার না করিলে উপায়ান্তর নাই। বিলক্ষণ বিষয়তা স্বীকার করিলে ঘটবিশিষ্ট ভূতল এই জ্ঞানে ঘটে প্রকারতাখ্য, ভূতলে বিশেষ্যতাখ্য বিষয়তা থাকে,—ভূতল-বিশিষ্ট ঘট এই জ্ঞানে ভূতলে প্রকারতাখ্য বিষয়তা, ঘটে বিশেষ্যতাখ্য বিষয়তা থাকায় বিষয়ের বৈলক্ষণ্য হইল, তন্নিবন্ধন ঐ জ্ঞানদ্বয়েরও বৈলক্ষণ্য নির্ব্বাহিত হইল এবং ভূতল হইতে ঘটানয়ন-প্রবৃত্তির প্রতি ঘটপ্রকারক ভূতল-বিশেষ্যক নিশ্চয় কারণ হওয়ায় ভূতলবিশিষ্ট ঘট এই নিশ্চয় সত্ত্বে ভূতল হইতে ঘটানয়ন-প্রবৃত্তি হইবে না; যেহেতু ঐ নিশ্চয় ভূতল-প্রকারক ঘট-বিশেষ্যক নিশ্চয়, ঘট-প্রকারক ভূতল-বিশেষ্যক নিশ্চয় নহে; এবং সংযোগসম্বন্ধে ঘটবান্, সমবায় সম্বন্ধে ঘটবান্ এই প্রতীতিদ্বয়ের বৈলক্ষণ্য-নির্ব্বাহের জন্য সংসর্গতাখ্য বিলক্ষণ বিষয়তাও অবশ্যস্বীকার্য্য; তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রতীতিতে সংযোগে পরপ্রতীতিতে সমবায়ে সংসর্গতাখ্য বিষয়তা থাকায় বিষয়-বৈলক্ষণ্য-নিবন্ধন প্রতীতিদ্বয়ের বৈলক্ষণ্যও অবশ্য নির্ব্বাহিত হইবে, এবং আধারতা ও আধেয়তা বিষয়ক প্রতীতি স্থলেও কতিপয় পারিভাষিক পদার্থ স্বীকারের আবশ্যকতা আছে, এবং অনুমানাদি প্রমাণের নির্ব্বাহার্থ যে সকল পারিভাষিক পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য্য তাহা প্রবন্ধান্তরে বক্তব্য।

স্থূলভাবে পদার্থ নির্ব্বচনে পারিভাষিক পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজন হয় না; দার্শনিক মুনিগণ স্থূলভাবে পদার্থনির্ব্বচন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের পারিভাষিক পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজন হয় না; এইজন্য তাঁহারা নিজ নিজ দর্শনে পারিভাষিক শব্দের উল্লেখও করেন নাই; পরন্তু নব্য দার্শনিকগণ সূক্ষ্মভাবে পদার্থ নির্ব্বচন করিয়াছেন. সেই নির্ব্বচনে পারিভাষিক পদার্থের আবশ্যকতা; সেই জন্য তাঁহারা পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, নব্য দার্শনিকগণ দর্শনের কাঠিন্য সম্পাদনার্থই কতকগুলি অব্যাবর্ত্তক পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, পরন্তু ঐ ধারণা তাঁহাদের অত্যন্ত ভ্রান্তিমূলক। নব্য দার্শনিকগণ দর্শনের কাঠিন্য সম্পাদনার্থ অব্যাবর্ত্তক পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করেন নাই, সূক্ষ্মভাবে পদার্থ নির্ব্বচনের জন্যই বাধ্য হইয়া পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন; যদি সেই সকল মহাত্মা বলেন যে দুর্ব্বোধ পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়া সূক্ষ্মভাবে পদার্থ নির্ব্বচন

না করিয়া স্থূলভাবে পদার্থ নির্ব্বচন করিয়া মুনিবচনের অনুকরণ করিলে কি ক্ষতি হইত? ইহাতে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে নিজ নিজ বালকদিগকে বর্ণমালা অধ্যয়ন করাইয়া নিবৃত্ত রাখিলেই ভাল হইত, তাহাদিগকে উত্তরোত্তর দুরূহ বিষয়ের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করাইয়া বহুতর ক্লেশ দিবার কি প্রয়োজন ছিল? উত্তরোত্তর দুরূহ বিষয়ের পর্য্যালোচনা দ্বারা মস্তিষ্ক আলোড়িত হইবে, ঐ আলোড়ন দ্বারা মস্তিষ্ক পরিষ্কৃত হইবে, মস্তিষ্ক পরিষ্কৃত হইলে অন্যান্য দুরূহ বিষয় বালকদিগের অনায়াসে বোধগম্য হইবে,—এইজন্য বালকদিগের উত্তরোত্তর দুরূহ বিষয়ের পর্য্যালোচনার আবশ্যকতা আছে; তাহা হইলে দার্শনিকগণেরও উত্তরোত্তর দর্শনের কঠিন বিষয়ের পর্য্যালোচনা দ্বারা মস্তিষ্ক অধিকতর আলোড়িত হইবে, ঐ আলোড়ন দ্বারা তাঁহাদের মস্তিষ্ক সংশোধিত হইবে, সংশোধিত হইলে তাঁহারা অনায়াসে অনেক শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝিতে সমর্থ হইবেন। মুনিকৃত যে দর্শন উহা দর্শন বিষয়ে এক প্রকার বর্ণমালা-স্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, উহার পর্য্যালোচন দ্বারা মস্তিষ্ক পরিষ্কারের সম্ভাবনা নাই। দর্শনের মধ্যে নব্য ন্যায় যাঁহাদের পর্য্যালোচিত হইয়াছে তাঁহারা অন্যান্য দর্শনের নিগূঢ়তত্ত্ববোধে সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়া থাকেন, এবং তাঁহারা অন্যান্য দার্শনিকগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইতে পারেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় নব্য ন্যায়ে সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়া বেদান্তাদিশাস্ত্রের সমালোচনা করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি অনেক দার্শনিকের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। আমি যে কয়েকটি পারিভাষিক পদার্থের উল্লেখ করিয়াছি তাহার মধ্যেও অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পারিভাষিক পদার্থ সন্নিবেশিত আছে,প্রবন্ধের কাঠিন্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না। আমার এই প্রবন্ধে যদি স্থানীয় কতিপয় মহাত্মারও আগ্রহাতিশয় দেখিতে পাই, তাহা হইলে সময়ান্তরে সেই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পারিভাষিক পদার্থের স্বতন্ত্রভাবে পর্য্যালোচনে প্রবৃত্ত হইব। যাঁহারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পারিভাষিক পদার্থ পর্য্যালোচন পূর্ব্বক নব্য ন্যায়ের সমালোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মস্তিষ্ক যে কিরূপ আলোড়িত হইয়াছে তাহা তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন, অন্য কে বুঝিবে? এইজন্য পূর্ব্বে দেশে নৈয়ায়িকদিগের অধিকতর সম্মান ছিল, বিদায়ও অধিক পাইতেন; এক্ষণে রাজা পণ্ডিতগণের সম্মানার্থ মহামহোপাধ্যায় উপাধি সৃষ্টি করিয়াছেন, ঐ উপাধি দ্বারা মুড়ি মিছরী এক হইয়াছে। "তাম্বুরকো নাম"

ইত্যাদি সন্দর্ভের পর্য্যালোচক পণ্ডিতও মহামহোপাধ্যায়, গভীরাতিগভীর ন্যায়ের পর্য্যালোচক পণ্ডিতও মহামহোপাধ্যায়! রাজপ্রদত্ত উপাধি দেখিয়া স্থানীয় মহাত্মাগণও নৈয়ায়িকের সেই পূর্ব্ব সম্মান রক্ষা করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, ইহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। "ভাস্বরকো নাম" ইত্যাদি সন্দর্ভের কি প্রকৃতার্থ ইহাও তাঁহারা বলিতে সমর্থ হন না; অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "ভাস্বরক নামে সিংহ প্রতিবাস করিতেছে"; এই অর্থ বোধ হয় পণ্ডিতের বাটীর প্রাচীন ভৃত্যও করিতে সমর্থ হয়। "ভাস্বরকো" নাম এই সন্দর্ভের নাম পদ কোন্ বিভক্ত্যন্ত, সেই বিভক্তির অর্থ কি, তাহার অন্বয়ই বা কোথায়, ভাস্বরক শব্দ মুখ্য বা গৌণ, গৌণ হইলে তাহার অর্থ কি, এ বাক্য-জন্য শাব্দবোধই বা কিরূপ? ইহা বলিবার তাঁহাদের সামর্থ্য নাই। তথাপি তাঁহারা নৈয়ায়িক স্থান সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া থাকেন, ইহা দেশের দুর্ভাগ্যের ফল ভিন্ন আর কি বলিব! এইজন্য বিদ্যার্থিগণের ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে উৎসাহ নাই, ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্র পাওয়া যায় না। ছাত্রদিগকে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের কথা বলিলে তাহারা বলে কাব্য অধ্যয়নে যে ফল, গভীরতম ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নেরও সেই ফল। অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহাই উল্লিখিত হইয়াছে যথা—"কটুকৌষধোপশমনীয়স্য রোগস্য সিতশর্করোপশমনীয়ত্বে কস্য বা রোগিনঃ সিতশর্করাপ্রবৃত্তিঃ সাধীয়সী ন স্যাৎ।" কটুতিক্তকষায় ঔষধ দ্বারা উপশমনীয় রোগ যদি স্নিগ্ধশর্করাসেবনে উপশমনীয় হয়, তাহা হইলে কোন্ রোগীর স্নিগ্ধশর্করাসেবনে প্রবৃত্তি সাধীয়সী না হয়! সেইরূপ, সুখসেব্য অনায়াস-বোধগম্য যে শাস্ত্রের পঠনসময়েই সুমধুর রসাস্বাদ দ্বারা অন্তেবাসিগণ অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভে সমর্থ হইতে পারে, সেই শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কোন্ অন্তেবাসীর দুরূহ তর্কশাস্ত্রের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি সাধীয়সী হইয়া থাকে? এই বিষয়ে প্রাচীন কবিদিগের উক্তিও আছে,—"বয়ং বকুলমঞ্জরীগলদপারমাধ্বীধুরী ধুরীণপদরীতিভির্য্বতিভির্বিনোদামহে," আমরা বকুল মঞ্জরী হইতে ক্ষরিত অসীম মধু শ্রেণীর ভারে আক্রান্ত যে সকল পদ রচনা রূপ যুবতি, তাহাদের সহিত সর্ব্বদা বিনোদ করিয়া থাকি; অতএব অধিকতর গভীর ও দীর্ঘকাল সাধ্য ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়নে বিশেষ ফল লাভের কি সম্ভাবনা আছে! ইহাতে সম্মানও নাই, অর্থলাভও নাই; বরং কাব্যশাস্ত্রের পর্য্যালোচনা দ্বারা স্কুলের পণ্ডিত হইয়াও জীবিকা-নির্ব্বাহ হইতে পারে; কিন্তু নৈয়ায়িক হইলে তাঁহাদের অভিমান হয়,

সুতরাং ঐ কার্য্য দ্বারাও তাঁহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের সম্ভাবনা থাকে না। সংস্কৃতশাস্ত্রের উন্নতির জন্য রাজা অনেক সাহায্য করিয়া থাকেন, পরন্তু ঐ সাধারণ সাহায্যে নৈয়ায়িকগণ সম্মানিত ও উপকৃত হন না ; যদি রাজা স্বতন্ত্র ভাবে নৈয়ায়িকদিগের সাহায্যের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে নৈয়ায়িকগণ ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যে পুনরুৎসাহিত হন এবং দেশে ন্যায়শাস্ত্র রক্ষিত হয়। তাহা না হইলে দেশের ন্যায়শাস্ত্র রক্ষিত হইবার উপায়ান্তর নাই। যে ন্যায়শাস্ত্র বঙ্গদেশের গৌরব ছিল, যে ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারা পূর্ব্বে নবদ্বীপ গৌরবান্বিত হইয়া দেশে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, সে নবদ্বীপে এক্ষণে ন্যায়শাস্ত্রের কিছুই নাই, তথাপি পূর্ব্ব সংস্কারে এখনও পর্য্যন্ত নবদ্বীপের গৌরব অনেকে করিয়া থাকেন ; সেই ন্যায়শাস্ত্র এক্ষণে দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছে ইহা অপেক্ষা দেশের আর অধিক দুর্ভাগ্য কি হইতে পারে ? স্বতন্ত্র সাহায্য দ্বারা নৈয়ায়িক-দিগের সম্মান রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এই বিষয় রাজার গোচর করাইয়া যাহাতে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি এই বিষয়ে সকল মহাত্মগণ যত্ন করেন ইহাই আমার তাঁহাদের নিকট সানুনয় প্রার্থনীয়।

আমি যতদূর সাধ্য সহজ ভাষাতে ন্যায়শাস্ত্রের দুরূহ পারিভাষিক শব্দ সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি ; পরন্তু ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ দুরূহ বিষয় তাহাতে চেষ্টা করিয়াও যে কৃতকার্য্য হইয়াছি মনে হয় না। প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয়তম আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ নানা শাস্ত্রবিশারদ বিদ্বদগ্রণী ৺রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী রায় বাহাদুর সাধারণের অনায়াসে বোধের জন্য সরল বাঙ্গালা ভাষায় ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম পাঠ্য ভাষা-পরিচ্ছেদের অনুবাদ করিয়া আমার নিকট বলিয়াছিলেন যে, ন্যায় শাস্ত্রের বিষয় যেরূপ দুর্জ্ঞেয় তাহাতে কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা কম। তপোনুষ্ঠানের ন্যায় বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া একজন উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট দীর্ঘকাল ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিলে দুরূহ ন্যায়শাস্ত্রে অধিকার হওয়ার অবশ্য সম্ভাবনা। উপযুক্ত অধ্যাপক না হইলে, অর্থাৎ যে অধ্যাপকের নিগূঢ় বিষয়ের উপদেশদানে সামর্থ্য আছে সেইরূপ অধ্যাপক না হইলে, তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিলে বুদ্ধিমান্ ছাত্রও কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। নবদ্বীপের অবস্থা এক্ষণে সেইরূপই ঘটিয়াছে। নবদ্বীপে কোন এক টোলে মাড়ওয়ারী-বৃত্তিলোভে আকৃষ্ট হইয়া অধ্যয়নার্থে ছাত্র গমন করে, পরে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়াও সঙ্কেতের লক্ষণ

কি তাহা বলিতেও অসমর্থ হয়। যদি কেহ বলেন যে এত পরিশ্রম করিয়া দুরূহ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়নের প্রয়োজন কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে; ন্যায়শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইলে সেই ব্যক্তি অনায়াসে অন্যান্য শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকার লাভে সমর্থ হইবে, এবং অনেক শাস্ত্রের মীমাংসা করিতে পারিবে, এবং পণ্ডিত সমাজে সিংহের ন্যায় প্রতিভা সম্পন্ন হইবে। পূর্ব্বে যে সকল নৈয়ায়িক পণ্ডিত দেশে সর্ব্বপ্রধান হইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমে ন্যায়শাস্ত্রে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াই ঐরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারে নৈয়ায়িক পণ্ডিত মধ্যস্থ হইয়া থাকেন, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে স্মৃতির পণ্ডিত মধ্যস্থ হইতে সমর্থ হন না; ইহার দ্বারাই বুঝিতে হইবে যে ন্যায়শাস্ত্রের উৎকর্ষ কত দূর!

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্বন্ধে রাজার কোন সাহায্য ছিল না, স্থানীয় মহাত্মাগণই তাঁহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় চিন্তা করিতেন, তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া কেবল শাস্ত্র চিন্তা করিতেন এবং ছাত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইতেন; স্থানীয় ভূম্যধিকারীগণ সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে ভূমিদান করিতেন,—এখনও পর্য্যন্ত অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশধরেরা নদীয়া-মহারাজা প্রদত্ত ও বর্দ্ধমান-মহারাজ প্রদত্ত ভূমি ভোগ করিতেছেন। পূর্ব্বে স্থানীয় মহাত্মাদিগের বাটীতে সর্ব্বদা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইত; সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া প্রচুর অর্থসংগ্রহ করিতেন, তাহাতেই তাঁহাদের অনায়াসে জীবিকানির্ব্বাহ হইত। এক্ষণে স্থানীয় মহাত্মাদিগের বাটীতে পূর্ব্ববৎ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান নাই, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপরে স্থানীয় মহাত্মাদিগের সেই ভক্তি নাই,—ভক্তির কথা দূরে থাকুক, অনেক মহাত্মা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন; সুতরাং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় কি? এইজন্যই ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশধরগণ দলে দলে পাশ্চাত্য বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ গমন করিতেছে, টোল সকল অন্ধকারে পরিণত হইয়াছে!

যে দুই চারি জন ছাত্র এই দুর্দ্দিনেও শাস্ত্রের অধ্যয়নার্থী, তাহারাও উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে অধ্যয়ন করিয়া পূর্ব্ববৎ ব্যুৎপত্তিলাভে সমর্থ হইতে পারে না। প্রতি বৎসর অনেক তর্কতীর্থ, স্মৃতিতীর্থ, সাংখ্যতীর্থ ও বেদান্ততীর্থ দেশে আবির্ভূত হইতেছেন, কিন্তু একজনও পূর্ব্ববৎ ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত পরিলক্ষিত হইতেছে

না! কই পূজ্যপাদ ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন ও পূজ্যপাদ রাখালদাস ন্যায়রত্ন প্রভৃতির ন্যায় পণ্ডিত একজনও বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইলেন না! পূর্ব্বে এই জাতীয় পরীক্ষা ছিল না, তীর্থোপাধিও বিতরিত হইত না,—তথাপি স্থানে স্থানে এক একজন অসাধারণ পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়া দেশকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে শত শত তীর্থের আবির্ভাবেও তাহা হইতেছে না,—ইহাতে পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়া দেশের উপকার বা অপকার হইতেছে তাহা আমি এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেছি না।

পরীক্ষার সৃষ্টির পর হইতেই সাংখ্য-বেদান্তশাস্ত্র এত সহজ হইয়াছে যে কাব্য-ব্যাকরণের পণ্ডিতও বিনা উপদেশে নিজে নিজে পর্য্যালোচনা করিয়া সাংখ্য-বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যাপক স্থানে অভিষিক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের ছাত্রগণ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ উপাধি দ্বারা বিভূষিত হইতেছেন। ইহা এক অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার, ইহারই নাম দৈব-বিদ্যা! পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ন্যায় শাস্ত্রের চর্চ্চা কম ছিল; ন্যায় শাস্ত্রের মুখ্য কর্ত্তা গঙ্গেশোপাধ্যায় ও বর্দ্ধমানোপাধ্যায় ও মিথিলাতে পক্ষধর মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের রচিত ন্যায়শাস্ত্রের পঠন পাঠন সেই দেশেই প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশের ছাত্রবৃন্দ মিথিলায় গমনপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য ও লব্ধোপাধি হইয়া এদেশে প্রত্যাগমনানন্তর চতুষ্পাঠি-স্থাপন করিতেন। মিথিলার পণ্ডিতদিগের নিয়ম ছিল তাঁহারা পুস্তক কাহাকেও দিতেন না; প্রতিলিপি করিয়াও পুস্তক আনিবার উপায় ছিল না! সেইজন্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম অধ্যয়নচ্ছলে মিথিলায় গিয়াছিলেন; তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন; তিনি কিছুদিন সেই স্থানে থাকিয়া অনেক ন্যায়ের গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সেই যাবতীয় গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং চতুষ্পাঠি-স্থাপন করিয়া অধ্যাপকত্বে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর ন্যায়শাস্ত্রের সম্যক্‌রূপে অধ্যয়নার্থ ছাত্রগণ নবদ্বীপে আসিতে আরম্ভ করিলেন; অধিক কি মিথিলা হইতেও দলে দলে ছাত্র নবদ্বীপে আসিলেন। পরে বাসুদেবের ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি সাক্ষাৎ পরম্পরায় ছাত্রগণ নূতন পথের আবিষ্কার করিয়া অনেক ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন; তদ্দর্শনে ন্যায়দর্শনাধ্যায়নার্থী প্রায় সকল ছাত্রই নবদ্বীপে অধ্যয়নার্থ উপস্থিত হইল, মিথিলা প্রদেশ প্রায় ছাত্রশূন্য হইল; সেই সময় হইতেই নবদ্বীপ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়নের শীর্ষস্থান অধিকার করিল।

পরে বঙ্গদেশে ত্রিবেণী, ভট্টপল্লী, বাকলা, বিক্রমপুর প্রভৃতি অনেক স্থানেই ন্যায় চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হইল।

এক্ষণে ন্যায় দর্শনের উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে সকল স্থানই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে ; যে নবদ্বীপ অধ্যয়নের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল সেই নবদ্বীপ উপযুক্ত অধ্যাপকের সামান্যাভাবে ঘোর তিমিরাবৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে নবদ্বীপেশ্বরী পোড়ামার কৃপাদৃষ্টিতে একদিনও উপযুক্ত অধ্যাপক-স্রোত বন্ধ হয় নাই ; একজন উপযুক্ত অধ্যাপকের তিরোভাব-সময়ে অপর একজন উপযুক্ত অধ্যাপক সেই অধ্যাপকের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অনেক অধ্যাপকই নবদ্বীপে প্রাধান্য পাইয়াছিলেন, পরন্তু সকলের উল্লেখ না করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম উল্লিখিত হইল,—বাসুদেব সার্ব্বভৌম, তৎপরে রঘুনাথ শিরোমণি, পরে যথাক্রমে হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার, রামভদ্র সার্ব্বভৌম, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ বেদান্তবাগীশ, হরিনাম তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্য, গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ, শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার, জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতি, বুনো রামনাথ, রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন, হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, শঙ্কর তর্কবাগীশ, শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, কাশীনাথ চূড়ামণি, শ্রীরাম শিরোমণি, হরমোহন তর্কচূড়ামণি, পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন ; ইঁহারা সকলেই প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন এবং সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভা সম্পন্ন ছিলেন,—ইঁহাদের প্রতিভাতে নবদ্বীপ আলোকিত হইয়াছিল ;—কেবল নবদ্বীপ নয়, ভারতবর্ষ আলোকিত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্ত হয় না। পরে মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম ও মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন এই উভয় দ্বারা শিবরাত্রি-প্রদীপের ন্যায় কথঞ্চিৎ নবদ্বীপ রক্ষিত হইয়াছিল। তৎপরেই নবদ্বীপ ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন। পরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নগণ্যাতিনগণ্য খদ্যোতপ্রতিভা অপেক্ষাও ন্যূনপ্রভা-সম্পন্ন আমি "নিরস্ত পাদপদেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে" এইরূপ কয়েক বৎসর নবদ্বীপে প্রধান নৈয়ায়িক পদে নিযুক্ত আছি। আমি প্রভাশূন্য, আমার দ্বারা নবদ্বীপ আলোকিত হইবার সম্ভাবনা কি ? তবে ইহা বলিতে পারি, নবদ্বীপ আলোকিত না হইলেও নবদ্বীপে ঘোরান্ধকারের দৃঢ় আক্রমণ নিবারিত হইয়াছে। আমার তিরোভাবের সময় উপস্থিত ; আমার তিরোভাবের পর আমার

পদে অধ্যাপক নিযুক্ত করা মহামহিম কর্ত্তৃপক্ষের চিন্তার বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

আশীর্ব্বচন। *

চুণীলাল বসু।

বিদ্যাগৌরভ-সাধিত-গৌরব
ভারত-গৌরব হেতো,
জয়তি যশস্তে জগতি সমস্তে
ভারতশুভশতসেতো।
নগরী-নায়ক পদবীদায়ক
বসুধাপতিরতিধীরঃ
গুণিগণগণনা সুবিহিতবিধিনা
জয়তি নয়জ্ঞো বীরঃ।

যতীন্দ্রনাথ বসু।

বিদ্যাবতাং বর নরেশ যতীন্দ্রনাথ,
বঙ্গব্যবস্থিতিসদস্যপদং ত্বমাপ্তঃ।
তস্মাৎ প্রমোদসহিতা সমিতিস্তবেয়ং
সম্মাননাং বিতনুতে বিজয়ং লভেথাঃ

ফণীন্দ্রলাল দে।

ফণীন্দ্রলাল প্রিয়পৌরুষো ভবান্
বঙ্গীয়নীতেঃ সমিতৌ বৃতো হি যৎ।
তদস্ত তে পাটবমেব শংসতি
প্রমোদপুষ্পাঞ্জলিরেষ গৃহ্যতাম্॥

"ইউনিয়ন ক্লাব" কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

সাংখ্যদর্শন

অধ্যাত্ম-তত্ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য হিন্দুর প্রধানতঃ ছয়টী দর্শন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; মহর্ষি কপিল সাংখ্য, বেদব্যাস বেদান্ত, অক্ষপাদ গোতম ন্যায়, মহর্ষি পতঞ্জলি পাতঞ্জল, কণাদ উলুক বৈশেষিক ও মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত মীমাংসা দর্শন হিন্দুকে অধ্যাত্ম জগতে যাইবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

উক্ত ষড়্দর্শনের সহিত পার্থক্য থাকিলেও এতদ্ব্যতীত পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, আর্হত দর্শন, নকুলীশ পাশুপতদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, রামানুজদর্শন, শৈবদর্শন, শাঙ্করদর্শন, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ও রসেশ্বরদর্শন এবং চার্ব্বাকদর্শন আছে।

সকলের প্রতিপাদ্য বিষয় অমোঘ যুক্তি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষবৎ দর্শন,—ইহাই দর্শনশাস্ত্র বলিয়া কথিত; অর্থাৎ যাহা চাক্ষুষ জ্ঞানের ন্যায় প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ হয় তাহাই দর্শন। আচার্য্যদিগের এ সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ থাকিলেও শেষে যে কোনও উপায়ে দর্শনের প্রত্যক্ষতা ত স্বীকার করিতে হইয়াছে! যাহা হউক, আমি সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে দু একটি কথা বলিতেছি—মূল প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র; চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; মনঃ; ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত; ও পুরুষ। ইহাদের মধ্যে পুরুষ ভিন্ন সকলেই জড়। কেবল পুরুষই চেতন বলিয়া অভিহিত। সাংখ্যমতে জগৎ মিথ্যা নহে, সত্য। পুরুষ কর্ত্তা নহে; কিন্তু নিত্য ও বহু। পুরুষ এক হইলে একজনের জন্ম কিম্বা মরণে সকল দেহেই জন্ম মরণ বা সুখ দুঃখাদি ঘটিত। তাই শরীর ভেদে পুরুষ বহু স্বীকার করিতে হইয়াছে।

প্রকৃতির দ্বারাই জগতের কার্য্য সমূহ সম্পন্ন হইতেছে। চিত্তবিষয়ক, বজ্রপাতাদি বিষয়ক ও ব্যাঘ্র সর্পাদিবিষয়ক দুঃখকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ কহে। এই ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তি হইলেই মোক্ষ লাভ করা যায়। কিরূপে এই দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি হয় তাহাই সাংখ্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গ যোগাদি দ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায়। মোক্ষ আর কিছু নহে,—দুঃখনিবৃত্তি। ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই। তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ অভাব। সাংখ্যদর্শনের সহিত পাতঞ্জল দর্শনের এইটুক প্রভেদ যে পাতঞ্জলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, সাংখ্যে তাহা হয়

নাই। যোগের বিষয় পাতঞ্জল দর্শনে বিস্তৃত ভাবেই বর্ণিত আছে। পদার্থ নির্ণয় বিষয়ে উভয়েই এক মত গ্রহণ করিয়াছেন।

মানব স্বতঃই কর্ম্মশীল। কর্ম্ম না করিলে মানুষ থাকিতে পারে না, কেননা মানব রজোপ্রধান ও ক্রিয়াশীল; সুতরাং রজোগুণ প্রধান থাকায় আবালবৃদ্ধ সকলেই স্বাভাবিক কারণে যে কোনও একটি না একটি, কার্য্য করিতে থাকে। নিদ্রিতাবস্থায়ও আমরা শ্বাস প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া দেখিতে পাই।

মানব নিয়ত সুখের অনুসন্ধান করে,—কেহ ইচ্ছা করে না যে আমার দুঃখ হউক; সেই সুখ লাভ করিতে হইলে আমাদের বহুবিধ দুঃখ সহ্য করিতে হইবে। দুঃখকে দূর করিয়া যখন সুখের অনুসন্ধান করিতে হইবে, তখন পরিশ্রম না করিলে উপায় নাই। শত পরিশ্রমের পর যখন ঐ কার্য্যের ফল পাওয়া যায় তখন মনে যে বিমল সুখের উদয় হয়, তাহাতে পরিশ্রম জনিত যে কষ্ট তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইতে হয়। সে এক নূতনত্ব ও অভাবনীয় আনন্দ। কিন্তু অনায়াসে প্রাপ্ত বস্তুর জন্য তাদৃশ আনন্দ পাওয়া যায় না; তাই দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে যিনি যত অধিক শ্রম করিতে পারিবেন তিনি তত অধিক সুখের অধিকারী হইতে পারিবেন। দর্শনশাস্ত্র অনন্তপার। সারা জীবন ধরিয়া এক একখানি দর্শন লইয়া গভীর গবেষণা করিলেও তাহা শেষ হয় না। এ সম্বন্ধে দু চারি কথায় সাধারণকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

তবে ইহাতে ভয়ের কারণ নাই, দূর হইতে মনে হয় যাহা সারাজীবন ধরিয়া আলোচনা করিলে শেষ হয় না, তাহার সম্বন্ধে গবেষণা নিষ্ফল হইয়া যাইবে। যেমন ইক্ষুকে যত চর্ব্বণ করিবে, ততই মিষ্টত্ব অনুভূত হইবে, সেইরূপ দর্শনশাস্ত্র লইয়া যতই আলোচনা করিবে, ততই মধুর হইতে মধুরতর রস আস্বাদান করিতে পারিবে; আলোচনার পরিণতিতে বিমল সুখ, এ সুখ সাধারণের উপভোগ্য নহে। আজকাল বিজ্ঞানের সাহায্যে নানা রূপ কল কারখানা আবিষ্কৃত হইতেছে, জগতে প্রত্যেকের প্রয়োজন নির্ব্বাহ হইতেছে। পরমাত্মবিষয়ক চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই, এ কথা ঘোর সংসারী জীবের পক্ষে কিছু মাত্র নিন্দনীয় নহে। কিন্তু ইহা ঠিক যে আমরা আত্মপরিজনকে আত্মার প্রিয় বলিয়াই তাহাদিগকে ভালবাসি,—তাহারা যাহার প্রিয় সেই আত্মার অনুসন্ধান না করা মোহান্ধ জীবের চরম ফল।

জরামরণাদির সময় মানবের ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠে। জরামরণে মানবের ভয় স্বাভাবিক, কেননা উহা যে দুঃখাত্মক। দুঃখাত্মক কালে যখন বিজ্ঞানাদির উদ্ভাবক শক্তির জোর থাকে না, তখনই কে যেন অন্তর হইতে বলিয়া দেয় এতদিন তুমি বৃথাই শ্রম করিয়াছ;—এখানে যুক্তি তর্কের অবসর নাই, আত্মকৃত দুষ্কৃতের অনুশোচনাই তখন সার হইয়া থাকে। এ অল্প অনুশোচনায় সুফলের আশা তখন দূর হইয়া যায়। মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন জীব আত্মচিন্তাবিষয়ক ত্রুটী বুঝিতে পারে না। আমরা জগতে যাহা দেখিতেছি তাহার প্রত্যেকেরই এক একটি কর্ত্তা দেখিতে পাই,—যেমন ঘট দেখিলে তাহার কর্ম্মকর্ত্তা কুম্ভকার, মঠ দেখিলে তাহার কর্ত্তা নির্ম্মাতা,—এইরূপ প্রত্যেক পদার্থেরই এক একজন কর্ত্তা আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়ে। তেমনি এমনই অনেক পদার্থ আছে যাহার কর্ত্তা আমরা চোখে দেখিতে পাই না, সেই অতীন্দ্রিয় পদার্থগুলি কেবল অনুমানের দ্বারাই ঠিক করিয়া লইতে হয়। আমরা জগৎরূপ কার্য্য দেখিতে পাইতেছি,—ইহা কিরূপে সম্পন্ন হইতেছে কেহ কি বলিতে পারেন? সেগুলি অতীন্দ্রিয় বিষয় বলিয়া আমরা তাহা জানিতে পাই না; কিন্তু ইহা ঠিক যে সে সকল কার্য্যের নিশ্চয়ই কোন না কোন কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, বিনা কারণে কখনও কার্য্য সংঘটিত হইতে পারে না। দুগ্ধ হইতে যে দধি উৎপন্ন হয়, মৃত্তিকা হইতে বিভিন্ন পদার্থ অর্থাৎ ঘট, কুম্ভাদি প্রস্তুত হয়,—ইহা কি প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন? প্রকৃতি বিকৃতিরূপে ভিন্ন হইলেও বাস্তবিক বিভিন্ন নহে, অবস্থান্তরভেদে পৃথক মাত্র; সুতরাং কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন নহে; অতএব জন্মের পূর্ব্বে সকলই সূক্ষ্মকারণ রূপে বিদ্যমান থাকে। তাই সাংখ্যে কারণ ও কার্য্য উভয়ই সৎ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা সাংখ্যাচার্য্যেরা বলিয়াছেন যে, যে সকল বৈধ হিংসা করা হয় তাহাতেও পাপ স্পর্শ করিবে। বৈধহিংসায় যেমন পুণ্যফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, তেমনই কিছু কিছু যে পাপ হয় তাহাও কথিত হইয়াছে। বৈধহিংসা যজ্ঞেই করা হয়। ঐ যজ্ঞের আবার স্বর্গ ফল। অমৃতময় স্বর্গসুখ অনুভব করিলে যজ্ঞকর্ম্মে বৈধহিংসাজনিত সামান্য পাপকে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু স্বর্গ চিরস্থায়ী নহে, তাই ভগবান বলিয়াছেন যে 'স্বর্গগামিগণ বিশাল স্বর্গ সুখভোগ করিয়া পুণ্যক্ষীণতাবশতঃ আবার মর্ত্ত লোকে প্রবেশ করেন'। সুতরাং ঐরূপ

মাত্র বিবেকজ্ঞান না হইলে কোনদিকেই সুখ নাই। তাই বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—"ক্লেশসলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্ম্মবীজাঙ্কুরং প্রসুবতে; তত্ত্বজ্ঞাননিদাঘনিপীত সকলক্লেশসলিলায়ামুষরায়াং কুতঃ কর্ম্মবীজানামঙ্কুরপ্রসবঃ।" অর্থাৎ ক্লেশরূপ জলে সিক্ত বুদ্ধিরূপ ভূমিতেই কর্ম্মরূপ বীজ হইতেই সুফল রূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তত্ত্বজ্ঞান রূপ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে সকল ক্লেশরূপ জল শুষ্ক হইলে বুদ্ধিক্ষেত্রে উষর অর্থাৎ ক্ষারময় হইয়া যায়; সুতরাং সেই ক্ষারাত্মক ক্ষেত্রে অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা নাই।

এ সম্বন্ধে সারাজীবন ধরিয়া লিখিলে বা চিন্তা করিলেও তাহা সম্পূর্ণ হইবার নহে। সাংখ্যদর্শনে নানা যুক্তি তর্ক দ্বারা প্রতিবাদীর মত খণ্ডন যে কত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বারান্তরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা আছে।

মহামহোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহামহোপদেশক—শ্রীসদাশিব মিশ্র শর্ম্মা।

সংস্কৃত সংলাপ কাব্যম্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সংস্কৃতম্।

১২। চিন্তাদেবী—যথা প্রতিজ্ঞাতং ময়া, তথা ব্যাখ্যাতমণুকাব্যং। ব্যাখ্যাতব্যম্। যাবৎ প্রাপ্তং ময়া। দিষ্ট্যা (আনন্দে) মতিমন্, একং বচঃ পৃচ্ছ্যতে ভবান্। যথা বর্ণ্যতে ময়া, তৎকথঞ্চিদ্ যুক্তং ভবতি কচ্চিৎ। মাদৃশানাং বচসো যুক্ততা যুক্ততয়ো নির্ণয়ে ভবাদৃশাং সূক্তিরেব নিকষঃ। অর্থাদ্ ভবাদৃশৈ র্যদুচ্যতে, ওম্, প্রকৃতমভূদেতদিতি, তর্হি মন্তব্যং, প্রকৃতমেব জাতমিতি। তদ্-বৈপরীত্যেতু, বিপরীতমেবাঙ্গী কর্ত্তব্যমিতি। তদেব জিজ্ঞাস্যতে। ভবতা তাবৎ কীদৃশং বিবেচ্যতে মদ্বর্ণনং। সাধ্বসাধুবেতি॥

ইতি প্রস্তাবস্য পূর্ব্বার্দ্ধম্।

অনুবাদ।

১২। চিন্তা দেবী বলিতেছেন—যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলাম, সেইরূপ সংক্ষেপে অণুকাব্যের মর্ম্ম কি, তাহা বর্ণিত হইল। আমি এক্ষণে এই রীতি

অনুসারে স্তুতি নীতি প্রভৃতি খণ্ডকাব্যগুলি যাহার এক একটী কণ, সেই কণ-কাব্যেরও মর্ম্ম বর্ণন করিব। অর্থাৎ যে যে মর্ম্মে কণ-কাব্যলিখিত হইয়াছে তাহাও সংক্ষেপে বর্ণন করিব;—কণকাব্যের যে পর্য্যন্ত আজ অবধি আমার হস্ত-গত হইয়াছে। আচ্ছা পণ্ডিতজি, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি! আমি যে এই বর্ণন করিতেছি, এটা এক প্রকার হচ্চে তো! আমাদের মত ব্যক্তির কথা গুলো কতদূর সঙ্গত বা অসঙ্গত, এ বিষয়ের নির্ণয় করিতে হইলে আপনাদের মত মহাত্মবর্গের বিশুদ্ধ বাক্যই হচ্চে কষ্টিপাথর। অর্থাৎ আপনারা যদি বলেন, যে হাঁ ঠিক হইয়াছে, তাহা হইলে মনে কর্ত্তে হইবে, যে ঠিকই হয়েছে। আর আপনারা যদি বলেন যে না, কিছুই হয় নাই, তাহা হইলে তাই স্বীকার কর্ত্তে হবে। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি। আপনি আমার এইরূপ বর্ণনাটাকে কিরূপ বিবেচনা করেন। এক রকম হচ্চে,—না কিছুই হচ্চে না। ইতি।

সংলাপকাব্যের উদয়ের হেতুভূত প্রস্তাবের পূর্ব্বার্দ্ধ ব্যাখ্যাত হইল।

সংস্কৃতম্।

অথোত্তরার্দ্ধং প্রস্তাবস্য।

১৩। উপাধ্যায়ঃ—দেবি, সম্যক্ প্রণিহিতমনসা শ্রুতং ময়া। সুসমীচীন মেবাভূদ্ ভবৎকৃত সমালোচনমিতি মে বিশ্বাসঃ। অয়মেকো মহত্তর প্রশংসা-বিষয়স্তে বর্ণনায়াম্। যৎ, গ্রন্থানাং প্রতিপাদ্যবিষয়মাত্রস্য প্রতিপাদনায় প্রত্যেকং সর্ব্বেভ্য একশঃ শ্লোকাঃ সমুদ্ধৃতা স্তেষাঞ্চ যথাকথঞ্চিৎ মর্ম্মমাত্রা-বগতায় তাৎপর্য্যমাত্রং বর্ণিতং, ন ব্যাখ্যানাদিকং কৃতমিতি। অতীব সুষ্ঠু কৃতমেতৎ। কারণম্। দৃষ্টান্তপ্রদর্শনমন্তরেন সুষ্ঠু নাববুধ্যতে লোকৈরভিহিতো বিষয়ঃ। প্রাসঙ্গিকবিষয়ানাঞ্চ বিস্তৃতৌ রসদোষঃ স্যাৎ। বিরক্তিকরত্বাৎ শ্রোতৃণাং, মুখ্যবিষয়াবধারণব্যাঘাতকত্বাচ্চ। অতএবায়ং নিয়মঃ। মুখ্যবিষয় এব যথাবদ্ বর্ণনীয়ঃ। আনুসঙ্গিকস্তু ন তথা। তে তু কেবলং অব্যক্ততা-দোষনিরাসায়, মর্ম্মমাত্রাবগতয়ে চ যথাকথঞ্চিৎ প্রকাশিতার্থাঃ করণীয়াঃ।

বরবধ্বোর্হি সৌন্দর্য্যং দিদৃক্ষন্তে যথা জনাঃ।
ন তথা দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি তৎ কন্যা-বর-যাত্রিনা মিতি ॥
অহমিদানী মীদৃশবীতাা শ্রুত-কণকাব্য-সমালোচনঃ প্রীয়েয়েতীচ্ছামি।

অনুবাদ।

১৩। উপাধ্যায় বলিতেছেন:—দেবি, আমি খুব মনোযোগের সহিত শুনিয়াছি। আপনি যেরূপ সমালোচনা করিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, তাহা খুবই ভাল হইয়াছে। আপনার সমালোচনায় এই একটা খুব বড় গোছের প্রশংসার বিষয় যে, গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়টী যাহাতে সহজে লোকের বোধগম্য হয়, এইজন্য গ্রন্থের বড় বড় অংশ হইতে এক একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন; আর সেই উদ্ধৃত শ্লোকগুলির যে কোনওরূপে একটু মর্ম্মগ্রহের জন্য তাহাদের তাৎপর্য্যমাত্রই কেবল বর্ণন করিয়াছেন, বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করা হইয়াছে। এটা আপনার খুব ভাল করা হইয়াছে। কারণ কি? দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করিলে বর্ণিত বিষয়টা লোকে ভালরূপে বুঝিতে পারে না; আবার যে বিষয়গুলা প্রাসঙ্গিক, সেই বিষয়গুলাকে বেশী বিস্তার করাও ভাল নয়, বেশী বিস্তার করিলে রসদোষ হয়, শ্রোতাদের বিরক্তিকর হয়, এবং মুখ্য বিষয়টীর ভালরূপে বোধ হয় না। অতএব, বর্ণনার নিয়মই হচ্চে এই যে, বর্ণনীয় বিষয়গুলির মধ্যে যে বিষয়টী প্রধান, সেই বিষয়টীরই খুব ভালরূপে বর্ণন করিতে হয়; আর যে বিষয়গুলি আনুসঙ্গিক, সে গুলির সেরূপ বর্ণন না করিয়া সেই গুলির কেবল অব্যক্ততাদোষের নিরাস, এবং মর্ম্মমাত্রের অবগতির জন্য যে কোনও রূপে অর্থাৎ সামান্যাকারে অর্থটী মাত্র প্রকাশ করিতে হয়। যে হেতুক, বিবাহোৎসবে—প্রধান দৃশ্য হচ্চে বর এবং বধূ; সমাগত ব্যক্তি সমুদয় এ উভয়ের সৌন্দর্য্যই খুব ভালরূপে দেখিতে ইচ্ছা করে; সেই উভয়ের সৌন্দর্য্য যত ভালরূপে দেখিতে চায়, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদিগের সৌন্দর্য্য তত ভালরূপে দেখিতে চায় না।

আমি এক্ষণে এইরূপ সংক্ষেপে কণকাব্যের সমালোচনা শুনিয়া প্রীত হইতে ইচ্ছা করি।

শ্রীসীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি—(মহামহোপাধ্যায়)।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। *

আজ যে মহাত্মার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য আমরা এই সভাস্থলে সমবেত হইয়াছি, তিনি আমাদের সকলেরই নিতান্ত পরিচিত ছিলেন। কৃষ্ণবর্ণ চাপকান ও দেশীয় টুপী পরিহিত তাঁহার সৌম্য উদার মূর্ত্তি ইদানীং কলিকাতার বহু সভাস্থলের নিত্য সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার অমায়িকতা সরলতা ও সৌজন্য বহুকাল আমাদের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবে এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণা তাহাকে বিদ্বজ্জগতে অমরত্ব প্রদান করিবে।

আচার্য্য সতীশচন্দ্র ১৮৬৯ খৃঃ অঃ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত খানাকুলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য স্কুল হইতে ১৮৮৫ খৃঃ অঃ মধ্য ইংরেজী পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হন। তিন বৎসর পরে ঐ স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। পরে কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে এফ্-এ, ও বি-এ, পাশ করিয়া এম-এ পড়িবার নিমিত্ত কলিকাতায় আসেন। ১৮৯২ সালে বি-এ, পরীক্ষায় তিনি সংস্কৃতে অনার পাইয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় পরীক্ষা দেওয়াতে তিনি পরবর্ত্তী বৎসরে সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাইতে পারেন নাই; দ্বিতীয় বিভাগে সর্ব্বশেষ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০১ সালে তিনি পালিভাষায় এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মান Doctor of Philosophy (Ph. D.) নামক উপাধিতে ভূষিত হন। এতদ্ব্যতীত তিনি নবদ্বীপ-পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট হইতে বিদ্যাভূষণ ও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন।

সতীশচন্দ্র জীবনে অনেক উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সিণ্ডিকেটের সদস্য এবং এসিয়াটিক সোসাইটির Joint Philological Secretary ছিলেন। তিনি বহুকাল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি

---

* "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে" পঠিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। গত বৎসর পুনা নগরীতে নিখিল ভারতবর্ষীয় প্রাচ্য বিদ্যা সম্মিলনীতে তিনি সহকারী সভাপতি ও শাখা সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং সার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের অনুপস্থিতিতে সভাপতির কার্য্যও নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন।

যে পাণ্ডিত্য গুণে আচার্য্য সতীশচন্দ্র এই সমুদয় সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাহার সম্যক পরিচয় দিবার সাধ্য আমার নাই,—আর এই সভাস্থলও তাহার প্রকৃষ্ট স্থান নহে। কিন্তু একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে এই বিংশ শতাব্দীতে যে সমুদয় ভারতবাসী জ্ঞান-গৌরবে জগতের পণ্ডিত-সমাজে সুপরিচিত, সতীশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ স্থানের অধিকারী। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল। তিনি সংস্কৃত, পালি ও তিব্বতীয় ভাষা, এবং বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম সাহিত্যে সম্যক পারদর্শী ছিলেন। তিব্বতীয় সাহিত্য ও প্রাচীন ভারতের ন্যায়শাস্ত্রই তাঁহার বিশেষ চর্চ্চার বিষয় ছিল, কিন্তু প্রসঙ্গতঃ তিনি অন্যান্য বিষয়েরও আলোচনা করিতেন।

ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে "Mediæval School of Indian Logic" নামক তাঁহার গ্রন্থ জগতের বিদ্বজ্জনগুলীর নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি তিনি ইহার বহু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে নিযুক্ত ছিলেন। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি ইহার শেষ প্রুফ দেখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বঙ্গদেশের ও লণ্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার বিশেষত্ব এই যে, ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, কিন্তু অধুনা বিলুপ্ত, বহু গ্রন্থের মর্ম্ম তিনি তিব্বতীয় অনুবাদের সাহায্যে উদ্ধার করিয়াছেন। পরোক্ষভাবে ইহা দ্বারা তিনি তিব্বতে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের ইতিহাসের এক অংশে উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটী প্রবন্ধের উল্লেখ করিতেছি। ইহা হইতে বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিব।

১। Indian Logic as preserved in Tibet (তিনটী প্রবন্ধ)

২। Sankhya Philosophy in the Land of the Lamas

৩। Dingnaga's Hetuchakra Hamaru recovered from Tibetan Source in Sikkim

এতদ্ব্যতীত ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে আরও কয়েকটী প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১। Lankavatara Sutra

২। An Analysis of the Lankavatara Sutra

৩। Descriptive List of Works on the Madhyamika Philosophy

৪। Nyaya Pravesa

৫। Dingnaga and his Pramana Samuchchaya

৬। Anuruddha Thera, a learned Pali author of Southern India

৭। Sarvajna Mitra—a Tantrik Buddhist author of Kashmir in the 8th century A. D.

৮। Influence of Aristotle on the Development of the Syllogism in Indian Logic.

তিব্বতীয় সাহিত্য হইতে তিনি ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য অনেক পুস্তকের উদ্ধার করেন। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত দুইটী প্রবন্ধে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

১। Some Rare Sanskrit Works on Grammar, Lexicography and Prosody recovered from Tibet

২। Sanskrit Works on Literature, Grammar, Rhetoric and Lexicography as preserved in Tibet

তিব্বতীয় সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া তিনি তথাকার রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে (১) Two Tibetan Charms; (২) Tibetan Almanac for 1906-7, এই দুইটীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিম্নলিখিত দুইখানি গ্রন্থ Asiatic Societyর গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

১। On Certain Tibetan Scrolls and Images lately

২। Srid-pa-ho—a Tibeto-Chinese Tortoise Chart of Divination

এতদ্ব্যতীত ডাঃ ডেনিসন রসের সহযোগিতায় Sanskrit Tibetan English Vocabulary এই নামীয় Alexander Csoma de Koros প্রণীত মহা-ব্যুৎপত্তির অনুবাদের সম্পাদন করেন—ইহাও এশিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিভাগে আচার্য্য সতীশচন্দ্রের সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বপ্রধান কার্য্য তিব্বতীয় তেঙ্গুর ও কেঙ্গুর নামক অতিকায় গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Council of Post-Graduate Teaching এই মহৎকার্য্যের ভার আচার্য্য সতীশচন্দ্রের উপর ন্যস্ত করেন—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পণ্ডিতপ্রবর সতীশচন্দ্র এই কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য বশতঃ এই মহৎ অনুষ্ঠান আবদ্ধ হইতে না হইতেই তাঁহার জীবনলীলার অবসান হয়। সতীশ-চন্দ্রের মৃত্যুতে ভারতবর্ষের কি ক্ষতি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাঁহার আরব্ধ এই সুমহৎ অনুষ্ঠানের ভার লইতে পারেন, আজ সমগ্র ভারতবর্ষে এমন একজন ব্যক্তিও নাই! এই বিপুল গ্রন্থরাজির মধ্যে ভারতীয় প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের কত অমূল্য বিবরণ নিহিত আছে, কত বিলুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—আচার্য্য সতীশচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিলে দেশ-বাসীকে এই অমূল্যরত্ন উপহার দিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে সে অনু-বাদকের স্থান শূন্য হইল,—আর কতদিনে তাহার পূরণ হইবে বলিতে পারি না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আচার্য্য সতীশচন্দ্র মুখ্যতঃ তিব্বতীয় সাহিত্য ও ন্যায়-শাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিলেও অন্যান্য বিষয়েও অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়াছেন। মহাযান ও হীনযান নামক প্রবন্ধে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের এই দুই সুপরিচিত শাখার বিশেষত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত না হইলেও, তিনি যে বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব গ্রন্থ হইতে অনেক নূতন তত্ত্বের অধ্যাহার করিয়াছেন তাহার মূল্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়াছেন। *

জৈন অঙ্গদিট্ঠিবাদের অভয়দেব কৃত টীকা আলোচনা করিয়া তিনি মনস্বী

* Nagarjuna, the Earliest Writer of the Renaissance Period নামক গবেষণা-প্রবন্ধ তিনি পুনার প্রাচ্য বিদ্যা-সম্মিলনীতে পাঠ করিয়াছেন।

বুলারের প্রাচীন ভারতীয় বর্ণমালা সম্বন্ধে মতবাদ কোন কোন অংশে সংশোধিত করিয়াছেন। প্রাচীন পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থে জগদ্বিখ্যাত রোম নগরীর যে বিবরণ আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া তিনি এ বিষয়ে একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সুদূর সিংহল দ্বীপ ভ্রমণ কালে তিনি মহাকবি কালিদাস সম্বন্ধে কতকগুলি জনশ্রুতি সংগ্রহ করেন, তদবলম্বনে Funeral Place of Kalidasa নামক এক প্রবন্ধ পুনা সম্মিলনীতে পাঠ করেন। ভারতবর্ষের জাতিতত্ব সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করিয়াছেন,—Vratya and Sankara Theories of Castes নামক প্রবন্ধ তাহার নিদর্শন। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি চিরাগত সংস্কারের পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন, এবং মনুস্মৃতিতে উল্লিখিত বিভিন্ন জাতির উদ্ভবের বিবরণ অগ্রাহ্য করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে তাহার নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন—ইহা কম সৎসাহসের পরিচয় নহে। প্রাচীন লিচ্ছবি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি একটী নূতন মতবাদের প্রচার করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষায় তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক।

একটি কথা না বলিলে সতীশচন্দ্রের বিদ্যাবত্তার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্পূর্ণরূপে অভিমানবর্জ্জিত ছিল এবং কেহ তাঁহার মতের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিলেও তিনি তাহার প্রতি বিরক্ত বা তাহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতেন না। তাঁহার চরিত্রের এই অনন্যসুলভ বিশেষত্ব অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন; আমি নিজেই ইহার পরিচয় পাইয়াছি। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পুরস্কার পাইবার নিমিত্ত আমি একটি প্রবন্ধ লিখি, তাহাতে আচার্য্য সতীশচন্দ্রের কোন মতবাদের বিশেষভাবে প্রতিবাদ করি। দৈবক্রমে আচার্য্য সতীশচন্দ্রই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ঐ প্রবন্ধের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে কোন কার্য্যবশতঃ সংস্কৃত কলেজে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি সহাস্যে এই বিষয়ের উল্লেখ করেন। আমাকে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতে দেখিয়া তিনি বলিলেন—"আপনার লজ্জার কোন কারণ নাই। আমি ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হই নাই—তবে এ বিষয়ে আমারও কিছু বক্তব্য আছে; অবসর পাইলে লিখিব"। বস্তুতই তিনি এ জন্য আমার সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন নাই, বরাবর বিশেষ স্নেহের চক্ষেই

দেখিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে ন্যায় তাঁহার এই উদারতা যে কত দুর্ল্ভ, তাঁহার এই পণ্ডিতোচিত বিদ্বেষশূন্যতার যে মূল্য কত, তাহা আমার এই জীবনের স্বল্প অভিজ্ঞতায়ও বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি।

প্রবন্ধের কলেবর বাড়াইয়া আর আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। আচার্য্য সতীশচন্দ্রের মধুর স্বভাবের কথা আপনারা সকলেই জানেন এবং তাঁহার সমবয়সী যাঁহারা এই সভায় উপস্থিত আছেন তাঁহারা তাঁহার মহৎ জীবন সম্বন্ধে আমাদিগকে অনেক কথা শুনাইতে পারিবেন ; আমার পক্ষে তাহা অসাধ্য। সুতরাং মৃত মহাত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়া আমি আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্-এ, পি-এইচ-ডি, (পি-আর-এস্)

দুর্গেশনন্দিনী

তিলোত্তমা ও আয়েষা।

চরিত্র সমালোচনা

তিলোত্তমা।

তিল তিল করি সৌন্দর্য্য উজাড়ি
গড়িলা বিধাতা তিলোত্তমা নারী।

তিলোত্তমা অপ্সরার নাম। তিল তিল করিয়া বিধাতা বিশ্বের সমগ্র সৌন্দর্য্য একস্থানে সমাহার করিয়া তবে এই রমণীরত্ন সৃষ্টি করেন। আমাদের 'দুর্গেশ-নন্দিনী' সৌন্দর্য্যে তিলোত্তমার তুল্য বলিয়া কবি ইঁহার নাম তিলোত্তমা রাখিয়াছেন।

ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।

সৌন্দর্য্যে 'দুর্গেশনন্দিনী' তিলোত্তমাকে দেখিলে মর্ত্ত্যে নারী বলিয়া একেবারেই বোধ হয় না। ইহার প্রতি অবয়বে মন্দারের অপূর্ব্ব সৌরভ, ইহার প্রত্যেক অক্ষরে বল্লকীর মনোমোহন ঝঙ্কার, ইহার ভালবাসায় অমৃতের মধুরাস্বাদ।

তিলোত্তমা ষোড়শী। যে সময়ে যে বয়সে রমণী অধিকতর প্রিয়দর্শনা, তিলোত্তমা সেই বয়সের নারী,—নবযৌবনাবির্ভাবে বড় মনোহারিণী। ভাবে কিশোরী, মুখশ্রীতে বালিকা মাত্র। অভিমানে অতি মৃদু। প্রণয়ে নিরভিমানিনী। তিলোত্তমা অলঙ্কারশাস্ত্র-নিয়মানুসারে মুগ্ধা নায়িকা;—অতীব লজ্জাবতী, মানে অতি মৃদু, প্রথমাবতীর্ণ-যৌবন-মদন-বিকারা, রতিতে বাহ্যতঃ প্রতিকুলচারিণী নারীই মুগ্ধা নায়িকা।

নিরভিমানিতা আদর্শ প্রণয়ের লক্ষণ, ইহা কবির নিজের উক্তি (মৃণালিনী) প্রেমাস্পদের সুখ-সন্তোষ নিজের সুখ-শান্তি অপেক্ষা যেখানে বড়, নিজের স্বার্থ যেখানে প্রণয়ীর স্বার্থ ও ধর্ম্মের তুলনায় ছোট, সেই খানেই নিরভিমানিতা। সংসারে ইহা সচরাচর মেলে না, স্বাভাবিকও নহে। আত্মদানই সেখানে প্রকৃত আত্মবিসর্জ্জন, আত্মত্যাগ বা আত্মবলি। সেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকের দেস্‌দিমনা চরিত্রটী নিরভিমানিতার বড় আদর্শ। এ অপেক্ষা বড় আদর্শ আর বিশ্বসাহিত্যে দেখা গিয়াছে বলিয়া জানি না। পিতার অভিশাপের ঝড়ে এ ফুল অকালে বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূমে লুটাইয়া পড়িল। অভিমান সাধারণতঃ প্রণয়ের মূল। যেখানে প্রেম, অভিমানও সেইখানে। প্রেম যত গাঢ়, অভিমান ক্ষণস্থায়ী হইলেও তত অধিক। কথায় কথায় অভিমান, আদর করিলেই সে অভিমান ভঙ্গ—ইহা প্রণয়ের মধুর খেলা। অভিমান-শূন্য প্রণয় সংসারে দুর্ল্ভ। অভিমানিনী প্রণয়িনীরা বলেন "যে প্রেমে অভিমান নাই, তরঙ্গোচ্ছ্বাস নাই—সেই শান্ত স্থির প্রেম কি আবার প্রেম?" এই প্রেমেরও দুইটী আদর্শ,—এক শ্রীরাধা, অপর ভ্রমর। "শ্রীরাধা-তত্ত্ব" (নব্যভারতে ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায়) এবং "ভ্রমর" (অর্চ্চনায় ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত) প্রবন্ধে সে আদর্শ বুঝাইয়াছি। ভালবাসার জন আদরের ত্রুটী করিল, একটু ঔদাসীন্য প্রকাশ করিল, মতে মত দিল না, অমনিই অভিমান। অভিমানে কষ্ট সুখ! আবার সেই অভিমান ভাঙ্গা হইলে যে সুখ, তাহা অনির্ব্বচনীয়!

তিলোত্তমা প্রেমের মাধুর্য্য মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, যেন চন্দ্রপ্রভা মূর্ত্তি ধরিয়া পৃথিবীতলে অবতীর্ণা। তাহার সৌন্দর্য্য বাসন্তী মল্লিকার মত নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল পরিমলময়। তাহার প্রেমও নবমল্লিকার মত মত নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল পরিমলময়। সে প্রেমে মাধুর্য্য আছে, কিন্তু দাহ নাই।

সে রূপে মানুষ মুগ্ধ হয়, কিন্তু পুড়িয়া মরে না। মগ্ন প্রেমের বিপুল আত্মবিস্মরণ বড় মিষ্ট, বড় মনোমোহন।

বয়সে তিলোত্তমা কিশোর ও যৌবনের সীমানা পার হইয়া যৌবনের প্রথম স্তরে পা দিয়াছে, কিন্তু মনোবৃত্তি ও বুদ্ধি বালিকার মতই আছে। দেহে যৌবনের শোভা, মুখখানি কিন্তু বালিকার মত নির্ম্মল, চাতুর্য্যশূন্য!—সরমে কুণ্ঠিত, ভয়ে জড় সড় মিলনে আত্মহারা, প্রণয়ে বিবশ, অথচ নিরভিমান—এমন চরিত্র সংসারে কয়টা মেলে?

তিলোত্তমার নূতন প্রেম রূপজ, অথচ অকৃত্রিম। আমাদের প্রাচীন কবিগণ রূপজ প্রেমকেই মদন-শরজ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; এই প্রেমের অপর নাম চক্ষুরাগ। তাই তিলোত্তমা প্রথম দর্শনেই অবগুণ্ঠন কিয়দংশ অপসৃত করিয়া জগৎসিংহের দিকে অনিমেষ-লোচনে চাহিয়াছিল, ভাবনা চিন্তা না করিয়া একেবারে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। এই ভালবাসা প্রথমাবস্থায় একেবারেই আত্মহারা করাইয়া দেয়; এই ভালবাসাই দিনের পর দিন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; শেষে আবার গুণের আকর্ষণে বদ্ধমূল গুণজ প্রেমের আকার ধারণ করে। এক এক জাতীয় চরিত্র আছে - ভাবের ভরেই বাহিয়া চলে, হৃদয়ের টানেই ভাসিয়া যায়! তিলোত্তমা এইরূপ জাতীয়।

তিলোত্তমার রূপালোক বালেন্দুজ্যোতির মত সুবিমল, সুমধুর ও সুশীতল। সে রূপালোকে প্রেমের খেলা বেশ খেলা চলে, জীবনের আঁধার দূর হয়—কিন্তু তাহার দ্বারা সংসার-কার্য্য করা যায় না, জীবন-সংগ্রামে সহায়রূপী হইয়া জয়ী বীরের বীরকার্য্যের উদ্দীপনার মত হয় না। ক্ষত্রিয় কন্যা বাঙ্গলার জল-বায়ু-বাতাসের মাহাত্ম্যে বাঙ্গালির মেয়ের মত হইয়া দাড়াইয়াছে,—বীরাঙ্গনা কোমলাঙ্গনা হইয়াছে। তিলোত্তমার চক্ষু দুটী সর্ব্ব সময়ে শান্ত, স্থির; সে চক্ষুতে কোন দিনই যৌবন-সুলভ চাপল্য, রাজকন্যোচিত চাতুর্য্য দেখা যাইত না। সে চক্ষুতে বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরণ-চকিত কটাক্ষ খেলিত না, যৌবনের হাব ভাব বিলাস বিভ্রম ছল কলা—এ সকল একেবারে ছিল না; সে দৃষ্টি সায়াহ্ন আকাশের নক্ষত্রের মত। তিলোত্তমা সঞ্চারিণী লতার মত ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ করিত; তাহার গতি অতি মৃদু, গজেন্দ্রগতির সহিত তাহার তুলনা হইত না। তিলোত্তমা তন্বী; সুললিত সুগঠিত, কিন্তু তথাপি সে ক্ষীণা। গজেন্দ্রগমনা নহে বলিয়া

তাহার গতি যে গজেন্দ্রগমনাদির তুলনায় অনুৎকৃষ্ট, তাহা নহে। তিলোত্তমার হৃদয় শিরীষ ফুল অপেক্ষাও সুকোমল; কোমল বলিয়াই ভালবাসার দাগ তাহাতে দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল। মদনশর অবসর বুঝিয়া তীক্ষ্ণলৌহ-শলাকার মত মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল। তিলোত্তমা বড় সরলা—তাই ভালবাসার পূর্ব্বে কোন বিচার কোন দ্বিধা কিছুই করিল না। সে বালিকা—তাই লতা পাতা আঁকিতে বসে। সে কিশোরী, নব প্রণয়বতী—তাই কুমার "জগৎসিংহ" লিখিয়া ফেলিয়া লজ্জায় রাঙ্গা, ভয়ে চোর হইয়া যায়। সে যৌবন-মদন-বিকারা—তাই গীতগোবিন্দ পড়িতে পড়িতে সলজ্জ ঈষৎ হাসিয়া পুস্তক ছুঁড়িয়া দেয়। তিলোত্তমার প্রাণ যেমন দুর্ব্বল, তেমনই ভয়াতুর; তাই সে মোগল-আক্রমণ সংবাদেই একেবারে চীৎকার করিয়া পালঙ্কের উপর মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল।

তিলোত্তমা ভাবময়ী নারী। বীণার ঝঙ্কারের মত সে জগৎ সিংহের কণ্ঠলগ্ন হইল, কিন্তু ভেরীধ্বনির মত বীরের উৎসাহ বর্দ্ধন করিল না। যুদ্ধের শেষে শান্তির মত, শ্রমের অবসানে বিশ্রামের মত সে জগৎ সিংহের প্রিয়া হইল, কিন্তু বীরত্বের সহায়রূপা হইয়া দাঁড়াইল না।

আয়েষা।

আয়েষা স্থিরা ধীরা সংযত-হৃদয়া মহীয়সী নারী; বেহেস্তের বাণী যেন মূর্ত্তি ধরিয়া ধরায় অবতীর্ণা। মুখে দেবীর করুণা, ভঙ্গীতে সম্রাজ্ঞীর জ্যোতি। সেই উন্নত আকার, সেই সুপরিপুষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সেই নবসূর্য্যকরোজ্জ্বল বর্ণ, আর সেই মহিমময় পদবিন্যাস সম্রাজ্ঞীর উপযুক্ত। অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুশাসনে আয়েষা "মধ্যা" নায়িকার অন্তর্গত। প্ররূঢ়স্মরযৌবনা ঈষৎপ্রগলভবচনা মধ্যমব্রীড়িতা নারীই মধ্যা নায়িকা। তিলোত্তমা মুগ্ধা ও স্ফুটনোন্মুখী; আয়েষা মধ্যা ও পূর্ণ-যৌবনা। আয়েষার বাক্য বীণাধ্বনিবৎ মধুর, সুস্পষ্ট, স্থান বিশেষে ঈষৎ প্রগলভ না নির্লজ্জা, না তিলোত্তমার মত সমধিক লজ্জাবতী,—কাজেই মধ্যম রকমের লজ্জাশীলা। আয়েষা দ্বাবিংশতি বৎসরের; এই কারণে সে ফুট ফুটি না ফোটা ভাব, সেই আধলজ্জা আধ[illegible] চলিত শঙ্কা ভাব তাহাতে থাকা সম্ভব নহে।

আয়েষার সৌন্দর্য্য নবরবিকরফুল্ল জলনলিনীর ন্যায় সুবিকশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, সৌরপ্রদীপ্ত, কোমল অথচ উজ্জ্বল; তাহার রূপ ভুবনমনোমোহন পূর্ব্বাহ্নের সূর্য্যরশ্মির মত প্রদীপ্ত প্রভাময়,—অথচ যাহাতে পড়ে তাহাই হাসিতে

থাকে। আয়েষা রাজোদ্যানের বসোরা গোলাপ,—ধ্যানলভ্যা আরাধ্যা মূর্ত্তি; প্রথম দর্শনেই জগৎসিংহের নিকট দেবকন্যাবৎ প্রতীতা। তাহার সমীরণকম্পিত নীলোৎপলদলতুল্য কটাক্ষের প্রতি জগৎসিংহ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। তাহার লীলাময় সঙ্গীতমধুর পদবিন্যাস, বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ মেঘবৎ চঞ্চল দৃষ্টি, জ্যোৎস্নারূপবৎ সুন্দর প্রদীপ্ত হাসি, আর লাবণ্যময় গ্রীবাভঙ্গী তাহাকে অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব দিয়াছিল। তাহার প্রকৃতি পুষ্পের মত যেমন কোমল, আঘাত প্রাপ্ত হইলে তেমনই বজ্রের মত কঠোর হইয়া উঠিত; ধরার মত সাধারণতঃ ধীর, কিন্তু কদাচিৎ ভূমিকম্পের মত প্রবল ধাক্কায় সে প্রকৃতির ধৈর্য্য লোপ পাইত; সে সময়ে তাহার মূর্ত্তি প্রখরা, জ্বালাময়ী, মহিমময়ী এবং এক অপরূপ শক্তিসৌন্দর্য্যবতী হইয়া দেখা দিত।

আয়েষা তিলোত্তমার মত জগৎসিংহকে দেখিবামাত্র মুগ্ধা ও অনুরক্তা হইয়া পড়ে নাই বা তাঁহার রূপসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ভালবাসিয়া ফেলে নাই। তাহার ভালবাসা একক্ষণে একদিনে গড়িয়া উঠে নাই; একটু একটু করিয়া ধীরে ধীরে গোপনে ছদ্মবেশে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল; ক্রমে ক্রমে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া শেষে একদিন সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিয়া দিয়াছিল।

বন্দী রাজপুত্রের প্রতি করুণা, মুমূর্ষুর প্রতি সহানুভূতি, ব্যথিতের প্রতি সমবেদনাই ক্রমে ভালবাসা রূপে দেখা দিল। আয়েষা জানিত, পীড়িতের সেবা করা, ব্যথিতকে সান্ত্বনা দেওয়া রমণীর ধর্ম্ম; তাই, (আর ওসমানের অনুরোধেও) সে রাজকুমারের ভার গ্রহণ করিয়াছিল। করুণায়, সমবেদনায় ও সহানুভূতিতে তাহার নারীহৃদয় দিনে দিনে দ্রবীভূত হইতে লাগিল; সুপুরুষ সংস্পর্শে, দেবকান্তি রাজপুত্রের সাহচর্য্যে সেই দ্রবীভাব অনুরাগে পরিণত হইল। মৃত্যুর কোলে শুইয়া জগৎসিংহ যখন আয়েষাকে সান্ত্বনার মত প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিত, তখন তাহার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া যাইত; বড় আগ্রহে ব্যথাকাতর রাজপুত্র যখন আয়েষার বাহুদুটি গ্রহণ করিত, তখন তাহার নারীহৃদয় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিত; যৌবনের বৃত্তিগুলি জাগিয়া মাথা নাড়া দিত। আয়েষা তাহার বিস্ফারিত তৃষাতুর দৃষ্টি দ্বারা পলে পলে রাত্রিদিন রাজকুমারের রূপমদিরা পান

প্রাণের সমস্যা উত্তীর্ণ না হইলে আত্মদান করা ঘটিত না, মাতার নিকট হইতে তাড়া না আসিলে পীড়িতের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া যাওয়া হইত না।

আয়েষা প্রতিদানের আশা না করিয়া বা না রাখিয়াই ভালবাসিয়া ফেলিল জানিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া ত আর সে ভালবাসে নাই। নহিলে যেখানে মিলনের আশা নাই, সেখানে বুদ্ধিমতী কোন রমণী ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণ মন সমর্পণ করে! আয়েষাও অবশ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক সাধ করিয়া আপনার সর্ব্বসুখে বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হয় নাই। আয়েষা ভাবময়ী; ভাবের টানে, সংযতহৃদয়া হইয়াও সে ভাসিয়া গেল।

আয়েষা ভাবময়ী, আবার কর্ম্মময়ী। সে যেমন সঙ্গীতের ঝঙ্কারের মত কণ্ঠে থাকার যোগ্যা, তেমনই ভেরীধ্বনির মত বীরের উৎসাহ বর্দ্ধিকা। আয়েষা একাধারে যুদ্ধাবসানে শান্তি, আবার যুদ্ধাবির্ভাবে উত্তেজনা; হৃদয়ের প্রিয়া অথচ জীবনের সহায়রূপা; স্বভাবতঃ করুণারূপিনী, প্রয়োজন স্থলে তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা।

তিলোত্তমা।

তিলোত্তমা পিতৃগৃহে নবমল্লিকার মত মন্দ বায়ুহিল্লোলে বিধুত হইয়া হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইত; আর আজ সে কতলুখাঁর গৃহে থাকিয়া নৈদাঘ-ঝটিকাতে অবলম্বিত বৃক্ষ হইতে ভূতলশায়িত লতার অবস্থায় উপনীতা; মুখের সে জ্যোৎস্নামধুর হাসি কান্নায় রূপান্তরিত, চক্ষুর সে ধীর প্রশান্ত দৃষ্টি নৈরাশ্য-ভারে বেদনায় অবনত। বিষাদপ্রতিমা কোমলপ্রাণা তিলোত্তমা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শয্যায় অবসন্নভাবে শায়িতা।

দুঃখে পড়িয়া মানুষের অনেক শিক্ষা হয়; দুঃখ শোকই মানুষকে ভাল রকমেই গড়িয়া তোলে। তিলোত্তমা আর সে বালিকা নবীনা প্রণয়িনীর মত নাই; দেখিলে, দশ বৎসর বয়স বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কতলুখাঁর জন্মদিনের উৎসবে যোগ দিবার জন্য বিমলা বেশবিন্যাস করিয়া তিলোত্তমার গৃহে উপস্থিতা। তিলোত্তমার সহ্য হইল না; কহিল, "তবে মা এ সকল অলঙ্কার খুলিয়া ফেল। তুমি অলঙ্কার পরিয়াছ, আমার চক্ষুশূল হইয়াছে।" তিলোত্তমার ছবিখানি কুমারসম্ভবের রতির অবস্থা স্মরণ করাইয়া দেয়:—

গত এব ন তে নিবর্ত্ততে স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্য মামবিসহ্যব্যসনেন ধূমিতাং॥

বিমলা আজ প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসংকল্পা হইয়া রূপের ফাঁদ পাতিয়াছে; কতলুখাঁকে সেই ফাঁদে ফেলিয়া পতিহত্যার প্রতিশোধ দিয়া স্বর্গগত পতির তৃপ্তি বিধান করিবে। ওসমান প্রদত্ত মুক্তি চিহ্ন স্বরূপ অঙ্গুরী দিয়া তৎসাহায্যে এ রাক্ষসপুরী ত্যাগ করিয়া অভিরাম স্বামীর কুটীরে যাইতে পরামর্শ দিয়া গেল। আশমানী অভিরাম স্বামীর প্রেরিত হইয়া নবাবান্তঃপুরে নূতন পরিচারিকারূপে প্রবেশ করিয়াছে; তাহার দ্বারা অভিরাম স্বামীর সহিত বিমলার সংবাদ আদান প্রদান চলিত।

তিলোত্তমার বড় সাধ সে জানিয়া লয় যে রাজপুত্র এক্ষণে কি অবস্থায় আছেন। মায়ের কাছে প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইল, জগৎসিংহ দুর্গমধ্যে আছেন এবং শারীরিক ভালই আছেন।

তিলোত্তমা বাষ্পাকুললোচনা হইয়া ভাবিতে বসিল, "রাজপুত্র আমার জন্য কারাগারে বন্দী! কেমন সে কারাগার! আচ্ছা এ অঙ্গুরী দ্বারা তাঁহার উদ্ধারের কৌশল করা যায় না? একবার কি তাঁহার সাক্ষাৎ মেলে না?"

তিলোত্তমা অঙ্গুরী লইয়া—পা কাঁপে, হৃদয় কাঁপে, মুখ শুকায়,—তবু চলিতে লাগিল; প্রহরীর নিকট "কোথায় লইয়া যাইব" প্রশ্নের উত্তরে অর্দ্ধস্ফুট "জগৎসিংহ" কথাটি উচ্চারণ করিল; কোনরূপে প্রহরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কারাগারের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল। পা আর সরে না। কপাট ধরিয়া পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিল। একবার মনে করিল ফিরিয়া যাই, কিন্তু ফিরিতেও পা উঠে না। তখন দুই দিকে পর্ব্বত, মধ্যস্থলে নদীস্রোতের মত তিলোত্তমার 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা (কুমার সম্ভব, ৫ম সর্গ শেষ)।

তারপর জগৎসিংহের নয়নে নয়ন মিলিল। তিলোত্তমা বেতসলতার মত কাঁপিয়া উঠিয়া সম্মুখে ঢলিয়া পড়িবার মত হইল; জগৎসিংহ পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। অমনই তিলোত্তমার দেহ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। ক্ষণপ্রস্ফুটিত হৃৎপদ্ম সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া গেল। "বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা" এই নিষ্প্রণয় সম্বোধনে—"এখানে কি অভিপ্রায়ে" এই অবহেলাময় ব্যবহারে—তিলোত্তমার মাথা ঘুরিয়া গেল; কক্ষ প্রাচীর শয্যা প্রদীপ যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে

লাগিল। তিলোত্তমার বাক্‌শক্তি তখন লুপ্ত, ইন্দ্রিয় অসাড়, চিত্ত বিমূঢ়,—সে কথার উত্তর দিবে কি? এ যেন স্বপ্নের মত! তারপর শুনিল, "তুমি ফিরিয়া যাও, পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হও"; তখন আর ভ্রম রহিল না। বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ নিঃস্পন্দ হইয়া তিলোত্তমা ভূতলে পতিত হইল।

ভবভূতির সীতা পতি কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিতা হইয়া দুঃখ শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া সজ্ঞানে গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দেন; আর তিলোত্তমা উপর্য্যুপরি কঠোর আঘাতে বিগতচেতনা হইয়া অজ্ঞানে ধরণী গর্ভে লুটাইয়া পড়ে। ভবভূতির সীতা, দুষ্মন্তপ্রত্যাখ্যাতা অবমানিতা কালিদাসের শকুন্তলাও কোন উপায়ে প্রাণ ধরিয়া রাখিয়াছিল; তিলোত্তমা কিন্তু সে দুঃখ শোক সম্বরণ করিয়া কোন মতে আপনার প্রাণকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না,—একেবারেই মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতে চাহিল। জগৎসিংহের প্রণয়বারি সেচনে সে নিদাঘতপ্তা বল্লী ধীরে ধীরে জীবিতা হইল; নির্ব্বাণোন্মুখ দীপটি বিন্দু বিন্দু তৈল সঞ্চারে আবার হাসিয়া উঠিল। প্রণয়ই পরম রসায়ন। কুমার জগৎসিংহ আসিয়াছেন শুনিয়া তিলোত্তমা কি করিল? শুধু "নয়ন উন্মীলিত করিয়া জগৎসিংহের প্রতি চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি কোমল, কেবল স্নেহব্যঞ্জক; তিরস্কারণাভিলাষের চিহ্নমাত্রে বর্জ্জিত।"

তিলোত্তমা ভালবাসার মূর্ত্তি, খেলার বস্তু, আমোদের ক্রীড়নী। তাহার প্রেমপ্রতিম মুখখানি সংসারের অনেক দুঃখ কষ্ট ভুলাইয়া দেয়। কর্ম্মজগতে সে কর্ম্মময়ী হইতে আইসে নাই। কবিতার রাণী, স্বপ্নের ছবি, হৃদয়ের বিশ্রাম। ধনাঢ্য ভূস্বামীর কন্যা হইলেও সহচরিদের সাহচর্য্যেও কোনরূপ চাতুর্য্য শিক্ষাই হয় নাই, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা জন্মে নাই। আয়েষার নিকট সে বুদ্ধিতে বালিকার মত। আয়েষা যখন আপনার বহুমূল্য অলঙ্কার দিয়া তিলোত্তমাকে সাজাইয়া কহিল, "তুমি যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাঁর চরণরেণুর তুল্য নহে", (এই প্রথম জগৎসিংহকে আয়েষার আপনি সম্বোধন) তখন এ কথার ভিতর তিলোত্তমা প্রবেশ করিতে পারিল না। "• • • আর আমার—তোমার সাররত্ন" বলিতে বলিতে আয়েষার যখন কণ্ঠরোধ হইল—নয়নপল্লব জলভারে স্তম্ভিত হইয়া কাঁপিতে লাগিল, তখনও তিলোত্তমা কিছুই বুঝিতে পারিল না; সমদুঃখিনীর ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল মাত্র, "কাঁদিতেছ কেন?" তারপর হৃদয়মধ্যে

নয়নবারিস্রোত বহিতে লাগিল, তিলাৰ্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া আয়েষা দ্রুতবেগে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; তবু তিলোত্তমার মনে কোন সংশয়ের রেখাটুকুও ফুটিল না। এমন সরল অন্তর পাওয়া অনেক তপস্তার ফল। খেলার পুতুলের মত মিলনের সাধই তিলোত্তমাকে দিয়া সিদ্ধ হয়—তাই সে সংযম ও সহিষ্ণুতার মূর্ত্তি হইল না। আয়েষার মত সংযম ও সহিষ্ণুতার বলে জীবিত থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। লজ্জাবতী লতার মত সে কোমল স্পর্শেই নুইয়া পড়ে; প্রবল আঘাত সে সহ্য করিবে কিরূপে? জগৎসিংহকে পাইয়া তিলোত্তমা সুখিনী হইল,—অম্বরের পুত্রবধূ-পদলাভ করিয়া কৃতার্থ হইল!

আয়েষা

আয়েষা কোমলা ও তেজস্বিনী,—বালসূর্য্যপ্রভাসদৃশী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নৈদাঘ সূর্য্যরশ্মি। আয়েষা যখন কারাগারে কোনরূপ দ্বিধা সঙ্কোচ না করিয়া স্নেহময়ী রমণীর মত মূর্চ্ছিতা তিলোত্তমাকে কোলে তুলিয়া লইল; প্রেমময়ী নারীর ন্যায় যত্নে কোমলকরপল্লবে রাজপুত্রের করপল্লব গ্রহণ করিল; রাজকুমারের ব্যথা দর্শনে কাতরা হইয়া দর দর ধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল—সে কোমলা মূর্ত্তি। করপল্লবে নবোষ্ণবারিবিন্দুপাত অনুভব করিয়া জগৎসিংহ যখন বিস্মিত হইয়া আয়েষাকে কহিল, "তুমি কাদিতেছ আয়েষা"—তখন আয়েষা সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না; ধীরে ধীরে গোলাপ ফুলটা নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া ফেলিল মাত্র—এ প্রেমিকামূর্ত্তি। আপনি স্থলে তুমি সম্বোধনে আয়েষা বুঝিল, জগৎসিংহ তাহাকে আপন ভাবিয়াছে। তদ্দণ্ডে আবার ইষ্টদেবী ভবানীর মত আয়েষা জগৎসিংহকে মুক্তি দিবার প্রস্তাব করিল; তাহাকে বিপদাপন্না করিয়া জগৎসিংহ মুক্তি চাহিল না দেখিয়া আয়েষার চক্ষে দর দর ধারা বহিতে লাগিল —এ করুণাময়ী দেবীমূর্ত্তি!

আয়েষা ওসমানকে বরাবরই স্নেহময়ী ভগিনীর মতই স্নেহ করিয়া আসিয়াছে; কখনও যে তাহাকে বিবাহ করিবে, এ আশা করে নাই; তবে ওসমান যে তাহাকে প্রণয়িনী ভাবে ভালবাসে, তাহা তাহার জানা ছিল। আয়েষা যেরূপ প্রবল আগ্রহে জগৎসিংহের হাতখানি ধরিল, দর দর ধারা বহিয়া যেরূপ কান্না কাঁদিল—তাহাতেই তাঁহার প্রেম অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়া উঠে। জগৎসিংহ তিলোত্তমাকে হৃদয়-দান না করিলে হয়ত অবস্থা অন্যরূপ ঘুরিয়া যাইত। আয়েষার

ভাগ্যে যদি জগৎসিংহের প্রণয়লাভ ঘটিত, আর ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষম বাধা না থাকিত, তাহা হইলে তাহার ভালবাসা এমন নিঃস্বার্থ হইতে পারিত না।

কারাগারে ওসমানের মূর্ত্তি দেখা গেল। তখন প্রণয়ের্য্যায় আপাদমস্তক অনুরঞ্জিত ওসমান স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ক্রোধ-কম্পিত-স্বরে কহিল, "নবাব-পুত্রি, এ উত্তম ?" ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া, কথার অভিপ্রায় বুঝিয়া, আয়েষার মুখ রক্তবর্ণ হইল ; কোন মতে ধৈর্য্য ধরিয়া স্থিরস্বরে উত্তর দিল, "কি উত্তম ওসমান !" তারপর "নিশীথে একাকিনী বন্দীসহবাস নবাব পুত্রীর পক্ষে উত্তম" এই হিংস্র রাক্ষসী উক্তি আয়েষার কর্ণে তপ্ত সলিল ঢালিয়া দিল। তাহার পবিত্র চিত্তে এ তিরস্কার সহ্য হইল না। প্রত্যেক বিশেষণটি ঈর্ষ্যায় ব্যঙ্গে হিংসায় ক্রোধে জল জল করিতেছে ; হৃদয়গত ভাবটি সার্থক ভাবে অভিব্যক্তিলাভ করিয়াছে। তখন নবাবপুত্রী নবাবপুত্রীর মতই উত্তর দিল, "আমার কর্ম্ম উত্তম কি অধম সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।" ওসমানের ক্রোধ উপেক্ষায়, তাচ্ছিল্যের আঘাতে, দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল ! ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "আর যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি ?" আয়েষার বিশাল লোচন তখন আরও বিশালায়তন, মুখপদ্ম আরও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। স্বর গর্ব্বিত ও গম্ভীর হইয়া আসিল। তখন তেজস্বিনী মূর্ত্তি। তখন আহতা ময়ূরীর মত শিরোদেশ হেলাইয়া, তরঙ্গান্দোলিত শৈবালবৎ হৃদয় উৎকম্পিত করিয়া আয়েষা ওসমানকে কহিল, "এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।"

সেই মুহূর্ত্তে কক্ষমধ্যে যেন বজ্রপতন হইল ! আয়েষার নীরব রোদনের কারণ জগৎসিংহের চক্ষে স্পষ্ট প্রতিভাত হইল ; তিল তিল করিয়া অনেক-দিনের অনেক ব্যবহার স্মৃতিপথে আসিল। ওসমান অবিশ্বাসিনী ভাবিয়াছিল বলিয়া আয়েষার তিরস্কার সুপ্ত তেজ জাগিয়া উঠিল। সতীত্বের উপর আঘাতের মত বড় আঘাত মেয়েমানুষের আর নাই। সেই অন্যায় অপবাদে, মর্ম্মান্তিক আঘাতে, তাহার নারীহৃদয় মাথা খাড়া করিয়া উঠিল—তাই উত্তেজনার বশে রুদ্ধ ভালবাসা আত্ম প্রকাশ হইয়া পড়িল। ভাষার মধ্য দিয়া ভাবের মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিল। এইরূপ উত্তেজনায় আয়েষার চক্ষু ফাটিয়া তপ্ত অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। অভিমানে, ক্ষোভে, ক্রোধে, অপমানে আয়েষার মূর্ত্তি এক অভিনব আকার ধারণ করিল।

আয়েষা অশ্রু মুছিল। যে আয়েষা সেই আয়েষা হইল। একটি জলোচ্ছ্বাস নদীর উপর দিয়া চলিয়া গেল। একটি ভূমিকম্প ধরার বক্ষ তোলপাড় করিয়া দিল। প্রবল ঝটিকার পর প্রকৃতির অবস্থা যেমন হইয়া থাকে, কক্ষের অবস্থা সেইরূপ হইল।

ওসমান কথা কহিবে কি!—তাহার সামান্য সংশয় যে আজ সত্যরূপে দেখা দিবে, তাহা যে স্বপ্নেরও অগোচর। যে আশালতা ধরিয়া এতদিন ওসমান তাহার মূলে অনবরত জল সেচনই করিয়া আসিয়াছে, আজ যে তাহা জন্মের মত উন্মূলিত হইয়া যাইবে—ইহা যে ভাবনারও অতীত। আয়েষা স্নেহময়ী ভগিনীর মত ওসমানের দুঃখে সহানুভূতি করিয়া কত সান্ত্বনার কথা, কত স্নেহের বাণী কহিল; কিন্তু তাহাতে ওসমানের হৃদয়ের আগুন নিভিল না। প্রতিহিংসার কল্পনায় সে আত্মহারা, আজন্মের আশাবৃন্তচ্ছেদে সে মুহ্যমান। ওসমান পাঠান, তাহার উষ্ণ রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। আয়েষা দাসীর প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষা না করিয়াই একাকিনী চলিয়া গেল; ওসমান বিহ্বলের মত কিয়ৎক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া প্রস্থান করিল।

সেই রাত্রেই সুরাপানোন্মত্ত কতলুখাঁর বক্ষে আমূল ছুরিকা বিদ্ধ হইল। বিমলার পতিহত্যার শোধ হইল। আহত নবাব মৃত্যুশয্যায় ঢলিয়া পড়িল। সারা অন্তঃপুরে ক্রন্দনের রোল উঠিল।

তারপর আয়েষাকে দেখিলাম। আহত মুমূর্ষু পিতার মস্তক ক্রোড়ে করিয়া নিঃশব্দে উপবিষ্টা; নয়ন ধারায় মুখখানি প্লাবিত। সে মূর্ত্তি স্থির, গম্ভীর, নিঃস্পন্দ। আয়েষার স্থানে তিলোত্তমা বসিলে সে অবস্থায় সেবা করা দূরে থাক্, পার্শ্বে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া তাহাকে সেবা খাইতে হইত; মোগল আক্রমণেই তাহা দেখা গিয়াছে। জগৎসিংহ সন্ধির প্রার্থনায় এক প্রকার সম্মত হইলে, নবাবের মৃত্যু-পীড়িত মুখ প্রফুল্ল হইল। সেই সাংঘাতিক মুহূর্ত্তেও আয়েষার সংযমের পরাকাষ্ঠা বিস্ময় উদ্রিক্ত করে। পিতার কাণে কাণে যেই আয়েষা কি বলিয়া দিল, অমনই নবাব মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও "বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা সাধ্বী, তুমি দেখিও" বলিয়া গেল। আয়েষার নাম মুখে উচ্চারণ করিতে নবাবের নির্জ্জীব মস্তক ভূমে লুটাইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বিয়োগ হইল।

আজকাল উপন্যাসে বিশেষতঃ নাটকে মূর্চ্ছা করার একটা বাই দেখা যায়;

অথচ এখনকার কালে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে কাহাকেও বড় দেখা যায় না (হিষ্টিরিয়া বা মৃগীরোগ সে স্বতন্ত্র)। ওসমানের মর্ম্মান্তিক আঘাতে, পিতার শোচনীয় অপঘাত-মৃত্যুতেও আয়েষাকে কবি মূর্চ্ছিত করেন নাই। বিমলাও ত একবারও মূর্চ্ছিতা হয় নাই। তবে তিলোত্তমার মত কোমলা ভাবপ্রবণা দুর্ব্বল-প্রাণা নবীনার পক্ষে মূর্চ্ছিত হওয়া স্বাভাবিক। মোগল আক্রমণে ভয়ে, জগৎ-সিংহের মর্ম্মান্তিক প্রত্যাখানে বেদনায়, তিলোত্তমাকে অবশ্য দুইবার মূর্চ্ছিতা দেখা যায়। প্রাচীনকালে লোকে সরল সত্যবাদী ভাবপ্রবণ ছিল, বলিয়া হয়ত সহজেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। বর্ত্তমানে স্বার্থপর যুগে অত হৃদয়বান্ ভাবপ্রবণ কোমল হৃদয় সরল ব্যক্তি দুর্লভ বলিয়া মূর্চ্ছাও আজিকালি সুলভ নহে।

জগৎসিংহ বিদায় প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিতে মনস্থ করিয়া আয়েষাকে সংবাদ পাঠাইল। আয়েষা সাক্ষাৎ না করিয়া পত্র লিখিয়া জানাইল যে, ওসমানের হৃদয়ের আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে, সে অন্তরে বিষম ব্যথা পাইবে বলিয়া সাক্ষাৎ করিতে পারিবে না। শিশু ভ্রাতাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার এখন ওসমানের হস্তে—এ কারণও অন্ততম—ইহা আমরা আয়েষার মুখে কিম্বা কবির নিকট শুনিতে পাই নাই। আত্মধৈর্য্যের প্রতি অবিশ্বাসিনী বলিয়া যে সে দেখা করিল না, তাহা নহে। আয়েষার দেখা না করার জন্ত যে কষ্ট হইল, তাহা সে পাষাণীর মত সহ্য করিল। তবে "নারীহৃদয় দুর্দ্দমনীয়, অধিক সাহসও অনুচিত"—এ আশঙ্কাও আয়েষার ছিল না। সংযমের বল কতই থাকুক, তথাপি ভালবাসার প্লাবনে সে বন্ধন কাটিতেই বা কতক্ষণ—এ ভয় থাকাও অস্বাভাবিক নহে, হৃদয় লইয়া যুদ্ধ করা বড় সহজ নহে। আয়েষার তাৎকালীন হৃদয়ের অবস্থা জগৎসিংহকে লিখিত তাহার পত্রে সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জগৎসিংহ যদি সেই প্রদেশে বিবাহ করেন, তবে যেন আয়েষাকে সংবাদ দেওয়া হয়—এই অনুরোধ পত্রে করা ছিল। নতুবা জগৎসিংহ বিবাহোৎসবে যোগ দিবার জন্য আয়েষাকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিত না; সে নিমন্ত্রণ করাও তাহার পক্ষে শোভন হইত না। তিলোত্তমাকে মনের মত সাজাইবে বলিয়া নিজের অলঙ্কারগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন ধরণের অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছে। সে অলঙ্কারে তিলোত্তমাকে সাজাইয়া তাহার মুখ খানি তুলিয়া ধরিয়া আয়েষা

মনে মনে বলিল, "এ সরল প্রেমপ্রতিম মুখখানি দেখিলে প্রাণেশ্বর মনঃপীড়া পাইবেন না।" আয়েষা জগৎসিংহকে প্রাণেশ্বর বলিয়া হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়াছে, কাজেই তাহাকে আপনি সম্বোধন না করিয়া অসাক্ষাতে তুমি সম্বোধনই বা কি করিয়া করে!

আয়েষা জগৎসিংহকে পাইলে যে সুখিনী হইত, তাহার নারীজীবন যে সার্থক হইত, তাহা তাহার নিজের কথাতেই বুঝা যায়। "যখন বিধাতা অন্যরূপ ঘটাইলেন না, তখন ইহার দ্বারাই তিনি সুখী হউন।" দর দর ধারায় অশ্রুত্যাগ করাতেই, "আমার—তোমার সাররত্ন" বলিতে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াতেই, তাহার ভিতরের ভালবাসা তৃষ্ণা কত বলবতী ছিল তাহা জানা যায়।

পূর্ব্বে নবাবপুত্রী বন্দী রাজকুমারকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিত। আর আজ জগৎসিংহ যে তাহার প্রাণের ঈশ্বর, সে যে তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী উপাসিকা দাসী। আজ সে কেমন করিয়া প্রাণেশ্বরকে আপনি সম্বোধন না করিয়া "তুমি" সম্বোধন করে? পতিরূপে লাভ করিলে এ শ্রদ্ধার বাণী হয়ত সম্মুখে সম্বোধনের সময় শুনিতে পাইতাম না। অসাক্ষাতে এখনও অনেক স্ত্রী পতিকে "তুমি" "সে" সম্বোধনে সম্বোধিত না করিয়া "আপনি" "তিনি" সম্বোধন করিয়া থাকে; এখনও কোন কোন স্ত্রী পতিকে সম্মুখেও আপনি সম্বোধন করে—এমনও দেখা যায়। পূর্ব্বকালে "আপনি" বা "তিনি" প্রচলন এখনকার অপেক্ষা অধিকই ছিল। বিশেষতঃ কুলীন কন্যারা বহুদিন অন্তর দুই এক দিনের জন্য পতিসমাগম লাভ করিত বলিয়া "আপনি" সম্বোধনই করিত।

জগৎসিংহ আয়েষাকে "আপনি" বলিত; কিন্তু যখন তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিল, তাহার হৃদয়ের পরিচয় অস্পষ্ট রকমে পাইল, তখনই আপনি স্থলে "তুমি কাঁদিতেছ আয়েষা" বলিয়া "তুমি" বলিয়া ফেলিল; হৃদয় গলিয়া গেল ভদ্রতার সম্বন্ধ লোপ পাইল। কারাগারে "তুমি" সম্বোধনের পর জগৎসিংহ আয়েষাকে আর "আপনি" বলে নাই।

আয়েষা প্রেম, সহিষ্ণুতা ও স্বার্থত্যাগের আদর্শ; তথাপি হৃদয়ে নারী। রক্তমাংসে গড়া, সুখ-দুঃখময় হৃদয় সমন্বিতা মানবী মাত্র। কাজেই তাহার ভালবাসার ও আরাধনার ধনকে অপর একজনের হাতে জন্মের মত সমর্পণ

করিতে গিয়া যে না কাঁদে, সে তবে কেমন নারী ? কেমন তার হৃদয় ? প্রেমিকা যুবতী নারী সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিবার সময়ে অবরুদ্ধ বেদনায় ভারে যদি কাঁদিয়াই থাকে, তাহাতে তাহার মানবীত্বই পরিস্ফুট হইয়াছে। আয়েষা সংযম ও সহিষ্ণুতার মূর্ত্তি ; কিন্তু তা'া বলিয়া তাহার রক্তমাংসসমন্বিত হৃদয় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিবে না ? সান্ধ্যসমীরণকম্পিত নীলোৎপলবৎ অন্তরে টলমল করিবে না ? তৃষ্ণাতুর বিশুষ্ক অধর প্রণয়বারি পানলালসায় ব্যাকুল হইবে না ? আয়েষা ত আর পাষাণনির্ম্মিতা প্রতিমূর্ত্তি নহে। তারপর রজনীর মধ্যযামে একাকিনী—এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে একদিনের জন্য আয়েষা মনে করিল "এই গরলাধার অঙ্গুরীয়স্থ বিষেই ত আমার সকল জ্বালা সকল তৃষ্ণা হয় ; তবে কেন তাহাই করি না ?" পরক্ষণে সে ভাবিল—"এটুকু দুঃখ যদি নাই সহ্য করিতে পারিলাম, তবে মানব জন্ম লইলাম কেন ?" আয়েষা সেই প্রলোভনের বস্তুটি (বহুমূল্য অঙ্গুরীয়টি) জলে নিক্ষেপ করিল। নিরাশ প্রণয়িনী সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করিতে লাগিল। বহুমূল্য রত্নালঙ্কার ভূষিতা আয়েষা জটাবল্কল না পরিয়াই, ভস্ম না মাখিয়াই, যোগিনী সাজিল। জগৎসিংহের সহিত মিলন বিধাতার অভিপ্রেত নহে—তাই আয়েষা জীবনের সুখ বিসর্জ্জন দিল। তিলোত্তমাকে বঞ্চিতা করিয়া, প্রাণেশ্বরের ধর্ম্ম লোপ করিয়া, পিতৃমাতৃক্রোড় হইতে সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সে নিজের স্বার্থসিদ্ধি, ভোগসুখ চাহে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাধা যদি না থাকিত, জগৎসিংহের তিলোত্তমা যদি না থাকিত, ওসমানের হৃদয়ের আগুন যদি না জ্বলিত, তাহা হইলে আয়েষার ঐ সংযম-মূর্ত্তি আমরা পাইতাম না।

প্রলোভন-জয়, স্বার্থত্যাগই মানব জীবনের আদর্শ ; সংযম ও সহিষ্ণুতাই পরম ধর্ম্ম। প্রলোভন-জয়ে, স্বার্থত্যাগে প্রতাপ একদিকে উন্নত, আয়েষা অপরদিকে উন্নতা। প্রতাপ কঠিনচেতা পুরুষ হইয়া যে কারণেই হউক রূপসীকে বিবাহ করে, আয়েষা দুর্ব্বলা নারী হইয়া কোন কারণেই বিবাহের সঙ্কল্প পর্য্যন্ত করিল না। এই দিকে আয়েষা উন্নত। আবার অন্য দিকে শৈবলিনীর স্মৃতি প্রতাপের নিকট বৃশ্চিক দংশনের মত বাথা দায়ক, পাপবৎ পরিত্যাজ্য; কিন্তু জগৎসিংহের স্মৃতি আয়েষার কাছে স্বর্গের অমৃতের তুল্য মনোরম, পুণ্যবৎ উপাদেয়। জগৎসিংহ-স্মৃতি আয়েষা-জীবনের বন্ধনী; শৈবলিনী-স্মৃতি প্রতাপের জীবনান্তিকা।

প্রলোভন জয়ে, ইন্দ্রিয় সংযমে ও স্বার্থত্যাগের পুণ্যবলে আয়েষা যে অক্ষয় স্বর্গলাভের অধিকারিণী হইবে, ইহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি। পরলোকে অক্ষয় সুখশান্তির অধিকারিণী হইয়া আয়েষা তুমি আবার এই পৃথিবীতে আসিও ; এবার যেন তোমার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা ধন্য হইতে পারি।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

গান।

[রচনা—কবিরাজ শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন, বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ বিদ্যাবিনোদ, আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকর, দর্শন-নিধি।]

ভূপালী—একতালা।

ভূলোক আলোকে, পলকে পুলকে,
উদিলে ঐ চারু চন্দ্র।
ও রূপ ঝলকে, দেখি সব লোকে,
বাজায় মুরজ মন্দ্র॥
সপ্তস্বরা যন্ত্রী, সুমধুর তন্ত্রী,
বাজে নব নব রাগে।
রূপে রসে গন্ধে, নাচিছে আনন্দে,
সবে বিভু পদ মাগে॥

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।]

আস্থায়ী।

০ ১ ২´ ৩
| | {ধা র্সা র্সা | র্রা র্সা র্সা | ধা র্রা র্সা | ধা পা গা |
ভূ লো ক আ লো কে প ল কে পু ল কে

০ ১ ২´ ৩
| রা গা রা | সা সা -া | গা -পা রা | সসা সা -া } |
উ দি লে অ ই ০ চা ০ রু চন্ দ্র ০

০ ১ ২´ ৩
| সা রা গা | পা গা রা | সা ধা্ সা | রা পা পা |
ও রূ প ধ ন কে দে খি স ব লো কে

০ ১ ২´ ৩
| গা পা গা | রা গা রা | সা -ধা্ -ধা | সা -া -া || |
বা জা য় মু র জ ম ০ ন্ দ্র ০ ০

অন্তরা।

০ ১ ২´ ৩
|| { গা -া গা | পা -ধা পা | র্সা -া -া | র্সা -া -া |
{ স প্ ত স্ব ০ রা য ০ ন্ খী

০ ১ ২´ ৩
| র্সা ধা র্সা | র্রা -া -া | র্সা -র্গা -র্রা | র্সা -া -া | |
সু ম ধু র ০ ০ ত ০ ন্ ত্রী ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| র্সা র্রা ধা | র্সা পা ধা | পা -পা -ধা | ধা -া -া
বা জে ন ব ন ব বা ০ ০ গে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| { ধা র্সা ধা | পা গা -গগা | রা গা পা | ধা র্সর্রা র্সা } |
{ রূ পে র সে গ ন্ধে না চি ছে আ নন্ দে }

০ ১ ২´ ৩
| ধা র্সা ধা | রা পা গা | সা -রা -গা | পা -া -া || |
স বে বি ভু প দ মা ০ ০ গে ০ ০

সঞ্চারী।

০ ১ ২´ ৩
|| { সা ধা্ ধা্ | সা রা রা | সা গা পা | রা পা পা |
{ ভূ লো ক আ লো কে প ল কে পু ল কে

০ ১ ২´ ৩
| গা ধা ধা -পা | পা -া | গা -পা ধা | র্সর্রা র্সা -া } |
উ দি লে অ ই ০ চা ০ ক চন্ দ্র ০ }

'আভোগ।

১ ২´

। র্সা র্গা র্রা । র্গা র্সা র্রা । ধা র্সা পা । ধা গা পা ।
ও রূ প ম ন কে দে খি স ব লো কে

১ ২´ ৩

। র্রা গা পা । ধা র্সা ধা । পা -গা রা । সা -া -া । ।
বা ঞা য় সু র জ ন ৹ নূ দ্র ৹ ৹

৺সুরেশচন্দ্র।

দেবীপ্রসন্নের চিতানলের শেষ বহ্নি নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে বঙ্গের সাহিত্যকুঞ্জ হইতে আর একটি কলকণ্ঠের সুমধুর ঝঙ্কার নীরব হইয়াছে। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর আদরের সুরেশচন্দ্র আর ইহজগতে নাই। বিগত ১৭ই পৌষ শনিবার বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রের নির্ভীক, তেজস্বী ও নিরপেক্ষ সমালোচক, বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ আরাধক সুরেশচন্দ্র ইহকালের যাবতীয় নশ্বর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া অবিনশ্বর ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

সুরেশচন্দ্র আমার গুরু—সুরেশচন্দ্র আমার সহায়ক—পৃষ্ঠপোষক। সাহিত্যের পরিচালনায় কিছু দিনের জন্য তাঁহার সাহচর্য্য লাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমি সেই 'বৃষস্কন্ধো শালপ্রাংশু মহাভুজো' বিরাটকায় পুরুষের নিকট যে সমস্ত অলৌকিক গুণাবলী শিক্ষা করিয়াছি তাহা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পথ নির্দ্দেশক আলোকরশ্মির ন্যায় দেদীপ্যমান থাকিবে।

সুরেশচন্দ্র মনুষ্যত্বের একটা মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন। প্রশংসা ও স্তুতিবাদের জয়মাল্যে বিভূষিত হইবার আশায় তিনি বিবেককে কখনও কাহারও দ্বারে উৎসর্গ করেন নাই; যাহা সত্য, যাহা শ্রেয়ঃ ও প্রেয় বলিয়া তিনি বুঝিয়াছেন, তাহা জলদগম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষণা করিতে তিনি বিন্দুমাত্র কম্পিতকলেবর হন নাই। অমিত প্রতিভার আকর হইলেও শুধু এই কারণেই সুরেশচন্দ্র জীবনে কখনও জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই! নিরপেক্ষ সমালোচনা ও স্পষ্টবাদিতায়

* গত ৩রা বৃহস্পতিবার ২ই জানুয়ারী "সাহিত্য সভায়" লেখক কর্তৃক পঠিত।

সুরেশচন্দ্র একবাক্যে বঙ্গের মনীষিবৃন্দ কর্ত্তৃক 'শ্রেষ্ঠ সমালোচক' আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন। "সাহিত্যে" তাঁহার রঙ্গরস ও ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ তীব্র সমালোচনা প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত—ক্ষুদ্র গল্পের মোহিনী মূর্ত্তির দিকে কোনও দৃক্‌পাত না করিয়া সাহিত্যের পৃষ্ঠা খুলিয়া পাঠক সর্ব্বাগ্রে সমালোচনা পড়িতেন,—সুরেশচন্দ্রের পক্ষে ইহা কম শ্লাঘার কথা নহে। সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনই সুরেশচন্দ্রের মূলমন্ত্র ছিল। "সাহিত্য" সম্পাদন ব্যপদেশে তিনি সে মূলমন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অর্থার্জ্জন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। একথার যাথার্থ্য একটি মাত্র ঘটনায় আপনারা জানিতে পারিবেন। সে আজ নূন্যকল্পে ৩৭ বৎসরের কথা। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-পাঠক তখন সুরেশচন্দ্রের সহায়ক। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কোম্পানী "বিচিত্র" প্রমুখ কয়েকখানি শিশু-পাঠ্য পুস্তকের বিজ্ঞাপন "সাহিত্য" পত্রে দিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে কয়েক খানা পুস্তক পাঠাইয়া একটু অনুকূল সমালোচনা করিবার জন্যও অনুরোধ জানাইয়াছেন। সমাজপতি মহাশয় আপন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে বসিয়া পুস্তক কয়েক খানি লইয়া এক তীব্র কটূক্তিপূর্ণ সমালোচনা লিখিয়া তখনই তাহা প্রেসে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমাকে আদেশ করিলেন; আমি সেই সমালোচনা পড়িয়া বলিলাম, "এ সমালোচনা সাহিত্যে মুদ্রিত হইবামাত্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স পরমাসেই বিজ্ঞাপন তুলিয়া লইবে!" আমার মুখের দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ করিয়া সমাজপতি বলিলেন, "তুমি কি মনে কর আমি অর্থের লোভে তিলকে তাল বলিব!" এমনই ধারা নিঃস্বার্থ সমালোচক ছিলেন সমাজপতি মহাশয়! অনধিকারচর্চ্চা করা তিনি ধৃষ্টতার পরিচায়ক বলিয়া জানিতেন; তাই ঐতিহাসিক বা অন্য কোন দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা নিখিলনাথ প্রমুখ ঐতিহাসিক ও বিশেষজ্ঞের দ্বারা লিখাইয়া তবে তাহা পত্রস্থ করিতেন। প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে তাঁহার কিরূপ অসামান্য নৈপুণ্য ছিল তাহা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই জানেন।

সুরেশচন্দ্র অকপট মিত্র, অকৃত্রিম বান্ধব এবং পরম সুহৃৎ ছিলেন; যিনি তাঁহার বন্ধুত্বলাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন তাঁহার বন্ধুত্ব পূর্ণিমার জোৎস্নারাশির ন্যায় নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ—স্ফটিক-স্বচ্ছ জলাশয়ের জলের ন্যায় অনাবিল। সুরেশচন্দ্রের কর্ম্মজীবনের বন্ধু পণ্ডিত সখারাম গণেশ

সাহিত্য-সংহিতা।

নবপর্য্যায়, ১২ খণ্ড } ১৩২৭ সাল, মাঘ—চৈত্র, { ৯ম—১২ সংখ্যা।

সংস্কৃত সংলাপ কাব্যম্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৪। চিন্তাকেন্দ্রী।

ভকংস্তর্হি পুনঃসকৃৎ কিঞ্চিত সন্নিবিষ্টমনা ভবতু।

অহ মেতর্হি বিবিধৈ র্মনোরমৈশ্ছন্দোভি র্বিরচিতং যৎকণ কাব্যং স্তুতি নীতি নির্নীতি প্রভৃতাবয়বং, তদেব ব্যাখ্যাস্যামি তথা, যথা ব্যাখ্যাতং পূর্ব্ব-মণুকাব্যম্।

কণকাব্যস্য প্রথম কণভূতায়াং স্তুতৌ তাবৎ প্রারিপ্সিত কণকাব্যস্য নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তয়ে মঙ্গল কামিনেব সতাগ্রন্থকৃতা মঙ্গলময় দেবতানা মন্তেবাঞ্চ গুরুজনানাং স্তুতয়ঃ প্রণতয়শ্চ কৃতাঃ। তাভিশ্চ দেবতা স্তুতিভিঃ শ্রীধাম নবদ্বীপা বস্থিত শ্রীমূর্ত্তীনাং (দেবমূর্ত্তীনাং) কা স্তাবৎ শ্রীমূর্ত্তয়োঽপি সুচিরস্তস্তদপি নিশ্চিতম্। স্তুতি শব্দস্যার্থঃ স্তুতিঃ। স্তুতি ময়তা দস্যাঃ সংজ্ঞা স্তুতি রিতি। যস্যা অয় মাদিমঃ শ্লোকঃ।

ওঁ নমঃ শ্রীগঙ্গা দেব্যৈ।

স্রগ্ধরাচ্ছন্দঃ।

(১) যে নিত্যং স্নান্তি পূতে তব বিমল জলে,

(২) স্বচ্ছ-পয়ো বা পিবন্তি,

(৩) যে বা নিত্যং স্পৃশন্তি ত্বদমৃত মমৃতং,

(৪) হস্ত পশ্যন্তি যে বা।

(৫) যে বা ধ্যায়ন্তি মাত স্তব তনু মমলাং,

(৬) নাম কুর্ব্বন্তি যে বা।

(৭) যে বা নিত্যং বসন্তি ত্বদুদর ইহ, কিং

(৮) তেহপি দেবা ন সন্তি॥

অনেন শ্লোকেন—গঙ্গা স্নানাদি কৃদ্‌ভ্য আরভ্য গঙ্গাতীর বাসিনা মপ্যমরত্বো পবর্ণনেন মনুষ্যমাত্রং প্রতি, অতি সুনির্ম্মলাম্বুৎপন্ন কীট পবিত্রতমা-রোগ্যকর ভব রোগ হরস্ব পেয়পানীয়ায়া ভাগীরথ্যা স্তীরে বসতা বুপ দেশোদত্তঃ।

পবিত্রতর পানীয়ে মাননীয়ে সুখপ্রদে। গঙ্গাতীরে বসেযুর্যে ভোগা পবর্গ কামিন ইর্ত্তি॥

অনুবাদ।

চিন্তাদেবী বলিলেন। আপনি তবে আবার একটুকু মনোনিবেশ করুন। আমি এক্ষণে বিবিধ মনোরম ছন্দে বিরচিত, স্তুতি নীতি নির্নীতি প্রভৃতি খণ্ড কাব্যগুলি যাহার এক একটী কণ, আপনার প্রণীত সেই কণকাব্য খানির ও সেইরূপেই সংক্ষেপে সমালোচনা করিব। যেরূপ সংক্ষেপে এই-মাত্র অণুকাব্য খানি সমালোচিত হইল।

আপনার কণ কাব্যের প্রথম কণ—স্তুতি নামক কাব্য খানিকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কণ কাব্যের রচনার প্রারম্ভের ইচ্ছা হওয়ায় সেই কণ কাব্য খানির নির্ব্বিঘ্নে যাহাতে পরি সমাপ্তি হয় এই কামনা করিয়াই রচয়িতা মঙ্গলময় দেবতাগণের এবং অন্যান্য গুরুজনের স্তুতি ও প্রণতি বোধক কতক গুলি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। ঐ স্তুতি গুলি দ্বারা এই একটি অন্য প্রকা-রের উপকার পাওয়া যায়, যে, শ্রীধামে নবদ্বীপে অসংখ্য শ্রীমূর্ত্তী দেবমূর্ত্তী আছে। তাহার মধ্যে কোন শ্রীমূর্ত্তি গুলি অতি প্রাচীনা তাহার নিশ্চয়করা যায়। স্তুতি শব্দের অর্থ স্তুতি। এই কাব্যখানি স্তুতিময় বলিয়া ইহার নাম স্তুতি। যাহার প্রথম শ্লোক এই।

ওঁ নমঃ শ্রীনবদ্বীপ গঙ্গায়ৈ।

যে নিত্যং স্নান্তি পূতে ইত্যাদি। উল্লিখিত। ব্যাখ্যা, যে সকল

মহাত্মা তোমার পবিত্র নির্ম্মল জলে স্নান, তোমার পবিত্রতম পানীয় পান, অমৃতরূপ তোমার অমৃত (জল) স্পর্শ, ইত্যাদি এই শ্লোকোক্ত সপ্তবিধ ক্রিয়াই যথাবিধি সমাধা করেন। তাঁহারা তো দেবোত্তম ইহা নিঃ সন্দেহ। যাঁহারা সপ্তবিধ ক্রিয়ায় অসমর্থ হইয়া এক একটী ক্রিয়ামাত্র সম্পাদন করেন। আমি বিবেচনা করি তাঁহারাও দেবতা। (১) যাঁহারা নিত্য তোমার পবিত্র ও নির্ম্মল জলে স্নান মাত্র করেন। (২) যাঁহারা নিত্য স্নানে অসমর্থ হইয়া বাটীতে বসিয়া কেবল তোমার সুমধুর জল পান করেন। (৩) যাঁহারা তাহাতেও অশক্ত হইয়া দিনান্তে তোমার অমৃতময় অমৃত জল স্পর্শ মাত্র করেন। (৪) যাঁহারা তাহাতেও অসমর্থ বা বীতশ্রদ্ধ হইয়া ত্বদীয় নির্ম্মল জল সম্বন্ধ বশতঃ নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ বিচরণ কালে নিরন্তর তরঙ্গ সুশোভমান তোমার অমল অর্থাৎ নির্ম্মলও পাপরাশি বিনাশী, দেহ দর্শন মাত্র করেন। (৫) যাঁহারা বার্দ্ধক্যাদি বশতঃ তাহাতেও অসমর্থ বা শ্রদ্ধাহীন হইয়া তোমার এই তরঙ্গময় তনু ভক্তি পূর্ব্বকই হউক, আর নিজের ব্যবসায়াদি কার্য্য বশতঃই হউক দিবা রাত্রির মধ্যে এক একবার ধ্যান মাত্র করেন। (৬) যাহারা ধ্যানে ও অসমর্থ হইয়া প্রাতে, স্নান কালে, সায়ং কালে, অথবা যে কোন সময়ে তোমার পবিত্র নাম (গঙ্গা গঙ্গা) জপ, অথবা একবার উচ্চারণ মাত্র করেন। (৭) অথবা যাহারা কিছুই না করিয়া তোমার উদর মধ্যস্থিত সুতরাং পবিত্রতম এই নবদ্বীপ (নূতন দ্বীপ) ধামে অবস্থিতি মাত্র করেন। তাঁহারা ও কি দেবতা নহেন। তাঁহারাও দেবতা॥

(১) যাঁহারা কেবল নিত্য স্নান মাত্র করেন, তাঁহারা দেবতা কিরূপে? যাহারা তোমার পরম পবিত্র ও সুনির্ম্মল জলে নিত্য স্নান করেন। তাঁহাদের শরীর মন ও আত্মা, পবিত্র ও নির্ম্মল হয়। তাহাতে তাঁহারা নীরোগ ও নির্জ্জর হয়েন। যাঁহারা নির্জ্জর তাঁহারাই দেবভাব প্রাপ্ত। সুতরাং দেবতা। "অমরা নির্জ্জরা দেবা" ইতি। (২) যাঁহারা কেবল জল পান বা স্পর্শ করেন, তাঁহারাও দেবতা; তাঁহারা দেবতা কিসে? মা, তোমার যে অমৃত (জল) সে সাক্ষাৎ অমৃতই। অমৃত স্পর্শ, অমৃত পান এই সমস্ত কি, দেবতা ভিন্নের ভাগ্যে ঘটে। (৪) আচ্ছা যাঁহারা দর্শন মাত্র করেন তাঁহারা দেবতা হলেন কিরূপে। দেবত্ব লাভ না হইবে কি, মহা-

দেবত্ব দায়িনীর দর্শন লাভ হয়। (৫) যাঁহারা ধ্যান মাত্র করেন তাঁহাদের দেবত্ব প্রাপ্তির প্রতি কারণ কি? যে যাহাকে নিত্যধ্যান করে, সে তাহার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। যেমন তেলা পোকা নিত্য কাঁচ পোকার ধ্যানে কাঁচ পোকার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ধ্যান কর্ত্তারা ও দেবতা। অথবা সুন্দর বস্তুর ধ্যান করিলেই মন সুন্দর হয়। যাহার মন সুন্দর তাহাকেই বলে সুমনাঃ। যে সুমনা সেই দেবতা। "সুপর্ব্বানঃ সুমনস" ইতি। (৬) যাঁহারা নাম মাত্র উচ্চারণ করেন, তাঁহারা দেবতা কিসে? যাঁহারা শত যোজন দূর হইতে গঙ্গা গঙ্গা বলেন তাঁহারা সর্ব্ব পাপে বিমুক্ত হন। যাঁহারা সর্ব্ব পাপে বিমুক্ত তাঁহারা দুঃখভাগী নহেন। যাঁহারা দুঃখভাগী নহেন, তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী। যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখের মালীক তাঁহারাই দেবতা। (৭) আচ্ছা বেশ তাহাও স্বীকার কবিলাম। যাঁহারা আমার গর্ত্তগত নবদ্বীপে বাস মাত্র করেন, তাঁহারাও দেবতা। তাঁহাদের দেবত্ব প্রাপ্তির প্রতি হেতু কি? সপ্ত দ্বীপা পৃথিবী। যাঁহারা নবদ্বীপে অর্থাৎ সপ্ত দ্বীপ হইতে একটী নূতন দ্বীপে বাস করেন। তাঁহাদিগকে মর্ত্তলোক বাসী বলা যায় না। যাঁহারা মর্ত্তলোক বাসী নহেন তাঁহারা অমর্ত্তলোক বাসী। যাঁহারা অমর্ত্তলোক বাসী তাঁহারাই দেবতা। প্রকৃত কথা হচ্ছে এই, দেবতা না হলে কি, ব্রহ্ম কমণ্ডলু বিগলিতা, বিষ্ণু পাদপদ্ম সম্ভূতা, হর শিরো বিহারিনীর গর্ত্তে বাস সম্ভব হয়। (৮) আচ্ছা বেশ। যাঁহারা শ্লোকোক্ত সপ্তবিধ কর্ম্মই আমাতে সম্পন্ন করেন। তাঁহারা দেবোত্তম। ইহা নিঃসন্দেহ। তাঁহাদের সুরোত্তমতা লাভের হেতু কি? পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে সাধারণ সুরত্ব লাভই না হয় হোক্। মা গো, মহাদেব যদি তোমায় শিরে মাত্র ধারণ করিয়া মহাদেবত্ব লাভ করিতে পারেন তবে যাঁহারা এই সপ্ত প্রকারে তোমাকে ধারণ করিতেছেন। তাঁহারা সুরোত্তমতা লাভ কেন না করিতে পারিবেন। অবশ্যই করিতে পারিবেন। সুতরাং সেই বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই।

সংস্কৃতা নভিজ্ঞ পাঠক বৃন্দের কেবল তাৎপর্য্য বর্ণন দ্বারা শ্লোক গুলির অর্থবোধ হওয়া কঠিন এই বিবেচনায় শ্লোক গুলির ও সংক্ষেপে বঙ্গানুবাদ করা হইল। বিস্তৃত ব্যাখ্যা স্তুতি কাব্যে দ্রষ্টব্য।

তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা এই শ্লোকটিতে গঙ্গা স্নানকারী হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গা-

তীর বাসী পর্য্যন্ত সকলেরই অমরত্ব উপবর্ণিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা মনুষ্যমাত্রের প্রতি সাক্ষাদ্ভগবতী ৺ভাগীরথীর তীরে বাস করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

যে ভাগীরথীর জল অতি নির্ম্মল (যেমত জল আর কুত্রাপি নাই)। যে জল সুদীর্ঘ কাল কলস আদিতে তোলা থাকিলেও কীটের উৎপত্তি হয় না। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে ঐ জল ব্যবহারে শরীরের কীটও নষ্ট হয়। এবং পবিত্রতম (পাপ হর পুণ্যপ্রদ, এবং সুস্বাদু, সুদৃশ্য ও সুশীতল)। এই এই কারণেই নৈরুজ্যকর ভবদুঃখ হর ও সুপেয়।

কিরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—যাঁহারা সাংসারিক সুখ এবং সাংসারিক দুঃখ মোচনের কামনা করেন। তাঁহারা যেন ভাগীরথী তীরে বাস করেন। কারণ ভাগীরথীর জলের মতপবিত্রতম জল আর পৃথিবীতে কুত্রাপি নাই। এই কারণেই ভাগীরথী তীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সম্মাননীয় ও সুখপ্রদ ॥

মহামহোপাধ্যায়—শ্রীসীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি।

রাস পূর্ণিমা।

[শ্রীমতী চারুকুন্তলা সেন লিখিত]

(১)

আজি কিসের কারণে, ধ্বনিছে হৃদয়ে,
নীরদ গর্জ্জন সম।
আজি কিসের কারণে, ভাবের প্রবাহ,
বহিছে হৃদয়ে মম ॥

(২)

বুঝি পূর্ণিমার ইন্দু, হেরিছে নয়ন,
হইয়াছে উনম'না।
তাই গেছে চলি আজ, সকল বেদনা,
ঘুচিছে বিষাদ ক'ণা ॥

(৩)

আহা কি সুন্দর শোভা, সুনীল অম্বরে,
হৃদয় মোহন করা।
যদি হতেম রাজীব, হেরে সুধাকর,
আপনা হতেম হারা ॥

(৪)

আজি কিসের চন্দ্রমা, হিরণ্য আসনে,
চারি পাশে তারা দল।
দেখ নিশাকর হ'তে, পান করি সুধা,
বিকশিত শতদল॥

(৫)

শুধু শীতল বলিয়া, হিমাংশু কিরণ,
সকলে পাইতে চায়।
ওই ভানুর ময়ুখ, প্রখর বলিয়া,
সব লোক ধেয়ে যায়॥

(৬)

ওই নির্ম্মল শশাঙ্ক, পূরব গগনে,
যখন উদিল গিয়া।
প্রতি ঘরে, ঘরে ঘরে, বাজিল বাজনা,
মোহিত করিয়া হিয়া॥

(৭)

আমি দেখিয়া এসব, নিসর্গ মাধুরী,
বিস্ময়েতে নিমগন।
দেখ পূরব আকাশে, কি মোহন বেশে,
সুধাংশু উদিত হন॥

(৮)

আজি তাহারি প্রভায়, সমগ্র ভুবন,
হাসিছে মধুর হাসি।
শুধু আমি একা আজি, তাহারে চাহিয়া
কাটাব ত্রিযামা বসি॥

(৯)

হেথা চারি দিক হ'তে, মৃদু সমীরণ,
আনিছে সৌরভ লুটে।
আমি দেখিয়া এসব, চাহি নিশি দিন,
উধাও যাইতে ছুটে॥

মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন।*

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

মুখবন্ধ।

সভার প্রতি নিবেদন—

কালিদাস তত্বের অনুসন্ধান ও আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বাঙ্গালার নানাস্থানে বিদ্বান ব্যক্তি ও সভা সমিতিতে উপস্থিত হইয়াছি। অধিকাংশ স্থলেই পাঁচ মিনিট দশ মিনিট বা পনের মিনিট মধ্যেই আমার কালিদাস তত্বের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে বাধ্য হইয়াছি। আপনারা দয়া করিয়া গত ২৭শে আষাঢ়ের আপনাদের অধিবেশনে আমার কালিদাস তত্বের আলোচনায় আপনাদের অমূল্য সময়ের দুইঘণ্টা সময় অপচয় করিয়াছেন এবং আরও সময় অপচয় করিতে স্বীকৃত হইয়া আমায় উৎসাহিত করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি বা আমরা আপনাদের নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিলাম।

প্রবন্ধ লেখার হিসাবে ও আমার এই বিষয়ের এই প্রথম প্রবন্ধ। অনেক পত্রিকায় আমার অনুসন্ধিত বিষয়ের এক প্যারাগ্রাফ বা এক পত্র সংক্ষেপ বাহির হইয়াছে, মাত্র, পূর্ণ প্রবন্ধ কখনও লেখাও হয় নাই—এবং কোনও পত্রেও বাহির হয় নাই। আমার প্রথম দিনের তিনটি কারণ লিখিয়া পড়িতে আপনাদের দেড়ঘণ্টা সময়ের উপর আঘাত করিয়াছি বক্রী আর পনেরটি কারণ সম্পূর্ণভাবে লিখিয়া আপনাদের সভায় পাঠ করিতে আরও ছয় সাত ঘণ্টা সময় লাগিবার সম্ভাবনা। তাহাতে আপনাদের চারি বা পাঁচ দিনের অধিবেশন ব্যয়িত করিতে হইবে বলিয়াই মনে হয়।

সকল কারণ সমান নহে, এবং প্রবন্ধের শৃঙ্খলাবদ্ধ সংক্ষেপ ও নাই আমার বিশৃঙ্খল সংক্ষেপ হইতে আমি মনে করি আমার কালিদাসের বাসভবন বিষয়ক অনুসন্ধান আপনাদের পূর্ণ ভাবে শুনাইতে হইলে আপনাদের আরও চারি বা পাঁচ দিনের প্রবন্ধ পাঠ করিবার অবসর দিতে হইবে। গত অধিবেশনে

---

* সাহিত্য সভায় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

মাননীয় সভাপতি মহাশয় আমায় কালিদাসতত্ত্ব সুমীমাংসা করিবার যে ভাবে আশা দিয়াছেন তাহা আর চারি পাঁচ দিন প্রবন্ধ পড়িয়া বিষয় পরিস্ফুট না করিলে হয় না।

সভাপতি মহাশয়ের নিকট নিবেদন—

মহাকবি কালিদাস্ বাঙ্গালি ছিলেন কি অন্য দেশীয় ছিলেন ইহা একটি গুরুতর বিষয়। ইহা লইয়া অনেক বাদ প্রতিবাদ হইবে। মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন—এই মতের অনুকূলে বাঙ্গালা দেশে অনেক মনীষী আছেন,—এবং প্রতিকূলে ও অনেক মনীষী আছেন। আমার এই প্রবন্ধ পাঠের সহিত বা আমার প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে ইহার প্রতিবাদ রূপে যিনি যাহা যাহা বলিবেন তাহার শেষ সমর্থন করিবার অবসর আমায় বা বা আমার মতের সমর্থন কারী মহোদয় দিগকে দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। আমার বিরুদ্ধ বাদীরা যেমন প্রতিবাদ করিতে জানেন, আমরাও তেমনই কি কি বাক্য বলিয়াছি তাহার কি কি প্রতিবাদ হইতে পারে তাহা বুঝিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছি। এবং যাহা যাহা প্রতিবাদ হইবে তাহা তাহা খণ্ডন করিয়া স্বমত দৃঢ় করিতে ও আমরা বা কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন—এই মতের সমর্থনকারীগণ প্রস্তুত আছেন।

স্বমত সমর্থন।

যে টুকু প্রবন্ধ পড়া হইয়াছে তাহা সুবিচারিত করিবার জন্য আমি গত অধিবেশনের প্রতিবাদের অগ্রে সমর্থন করিতেছি।

গত অধিবেশনে (২৭ শে আষাঢ় ১৩২৭) আমার পঠিত প্রবন্ধাংশের "সাহিত্য" সভার একজন মাননীয় সভ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর এম. এ, একটি প্রতিবাদ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার সমর্থন এই—

১। তিনি আপত্য করিয়াছেন "আসমুদ্র ক্ষীতীশ" শব্দে যদি সমুদ্র গুপ্ত হইতে যে বংশ ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়াছেন এই অর্থই যদি হয় তবে সমুদ্র বর্ণনা স্থলে কালিদাস সমুদ্র গুপ্তের যশোরাশির আরও বর্ণনা কেন করিলেন না? এ সম্বন্ধে আমার সমর্থন এই যে—

আমি যে উপরি উক্ত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা জর্ম্মন নিবাসী Dr. T.

Bloch. নামক ঐতিহাসিক এবং বারানসী নিবাসী রামাবতার শাস্ত্রী M. A. নামক ঐতিহাসিক দ্বয়ের। তাহাদের এই নবাবিষ্কৃত মত ভারতের এবং ইউরোপের সমগ্র ঐতিহাসিক মণ্ডলী একবাক্যে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাহাদের এই আবিষ্কার ভারতের পুরাতত্ত্বানুসন্ধান জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। এইরূপ বহুজন সম্মত মতের বিরুদ্ধে পুনঃসমর্থন চাহিলে আমার উপর কিছু অবিচার করা হয়। পূর্ব্বতন জ্ঞানীদের মতের উপর ভিত্তি করিয়াই পরবর্ত্তী নবীন জ্ঞান দণ্ডায়মান হয়। যখন নবীন মত প্রচারিত হয় তখন তাহার সমালোচকগণ তাহার নবীনাংশেরই উপর বাদ বিতণ্ডা করিয়া থাকেন, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী মতের জন্য আর তাহার নিকট কেহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না এ কথা মাননীয় সদস্য মহাশয়ের সর্ব্বথা জানা আছে; কাজেই এ কথার উত্তর দিবার জন্য আমাকে আহ্বান করা মাননীয় সদস্য মহাশয়ের উপযুক্ত হয় নাই। এই কথার উত্তর ডাঃ T. Bloch, এবং রামাবতার শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয় ১৪।১৫ বর্ষ পূর্ব্বে বহু ব্যক্তিকেই দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় পঠিত B. A ক্লাসে "কালিদাস" নামক পুস্তকের ভূমিকায় ৺হরিনাথ দে মহাশয় এই সকল মত উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাঁহার মতের প্রতিবাদকারীদিগকে তিনিও উত্তর দিয়াছেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার M.R.A.S. মহাশয় কালিদাস নামক এক পুস্তক লিখিয়াছেন এবং তাহাতেও ঐ মত উদ্ধৃত করিয়াছেন—তিনি তৎপ্রতিবাদকারীদিগকে ও এই সকল কথার উত্তর দিয়াছেন। এইরূপসর্ব্বজন বিদিত ও স্বীকৃত মতের বিরুদ্ধে উত্তর দিবার জন্য মাননীয় সদস্য মহাশয় আমাকে যখন আহ্বান করিয়াছেন তখন আমি এই সকল কথার উত্তর বিশেষ বিচার স্থলে সেই সকল গ্রন্থ উপস্থাপিত করিব এবং তৎসহিত আমার নিজ বক্তব্য ও বলিব।

২। আমার নিজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন আমি তাহার যথাযথ উত্তর দিতেছি। আমি বলিয়াছি—বাঙ্গলা ব্যতীত ভারতের কুত্রাপি সৌরমানে গ্রীষ্মকাল হইতে বর্ষারম্ভ গণনা হয় না।

ইহার প্রতিবাদে তিনি বলিয়াছেন—পাটনায় চান্দ্রমানে গ্রীষ্মকাল হইতে বর্ষারম্ভ গণনা হয়।

ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য—বিহার চিরদিনই বাঙ্গলার রাজাদের শাসনাধীন। বাঙ্গালার রাজা লক্ষণসেনের অব্দ সেখানে প্রচলিত।* বাঙ্গালা সালও সৌরগ্রীষ্মে বর্ষারম্ভ সেই দেশে লইয়া গিয়াছেন। মূলতঃ বিহারে কালিদাসের যুগে যে সম্বৎ প্রচলিত ছিল তাহা চান্দ্র বসন্তকাল হইতে বর্ষারম্ভ গণিত হইত। বিহারে যে বাঙ্গলার রাজাদের অব্দ প্রচলিত এই কথা শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় গত ২৫শে আষাঢ় ১৩২৭ তারিখের থিয়োজফিক্যাল হলের সভায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

আরও চান্দ্রমানে গ্রীষ্মকালের সহিত সৌরমানে গ্রীষ্মকালের অনেক পার্থক্য।

২১। আমার কথিত "আষাঢ়স্থ প্রথম দিবসে" স্থলে—

মাননীয় সদস্য বলেন—

"আষাঢ়স্য প্রশম দিবসে" এই পাঠ হইবে।

এই সম্বন্ধে আমার সমর্থন—এই পাঠ আমার লেখা নহে, ভারতের সমুদয় হস্তলিখিত পুস্তকে ও মুদ্রিত পুস্তকে এই পাঠই আছে। মেঘদূতের যাবতীয় টীকাকার এই পাঠেরই টীকা করিয়াছেন, কাজেই কোনও টীকাকর কৃত পাঠান্তর "আষাঢ়স্য প্রশম দিবসে" এই পাঠের প্রামাণ্য কি করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

২২। মাননীয় সদস্য মহাশয় বলিয়াছেন—আষাঢ়ের শেষ দিবসেই মেঘের উদয় হয় অতএব আষাঢ়স্থ প্রশম দিবসে এই পাঠ হইবে।"

এই সম্বন্ধে আমার সমর্থন—নবমেঘ মাঘ মাসের শেষ হইতে উঠিতে আরম্ভ করে—জনপ্রবাদে—"ধন্যরাজার পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ"। বৈশাখ মাসে নবমেঘের উদয় হয়। তাহার নাম "কাল বৈশাখী" এই কাল বৈশাখীর কথা দুর্গেশ-নন্দিনী প্রভৃতি অনেক পুস্তকে আছে।

১লা আষাঢ় হইতে বর্ষাকাল আরম্ভ, এবং জ্যোতিষ, Metrology প্রভৃতি জড়বিজ্ঞান মতে সেই দিন হইতে মেঘ উদিত হইতেএবং বর্ষণ করিতে বাধ্য। তবে যে বর্ত্তমান বর্ষে উদিত হইয়া ও বর্ষণ করিতেছে না তাহার বিজ্ঞান সম্মত অন্য কারণ আছে। কাব্যে আমার এই সমস্ত কথা বলিবার আবশ্যক করে না।

তাহার পর "মেঘদূত" কাব্য, ইহা বিজ্ঞান নহে। আকাশে মেঘ উঠুক আর না উঠুক কবি কল্পনার চক্ষুতে ১লা আষাঢ় মেঘ দেখিবেনই।—কারণ সেদিন বর্ষাকালের আরম্ভ দিন। কল্পনায় মেঘকে উঠিতেই হইবে ইহার নাম অলঙ্কার শাস্ত্রমতে কবিসময় প্রসিদ্ধি। কবিসময় প্রসিদ্ধির মতে—অমাবস্যা ও কৃষ্ণপক্ষ বাদে শুক্লারাত্র হইলেই আকাশে পূর্ণচাঁদ উঠিবে। শকুন্তলায় গ্রীষ্মকালে মেঘোদয় আছে—

"দিবস ইবাভ্রস্যামঃ তপাত্যয়ে জীবলোকস্য।"

"নবমেঘোঠিতো চস্য ধারা নিপতিতা মুখে॥" ৩য় অঙ্ক।

ভিন্নাঞ্জন সন্নিভংনভঃ ১।১১ ঋতু।

সমীকবাস্তোধব সত্তকুঞ্জবঃ তড়িৎপতাকোপনি শব্দমঙ্গলঃ

সমনন্দতকমসুদ্ধত যুতিঃ ঘণাগয়মঃ॥

৩। আমি বলিয়াছি—তালীবন শ্যামদেশ—রাঢ়।

মাননীয় সদস্য বলেন "ভারতের বহুস্থান তালীবন শ্যাম।"

আমার সমর্থন—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি—উত্তর কোশল হইতে সমস্থ্রে সুহ্ম ও বঙ্গের পশ্চিম মহোদধির উপকণ্ঠস্থিত তালীবন শ্যামদেশ রাঢ়দেশ মাত্র।

৪। আমি বলিয়াছি—শকুন্তলা যতদিন মুণিকন্যা ছিলেন ততদিন গাঙ্গরাষ্ট্র দেশীয়া কন্যাদের মত একখানি সাড়ী পরিধান করিতেন। প্রতিবাদে মাননীয় সদস্য মহাশয় বোধ হয় বলিয়াছেন—"অনুসূয়াও প্রিয়ম্বদার একখানি অধোবস্ত্র ছিল।" কথাটা আমি ভাল করিয়া শুনিতে পাই নাই, যদি পার্ব্বতীর উর্দ্ধবস্ত্র থাকিত তবে স্তন ভিন্ন বল্কলা কি করিয়া হইল? রতি শৃঙ্গার বেশে গিয়াই বা কি করিয়া বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনী হইলেন?

৫। মাননীয় সদস্য বলেন "ঋতু সংহার" প্রামাণিক গ্রন্থ নহে, কারণ ঋতু সংহারের কোনও শ্লোক কোনও আলঙ্কারিক উদ্ধৃত করেন নাই।

ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য—ভারতের সর্ব্বত্র ঋতু সংহারের হস্তলিখিত ও মুদ্রিতপুস্তক পাওয়া যায়। সকলেই একবাক্যে ইহা কালিদাস বিরচিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে মুদ্রিত ঋতুসংহার অবলম্বন করিয়াই শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমাণ করিয়াছেন কালিদাস ঋতুসংহার লিখিয়াছেন। B. O.

R. Journal, June 1916, সেই সভার যদুনাথ সরকার, যোগীন সমাদ্দার বিজয় মজুমদার R. P. Jayaswal, প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ব বিদ্বান উপস্থিত ছিলেন।

চতুর্থ কারণ।

মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থে ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষা, প্রাকৃত ভাষা,, নাট্যোক্তি, রূঢ়, যোগরূঢ়, চলিত কথা, ছেঁদো কথা উহ্য, ঐতিহ্য, কৃত্রিম শব্দ, প্রাদেশিক শব্দ, বিশোধিত শব্দ, (Naturalised word) প্রভৃতি ভাষার যাবতীয় উপাদান, খৃষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর গৌড়ীয় ভাষা বা গৌড়ীয় প্রাকৃত হইতে গৃহীত।

মহাকবি কালিদাস কোন দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই কথা আলোচনা করিতে গেলে ক্রমশঃ প্রশ্ন উঠে—তাহার ভাষা হইতে কি বুঝা যায়? তিনি যখন মহাকবি, তখন তাহার ভাষার একটু অসাধারণত্ব, একটু বৈচিত্রী, একটু অভিনবত্ব আছেই, সেই অভিনবত্ব, সেই বৈচিত্রী, সেই অসাধারণত্ব হইতে, তাঁহার বাস ভবনের কিছু তথ্য পাওয়া যায় কি না?

ভাষা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে,—ইহা একটী জাতিগত সম্পত্তি। ভাষ', কাব্য বা জ্ঞান একটী জনসংঘের চিন্তাস্রোত মাত্র। যে চিন্তাস্রোত গৌরী-শঙ্কর শৃঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া, গঙ্গাসাগরের অভিমুখে ছুটিয়াছে, তাহার একটি বুদ্বুদ, বা বাঙ্গালার এক একটি কবি এক একটী জ্ঞানী এক একটী মহাপুরুষ মাত্র। এইচিন্তা নির্ঝরিনীতে কত কত বুদ্বুদ উঠিয়াছে একপল দুইপল চারি-পলস্থিতি করিয়াছে, এবং তাহার পর যথা সময়ে লীন হইয়া গিয়াছে। যে বুদ্বুদ অধিকক্ষণরহিয়াছে, বৈচিত্রী লাভ করিয়াছে, বৃহৎ হইয়াছে,—তাহারই কথা জগৎ মনে করিয়া রাখিয়াছে এবং যাবৎ হইয়াছে, জগৎ তাহার কথা আর মনে করিয়া রাখে নাই। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র বুদবুদটি—ক্ষুদ্রই হউন আর বৃহৎই হউন অচিত্রই হউন আর বিচিত্রই হউন, এক পলই থাকুন, আর দশ পলই থাকুন, তাহার উপাদান—সেই বৃহৎ নিঝরিনীই।

সেইরূপ কবি, জ্ঞানী ও ভাবুকগণ, জাতীয় চিন্তা স্রোতের এক একটি অংশ মাত্র তাঁহাদের নিজস্ব যদিও কিছু কিছু আছে বটে, কিন্তু তাহা অনন্তের তুলনায় অত্যল্প। (কনাদের মতে তাঁহাদের চিন্তায় "সামান্যত্ব" ও "বিশেষত্ব" উভয়ত্বই আছে) এবং তাহারা তাঁহাদের ভাবের নিজেদের উপাদান, সেই জাতীয় চিন্তাস্রোত হইতেই সংগ্রহ করিয়া থাকেন। যদিও কবিরা তখন তখন প্রচার করেন—

"পরের কাছে ধার করেনেব তা, হবে নাকো সিটি।
জানই বাছা, আমার সকল কাজে, Origenality.॥

একথা প্রমাণ সহ নহে, কারণ—অনন্ত শাস্ত্র ও অনন্ত কবিতা আমরা সকলের সন্ধান রাখিতে পারি না বলিয়াই, অজ্ঞানের নিকট এই সকল ব্যক্তির কার্য্য ক্ষনিক Origenality মাত্র প্রকৃতপক্ষে তাহা অনন্ত ভাবুকের ভাবের ছায়ার প্রকারভেদ মাত্র।

কালি দাসের সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযুজ্য। তাহার পূর্ব্বেও অনেক কবি জন্মিয়াছিলেন এবং পরেও অনেক কবি জন্মিয়াছেন তিনিও যেমন একটি অগ্রিম ভাব প্রবাহ হইতে স্বীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, অন্যেও সেইরূপ পরম্পরা-গত ভাব প্রবাহ হইতেই স্বীয় ভাবের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। এইরূপ স্থানে আমাদের অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে—তিনি কোন পরম্পরাগত ভাব প্রবাহ হইতে, স্বীয় ভাবের উপাদান সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। কোন দেশের কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের চিন্তাস্রোত এবং কালিদাসের পর-বর্ত্তী কালের চিন্তাস্রোতের সহিত কালিদাসের চিন্তাস্রোতের সামঞ্জস্য আছে। কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের চিন্তাস্রোত পাওয়া না গেলেও তাহার পরবর্ত্তী কালের কোন দেশের ভাব প্রবাহের সহিত, তাহার চিন্তাস্রোতের কতখানি আত্মীয়তা আছে, তাহাই আমাদের অগ্রে বিচার্য্য।

কালিদাসের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে, অগ্রে আমাদের আংশিক নির্ণয় করা কর্ত্তব্য যে, কালিদাস কোন গ্রন্থের পর কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার ভাষার স্তর কিরূপ? কারণ বর্ত্তমানের সকল কবিই স্বীকার করিয়াছেন যে তাহার বাল্যের ভাষা একরূপ, তাহার যৌবনের ভাষা অন্যরূপ, এবং তাহার বার্দ্ধক্যের ভাষা আবার অপর রূপ।

আমি এসম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামোল্লেখ করিতে পারি। তাঁহারা আমার "বাল্যের রচনা" শীর্ষক অনেক কবিতা বা প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়াছেন, এবং তাঁহারা তাঁহাদের বয়োবৃদ্ধির সহিত যে তাঁহাদের রচনার পারিপাট্য বাড়িয়াছে, তাহাও স্বীকার করিয়াছেন।

কালিদাসের গ্রন্থ সকল এই দশ বর্ষ আলোচনা করিয়া, আমি বুঝিয়াছি,—

কালিদাসের নব যৌবনের রচনা বা তাঁহার ২৫শ বর্ষ হইতে ৩৫ বর্ষ মধ্যের রচনা—

১। ঋতু সংহার।
২। শ্রুতবোধ।

কালিদাসের মধ্য যৌবনের রচনা বা তাহার ৩৫বর্ষ হইতে ৪৫ বর্ষ মধ্যের রচনা—

৩। রঘুবংশ।
৪। অভিজ্ঞান শকুন্তলা।

কালিদাসের প্রৌঢ়াবস্থার রচনা বা তাহার ৪৫ বর্ষ হইতে ৫৫ বর্ষের মধ্যকার রচনা—

৫। কুমারসম্ভব।
৬। বিক্রমোর্ব্বশী।

কালিদাসের বৃদ্ধাবস্থার রচনা বা তাহার ৫৫—৬৬ বর্ষ মধ্যের রচনা—

৭। মেঘদূত।
৮। মালবিকাগ্নি মিত্র।

এই পর্য্যায় আমি কোন ভিত্তির উপর বলিতেছি, তাহা আমি পৃথক প্রবন্ধে বিবৃত করিব।

এইস্থলে তাহার জীবন চরিত্রের ও একটু আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা প্রবন্ধ পরিস্ফুট হইবে না। আরও কি অবস্থার মধ্য দিয়া, তাহার চিত্তবৃত্তি গঠিত হইয়াছে, এবং কত ভাবার সংঘাতে তাহার ভাব প্রবাহ ব্যাহত হইয়াছে তাহাও আমাদের ইহার সহিত জ্ঞাতব্য। বিজ্ঞান সম্মত পুরাতত্ত্বানুশীলনে জনশ্রুতি আপ্ত বাক্যের মত গৃহীত হয়, অতএব জনশ্রুতির মতে—কালিদাস বাল্যে দুর্মূর্খ ছিলেন, রাজকেরা বিদুষী রাজকন্যাকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য, কালিদাসকে

পণ্ডিত সাজাইয়া বিদুষী রাজ কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন বাসর গৃহে বিদুষী তাহা জানিতে পারিয়া, কালিদাসকে তাড়াইয়া দেন। কালিদাস মা সরস্বতীর আরাধনা করিয়া রাতারাতি মহাকবি হইয়া উঠেন, এবং বিদুষীর মন্দিরে আসিয়া ঝড়ের মত কবিতা রচনা করিয়া স্বীয় অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিলে, বিদুষী তাহাকে পতিরূপে গ্রহণ করেন। পরে হর্ষ বিষাদে বিদুষী আত্মহত্যা করেন। বোম্বাইর ডাঃ ভাউদাজি এবং বাঙ্গালার ডাঃ রামদাস সেনের মতে—কালিদাস বৃদ্ধবয়সে কাশ্মীরের শাসন কর্ত্তা হইয়াছিলেন, তদানীং তাহার উপনাম হইয়াছিল মাতৃগুপ্ত।

এসকল কথা পৃথক প্রবন্ধে বিচার করা যাইবে আপাতত ভাষা বিশ্লেষনে সহায়তা করিবে বলিয়া একটু জীবন চরিত আলোচনা করিলাম। তাহাভিন্ন মগধ, মালব, কর্ণাট, অবন্তি প্রভৃতি নানা রাজসভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন; তজ্জন্য নানা ভাষার উপাদান হইতেও তিনি স্বীয় ভাষার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ভারতের সর্ব্বত্র তিনি পরিভ্রমন করিয়াছিলেন—এসকল কথা ও তাহার ভাষা বিশ্লেষন করিতে গেলে জানিয়া রাখা আবশ্যক।

ভাষা বিশ্লেষন।

(১) সংস্কৃত

সমুদয় কালিদাসের ভাষারই এইরূপ গঠন প্রনালী যে তাহার অনেক স্থলে অনুস্বর ও বিসর্গ তুলিয়া দিলেই,—বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালা ভাষা হইয়া যায়, এইরূপ কালিদাসের ভাষার সহিত সৌসাদৃশ্য, ভারতের অন্য কোনও ভাষায় নাই। পূর্ব্বের অধিবেশনে আমি বলিয়াছি, ঋতু সংহার কালিদাসের প্রথম যৌবনের প্রথম রচনা। তখনও তিনি মাতৃভাষা ভুলিতে পারেন নাই,—সবে স্বদেশ হইতে বিদেশে বাহির হইয়াছেন, তখন কেবল বাঙ্গালা ভাষায়, তাহার চিন্তিত বিষয়ের উপর অনুস্বার ও বিসর্গ লাগাইয়াই সংস্কৃত প্রয়োগ করিতেছেন, সেইরূপ অবস্থায় তাহার প্রথম কাব্যের প্রথম শ্লোকটি খাঁটি বাঙ্গালা।—

"প্রচণ্ড সূর্য্যঃ স্পৃহনীয় চন্দ্রমা,
সদাব গাহ ক্ষত বারি সঞ্চয়ঃ,

দিনান্ত রম্যোঽভ্যুপ শান্ত মন্মথঃ

নিদাঘকালঃ সমুপাগত প্রিয়ে ! ॥ ১ ।”

ইহা হইতে পাঁচটি—বিসর্গ তুলিলেই বাঙ্গালা ভাষা হয়, এবং বাঙ্গালা পদ্যই হয়, যেমন—

প্রচণ্ড সূর্য্য, স্পৃহনীয় চাঁদ,

সদা অবগাহে ক্ষত বারিচয়,

দিনান্ত সুরম সুশান্ত মন্মথ

নিদাঘের কাল সমাগতপ্রিয়ে ! ॥

এই শ্লোক ভাবে, ভাষায় এবং ছন্দে, বাঙ্গালা ভাষার সহিত এক। এইরূপে কালিদাসের লেখা ব্যতীত সংস্কৃত ভাষার কোনও শ্লোক, বাঙ্গালা ভাষা ব্যতীত ভারতের অন্য কোনও ভাষায়, এইরূপ ভাব, ভাষা এবং ছন্দের একতা রাখিয়া অনুবাদ করা যায় না। আমি এই শ্লোকের ভাব ভাষা এবং ছন্দঃ এক রাখিয়া, হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য, অনেক হিন্দীবালাকে বলিয়াছি, কিন্তু কেহই তাহা পারেন নাই।

ঋতু সংহারের আর একটি শ্লোক তুলিতেছি—

“সুবাসিতং হর্ম্মতলং মনোহরং

প্রিয়া মুখোচ্ছাস বিকম্পিতং মধু।

সুতন্ত্রীগীতং মদনস্য দীপনং

শুচৌ নিশীথেষু ভবন্তি কামিনঃ ॥ ৩ ।”

অনুবাদ কথা—

সুবাসিত হর্ম্যতল মনোহর,

প্রিয়া মুখোচ্ছাস বিকম্পিত মধু।

সুতন্ত্রীর গীত মদন দীপন

শুচির নিশীথে অনুভবে কামী ॥

এখানে ছয়টি অনুস্বর এবং একটি বিসর্গ তুলিয়া, ভাব ভাষা, এবং ছন্দ ঠিক রাখিয়া, এমন সুন্দর অনুবাদ হইয়াছে যে, ইহা যে অনুবাদ তাহা ঋতু সংহার না জানা লোকে বুঝিতে পারিবে না। এইরূপে অনুস্বর ও বিসর্গ তুলিয়া সমগ্র

ঋতুসংহার আমি অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছি, আপনাদের আবশ্যক হইলে আনিয়া শুনাইয়া দিব।

কালিদাসের দ্বিতীয় গ্রন্থ—

শ্রুত বোধের প্রথম শ্লোক—

ছন্দসাংলক্ষনং যেন শ্রুত মাত্রেন বোধ্যতে।
তদহং সংপ্রবক্ষ্যামি শ্রুতবোধ মবিস্তরং॥
ছন্দের লক্ষন যাতে শ্রুত মাত্রে বুঝাযায়,
তাহাই বলিব আমি শ্রুতবোধ অবিস্তর।
"অগুরু চতুষ্কং ভবতি গুরুদ্বৌ
ঘন কুচ যুগ্মে শশি বদনাসৌ। ৮।"
অগুরু চতুষ্ক সহ গুরু দুইটি
ঘন কুচ যুগ্মে! শশি বদনাসে।

রঘু বংশ—

বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ বাগার্থ প্রতিপত্তয়ে
জগতঃ পিতরৌবন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ॥"
বাগর্থ মত সম্পৃক্ত বাগার্থ প্রতিপত্তিতে
জগৎ পিতৃদের বন্দি পার্ব্বতী আর পরমেশ্বরে।
"কস্বর্য্য প্রভবো বংশঃ কচাল্প বিষয়া মতিঃ
তিতীর্ষু র্দুস্তরং মোহা দুড়ুপে নাস্মি সাগরং। ২"
কৈস্বর্য্য প্রভব বংশ, কৈ অল্প বিষয়া মতি
তরিতে দুস্তর মোহে, উড়ুপে চাহি সাগর।
"মন্দঃ কবি যশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপ হাস্যতাং
প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভাং উদ্বাহুরিব বামনঃ। ৩"
মন্দ কবি যশ প্রার্থী যাইব উপহাস্যতা
প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভে উদ্বাহু যেন বামন।

কুমার সম্ভব—

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা

হিমালয়ো নাম নগাধিরাজ
পূর্ব্বা পরৌ তোয় নিধীবগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মান দণ্ডঃ। ১।"
উত্তর দিকেতে আছে দেবতাত্মা
হিমালয় নামে নগ অধিরাজ
পূর্ব্বাপর তোয় নিধি অব গাহি,
স্থিত পৃথিবীর যেন মান দণ্ড।

অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে ইহার নাম "ভাষাসম" অলঙ্কার। "সাহিত্য দর্পণে" ভাষাসম অলঙ্কারের উদাহরণ রূপ যে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালা ভাষার অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটি কবিতা মাত্র। শ্লোকটি এই—

মঞ্জুল মনি মঞ্জীরে,
কল গম্ভীরে বিহার সরসী তীরে,
বিরসাসি কেলি কীরে
কিমালি! ধীরেচ গন্ধসার সমীরে॥

এই শ্লোক জয়দেবের কবিতার মত আধা বাঙ্গালা এবং আধা সংস্কৃত। যেমন—

"ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী,"
"চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীল নিচোলং"
"চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর পীতবসন বনমালী।"

জনপ্রবাদে যে সব শ্লোকে কালিদাস মা সরস্বতীর স্তব করিয়াছিলেন সেই সব শ্লোকই এইরূপ জয়দেবের কবিতার মত "ভাষাসম" অলঙ্কার মাত্র। যেমন—

"জয় জয় দেবি! চরাচর সারে,
কুচ যুগ শোভিত মুক্তাহারে,
বীনা লম্বিত পুস্তক হস্তে
ভগবতি! ভারতি! দেবি! নমস্তে॥"
"বিষদ কুসুম তুষ্টা, পুণ্ডরীকোপ বিষ্টা
ধবল বসন বেশা মালতী গন্ধ কেশা।" ইত্যাদি।

নবদ্বীপ বাসী ৺কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন মহাশয়ের একটি কবিতা আছে

তাহাও এইরূপ ভাষাসম অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত যেমন—

তারে কোয়ো সুধা লোভে
মৃতদেহে স্পৃহা কর।
গুপ্ত স্থানে সাদরেতে
তারি শ্রীচরণে ধরঃ॥

এই ভাষাসম অলঙ্কারটি বাঙ্গালী জাতির উদ্ভাবিত। বাঙ্গালী আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ সুরি, এই অলঙ্কারের উদ্ভাবয়িতা কারণ বাঙ্গালা ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায়, এই অলঙ্কার নির্ম্মাণ করা যায় না। এইরূপে কালিদাসের সমুদয় কাব্য, অনুস্বর ও বিসর্গ তুলিলেই বাঙ্গালা ভাষা হইয়া যাইবে। আমি আপাততঃ ঋতু সংহারের এইরূপ অনুবাদ সমাপ্ত করিয়াছি, বক্রী কয়খানি, ভগবানের দয়া হইলে এইরূপ অনুবাদ করিয়া রাখিয়া যাইব। এইরূপ অনুবাদ থাকিলে, কালিদাসকে বাঙ্গালী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য আর বাদবিতণ্ডা করিবার আবশ্যক হইবে না।

(২) প্রাকৃত—

কালিদাসের প্রাকৃত ভাষার কাব্যাদর্শের মতে নামান্তর গৌড়ীয় প্রাকৃত ভাষা। আচার্য্য দণ্ডী মহাকবি কালিদাসের অত্যল্প পরবর্ত্তী ছিলেন। তিনি কালিদাসের কাব্যাদিতে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষার নাম গৌড়ীয় প্রাকৃত ভাষা দিয়াছেন।—

"শৌর সেনীচ গৌড়ীচ লাটী চান্যাচ তাদৃশী—
যতি প্রাকৃত মিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিং।"

কাব্যাদর্শ প্রথম পরিচ্ছেদ ৩৫ শ্লোক।

—শৌর সেনী, গৌড়ী, লাটী, প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষা সাধারণ জনে ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদের কিছু কিছু সৌসাদৃশ্যও আছে। ইহা দণ্ডীর মত। পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকেরা শৌর সেনী ও প্রাকৃত ভাষাকে পৃথক্ পৃথক্ ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। "সাহিত্য দর্পনে" ভাষাসম অলঙ্কারের উদাহরণ স্থলে লিখিত হইয়াছে—"এবচ সংস্কৃত প্রাকৃত সৌর সেনী নাগর অপভ্রংশে ষেক বিধ এব।" এই কবিতা সংস্কৃত, প্রাকৃত, সৌরসেনী, নাগর, অপভ্রংশ প্রভৃতি সমুদয় ভাষাকেই একার্থ বাচক। "কাব্যাদর্শে—" যাহা গৌড়ীয় প্রাকৃত

ভাষা, তাহাই পরবর্ত্তী কালের আলঙ্কারিকদের মতে প্রাকৃত ভাষা। ইহা হইতে বা দণ্ডীর লেখা অনুযায়ী বুঝা গেল—কালিদাস তাহার নাটকে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা গৌড় দেশের বা বর্ত্তমান গাঙ্গরাষ্ট্রের প্রাকৃত জনেরা—বা প্রজা সাধারণে ব্যবহার করিত। সাধু জনেরা সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহার করিতেন। এইরূপে দণ্ডীর ভাষায় ইহাই স্পষ্ট হইল যে মহাকবি কালিদাস গৌড় দেশেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি গৌড় দেশের প্রজা সাধারণ যে ভাষা ব্যবহার করিত সেই ভাষাই তাহার নাটকে ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি পশ্চিম দেশীয় লোক হইলে "শৌরসেনী" ভাষা বা শৌরসেনী প্রাকৃত তাঁহার নাটকে ব্যবহার করিতেন। আচার্য্য দণ্ডীর কথাতেই কালিদাস যে গৌড়ীয় তাহা প্রমাণ হইল।

এইবার কালিদাসের গৌড়ীয় ভাষার সহিত, বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালা ভাষার কতদূর সৌসাদৃশ্য আছে, তাহাই দেখান যাউক—

"ইদো ইদো পিয় সহি"—ইদিকে ইদিকে প্রিয় সখী ; অথবা গ্রাম্য ভাষায় হ্যাদে হ্যাদে সই।

এখানে যেন বাঙ্গালার গ্রাম্য কথারই অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করা হইয়াছে।

> "হলে শউন্দলে! তত্তোপি তাদ কণ্বস্স
> অশ্‌শাম রুক্‌অা পিয় দরেত্তি তক্কেমি,
> জেন নোমালিআ কুসুম পরিপেল আবি
> তুমং, এদানং আল আল পরিউরনে নিউত্তা।"

হালা শকুন্তলা, তোর চেয়েও যে তাত কণ্বের আশ্রম বৃক্ষ প্রিয়তর এইটি তর্ক করিতেছি, যে হেতু নব মালিকা কুসুম পরিপেলক তোমাকে এদের আলবাল পরি পূরণে নিযুক্ত করিয়াছেন।

"হলে অনুস্যুয়ে! অদি পিনদ্ধেন বকলেন পিয়ম্বদাত্র দঢ়ং পিড়িদোম্হি। তা সিড়ি লেহি দাবনং।"

হালা অনুস্যুয়ে, অতি পিনদ্ধ বাকল খানায়, প্রিয়ম্বদা কর্ত্তৃক দৃঢ় পীড়িত হইয়াছি, তা ঢিলে করে দেত রে।

"এত্থদাব পত্তহর বিত্থার হেতুঅং অত্তনো জোব্বনারম্ভং উবালহম্ম। মং কি উবালহসি

এতে তবে পয়োধর বিস্তার হেতুক, আপনার যৌবনারম্ভকে উপালম্ভকর, মোকে কেন উপালম্ভিতেছ?

"অনুসূএ! জানাসি কিং নিমিত্তং সউন্দলা বন জোসিনীং অদিমেত্তং পেক্‌কদিত্তি।"

অনুসূয়া জানিস্ কি নিমিত্ত শকুন্তলা বন জোসিনীকে অতিমাত্র দেখছে।

"নকখু বিভাবেমি ভনতু।"

না কৈ ভাবিনিত, বলতো।—(কি জানি ভাই)

"তুস্মন্দং আক্কন্দ, হদো রাঅ রক্খিদাইং তবো বনাইং নাম।"

তুষ্মন্ত বলে কাঁদ. যেহেতু রাজ রক্ষিত তপোবন, জান না।

"অজ্জন কিম্পি অচ্চাহিতং,ইঅং নঃ পিয় সহী তুট্ট মহঅরেন অহিহুঅ মানা, কাদরী ভূদা।"

আজ্ঞা না কিছুই অত্যাহিত, এই আমাদের প্রিয় সখী তুষ্ট মধুকর দ্বারা অভিভূয় মানা হইয়া কাতর হইয়াছিলেন।

"হলে সউন্দলে! গচ্ছ উড়অং. কলমিস্সং অঘ ভাঅনং উপহর।"

হালা সউন্তলা. উঠানে যাও, কলমিশ্র অর্ঘ ভাজন উপহরন কর।

"হলা চণ্ডি। মারীহসি গন্ধং তুবেমে রুক্‌ক সেঅন কে ধারেদি।"

হালা চণ্ডি, মারবি যেতে, তুই আমার তুই উড় কি ধারিস্।

এইরূপে আলোচনা করিলে দেখা যায়, ষোলশত বর্ষ পূর্ব্বেকার কালিদাসের সময়কার গ্রাম্য ভাষা, এত বিপ্লব সহ্য করিয়া বর্ত্তমান গৌড়ের গ্রাম্য ভাষার সহিত কিরূপ অভিন্ন রহিয়াছে অথবা কালিদাসের প্রাকৃত, এখনকার রাঢ়ের নীচ জনের ব্যবহৃত ভাষার সহিত সমবয়' ও সমভাবাপন্ন হইয়া কিরূপ বর্ণে বর্ণে অভিন্নত্ব প্রতি পাদন করিতেছে।

এইবার কতকগুলি প্রাকৃত শব্দ তুলিতেছি যাহা রাঢ়ের গ্রাম্য শব্দের সহিত কিরূপ অভিন্ন তাহাই লক্ষ্য করিবেন।—

তহ—তাইহোক্

সিনেহ—স্নেহ, বৈষ্ণব গ্রন্থে "সিনেহ" এইরূপই লিখিত আছে।

সচ্চং সচ্চং—সত্যি সত্যি।

সচ্চং কিনং পেক্খধ—সত্যি কিনা দেখছিস না?

বহিনী—বহিন্ বুন্

অম্ম - ওমা, উমা, "উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাৎ উমাখ্যাং সুমুখী জগাম" কুমার। আমার এই অনুসন্ধানটি মহাঃ শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী B.& O. R. Journal পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

অহ্মে—অমরা। সংস্কৃত বয়ং

হন্দী হন্দী ইদোপি আঅচ্ছদি—হেদে হেদে, এদিগেও আসছে—এটা নেহাত রেঢ়ো কথা।

অপ্পা—আপনি, সং ভবান্

অজ্জ—আজ, সং—অদ্য,

ইধ—ইদিক, "সহরত্ত রঘুনাথ পুর ইধির চিড়া ইধির গুড়" রাঢ়ের দের কথা।

কদত্থ—কেদাত্ত। নদে জেলার কথা—"বেটা বেন ভাত খেয়ে বাপ মাকে কেদাত্ত করবেন।"

তুম্হে—তোমরা, সং—যূয়ং।

ন শুনিম্হং—শুনছি না।

শুনাধ অজ্জ—শোনোতো রাজা।

তা—তা, তবে,

মর্ষয়—মার্জ্জনা করুন

হুবিয়—হইয়া

গাত্রোপঘাত—গায়ের বেদনা।

হোত্তব্যং—হইবে। সং—ভবিতব্যং।

সিয়াল মিয় লোলুপ—সিয়াল সহ, বাঙ্গালা সিয়াল কথাই ব্যবহার।

মুহে—মুয়ে,—শুয়ে মুয়ে থাক।

হোমি—হোই

তাকিং তায়ে দিট্টি আয়ে—তা তাকে দিট্টি করে কি হবে?

পসজ্জং বড্ঢইসং—প্রশ্রয় বাড়াচ্ছি না।

তেল্ল চিক্কন শীর্ষস্য—তেল চেকনাই মাথা।

হথে—হাথে।

কীদিশে সে অনুরাআ—সে অনুরাগ টা কেমন ধারা (মেদিনী পুরী কথা)

ভন—বল, "কাশীরাম দাস ভনে"।

অবিতথ মাহ—ঠিক বলেছে।

কসবা অন্নস ভনিসং—আর অন্য কাকেই বা বলবো।

কিংবা সউন্দলা ভনাদি—কিবা শকুন্তলা ভনে।

তুজঝ—তুঝ, চণ্ডি দাসের কবিতা।

সঙ্গ দথাী নবেতি—অর্থের সংগতি হচ্চে কিনা।

মদনা—মরমা, বুড়ী মন্না বা মর্না বুড়ি,।

ইদো শিলা তলৈক দেশং অনুগেহ্নতু মহাভাআ—মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বসুন

শুনিয়—শুনিয়া

অখি বিশেযে—একটু বিশেষ হইয়াছে।

সম্পদং অনুভব দাব দুকখং—সম্প্রতি দুঃখ অনুভব কর।

লদাহর—লতাঘর।

রজ্জ কজ্জাইং উঝিয়—রাজ কার্য্য উঝে।

কার্য্য কথা বাঙ্গালায় বহু ব্যবহার, এস্থলে হিন্দীতে "কাম করতা হৈ" বলে।

কন্নআ—কন্যা, পূর্ব্ববঙ্গে এখনও কন্না এইরূপ উচ্চারণ হইয়া থাকে

জাদে—যাদুমনি।

আলবাল—আল্ বা আইল।

এই সমুদয় আলোচনা করিলে দেখা যায়—চৈতন্য ভাগবতের ভাষা, বৈষ্ণব কবিদের ভাষা এবং রাঢ়ের গ্রাম্য ভাষার সহিত কালিদাসের প্রাকৃত ভাষা একই পর্য্যায় ভুক্ত। কালিদাসের প্রাকৃতে য, বা য়, ষ, শ,, এই তিন বর্ণের ব্যবহার মোটেই নাই। ঋ কার ঋ ফলা, বা ঋৃ এই বর্ণ ও প্রাকৃতে নাই। প্রাচীন বাঙ্গালায় ও এই সকল ছিল না। একনেও জমিদারী সেরেস্তায় ও মহাজনীতে এই সকল বর্ণের ব্যবহার নাই।—বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশোধিত ভাষা মাত্র। পূর্ব্বে যফলা স্থলে দ্বিত্ব হইত,

যেমন ইস্‌সর বিদ্দে সাগর,কাজ্‌ অঘিয,জৌবন, দুকখ,অকখ এইরূপ লেখা ছিল। তাঁহার সময় হইতে ঈশ্বর, বিদ্যাসাগর, কার্য্য অর্ঘ্য, যৌবন, দুঃখ, অক্ষ, এইরূপ লেখা আরম্ভ হইল। সেকালে বাঙ্গালায় সংযুক্ত বর্ণও ছিল না। প্রাকৃতেও নাই।

একটা কলিকাতার সে কালের গল্প এইরূপ—কোন কলিকাতার বড়লোক কোনও স্ত্রীলোককে কিছু সম্পত্তি দান করেন তাহাতে লেখাছিল—তুমি জাবং-জীবন এই সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকিবে। উক্তবড় লোকের পুত্রেরা তাহার বিরুদ্ধে নালিস করিল বিচারক দেখিলেন সেই দানপত্রে লেখা আছে—তুমি জাবৎ জৌবন এই সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকিবে"। একালের বাঙ্গালা হইলে যাবৎ জীবনকে "যাবৎ যৌবন" করা বড় কঠিন হইত।

(৩) নাট্যোক্তি—

কালিদাসের গ্রন্থে কতকগুলি নাট্যোক্তি শব্দ আছে—

অব্রহ্মণ্য—অবধ্য স্থলে প্রযুক্ত।

অত্তিকা—জ্যেষ্ঠা ভগিনী. Antec ইং

অম্বা—মাতা

অজ্জুকা—স্ত্রীবেশধারী পুরুষ,

আবুক—জনক, "আবা আবা ধোবলি

আবা গেল বাবার বাড়ি—

সাতশ টাকার গুধ্‌ড়ি পড়ি।"

ইহার ইংরাজি অনুবাদ —

Off off white man (White Leprsey)

Off has gone to his fetherland

His sea fare seven hundred rupees

এই ছড়া পলায়িত সেকেন্দর সাহেকে রাঢ়ের বাঙ্গালীরা বলিয়াছিল।

দেব—রাজা

দেবী—কৃতাভিষেকা মহিষী,

নিষ্ঠা—নির্ব্বহন নাটকাংশ

বাছু— বালা বাছুনি, বাছা,—রাঢ়ের কথা।

ভাব—বিদ্বান, "বাবু"। বাবু শব্দে বাঙ্গালীদেরই বুঝায়, এক্ষণে ১৩১১ সাল ৩১শে আশ্বিন হইতে তাঁহারা "শ্রীযুৎ" হইয়াছেন।

ভর্ত্তৃদারক—যুবরাজ, কুমার,

ভর্ত্তৃদারিকা—রাজকন্যা।

ভট্টারক—রাজা।

ভট্টিনী—রাজাদের ইতরা পত্নী।

মারিষ—"মারিক" উপাধি,মুকখু, মরুর্ব্বি, আর্য্য,

রাষ্ট্রীয়—রাজ শ্যালঃ।

হণ্ডে—হাঁড়ে, রাঢ়ের নীচ জাতীয় আহ্বান।

হঞ্জে—হাঁগো,

হলা—হ্যাঁলা—সখী সম্বোধন।

সাধি—প্রাচীন রাঢ়ের বিদায়ের ভাষা "আসি" (Good by) পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও এই কথা চলিতছিল। এখন আর একথা কেহ বলে না। শব্দ বিজ্ঞার মতে "সাধি"—কথা হইতেই "আসি" কথা উৎপন্ন হইয়াছে।

কালিদাসের নাটকোক্ত এইরূপ অনেক কথা, অমর সিংহ ন্যাটোক্তি নামে স্বীকার করিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানা যায়—পুরাকালে, নট সম্প্রদায় যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহা সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে একটি পৃথক ভাষা। তাহার পদ চিহ্ন মাত্র সংস্কৃত নাটকে রহিয়াছে। বাঙ্গালার জাতিতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে জানা যায় রাজ সাহী বিভাগে "নট" নামক এক প্রকার জাতি আছে।

*উত্তর রাঢ়ে কোলোমার গ্রামে জনপ্রবাদ শুনিলাম—উজানি বা উজ্জয়নীর রাজা বিক্রমাদিত্যের রঙ্গনাথ নামে একজন সহচর ছিল। যাহার সুবিধার জন্য বিক্রমাদিত্য উজানি হইতে মোর গ্রাম পর্য্যন্ত এক রাজ পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। যাহার নাম "রাঙ্গার সরান" রঙ্গনাথ একজন উত্তম অভিনেতা ছিল। যাহার সহিত বিক্রমাদিত্য উত্তর বঙ্গে বাস করিতেন। সেই অবস্থিত স্থানের নাম "রঙ্গপুর"। এই কথা "আলোচনা" পত্রিকায় ১৩২৭ সালের মাঘ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ভুদেব মুখোপাধ্যায় M. A. জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় "কালিদাসের

যাহাদের কার্য্য নাচ ও গান করা। ইহারা পূর্ব্বে যাত্রা বা নাটক অভিনয় করিত। বাঙ্গালার রাজারা ইহাদের দ্বারা নাটক অভিনয় করাইতেন। ইহাদের পুরুষেরা যদিবা সংস্কৃত বলিতে পারিত স্ত্রীলোকেরা মোটেই সংস্কৃত উচ্চারণ করিতে পারিত না, কাজেই তাহাদের সুবিধার জন্য, প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার ইতর স্থলে হইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা অচিরে অভিনয়, স্থলে সেই সব ভাষা নাট্যোক্তিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল।

(৪) রূঢ় শব্দ—

সম্বন্ধী—শ্যালকার্থে, রূঢ় ইহা এই অর্থে বাঙ্গালা দেশেই ব্যবহার। অন্য দেশে সম্বন্ধী শব্দের অর্থ বৈবাহিক।

মৃণাল বলয়—বালা, ইং Bangles, যাহা বাঙ্গালার মেয়েরা পরে। যদি অন্য দেশে ইহা থাকিত তবে ইহার নাম Bangles কেন হইবে যেমন Banglow—বাঙ্গালাঘর যদি অন্য দেশে ইহা থাকিত তবে ইহার নাম Hindoosthancc হইত।

সম্ভোগান্ত—এখানে অন্ত শব্দ আদি মার্থে ব্যবহৃত। "কল্পান্তে ভগবান প্রভুঃ" এখানে অন্ত শব্দ আদি মার্থে প্রযুক্ত। চণ্ডী মেধস মুনি কর্ত্তৃক বিরচিত বা প্রোক্ত। বাঙ্গালাদেশে "মেধস মুনির আশ্রম" রামপুর হাটের নিকটে বীরভূম জেলায় অবস্থিত।

নির্ম্মক্ষিকং—মাছিটি পর্য্যন্তও নাই। ইহা মাছি মারা কেরাণীদের দেশের লোকের লেখা।

আচারং লাজ,—উড়ীধানের খৈ। উড়ীধান বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য দেশে জন্মে না। খৈ, মুড়ি, মুড়কি, উখড়া, খাগড়া প্রভৃতি সমুদয় ধান্য বিকারজ দ্রব্য মুরসিদাবাদ জেলায় উৎপন্ন এবং তত্তৎ গ্রাম্য বাচক। "উড়োখৈ গোবিন্দায় নম" এসব কথা বাঙ্গালা দেশেই আছে।

জন্মভূমি" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন।) রঙ্গভূমি কথার অর্থ নাট্যশালা, রঙ্গনাথ শব্দের অর্থ নাট্যাচার্য্য।

(৮) যোগরূঢ়—

সঞ্চারিনী দীপ শিখা—আলেয়া কথার সংস্কৃত অনুবাদ।

পিণ্ডী খেজুর—মিসর দেশীয় খেজুর.

গুড় বিকার—পাটালি, পাটুলি গ্রাম হইতে ইহার উৎপত্তি।

মোদক—মোয়া। হিন্দুস্থানী কথা লড্ডুক নাড়ুয়া। ময়রাদের উপাধি মদক "মোদক"—যাহা মদকদের দ্বারা প্রস্তত।

গুড়—গুড়ের উৎপত্তি স্থান গৌড় দেশ। "গুড়স্য অয়ং দেশঃ—গৌড়ঃ, গুড় ÷ অন তস্যেদং, অষ্টাধ্যায়ী ৪।৩।২। যে দেশে প্রথম গুড়ের উৎপত্তি সেই দেশেই "প্রচুর গুড় বিকারঃ" হইয়া থাকে।

জলযন্ত্র মন্দির—উনুই, ফোয়ারা প্রভৃতি কথার সংস্কৃত অনুবাদ।

শালি ধান—রাম শালি, কার্ত্তিক শালি, ঝিঙ্গে শালি প্রভৃতি ধান্য রাঢ়ে প্রচুর জন্মে।

ইন্দ্রায়ুধ দোতিতোরন } এই দুই শব্দই বাঙ্গালা—দেশের খিলান
সুরপতি ধনুশ্চারু তোরন } শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ।

নদীয়া জেলার দুলেরা পূর্ব্বাপর খিলান প্রস্তত করিতে পারিত। তাহারা কাদা দিয়া পাঁচতলা বাড়ি তুলিয়াছিল। তাহাদের এক প্রকার খিলানের নাম "যোড়া বাঙ্গালা"—যোড়া মন্দির। এই যোড় বাঙ্গালা ভারতের কুত্রাপি নাই। এই খিলান সকল, নানাবর্ণে চিত্র বিচিত্রও করা হইত।

সপ্তবর্ণ বেদিকা—এটি তান্ত্রিক শব্দ. এক্ষণে পঞ্চ বর্ণের গুড়ি দিয়া আস করিয়া ঠাকুর বসান হয়, বা আল্পনা দেওয়া পিড়িও করা হয়। এক্ষণে তাহার স্থলে "স্বাগত" লেখা লোমের আসন হইয়াছে। বোলপুর শান্তি নিকেতনে এই সপ্তবর্ণ বেদিকা প্রস্তত করা হইয়াছে।

রথাঙ্গনামা—চকা চকী পাখী।

শারদীয় জ্যোৎস্না—এটি বাঙ্গালীর কল্পনা।

"এতনু মকুরে আসি পূর্ণশশী—
নিরখিত মুখছবে শরদে ও
ভাসিত দশদিশি উৎসবে রঙ্গে" গোবিন্দ রায়।

(৬) চলিত কথা—

"তাগা বালা হার" ঋতুসংহারে সকল রমণীই বাঙ্গালীর মেয়েদের মত "তাগা বালা হার" পরিয়াছে, গোট এবং চন্দ্রহার ও ঝুলাইয়াছে। "চন্দ্রাস্তহার" এ কথা ঋতুসংহারের বহুত্র আছে। এই সব বাঙ্গালী অলঙ্কার।

অলম্ আয়াসেন—আর আয়াস করতে হবে না। একটু আয়েস করছিলাম,

—এই সব বাঙ্গালার চলিত কথা।

অয়মহ মাগত এব—এই আমি আসছি,

মদ্বচনাৎ উচ্যতাং—আমার নাম করে বোলো।

অহং অনুপদং আগত এব—তুমি এক পা যেতে না যেতেই আমি এলাম বলে

বিবেক বিভ্রান্তং অভিহিতং—ঠিক ব'লেছ।

প্রলপ তেষ বৈধেয়ঃ—এ বিটলে বামুন বেটা প্রলাপ বক্‌ছে।

যৎ প্রভবিষ্ণবে রোচতে—হুজুরের যাহা মর্জ্জি।

পরিহাস বিকল্পিতং—তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করিয়াছিলাম।

বলবদস্বস্থ শরীরা—ভয়ানক ব্যারাম।

(৭) ছেঁদো কথা, Phrase. বা বয়েৎ—

যথা জ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্—যে আজ্ঞা মহারাজ, আজ্ঞা কথাটা বাঙ্গালীর নিজস্ব, হিন্দুস্থানে "জি" বলে অথবা "জি হাঁ"

অনুকূল গলহস্ত—এটা একটা কুটনি পাঠানর গল্প। নায়িকা কুটনিকে, গলা ধাক্কা দিয়া খিড়কির বাহির করিয়া দিল, রাত্রিতে সেইদ্বারে নায়ক গৃহ প্রবেশ করিল। বেতাল পঞ্চবিংশতিতে এই গল্প আছে।

অহংউন বন্ধনো— আমি বাবা বামুন।

গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটক—গোদের উপর বিস্ফোড়া।

অক্ষিষুপহাদা রজনী—তাকিয়ে রাত্রি ভোর হয়ে গেল।

প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ—বামন হয়ে চাঁদে হাত।

উড়ুপেনাম্বি সাগরং—ভেলায় চড়ে সাগর পার।

হেম্নঃসংলক্ষ্যতেহ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকা পিবা—সোনা পোড়ালেই খাঁটি।

আকার সদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ—যেমন আকার তেমনি বুদ্ধি।

ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ—ফল দেখে কাজ বুঝতে হয়।

বৃদ্ধত্বংজরসা বিনা—জ্ঞান বৃদ্ধ।

শ্রুতৌতস্করতা—চুরির কথা গুজবে ছিল।

উরগক্ষতা অঙ্গুলী—বাঙ্গালার সাপুড়েদের মধ্যে ব্যবহার।

অনুকূল পবন—অনুকূলো বহন বায়ুঃ প্রয়ানে শুভ বাংশিনঃ।

নাম্নি কীর্ত্তিত এব—নাম করতেই উপস্থিত।

পিপাসাক্ষাম কণ্ঠেন যাচিতঞ্চ মু পক্ষিনা—মেঘ চাইতেই জল।

রত্নংরত্নেন সংগচ্ছতে—মুগের ডালে ঘি।

লোষ্ট্রকাঞ্চন—মুড়ি মিশ্রির সমান দর।

শাম্যেৎ প্রত্যুকারেন—মূর্খস্য লাঠৌষধি।

বিষবৃক্ষোপি সংবর্দ্ধ স্বয়ংছেত্তু মসাম্প্রতং—হাতে গড়ে ভাঙ্গতে নাই।

অরন্যেমত্ররুদ্রংকৃথ—আমার অরন্যে রোদন সার হইল।

(৮) অপভাষা Slang Word.

পুরাশক্রমুপস্থায় তবোর্ব্বিং প্রতিযাস্যতঃ।

আসিৎ কল্পতরুচ্ছায়ামাঃশ্রিতা সুরভিঃ পথি॥ ১ম ৭৫শ্লো

অব জানাসি মাং যস্মাৎ অতস্তেন ভবিষ্যতি।

মৎ প্রসূতি মনারাধ্য প্রজেতি ত্বাং শশাপসা। ৭৭।শ্লো।

সুতাং তদীয়াং সুরভে কৃত্বা প্রতিনিধিংশুচি।

য়ারাধয় সপত্নীক প্রীতাকাম দুঘা হি সা॥ ৮১শ্লো।”

এখানে “মৎপ্রসূতি মনারাধ্য”—কথার অর্থই আমাদের অনুধাবন করিতে হইবে। এই শ্লোক কয়টির ভাবার্থ এইরূপ—রাজা দিলীপ মহর্ষি বশিষ্টকে তাহার পুত্র না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—আপনি একদিন ইন্দ্রের আরাধনা করিয়া মর্ত্যালোকে আসিবার সময় পথিপার্শ্বে সুরভি শায়িতা ছিলেন, আপনি তাঁহার আরাধনা না করিয়া চলিয়া আসিয়া ছিলেন। এই অপরাধে সুরভি আপনাকে এই অভিশাপ দিয়াছিলেন—যে আমার প্রসূতির আরাধনা না করিলে, তোমার পুত্র জন্মিবে না। সেই সুরভি এক্ষনে ভুজঙ্গ পিহিত দ্বার—অগম্য পাতালে অবস্থিতি করিতে-ছেন, অতএব আপনি তাহার কন্যা নন্দিনী নাম্নি গাভিকে সেই সুরভির

প্রতিনিধি করিয়া আরাধনা করুন, এই নন্দিনী প্রীতা হইতেই সুরভি প্রীতা হইবেন।

এক্ষনে আমাদের এই শ্লোক কয়টির অর্থ ধীরভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। সুরভি অভিশাপ দিলেন আমার প্রসূতি কন্যা "নন্দিনীর" আরাধনা না করিলে তোমার পুত্র জন্মিবে না। কিন্তু বশিষ্ট বলিতেছেন-তুমি যখন পূজনীয়া সুরভির পূজা কর নাই তখন তুমি সুরভিরই পূজা কর। কিন্তু এক্ষনে সুরভি দুষ্প্রাপ্যা, ভুজঙ্গ পিহিত দ্বার—সর্ব্বতোভাবে অগম্য এইরূপ পাতালে রহিয়াছেন, এবং সুরভিকে যখন পাওয়া যাইতেছে না, তখন তুমি তাহার কন্যা নন্দিনীকে সুরভির প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করিয়া আরাধনা কর, দেবতাদের সর্ব্বজ্ঞত্ব শক্তি থাকায় তুমি নন্দিনীকে আরাধনা করিতেছ—এই কথা জানিতে পারিলেই, সুরভি পাতাল পুরী হইতেই, তোমার উপর সন্তুষ্টা হইবেন এবং তোমার পুত্র জন্মিবে।

এখানে আমার সন্দেহ—সুরভি বলিলেন আমার প্রসূতিকে আরাধনা না করিয়া, তোমার পুত্র হইবে না। এবং সেই সুরভির কন্যা নন্দিনীত বশিষ্ঠাশ্রমে বর্ত্তমানাই আছেন, তবে বশিষ্ঠ কেন নন্দিনীকে সুরভির প্রতিনিধি রূপে পূজা করিবার বিধান দিলেন? এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য অভীষ্ট প্রাপ্তিতে আবার প্রতিনিধি গ্রহণ কেন? বশিষ্ঠ সুরভির যে বিশেষণ দিয়াছেন—ভুজঙ্গ পিহিতদ্বার—এই বিশেষণ দ্বারাই বোধ হইতেছে সুরভির শাপের অর্থ বশিষ্ঠ বুঝিয়াছেন—সুরভি তাঁহার নিজেরই (সুরভিরই) উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, তিনি তাহার কন্যার উপাসনা করিতে বলেন নাই। তিনি যদি কন্যার উপাসনা করিতেই বলিতেন, তাহা হইলে বশিষ্ঠ সহজ কথায় সুরভির কন্যা নন্দিনীত এখানেই আছেন, তুমি তাঁহারই উপাসনা কর—এই কথা বলিতেন, তাহার প্রতিনিধিকে উপাসনা করিতে কেন বলিবেন? এবং সুরভি যে এক্ষণে অপ্রাপ্যা তাহাই বা বিশেষ রূপে কেন বলিবেন?

এইস্থানে টীকাকারগন যে অর্থ করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিলে, নির্দ্দোষ কবি কালিদাসের গ্রন্থে, অযথা প্রয়োগ" নামক দোষ আসিয়া পড়ে। কালিদাসের মত শব্দ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির পক্ষে, "মৎ প্রসূতি" শব্দটি অযথা প্রযুক্ত কখনই হইতে পারে না। আমার পরবর্ত্তী বশিষ্ঠের বচন হইতে মনে হয়, সুরভি

মং প্রস্থৃতি শব্দে তাঁহাকে সুরভিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমি এখানে এই অর্থ মনে করি—মং প্রস্থৃতিং—মামেব অনারাধ্য তে প্রজা নভবিষ্যতি—ইহাই সুরভির শাপের লক্ষার্থ অন্যথা বশিষ্ঠ ভুজঙ্গ পিহিত দ্বার কেন বলিলেন এবং তাহার কন্যাকে প্রতিনিধি করিতেই বা কেন বলিলেন।

যদি কালিদাসকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করা যায়, এবং পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ সকল হইতে তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে, কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে এখানে কালিদাস প্রযুক্ত "মৎপ্রস্থৃতি" শব্দটি, কোন বাঙ্গালা শব্দের কৃত্রিম শব্দ, (Coined Word) অনেক ভাবিয়া আমি বুঝিয়াছি—সেই কথাটি বর্ত্তমান বাঙ্গালার একটী অপভাষা বা Slang Word. তখনকার বাঙ্গালার সভ্য সমাজে তাহা সর্ব্বদা ব্যবহার হইত, এখন তাহা আর প্রযুক্ত হয় না। এরূপ দৃষ্টান্ত কালিদাসের গ্রন্থে অনেক আছে—যেমন "শকুন্তলায়" দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ব্যাপার রোধি মদনস্য নিসেবিতব্যং"। এখনকার বাঙ্গালার ভদ্র সমাজে কোন ও কুমারীকে, আর একথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। সেইরূপ এখানে মং প্রসৃতি শব্দের ও সেই অর্থ হইবে।

বাঙ্গালার কোনও ক্রোধিত ব্যক্তি অনায়াসে বলে—মৎ প্রস্থৃতিং—প্রসব দ্বারং—আমার প্রসব দ্বারে তৈল প্রয়োগ না করিলে তোমার এ কার্য্য কখনই হইবে না। আপনারা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন বাঙ্গালার কি অসভ্য কথার অনুবাদ "মং প্রসৃতি" এই শব্দটি।

এই আখ্যানটির মধ্যে আর একটি বিষয় আছে, যাহাতে কালিদাসকে নির্ব্বিবাদে বাঙ্গালী করিতেছে। তাহা গরু পূজা। গরুপূজা অনার্য্য জাতীর বা বাঙ্গালার আদিম জাতীর নিজস্ব প্রাচীন উপাসনা। ইহা আর্য্য জাতীর বা বৈদিক জাতীর উপাসনা নহে। বেদে শত শত মন্ত্রে গো বলির উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ বশিষ্ঠ একজন বিশেষ "গোঘ্ন"। ভবভূতি বলিতেছেন—"হুং বসিষ্ঠো, ম এ উর্ন জানিতং বঘেঘা বা বিওবা এ সোত্তি, জেন সমা গদেহিং বশিষ্ঠ মিস্‌সেহিং বরনিয়া কল্লানিয়া মড় মড়াইদা।"—তাইহোক বাবা বশিষ্ঠ! আমি বলিক একটা ব্যাঘ্রক বৃক এসেছিল, যে সমাগত বশিষ্ঠ মিশ্র, অমন নধর কৈলে বাছুরটি—মড় মড় করে খেয়ে ফেলে।

সে হেন বিখ্যাত গোত্র বশিষ্ঠ, দিলীপ সুরভিকে প্রদক্ষিন করেন নাই, এই অপরাধে দিলীপকে গো সেবা করিতে বিধান দিবেন, ইহা একজন অবঙ্গ কবির কল্পনা প্রসূত হইতে পারে না। এখন যদিও ভারতের সর্ব্বত্র "গো পূজা" প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু দেব যজ্ঞীদের দেশে পূর্ব্বে, গো পূজা প্রচলিত ছিল না। দেব যজ্ঞীগণ পূর্ব্বে গো হত্যাই করিতেন, দেব যজ্ঞীগণ ভারতে আসিয়া অনার্য্যদের নিকট হইতে, গো পূজা ও গো সেবা শিখিয়াছেন। কালিদাস এই সব শ্লোকে সেই সব ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। বশিষ্ঠের বলার ভাব এইরূপ —তোমরা বেদ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, এতদিন ইন্দ্রেরই পূজা করিয়া আসিয়াছ, কিন্তু বাঙ্গালার জাগ্রত দেবতা যে গো পূজা, তাহাত তুমি এতদিন কর নাই, সেইজন্ত তোমার পুত্র জন্মে নাই। এক্ষণে তুমি গো পূজা ও গো সেবা কর, তোমার পুত্র সন্তান জন্মিবে।

উদ্দাম দিগ গজ।—

ইহার মধ্যে আর একটি কথা আছে উদ্দাম দিগ্‌গজের নাদে তুমি সুরভির শাপ শুনিতে পাও নাই। স্থূল বুদ্ধি দিগ্‌নাগাচার্য্যের উপর, কালিদাস বড় চটা ছিলেন, তিনি বলিতেছেন, তুমি এতদিন স্থূল বুদ্ধি দিগ্‌নাগাচার্য্যের কথা শুনিয়া, জগৎকে মিথ্যা জ্ঞান করিয়া লৌকিক-উপাসনা বা জগতের প্রত্যেক বস্তুতে যে মহত্ব আছে, তাহা অস্বীকার করিয়াছিলে, এবং সেই মহত্ব যে গরুতে আছে, তাহাও অস্বীকার করিয়াছিলে, এবং সেই ভ্রমের জন্য তোমার এতদিন পুত্র জন্মে নাই। তুমি এখন হইতে পৃথিবীর বা জগতের প্রত্যেক বস্তুর সেই করিতে থাক, তোমার সৎপুত্র জন্মিবে এবং বংশ অক্ষয় হইবে। ইহাও এ শ্লোক গুলির অর্থ।—বাঙ্গালার লোকেরা চির দিনই কনাদের শিষ্য বা বাস্তব বাদী। পশ্চিম দেশের লোকেরা দিগ্‌নাগাচার্য্যের শিষ্য বা অবাস্তব বাদী—জগৎ ভ্রমবাদী। মেঘদূতে ও কালিদাস দিগ্‌নাগাচার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন।

(৯) উক্ত্য—

"অদেয় মাসীৎ ত্রয়মেব ভূপতেঃ
শশি প্রভং ছত্র মুভেচ চামরে।"

ইহা একটি বঙ্গদেশ প্রচলিত গল্প, এক্ষণে দিল্লীর বাদসাহের নামে গ্রথিত

হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। পুস্তক খানির নাম "রাজলক্ষ্মী"। সোমড়ার-বৈষ্ণবের পূর্ব্ব পুরুষদের কাহিনী।

দিলীপের দুইটি দ্রব্য অদেয় ছিল শশিপ্রভ ছত্র এবং উভয় চামর, কালিদাস কিন্তু দিলীপের নিকট চামরই চাহিয়াছিলেন, তিনি যখন রাজাকে কবিতা শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যখন বলিয়াছিলেন—

"কিন্তাষামররিন্দ সুন্দর দৃষাং
ত্রাকচামরান্দোলনাৎ
উদ্বেল্লৎ ভুজবলি কঙ্কন ঝনৎকারঃ
ক্ষনং বার্য্যতাং।"

রাজ সভায় গিয়াই তাহার চামরের উপর লক্ষ্য পড়িয়াছিল। তাহার সমুদয় কবিতা রাজাকে শুনান শেষ হইলে, রাজা যখন পুরস্কার দিতে চাহিলেন, তখন কবি বলিলেন—

"ন যাচে গজালিং নবা বাজি রাজিং
ন বিত্তেষু চিত্তং কদাচিৎ মমৈব।
ইয়ং সুস্তনী মস্তক ন্যস্ত হস্তা,
নবাঙ্গী কৃশাঙ্গী দৃগঙ্গী করোতু॥"

আমি আমার কবিত্ব শক্তির পুরস্কার স্বরূপ, আপনা[illegible] এই দুইটী কাশ্মীর দেশীয়া চামর ধারিণী চাই। কালিদা[illegible] বিক্রমাদিত্যের নিকট হইতে কাশ্মীরের শাশকত্ব লইয়াছিলেন! এই কথা "রাজ তরঙ্গিনী"র ভাষায় ব্যক্ত হয়।

"রাজলক্ষ্মী" পুস্তকের গল্পও এই কথারই প্রতিধ্বনি। দিল্লীর বাদসাহের নিকট এক নাচ্‌উলী পাঁচ শত বিঘা জমি পুরস্কার পাইবার, আদেশ পাইয়াছিল। তাহার আদেশ পত্র লিখিবার সময়, বাদসাহের বাঙ্গালী কেরানীটি,—কালিদাসের এই শ্লোকের অনুকরণে বসাইয়া দিল— "বেগর্ তক্ত্‌ জাফ্‌রান্" বাদসাহ জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহার ভাবার্থ কি? কেরানী উত্তর দিলেন—দিল্লীর পাঁচ শত বিঘা জমি ও কাশ্মীরের পাঁচ শত বিঘা জমি ব্যতীত, তুমি ভারতের যে কোনও স্থানে পাঁচ শত বিঘা জমি পাইতে পার।

"অপনীত শিরস্ত্রানাঃ শেষাঃস্তে শরণং যযুঃ"—

যাহার মাথায় শিরস্ত্রান নাই, সে পরের মাথায় শিরস্ত্রান দেখিলে, তাহা অপনয়ন করে, যেমন "গোফ ছিড়ে দাও" "টিকি কেটে দাও" এই সব কথা, যাহার গোফ নাই, বা যাহার মাথায় টিকি নাই, সেইই বলে। কালিদাসের মাথায় নিশ্চয় শিরস্ত্রান ছিল না, তিনি নিশ্চয় "নেঙ্গাশির বাঙ্গালী" অথবা "নিরুষ্ণীশাঃ বংগীয়া" ছিলেন।

"উষ্ণত্ব মগ্ন্যা তপ সংপ্রয়োগাৎ
শৈত্যং হি যৎসা প্রকৃতি জলস্য"

—"জলে মধুর শীতলৌ" বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য।

"আগম বৃদ্ধ সেবী"—বাঙ্গালা দেশই আগমের জন্ম ভূমি, আগম বাগীস্ ভট্টাচার্য্য ও এই বাঙ্গালার লোক।

(১০) ঐতিহ্য -

ককুস্থ যে দিলীপের পিতা, তাহা কোন পুরাণে লিখিত নাই, ইহা কৃত্তিবাস কথকদের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন।

মৈনাক্ নামে যে পার্ব্বতীর একটি ভ্রাতা ছিল, তাহা বাঙ্গালীরই কল্পনা, ইহা কোন পুরাণে নাই। সে যুগে অভ্রাতৃকা কন্যা, কেহ বিবাহ করিত না, সেইজন্য বাঙ্গালী জাতি, এই পার্ব্বতীর ভ্রাতা মৈনাকের কল্পনা করিয়াছে।

"ভাই সিন্ধুতে ঢুবিল জনক আমার হিমাচল," প্রাচীন গান।

(১১) কৃত্রিম শব্দ (Coined Word)

স্নান কসায়—মাথা ঘসার কৃত্রিম শব্দ,

উৎখাত প্রতিরোপিত—রোয়া, কলম,

ভাবার্থ বোধ কলুষা—"হুঁডকো" গাড়ের গ্রাম্য কথা

উৎখাতিনী ভূমি—উবড়ো খাবড়া, হড় গড়ানে,

বক্ষুং ঢৌকতে—ঢুকি গত্যাং—পাণিনী

ঢৌক্ৃগত্যাং—কবি কল্পদ্রুমঃ। "রাত্রিচরী ভূঢৌকে" ভট্টি। পাণিনী, বোপদেব, এবং সংস্কৃত ভাষার যাবতীয় ব্যাকরণিক দিগের মতে, "শকুন্তলা বক্ষুং ঢৌকতে" এই কথার অর্থ—শকুন্তলা বক্ষের মধ্যে ঢুকিতেছেন।

ঢুক্ ধাতু বাঙ্গালা ভাষাতে ও ঢোকা এই অর্থেই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত। যেমন

তিনি বাড়ি ঢুকিলেন, গৃহে চোর ঢুকিয়াছে। ইত্যাদি রূপে ঢুক ধাতুর অর্থ ঢুকা বা প্রবেশ করা॥ কিন্তু মহাকবি কালিদাসের এখানে "বক্তুং ঢৌকতে কথার অর্থ—শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তের বাসিত দেখিয়া—কর্ণোৎপলস্থ পরাগে উৎকনমূঢ়া শকুন্তলার চক্ষুকে, দুষ্মন্ত স্বীয় মুখ মারুতে সেবা করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলে, শকুন্তলা বক্ত্রের মধ্যে ঢুকিলেন এ কথার ভাবার্থ কি?

পূর্ব্বাপর ভাবের সামঞ্জস্য করিতে গেলে, কালিদাস এখানে ঢুক ধাতুর ঢাকা এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কোনও ব্যাকরণ, কোনও শিষ্ট প্রয়োগ, কোনও ভাষায় ঢুক ধাতুর অর্থ যে ঢাকা বা আবরণ করা, তাহা নাই। একে ঢুক ধাতুর বাঙ্গালা ভাষা ছাড়া, পৃথিবীর কোনও ভাষাতেই কোনও অর্থেই ব্যবহার নাই, তাহার উপর এইরূপ অপ্রসিদ্ধার্থে প্রয়োগ করায়, এখানে কালিদাসের "অপ্রসিদ্ধ পদ ব্যবহার্য্যতা" দোষ হইয়াছে। কালিদাসের মত অসাধারণ শাব্দিকের পক্ষে ইহা ভীষণ নিন্দার কথা।

কালিদাস এস্থলে "চেলাঞ্চলে নানন মাবৃনোতি" এই কথা লিখিলেই পারিতেন। তাহার মত শাব্দিক এইরূপ অপ্রসিদ্ধার্থ পদ কেন প্রয়োগ করিলেন? কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন; তাহা প্রাণে জাগিতেছিল—"যাও যাও মুখ ঢেকোনা সরম সবে নাই। তিনি ঢাকা কথার সমোচ্চারণ সম্পন্ন কোনও ধাতু পানিনীয় গণ পাঠে না পাইয়া, তৎ সদৃশ ঢুক ধাতুকে এই কৃত্রিম "ঢাকা" অর্থে এখানে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই একটি ধাতুর কৃত্রিম প্রয়োগ কালিদাসকে বাঙ্গালীত্বে টানিয়া আনিতেছে। "প্রয়োজন মনুদ্দিশ্য ন মন্দোপি প্রবর্ত্ততে।" অবঙ্গজনের পক্ষে এই অপ্রসিদ্ধ অর্থে ঢুক ধাতুর প্রয়োগের কোনও আবশ্যকতা বা আত্যন্তিক লিপ্সা দেখা যায় না। বাঙ্গালির কানে, এখানে ঢাকা কথাটি যত মিষ্ট শুনাইবে, আবরণ কথা বা অন্য কোনও কথা, তত মিষ্ট শুনাইবে না তাই কালিদাস গায়ের জোরে এখানে ঢুক ধাতুকে ঢাকা অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন।

টীকাকারগণ বলেন ধাতুনা মনেকার্থত্বাৎ" আমি বলি তবে পানিনীর "গণ পাঠ," এবং বোপদেবের "কবি কল্পদ্রুম" এতকষ্ট করিয়া না লিখিলেইত হইত, এবং ছাত্রদের আবার তাহাই মুখস্থ করিতে, প্রাণ পাত কর পরিশ্রম না করিলেই চলিত। যদি "ধাতু না মনেকার্থত্বাৎ" ইহাই ধাত্বর্থ নির্দ্ধারণের

সনাতন প্রথা হয়, তবে যার যা খুসি সেই অর্থে, যে কোনও ধাতু প্রয়োগ করিলেইত হইত, তবে আর গণ পাঠ দেখিয়া ধাত্বর্থ নিষ্কাশনের চেষ্টা কেন? ইহার নাম প্রাদেশিকতা, গ্রাম্যতা, বা সঙ্গীতের ভাষায় "জঙ্গলীয়ানা"। এই আমার শেষ এক কথাতেই প্রমাণ হইল, মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন এই প্রয়োগটিই কালিদাসের বাঙ্গালীত্বের বিনিগম হেতু।

শ্রীমন্মথ নাথ ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ।

কালিদাস বাঙ্গালী নহেন।

সন ১৩২৭সালের আশ্বিন মাসের সাহিত্য সংহিতা পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ—প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার স্বদেশানুরাগ প্রশংসনীয় বটে কিন্তু তাঁহার কথা ঠিক নহে। মিথ্যা কথা দ্বারা প্রথমে কিছু লাভ হইলেও তাহার শেষ ফল ভাল হয় না। সেইজন্য "সত্য যদি কটু কভু তবু শ্রেয়স্কর" এই উপদেশ বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক। কাব্যতীর্থ মহাশয় ইতিহাসে অনভিজ্ঞ হেতু ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কালিদাস বাস্তবিক বাঙ্গালী নহেন।

শকাব্দের দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালা দেশে আদিশূর কর্ত্তৃক বৈদ্য রাজত্ব স্থাপিত হয়। সেই রাজা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ গণকে মূর্খ এবং ভ্রষ্টাচার দেখিয়া কান্যকুব্জ হইতে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ দিগকে এদেশে স্থাপন করেন। তাঁহাদের অনুচর কায়স্থগণও সেই সময়েই বাঙ্গালা দেশবাসী হইয়াছিল। সেই শ্রোত্রিয়দের শিক্ষা গুণেই বৈদ্য দিগের ও বিদ্যাবুদ্ধি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালী দিগের বিদ্যাবুদ্ধির যে কিছু গৌরব তাহা বাঙ্গালী শ্রোত্রিয়, কায়স্থ এবং বৈদ্যদের দ্বারাই হইয়াছে। শকাব্দীর দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালীদের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ কোন লোক ছিল না।

আমরা বরাবর জানি যে কালিদাস সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সভাসদ মহারত্ন ছিলেন। অধুনা বিলাতী প্রলাপ যত কেন অযৌক্তিক না হউক তাহা এদেশের অনেক লোকের নিকট গুরুতর রূপে মান্য হয়। কেকবি প্রমুখ কতিপয় বিলাতী পণ্ডিত কালিদাসের জীবন কাল সম্বন্ধে অনেক দূরে পরবর্ত্তী কাল

অবধারণ করিয়াছেন এবং তাহার পোষক বিক্রমাদিত্যকে উজ্জয়িনীর সম্রাট না করিয়া মৌর্য্য বংশীয় মগধ সম্রাটকে লক্ষ্য করিয়াছেন। পূর্ব্বে শ্রীযুত অধ্যক্ষ সারদা রঞ্জন রায় এম, এ, মহাশয় সেই বিলাতী মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং আমিও সারদা বাবুর সমর্থন করিয়াছি। বোধ হয় মন্মথ বাবু সেই বিলাতী মতেরই ভক্ত। যাহা হউক কাব্যতীর্থ মহাশয়ের প্রকল্প খণ্ডনার্থ সমুদয় তর্ক পুনঃ প্রকাশ করা অনাবশ্যক। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দেশী ও বিলাতী মতে 'কালিদাসের যে সময় অনুমিত হয় সে সময়ে বাঙ্গালাদেশে কালিদাস জন্মিতে পারে না।

চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নামে কোন রাজা অথবা কোন লোক কোনকালে ভারতবর্ষে ছিলেন না। মগধ দেশে মৌর্য্য বংশে চন্দ্রগুপ্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তদ্বংশে বিক্রমাদিত্য নামিক একরাজাও থাকিতে পারে। কিন্তু এই দুইটা প্রকাণ্ড নামধারী কোন ব্যক্তিই ছিল না। চন্দ্রগুপ্ত ও তদ্বংশীয়েরা শূদ্র ছিল। তাহারা অতিশয় ক্ষত্রিয় বিদ্বেষী ছিল। তাহাদের সভাসদের রঘুবংশাদি ক্ষত্র গৌরব সূচক কাব্য লেখা অসম্ভব।

বৈদ্য রাজারা এবং শোত্রিয় ব্রহ্মণেরাই বাঙ্গালাদেশে সনাতন ধর্ম্ম এবং সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কাব্যতীর্থ মহাশয় কালিদাসের যে সময় অনুমান করিয়াছেন সে সময় বাঙ্গালা দেশ মগধসম্রাটের অধীন ছিল। সেই মগধ সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং পালি ভাষার চর্চ্চা ছিল। তখন নবদ্বীপ ছিল না এবং সংস্কৃত ভাষার ভাল চর্চ্চা ছিল না। তথায় কালিদাস সমাদৃত হইতে পারিতেন না। বর্ত্তমান সময়ের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে মহা পণ্ডিত কালিদাস জন্মিতে পারেন না ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আচার ব্যবহার সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কালিদাসের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ কাল মধ্যে অনেক রাজ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তদানুসঙ্গিক আচার, ব্যবহার এবং কথোপকথন প্রণালী প্রচুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুতরাং তদ্দৃষ্টে কোন যুক্তি সঙ্গত অনুমান করা যাইতে পারে না।

কালিদাস এবং কালীদাস এই দুইটি বিভিন্ন শব্দ। (কালিদং কৃষ্ণবর্ণ চিকুং অস্তিয়স্য স্নিন্স কালিদাঃ) কালিদাস অর্থ নীলকণ্ঠ মহাদেব। আর কাল্যাঃ

দাসঃ) কালীর দাস কালীভক্ত লোক মাত্রকেইবুঝায়। ইহা কোন বিশেষ ব্যক্তি বোধক নহে। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ লোকই শাক্ত। এদেশে কালীদাস নামিক বহুলোক পূর্ব্বে ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু কালিদাস নামিক কোন লোক বাঙ্গালাদেশে পূর্ব্বে ছিল না। বাঙ্গালাদেশে যেমন সর্ব্বদাই কালীপূজা হয় ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তদ্রূপ হয় না। তথায় শাক্ত মতাবলম্বী লোক খুব কম। যাহারা শক্তি ভক্ত তাহারা ও কালী নামে প্রায়শঃ পূজা বা উপাসনা করে না। তাহারা তৎপরিবর্ত্তে দুর্গা, পার্ব্বতী এবং মহামায়া শব্দ প্রয়োগ করে। কবি কালিদাসের সমস্ত গ্রন্থাবলী মধ্যে কুত্রাপি শক্তির কালী নাম দেখা যায় না। তস্মাৎ বুঝা যায় যে তিনি বাঙ্গালী ছিলেন না।

আর্য্যাবর্ত্ত বাসী হিন্দুদের আধুনিক নাম গুলি আরবির অনুকরণ। ঈদৃশ নাম পূর্ব্বে হিন্দুদের ছিল না পরন্তু মুসলমানদেরও কদাচিৎ এরূপ নাম ছিল। যেমন আরবি নাম ফর্জন্দ আলি, ওলদ্ হোসেন অনুকরণে হিন্দুর নাম রাম-কুমার, হরিকিশোর, রঘু নন্দন ইত্যাদি। আরবি খোদাবকৃশ, রহিম বকৃশ অনুকরণে শিব প্রসাদ, কালী প্রসন্ন, রামবকৃশ ইত্যাদি। গোলাম হোসেন, আবদ্ উল্লার অনুকরণে রামদাস, দুর্গাদাস, রামগোপাল ইত্যাদি। এরসান্-উল্লা, এরসান্ মহম্মদ নামের অনুকরণে রাম সহায় কালী সহায় ইত্যাদি। কবি কালিদাস যদি বাঙ্গালী হইতেন তবে তাঁহার নাম কালীদাস হইত এবং নামের শেষে কৌলিক উপাধি সংলগ্ন থাকিত। তাঁহার নামের শেষে সান্যাল গাঙ্গুলী ঘোষাল কিংবা শর্ম্মা শব্দ যুক্ত না থাকায় নিশ্চিত হয় যে তিনি বাঙ্গালী ছিলেন না।

ছোট নাগপুর প্রদেশে পাতকুথ নামক একটি রাজ্য আছে। বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার সংযোগ স্থলে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি অবস্থিত। এইরাজ্যে সুবর্ণ রেখা নদীতীরে বিক্রমগড় নামক একটী ভগ্নদশাপন্ন পুরাতন নগর আছে। কুথের রাজ কুমার শ্রীযুক্তরাম গোপাল আদিত্য নিজে আমার নিকট বলিয়াছেন যে ঐ স্থানই কবিকুল চূড়ামণি কালিদাসের জন্মভূমি। তাহার কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল—
১১ নং ভবানী দত্তের লেন, কলিকাতা।

"বঙ্গবাসী" সম্পাদক রায় সাহেব
কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার সাহিত্য সুধাকর
বিরচিত।

কালিদাস গীতি।

আলাইয়া—একতালা।

যার কাব্য কীর্ত্তি জগৎ জুড়িয়ে,
যার পুণ্য-স্মৃতি ভুবন ভরিয়ে,
কি গান গাহিবে কি ভাষে রচিয়ে
রাখিবারে তার স্মৃতি জাগাইয়ে
এ ধরণীমাঝে কোথা কোনখানে
কবি কালিদাসে কেবা নাহি জানে
তার মত কেবা গাহিয়ছে গানে
জীবন রাগিণী জীবন ঢালিয়ে।
অমর সঙ্গীত যে গেয়েছে সুরে,
রেখে গেছে রেশ বিশ্ব প্রাণে পুরে
স্মরণে সে কাছে থাক যত দূরে,
মরণেও রহে জীবন জাগিয়ে—
আজিকার পুণ্য শুভ সম্মিলনে
দেখি কবিচ্ছবি স্মৃতি জাগরণে,
গীতি মন্ত্র বাণী প্রীতির তর্পণে
কোটি কণ্ঠে বঙ্গে উঠে উছসিয়ে
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ মনন
অর্চ্চন বন্দন আত্ম নিবেদন
আছে গো যে কটী ভক্তির লক্ষণ
সাকার আলেখ্যে উঠিছে ফুটিয়া—
সে যে দীপ্ত ভানু পূর্ণ প্রতিভার,
সে যে বিশ্ববন্দ্য যোগ্য বন্দনার,
বিশ্ববন্দী গায় গরিমা তাহার,
এস বন্দি তারে ধেয়ানে ধরিয়ে॥

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সমাজনীতি ও রাজনীতি।*

কৌটিল্য কে ?

জৈন গ্রন্থকার হেমচন্দ্র তদীয় অভিধান চিন্তামনিতে চাণক্যের নাম সংজ্ঞায় এইরূপ পরিচয় প্রদান করেন।

"বাৎস্যায়নে মল্লনাগঃ কুটিলশ্চ ন কাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিল স্বামী বিষ্ণুগুপ্তো হঙ্গুলশ্চসঃ.

কামন্দকীয় নীতি সারের জয় মঙ্গল টীকায় শঙ্করাচার্য্যের উক্তিতে প্রকাশ —"বিষ্ণু গুপ্তায়েতি সাংস্কারিকী সংজ্ঞা, চাণক্যঃ কৌটিল্য ইতি জন্মভূমি গোত্র নিবন্ধনে।" আবার টীকান্তরে দেখিতে পাই—"কুটোঘটস্তং ধান্য পূর্ণং লান্তি সংগৃহন্তি ইতি কুটলাঃ কুম্ভীধান্যা ইতি প্রসিদ্ধিঃ। অতএব তেষাং গোত্রা পত্য কৌটিল্যো বিষ্ণু গুপ্তোনামঃ।" ন্যায় ভাষ্যের "তাৎপর্য্য টীকাকার" বাচস্পতি মিশ্রের মতে—অথ ভগবতা অক্ষপাদেন নিঃশ্রেয়সহেতৌ শাস্ত্রে প্রণীতেহ ব্যুৎ পাদিতে চ ভগবতা পক্ষিল স্বামিনা কিমপরমব শিষ্যতে যদর্থং বার্ত্তিকারম্ভঃ এই সকল প্রমাণে বিষ্ণুগুপ্ত, কৌটিল্য, চাণক্য, পক্ষিল স্বামী, বাৎস্যায়ন, মল্লনাগ, ও দ্রমিল যে একই ব্যক্তি তাহা অনুমান হয়।

চণকস্য মুনের্গোত্রাপত্যং চণক গর্গাদি যঞ"—এ হিসাবে চণক মুণির বংশজ বলিয়া চাণক্য নাম হইতে পারে। আবার শঙ্করাচার্য্যের টীকামতে চণী গ্রামের নামানুসারে ও চাণক্য নাম হইতে পারে। কৌটিল্য নাম একমতে গোত্রজ, মতান্তরে বংশগত, আবার কাহার ও মতে চাণক্যের পূর্ব্ব পুরুষগণ "কুটল" বা "কুম্ভী ধান্য" সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন, সেই অনুসারে ঐ বংশজ ব্যক্তি কৌটিল্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু পুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতে, বায়ু পুরাণে, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ও মৎস্যপুরাণে, "কৌটিল্য" নামে উল্লিখিত। অর্থ শাস্ত্রে ও কৌটিল্য নামে অভিহিত। জৈন গ্রন্থাদিতে চাণক্য নামে অভিহিত।

---

* "সাহিত্য সভার মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কামন্দকীয় "নীতি সারে" নন্দ বংশের উচ্ছেদ ও চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক প্রসঙ্গে চাণক্যের বন্দনা করা হইয়াছে—যথা—

"বংশে বিশাল বংশানামৃষীনামিব ভূয়সাম্।
অপ্রতি গ্রাহকাণাং যো বভূব ভুবি বিশ্রুত॥
জাত বেদাই বার্চ্চিমান্ বেদান্ বেদবিদাং বরঃ।
যোঽধীতবান্ সুচতরশ্চতুরোঽপ্যেক বেদবৎ॥
যস্যাভিচার বজ্রেণ, বজ্র জ্বলন তেজসঃ।
পপাত মূলতঃ শ্রীমান্ সুপর্ব্বা নন্দ পর্ব্বতঃ॥
একাকী মন্ত্র শক্ত্যাযঃ শক্ত্যা শক্তি ধরোপমঃ।
আজহার নৃচন্দ্রায় চন্দ্রগুপ্তায় মেদিনীম্॥
নীতি শাস্ত্রামৃতং ধীমনর্থ শাস্ত্র মহোদধেঃ।
সমুদ্দধ্রে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুগুপ্তায় বেধসে॥"

"মুদ্রারাক্ষসে"ও ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। অর্থ শাস্ত্রের একটী উপসংহার বাক্যে পরিদৃষ্ট হয়; যথা—

যেন শাস্ত্রং চ শস্ত্রং চ নন্দ রাজ গতাচ ভূঃ।
অমর্ষে নোদ্ধৃতা ন্যাশু তেন শাস্ত্র মিদং কৃতম্।

অর্থ শাস্ত্রের কয়েকটী অধ্যায় সংক্ষেপে নীতি সারে পরিগৃহীত হইয়াছে। দণ্ডীর "দশকুমার চরিতে" কালিদাসের "রঘুবংশ" ও "কুমার সম্ভব" কাব্যে অর্থশাস্ত্রের বচন অধ্যাহৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্, এ, পি, আর, এস মহাশয় যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ, পি, এইচ, ডি, পি, আর, এস্ মহাশয়ও বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। (See Mr. Law's Studies in Ancient Hindu Polity.)

কালিদাস, কামন্দক, দণ্ডী, ও অশোক প্রভৃতির—পূর্ব্বে অর্থশাস্ত্র প্রণীত ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অর্থশাস্ত্রে "ইতি কৌটীল্য" এবং "নেতি কৌটিল্য" বাক্যদ্বয় প্রায় বিসপ্ততি স্থানে দেখা যায়। তদ্দৃষ্টে অনেকের মতে ঐ গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচনা নহে, উহা সম্প্রদায় বিশেষের মত প্রকাশক গ্রন্থ। এই মত খণ্ডন করিয়া অনেকে বলেন—যে ভারতবর্ষের গ্রন্থকারগণ অপরের মতের

প্রতিবাদে প্রায়ই প্রথম পুরুষ অহং বাচক শব্দ প্রয়োগ করেন না, বিনয় প্রদর্শন করণার্থ তাঁহারা প্রতিবাদে প্রায়ই তৃতীয় পুরুষ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আর সম্প্রদায় বিশেষের গ্রন্থ হইলে সেই সম্প্রদায়ের কাহারও নামোল্লেখ ঐ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। অর্থ শাস্ত্র যে একজনের লিখিত নহে, তাহার স্বপক্ষে যুক্তি (১) অর্থ শাস্ত্রের রচনায় কোথায় ও সূত্র সাহিত্যের অনুস্মৃতি, কোথাও নিরুক্তের অনুকৃতি, কোথাও ভাষ্য (গদ্য), কোথাও কবিতা। এত বিভিন্ন প্রকৃতির ভাষা যে এক কালের ও এক লেখকের রচনা, তাহাতে ঘোর সন্দেহ হয়।

(২) "কৌটিল্য" (কুটিল স্বভাব সম্পন্ন) এই নিন্দনীয় নামেই বা গ্রন্থকার আপনাকে পরিচিত করিবেন কেন?

প্রথম যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় যে চাণক্যের ন্যায় অসাধারণ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে নানাছন্দে নানা Styleএ রচনা করা কিছুই অসম্ভব নহে। দ্বিতীয় যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় "কৌটিল্য" শব্দ চাণক্যের বংশগত উপাধি উহা হীনার্থ বোধক নহে। আর কৌটিল্য শব্দটী যদি হীনার্থেও ধরা যায় তাহা হইলেও যে জ্ঞানবীর উদার হৃদয় কুটিল রাজনীতি (দণ্ডনীতি) শাস্ত্রের রচনা করিয়া নিজেকে কৌটিল্য নামে অভিহিত করিয়াছেন—তিনি লোকরক্ষার জন্য ঐ নীতি রচনা করিলেও উহা কুটিল বুদ্ধির পরিচায়ক সুতরাং তিনি কৌটিল্য সংজ্ঞার সংজ্ঞিত হইবার উপযুক্ত—তাহাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার হীনত্বের নহে মহত্বেরই পরিচায়ক।

চাণক্য সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। অর্থশাস্ত্র বা অর্থ-নীতি—চাণক্যের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যরক্ষা প্রণালী বর্ণনাই অর্থশাস্ত্র প্রণেতার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য অর্থশাস্ত্রে পরিষ্কার-রূপে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের বা রাজ্যশাসন ব্যবস্থার উল্লেখ নাই কিন্তু অর্থশাস্ত্রের শ্লোক দেখিয়া উহা যে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বেরই বর্ণনা তাহা বেশ বোঝা যায়। যথা—

১। "বিদ্যাবিনীতো রাজাহি প্রজানাং বিনয়ে রতঃ।
অনন্যাং পৃথিবীং ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥"

২। "ভক্তিকন্নবৃদ্ধিরবক্তেব্রিয়ন্দাতুরন্তোপি রাজা নয়োবিনশ্যতি।"

৩। "দেশঃ পৃথিবী। তস্যাং হিমবৎ সমুদ্রান্তর মুদীচীনং
যোজন সহস্র পরিমাণং অতির্য্যক্ চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রম্॥"

এই শ্লোক তিনটী হইতে বুঝা যায় যে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, তিনি একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন ইত্যাদি। পুরাণাদিতে বা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ও তাঁহার ন্যায় অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন অন্য কোন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য যে চন্দ্রগুপ্ত ছাড়া ঐ সময়ে আর কাহারও ছিল তাহা বোধ হয় না। সুতরাং অর্থশাস্ত্রে যে রাজত্বের ও শাসন প্রণালীর উল্লেখ আছে তাহা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়।

অর্থশাস্ত্র বর্ণিত রাজ্যশাসন প্রণালী দেখিয়া মনে হয় ঐ রাজ্য বর্ত্তমান কোন ইউরোপীয় সুসভ্য রাজ্য হইতে হীন ছিল না বরং সমকক্ষ ছিল। ঐ সময়ে লোক গণনা হইত। বর্ত্তমান সময়ে যেমন লোক গণনার জন্য সাময়িক কর্ম্মচারীর নিয়োগ হইয়া থাকে তখন তাহা ছিল না; লোক গণনার জন্য একটী স্থায়ী রাজকীয় বিভাগ ছিল। বিভাগীয় প্রধান কর্ম্মচারীর নাম "সমাহর্ত্তা" (কলেক্টর জেনারেল) সমাহর্ত্তার অধীনস্থ প্রদেশ চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারিজন স্থানিকের (ডিষ্ট্রিকট ম্যাজিষ্ট্রেট) অধীনে থাকিত। স্থানিক আবার ১০টী বা ১৫টী গ্রামের উপর এক একজন গোপ (সবডিভিসনাল অফিসার) নিযুক্ত করিতেন। গোপ আর স্থানিকদের কার্য্য ইনেস্‌পেক্‌সন্ করিবার জন্য প্রদেষ্টাগণ নিযুক্ত ছিলেন। যথা—

"সমাহর্ত্তা চতুর্ধা জনপদং বিভজ্য জ্যেষ্ঠ-মধ্যম-কনিষ্ঠ বিভাগেন গ্রামাগ্রং পরিহারক মায়ুধীয়ং ধান্যপশু হিরণ্যকুপ্যবিষ্টিকর প্রতিকর মিদমেতাবদিতি নিবন্ধয়েৎ। তৎপ্রদিষ্টঃ পঞ্চগ্রামীং দশগ্রামীং বা গোপশ্চিন্তয়েৎ। এবং চ জনপদ চতুর্ভাগং স্থানিকঃশ্চিন্তয়েৎ। গোপ স্থানিক স্থানেষু প্রদেষ্টারঃ কার্য্য-করণং বলি প্রগ্রহং চ কুর্য্যুঃ।"

ইহা ব্যতীত গুপ্তচর (সি-আই-ডি) ছিল, তাহারা নানা বেশ ধারণ করিয়া রাজ্য মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সমাহর্ত্তাকে গোপনে সম্বাদ প্রদান করিত। ইহারা জমী জমার [illegible] আদায় প্রভৃতি প্রারম্ভ

অনেক কাজ করিত। কোন্ গ্রামে কত লোক বাস করে, প্রত্যেক গ্রামে কত ঘর গৃহস্থ বাস করে, কত পরিবারের বাস; প্রত্যেক গৃহস্থের জাতি, পেশা, কাহারা কর প্রদান করে, কাহারা কর প্রদান করে না, কোন গৃহস্থের কত আয়, কত ব্যয়, কাহার কত গো-মেষ প্রভৃতি আছে তাহার সংবাদ লইত। বৈদেশিকগণের আগমন ও নির্গমনের কারণ অনুসন্ধান, লোকজনের যাতায়াত পর্য্যবেক্ষণ, অসৎ চরিত্র বা সন্দেহযুক্ত স্ত্রী পুরুষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ, প্রভৃতি কার্য্য গুপ্তচরগণ গৃহস্থের বেশ ধারণ করিয়া (গৃহপতিক ব্যঞ্জনাঃ) জানিতে হইত। ইঁহারা সাধু সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া কৃষকের মেষপালকের, বণিকগণের এবং রাজ কর্ম্মচারীগণের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। তাঁহারা চোরের বেশ ধারণ করিয়া তীর্থস্থান সমূহে, পানালয়ে, জনশূন্য স্থানে, পর্ব্বতে এবং পুরাতন ভগ্নস্থান সমূহে চোর, শত্রু, এবং মন্দ চরিত্র ব্যক্তির চাল চলন দেখিতেন। যথা—

"সমাহর্ত্তৃ প্রদিষ্টাশ্চ গৃহ পতিক ব্যঞ্জনা যেষু গ্রামেষু প্রণিহিতাস্তেষাং গ্রামাণাং ক্ষেত্রগৃহ কুলাগ্রং বিদ্যুঃ। মানস প্রাতাভ্যাং ক্ষেত্রাণি, ভোগ পরিহারাভ্যাং গৃহাণি, বর্ণ কর্ম্মাভ্যাং কুলানি চ। তেষাং জঙ্ঘাগ্রং আয়ব্যয়ৌ চ বিদ্যুঃ। ......প্রস্থিতাগতানাং চ প্রবাসাবাস কারণ মনর্থ্যানাং চ স্ত্রী পুরুষাণাং চার প্রচারং চ বিদ্যুঃ। এবং সমাহর্ত্তৃ প্রদিষ্টাস্তাপস ব্যঞ্জনাং কর্ষক গোরক্ষক বৈদেহকানা মধ্যক্ষানাং চ শৌচা :শৌচং বিদ্যুঃ।......পুরাণ চৌর ব্যঞ্জনাশ্চান্তে বাসিন শ্চৈত্যচতুষ্পথ শূন্যা পদোদ পান নদী নিপান তীর্থায়তনাশ্রমারণ্য শৈল বনগহনেষু স্তেনামিত্র প্রবীর পুরুষানাং চ প্রবেশন স্থান গমন প্রয়োজনা ন্যুপলভেরন্।"

। গোপ গণের কর্ত্তব্য বিষয়ে কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় করে লিখিত আছে—গ্রাম্য কর্ম্মচারী গোপগণ প্রত্যেক গ্রামের লোক সংখ্যা গণনা করিয়া প্রতিগ্রামে কত ব্রাহ্মণ, কত ক্ষত্রিয়, কত বৈশ্য ও কত শূদ্র বাস করেন, তাহা ঠিক করিয়া প্রত্যেক গ্রামের কৃষক, গোপালক, বৈদেহক (ব্যবসায়ী), কারুকর্ম্মকর, দাস (ক্রীতদাস) প্রভৃতির সংখ্যা ও পরিমাণ তাঁহারা লিখিবেন। দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তুর সংখ্যা, হিরণ্য (স্বর্ণ) বিষ্টি (বেগার) শুল্ক দণ্ড প্রভৃতির পরিমাণ নির্ণয় করিবেন। গৃহস্থগণ কর প্রদানে কাহারা

কিনা। গ্রামের বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, প্রভৃতির সংখ্যা নির্ণয় করিয়া তাহাদের কর্ম চরিত্র, আয় ও ব্যয় নির্ণয় ও গোপগণ করিবেন।

যথা—"তেষু চৈতাবচ্চাচতুর্ব্বর্ণ্য সেতা বস্তু কর্ষক, গোরক্ষক, বৈদেহ, কারুকর্ম্মকর দাসাশ্চৈতাবচ্চ দ্বিপদ চতুষ্পদমিদং চৈষ হিরণ্য বিষ্টি শুল্কদণ্ডম্ সমুত্তিষ্ঠ তীতি। গৃহানাং চ করদা করদ সংখ্যানেন।"......"কুলানাং চ স্ত্রী পুরুষাণাং বালবৃদ্ধ কর্ম চরিত্রা জীব ব্যয় পরিমাণং বিদ্যাৎ।"

নগর সমূহেও লোক গণনা প্রচলিত ছিল। এখানে নাগরক (পুলিশ কমিশনার) প্রধান কর্ম্মচারী। অর্থশাস্ত্রের "নাগরক প্রণিধি" প্রকরণে এই রূপ বর্ণনা আছে—যথা—"সমাহর্ত্তৃ বন্নাগরকো নগরং চিন্তয়েৎ। দশ কুলীং গোপো বিংশতি কুলীং চত্বারিংশৎ কুলীং বা। স তস্যাং স্ত্রী পুরুষানাং জাতি গোত্র নাম কর্ম ভি জঙ্ঘা প্রমায় ব্যয়ৌচ বিদ্যাৎ। এবং দুর্গ চতুর্ভাগংস্থানি-কশ্চিন্তয়েৎ।"

প্রাদেশিক গণনায় গোপ গণের ন্যায়, নগরাদির জন সংখ্যা গণনায় গোপ গণের উপর অবস্থাভেদে দশটি, পনেরটী এবং কোন কোন স্থলে চল্লিশটী পরিবারের পর্য্যন্ত লোক সংখ্যা, জাতি, গোত্র, পরিচয়, পেশা, আয়, ব্যয় নিরূপণের ভার থাকিত।

অন্যত্র—"ধর্ম্মাবস্থিনঃ পাষণ্ডি পথিকানা বেভ্য বাসয়েষু। প্রস্থিতা গতৌ চ নিবেদয়েৎ। অন্যথা রাত্র দোষং ভজেৎ। ক্ষেম রাত্রিষু ত্রিপণং দদ্যাৎ।" ধর্ম্মালয়ে বা অতিথি শালায় কোন অপরিচিত আগন্তুক ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, অধ্যক্ষ দিগকে স্থানিকের নিকট আগমন ও নির্গমনের সংবাদ জানাইতে হইত। পরিবারের প্রধান ব্যক্তির উপরও কোন আগন্তুকের আগমন ও প্রস্থানের সংবাদ রাজকর্ম্মচারীকে জানাইতে হইত। প্রতি ব্যবসায়ীকে, প্রতি শিল্পিকে, প্রতি চিকিৎসককে—কেহ স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে কিনা, কেহ ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ম অমান্য করিয়াছে কিনা প্রভৃতি সংবাদ নাগরককে জানাইতে হইত। চিকিৎসক ব্যবসায়ী, শিল্পী, পরিবারের প্রধান ব্যক্তি, অতিথিশালায় এবং ধর্ম্মালয়ের অধ্যক্ষ যদি ঐসকল সংবাদ প্রদানে শৈথিল্য করিতেন তবে তাঁহাদিগকে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইত।

জমির পরিমাণ বিষয়ক ব্যবস্থাও অতি উত্তম ছিল। যথা—"গোমায়রোধেন

গ্রামাগ্রং কূটাকূট স্থল কেদারারাম ষণ্ডবাট বনবাস্ত চৈত্য দেবগৃহ সেতুবন্ধ শ্মশানে সত্র প্রপাপুণ্য স্থান বিবীত পথিসংখ্যানেন ক্ষেত্রাগ্রং। তেন সীমাং ক্ষেত্রানাংচ মর্য্যাদরণ্য পথি প্রমাণ সম্প্রদান বিক্রয়াচ্ছ গ্রহ পরিহার নিবন্ধান কারয়েৎ।" জরিপ করিয়া কোন্ গ্রামে কি পরিমাণ জমি আছে ঠিক করিয়া প্রত্যেক গ্রামের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। ভাল মন্দ ও মধ্যম প্রকারের জমি, উচ্চজমি, নিম্নজমি, উর্ব্বর জমি, অনুর্ব্বর জমি, যে জমি যে ফসলের জন্য উপযুক্ত, এবং জলকর ও বনকর প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত উদ্যান, বনভূমি, ধর্ম্ম মন্দির, তীর্থস্থান, অতিথিশালা, অনাথ আশ্রম, সমাধিস্থল গোচারণ ভূমি, রাজ পথ প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন এবং ঐ সংক্রান্ত হিসাব রক্ষা করিতেন।

আপনারা দেখুন খৃষ্ট জন্মের প্রায় তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভারতে এই সকল কার্য্য রাজকর্ম্মচারীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল।

চিকিৎসার বিষয়েও কৌটিল্যের দৃষ্টি ছিল। - যথা—"সূতিকা চিকিৎসক প্রেত প্রদীপায়ন নাগরক তূর্য্য প্রেক্ষাগ্নি নিমিত্ত মুদ্রাভিশ্চাগ্র হ্যা।"—(নাগরক প্রনিধি ১৪৬ পৃষ্ঠা)

"স্ত্রীনিবেশা গর্ভব্যাধি বৈদ্যঃপ্রখ্যাত সংস্থা। ন-চৈনাঃ কুল্যাঃ পশ্যেয়ুরণ্যত্র গর্ভব্যাধি সংস্থাভ্যঃ। নিশান্ত প্রনিধিঃ ৪১ পৃষ্ঠা—

তস্মাদস্য জাঙ্গলী বিদো ভিষজশ্চাসন্নাস্যুঃ।" আত্মরক্ষিতকম্ ৪৩ পৃষ্ঠা—

আমরা ভিষক্ চিকিৎসক জাঙ্গলীবিৎ, গর্ভব্যাধি সংস্থা বা সূতিকাগার চিকিৎসক ও পশু চিকিৎসকের পরিচয় পাইতেছি। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সূতিকা চিকিৎসা বা ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। ভিষক ও চিকিৎসক ইঁহারা সাধারণ ব্যাধি চিকিৎসা করিতেন। জাঙ্গলীবিদ্ বিষ পরীক্ষক ছিলেন। রাজার খাদ্যাদির সঙ্গে কেহ বিষ মিশ্রিত করিয়া যাহাতে কেহ তাঁহার প্রাণ নাশ করিতে না পারে এই জন্য জাঙ্গলীবিদ্ চিকিৎসক সর্ব্বদা রাজার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। রাজার আহার্য্য প্রস্তুত হইলে প্রথমে তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া পরীক্ষা করিতে হইত। তার পর পশু পক্ষীকে দিতে হইত পরে রাজা আহার করিতেন।

যথা—

"অগ্নের্জ্বালা ধূমনীলতা শব্দ স্ফোটনং চ বিষযুক্তস্য,—বয়সাং বিপত্তিশ্চ,—অন্নস্যোষ্মা ময়ূর গ্রীবাভঃ শৈত্যং, আশুক্লিষ্টস্যেব বৈবর্ণ্যং সোদকত্বম ক্লিন্নত্বং চ—ব্যঞ্জনানা মাশুশুষ্কত্বং চ ক্বাথ শ্যাম ফেন পটল বিচ্ছিন্নভাবো গন্ধস্পর্শ রসবধশ্চ,—দ্রব্যেষু হীনাতিরিক্ত ছায়া দর্শনং ফেন পটল সীমান্তোর্দ্ধ্ব রাজী দর্শনংচ—রসস্য মধ্যে নীলারাজী,—পয়সস্তাম্রা,—মদ্যতোয়য়োঃ কালী—দধ্নশ্‌ শ্যামাচ,—মধুনশ্‌ শ্বেতা,—দ্রব্যানামার্দ্রানামাশু প্রম্লানত্ব মুৎপক্বভাবঃ ক্বাথ নীল শ্যাবতাচ,—শুষ্কাণামাশু শাতনং বৈবর্ণ্যং চ কঠিনানাং মৃদুত্বং মৃদুনাং কঠিনত্বংচ,—তদভ্যাশে ক্ষুদ্রসত্ত্ববধশ্চ,—আস্তরণ প্রাবরানাং শ্যামমণ্ডলতা তন্তুরোম পক্ষশাতনং চ,—লোহমণিময়ানাং পাকলোপ দেহতা স্নেহরাগ গৌরব প্রভাব বর্ণ স্পর্শবধ শ্চেতি বিষযুক্ত লিঙ্গানি।

আত্ম রক্ষিতকম্‌ ৪৩ পৃষ্ঠা—

বিষ মিশ্রিত দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, অগ্নি ও ধূম নীলবর্ণ হইবে, আর তাহা শব্দিত হইতে থাকিবে। অন্নে বিষ মিশ্রিত থাকিলে সদ্যঃপ্রস্তুত অন্নের ধূমও ময়ূর কণ্ঠবৎ নীলবর্ণ দেখায়, আর সে ধূমে ঠাণ্ডা বোধ হয়। ব্যঞ্জনাদি অস্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করে, জলীয় বস্তু শক্ত ও হঠাৎ শুষ্ক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, ব্যঞ্জনাদি গন্ধহীন ও স্বাদহীন বলিয়া বোধ হয়। বিষ থাকিলে রন্ধন পাত্রের উজ্জ্বলতা কম হয় অথবা উজ্জ্বলতা বেশী হয়। বিষ মিশ্রিত হইলে রসাদি নীলবর্ণ এবং জল ও মদ্য রক্তবর্ণ, দধি কৃষ্ণবর্ণ ও মধু শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। জলীয় খাদ্যে বিষ থাকিলে তাহা বেশী সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শুষ্কখাদ্য নরম ও নরম খাদ্য শুষ্ক বলিয়া মনে হয়। খাদ্যপূর্ণ পাত্রের নিকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু দেখিলে এবং আস্তরণে ও প্রাবরণে গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ দাগ থাকিলে, উহা বিষ মিশ্রিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। মণিময় ও লৌহ পাত্র বিষের সংযোগে কলঙ্কিত ও দাগ যুক্ত হয়। পাত্রের বর্ণ, পালিস্‌ ও জ্যোতি কমিয়া যায়। পাত্র স্পর্শ করিলে অধিকতর কঠিন বলিয়া বোধ হয়।

অপিচ—

"জীবন্তি শ্বেতা মুষ্কক পুষ্প বন্দাকাভিরক্ষীপে জাতস্যাশ্বত্থস্য প্রতানেন বা গুপ্তং সর্পাবিষাণি বান প্রসহন্তে। মার্জ্জার ময়ূর নকুল পৃষতোৎসর্গ সর্পান্ ভক্ষয়ন্তি (গাসসর্পান্ ভক্ষয়ন্তি)। শুকশ্ শারিকা ভৃঙ্গরাজোবা সর্পবিষ শঙ্কায়াং ক্রোশতি

ক্রৌঞ্চো বিবাভ্যাশে মাদ্যতি। গ্লায়তি জীবং জীবকঃ। ম্রিয়তে মত্ত কোকিলঃ।
চকোরস্যাক্ষিণো বিরজ্যেতে। ইত্যেবং অগ্নি বিষ সর্পেভ্যঃ প্রতি কুর্বীত।"

নিশান্ত প্রণিধিঃ, ৪০ পৃষ্ঠা—

সর্পভয় নিবারণের জন্য ওষধি সকল প্রাসাদে উৎপন্ন করা হইত। সর্পভয় নিবারণের জন্য মার্জ্জার, ময়ূর, নকুল হরিণ প্রভৃতি রক্ষিত হইত। ময়না ও পারাবৎ, প্রভৃতি পক্ষী সর্প দেখিলেই চিৎকার করিয়া উঠে। বিষ সংস্পর্শে বক মূর্চ্ছা যায়, কোকিল মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এবং বিষের গন্ধে তিত্তির পক্ষীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। অর্থ শাস্ত্রের অন্তর্গত দুর্গনিবেশঃ আত্ম রক্ষিত কম্, কূটযুদ্ধ বিকল্পা, সীতাধ্যক্ষ প্রভৃতি অংশে চিকিৎসা বিষয়ক বিবিধ উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্গ নিবেশ অংশে ভেষজাগার প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে "উত্তর পশ্চিমাং ভাগং পণ্য ভৈষজ্য গৃহম্"—অর্থাৎ দুর্গের উত্তর পশ্চিম অংশে পণ্যাগার ও ভৈষজ্যাগার থাকিবে। এই সকল পণ্যাগার ও ভৈষজ্যাগারের দ্রব্য ক্ষয় ও ব্যয় অনুসারে নূতন নূতন ভেষজ ও পণ্য দ্বারা উহা পরিপূর্ণ করিবে কারণ একেবারে ফুরাইয়া গেলে অভাব অনুভব করিতে না হয়।
যথা—

"তেষু পুষ্পফল বাট ষণ্ড কেদারান্ ধান্যপণ্য নিশ্চয়াংশ্চ অনুজ্ঞাতাঃ কুর্য্যুঃ। দশ কুলী বাটং কূপ স্থানং সর্প স্নেহ ধান্যক্ষার লবন ভৈষজ্য শুষ্ক শাক যব সবল্লূর তৃণকাষ্ঠ লোহচর্ম্মাঙ্গার স্নায়ু বিষ বিষাণ বেণু বল্কলসার দারু প্রহরণা বরণাশ্ম নিচয়ানমেক বর্ষাপ ভোগ সহান্ কারয়েৎ। নবেনানবং শোধয়েৎ।"—

দুর্গ নিবেশ ৫৭ম পৃষ্ঠাঃ।

আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ সীতাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক অথবা ভৈষজ্য বিদ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিগণের দ্বারা ভৈষজ্য বপন হইত। যে ভূমি খুবভাল করিয়া অনেক বার কর্ষিত হইয়াছে, সেই ভূমি ভৈষজ্যাদি বপনের উপযোগী। "গন্ধ ভৈষজ্যোশীর হ্রীর বেরপিণ্ডালুকাদীনাং যথাস্বঃ ভূমিষু চ স্থাল্যাশ্চ অনুপ্যাশ্চৌষধীস্থাপয়েৎ।" স্থল ভূমিতেই ভৈষজ্য ভাল উৎপন্ন হয়। যেখানে রৌদ্র ও বৃষ্টি সমান ভাবে পায় সেখানে ভেষজ ভাল হয়। রাজকীয় ভূমিতেও ভেষজাদি বপনের ব্যবস্থা ছিল।

"চিকিৎসকাঃ শস্ত্র যন্ত্রাগদ স্নেহবস্ত্র হস্তাঃ স্ত্রিয়শ্চান্ন পান রক্ষিণ্য পুরুষাণা মুদ্ধর্ষনীয়া পৃষ্ঠতস্তিষ্ঠেয়ুঃ।—(কূট যুদ্ধ বিকল্পাঃ ৩৬৭ পৃষ্ঠাঃ)॥

সামরিক চিকিৎসকগণ শস্ত্র যন্ত্র, স্নেহ অগদ, বস্ত্র প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেন এবং সামরিক ধাত্রীগণ, অন্ন পানীয় প্রভৃতি সহ তাঁহাদের অনুগামী হইতেন।

রাজার চিকিৎসার ব্যবস্থা অন্যরূপ!

"ভিষগ ভৈষজ্যাগারাদাস্বাদ বিশুদ্ধমৌষধং গৃহীত্বা পাচক পোষকাভ্যামাত্মনা চ প্রতিস্বাদ্যরাজ্ঞে প্রযচ্ছেৎ।"—আত্মরক্ষিতকম্ ৪৪ পৃষ্ঠা।

রাজা যে ঔষধ সেবন করিবেন, ভিষক প্রথমতঃ তাহা পরীক্ষা করিয়া দিবেন। তৎপরে ক্রমান্বয়ে পাচক ও পোষক উহা আস্বাদ করিতেন। তৎপরে রাজা ঔষধ সেবন করিতেন।

চিকিৎসক দিগের দণ্ডের ব্যবস্থাও ছিল। যথা—ভিষজঃ প্রাণাবাধিকমনা খ্যায়োপক্রম মানস্য বিপত্তৌ পূর্ব্বস সাহস দণ্ডঃ। কর্ম্মাপরোধেন বিপত্তৌ মধ্যমঃ কর্ম্মবধ বৈগুণ্য করণে দণ্ড পারুষ্যং বিদ্যাৎ।" কারুকরক্ষণম্ ২০২ পৃষ্ঠা॥

"চিকিৎসকঃ প্রচ্ছন্ন ব্রণ প্রতীকার কারয়িতা পরম পথ্য কারিণং চ গৃহস্বামীচ নিবেদ্য গোপস্থা নিবেদ্য গোপস্থানিকয়োর্ম্মুচ্যেতান্যথা তুল্য দোষস্স্যাৎ।"

নাগরক প্রণিধি ১৪৪ পৃষ্ঠাঃ॥

সে সময়ে চিকিৎসা বিভাগ—রাজকীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং রাজ বিধি অনুসারে ঐ বিভাগের কার্য্য কলাপের তত্ত্বাবধান করা হইত। রোগীর চিকিৎসায় অবহেলা করিলে, রোগীর রোগ বৃদ্ধি হইলে, ঔষধে ভেজাল দিলে, কুচিকিৎসায় প্রাণ হানি ঘটিলে; সংক্রামক রোগের বিষয় রাজাকে না জানাইলে চিকিৎসকরা দণ্ডিত হইতেন। সে সময়ে রোগের পরিচয় চিকিৎসার বিবরণ এবং রোগীর নাম ধাম সম্বলিত তালিকা রাজকীয় কার্য্যালয়ে দাখিল করিবার বিধি ছিল। সুতরাং চিকিৎসা বিষয়ক সকল দোষের কথাই রাজা জানিতে পারিতেন এবং অপরাধের তারতম্যানুসারে দণ্ড বিধান করিতেন।

বর্ত্তমান মিউনীসিপালিটির অনুরূপ ব্যবস্থা সে যুগেও ছিল। যথা—

"পাংশুন্যাসে রথ্যায়ামষ্টভাগো দণ্ডঃ। পঙ্কোদক সন্নিরোধে পাদাঃ। রাজ মার্গে দ্বিগুণঃ। পুণ্যস্থানোদকস্থান দেব গৃহরাজ পরিগ্রহেষু পণোত্তরা বিষ্টা

দণ্ডাঃ। মূত্রেষ্বর্ধদণ্ডাঃ। ভৈষজ্য ব্যাধি ভয় নিমিত্তম দণ্ড্যাঃ। মার্জ্জার শ্বনকুল সর্প প্রেতানাং নগর স্যান্তরুৎসর্গে ত্রি পণোদণ্ডঃ। খরোষ্ট্রাশ্বতরাশ্বপশু প্রেতানাং ষট্‌পণঃ। মনুষ্য প্রেতানাং পঞ্চাশৎ পণঃ। 'মার্গবিপর্যাসে শবদ্বারাদ্য নয়তশ্‌ শবনির্গয়মে পূর্ব্বস্‌ সাহস দণ্ডঃ। দ্বার্স্থানাং দ্বিশতম্‌। শ্মশানাদন্যত্র ন্যাসে দহনেচ দ্বাদশ পণো দণ্ডঃ।''——নাগরক প্রনিধিঃ, ১৪৫ পৃষ্ঠা। অপিচ—

"ব্যাধিভয় মৌপনিষদিকৈঃ প্রতিকারৈঃ প্রতি কুর্য্যুঃ। ঔষধৈশ্চিকিৎসকাঃ, শান্তি প্রায়শ্চিত্তৈর্ব্বা সিদ্ধ তাপসাঃ। তেন মরকো ব্যাখ্যাতঃ। তীর্থাভিষেচনং মহাকচ্ছবর্ধনং গবাং, শ্মশানাবদোহনং কবন্ধ দহনং দেবরাত্রিংচ কারয়েৎ। পশু ব্যাধিমরকে স্থানান্তর্থ নীরাজনং স্বদৈবত পূজনং চ কারয়েৎ। দুর্ভিক্ষেরাজা বীজ ভক্তোপ গ্রহং কৃত্বাহনুগ্রহং কুর্য্যাং। দুর্গত কর্ম্ম বা ভক্তানুগ্রহেণ ভক্ত সংবিভাগং বা দেশ নিক্ষেপং বা।"

উপনিপাত প্রতিকারঃ, ২০৬—২০৭ পৃষ্ঠা—

জনবহুল সহরে স্বাস্থ্যরক্ষার সুন্দর বন্দোবস্ত দৃষ্ট হয়। রাজ পথে জল জমিলে রাজ কর্ম্মচারীদের দণ্ড হইত। মন্দির তীর্থস্থান, প্রাসাদ, পুষ্করণী প্রভৃতিতে অস্বাস্থ্যকর কোন কাজ করিলে দণ্ড হইত। নগরের মধ্যে মৃতদেহ বা অন্য কোন অস্থি কঙ্কালাদি পড়িয়া থাকিলে রাজা তাহার দণ্ড দিতেন। মৃতদেহ বহন করিয়া লইবার জন্য পৃথক "শ্মশান পথ'' ছিল। ঐ পথ ছাড়া অন্য পথে মৃতদেহ লইয়া গেলে দণ্ড ভোগ করিতে হইত। নির্দ্দিষ্ট সমাধি স্থান বা শ্মশান স্থান ছাড়া অন্যস্থানে মৃতদেহ সমাধিস্থ করিলে বা দাহ করিলে দণ্ডার্হ হইতেন। মহামারী উপস্থিত হইলে তৎপ্রদেশে নানা প্রকার চেষ্টা চলিত। চিকিৎসকগণ সেই প্রদেশে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের জন্য নিযুক্ত হইতেন। সিদ্ধ তাপসগণ শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও দেব দেবীর আরাধনা করিতেন। পশু মড়কের ও নিবারণের চেষ্টা চলিত।

তখন প্রত্যেক নগরে মৃতদেহ পরীক্ষা ও সন্দেহজনক শব ব্যবচ্ছেদের জন্য রাজকীয় "মরগ" বা মৃত পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল। যথা—

"তৈলাভ্যক্ত মাত্ত মৃতকং পরীক্ষেত—নিষ্কীর্ণ মূত্র পুরীষং বাতপূর্ণ কোষ্ঠ ত্বকং শূন পাদপাণি মুন্মীলিতাক্ষং সব্যঞ্জন কণ্ঠং পীড়ন নিরুদ্ধোচ্ছাস হতং বিদ্যাৎ॥ তমেব সঙ্কুচিত বাহু সক্থি মুদ্বন্ধ হতং বিদ্যাৎ॥ শূণপাণি পাদো

দর যপগতা ক্ষুদ্রক্তনাভি মবরোপিতং বিদ্যাৎ॥ নিস্তব্ধ গুদাক্ষং সন্দষ্ট জিহ্ব মাধ্মাতোদর মুদক হতং বিদ্যাৎ॥ শোণিতানু সিক্তং ভগ্নভিন্ন গাত্রং কাষ্ঠৈ রশ্মি ভির্বাহতং বিদ্যাৎ॥ সম্ভগ্ন স্ফুটিত গাত্রং বিক্ষিপ্তং বিদ্যাৎ॥ শ্যাব পাণিপাদ দন্তনখং শিথিল মাংস রোম চর্ম্মাণং ফেনোপ দিগ্ধমুখং বিষহতং বিদ্যাৎ॥ তমেব সশোণিত দংশং সর্প কীট হতং বিদ্যাৎ॥ বিক্ষিপ্ত বস্ত্রগাত্র মতিবাংত বিরিক্তং মদন যোগ হতং বিদ্যাৎ॥ অতোঽন্যতমেন কারণেন হতং হত্বা বা দণ্ড ভয়াদুদ্বন্ধ নিকৃত্ত কণ্ঠং বিদ্যাৎ॥ বিষ হতস্য ভোজন শেষং পয়োভিঃ পরীক্ষেত। হৃদয়াদুদ্ধৃত্যাগ্নৌ প্রক্ষিপ্তং চিট চিটায় দিন্দ্র ধনুর্বর্ণং বা বিষযুক্ত বিদ্যাৎ॥ দগ্ধস্য হৃদয় মদগ্ধং দৃষ্টা বা তস্য পরিচারক জনং বা দণ্ড পারুষ্যাদতি মার্গেত॥ দুঃখোপ হতমন্য প্রসক্তং বা স্ত্রী জনং দায় নিবৃত্তি স্ত্রীজনাভি মন্তারং বা বন্ধুম্। তদেব হতত্ববদ্ধস্য পরীক্ষেত। স্বয়মুদ্বদ্ধস্য বা বি প্রকারমযুক্তং মার্গেত। সর্বেষাং বা স্ত্রীদায়াদ্য দোষঃ, কর্ম্মস্পর্ধা প্রতিপক্ষদ্বেষঃ পণ্যসংস্থা সমবায়োবা বিবাদপদানা মন্যত মদ্বা রোষস্থানং; রোষ নিমিত্তোঘাতঃ॥ স্বয়মাদিষ্ট পুরুষৈর্বা চোরৈরর্থ নিমিত্তং সাদৃশ্যাদন্যবৈরিভির্বা হতস্য ঘাতমাসন্নেভ্যঃ পরীক্ষেত যেনাহূতস্ সহস্থিতঃ প্রস্থিতোহত ভূমি মানীতোবা, তমনুযুঞ্জীত। যে চাস্য হত ভূমা বাসন্ন চরাস্তানেকৈকশঃ পৃচ্ছেৎ 'কেনায়মিহানীতো বা কস্সশস্ত্রঃ সঙ্গুহ মানঃ উদ্বিগ্নো বা যুষ্মাভির্দৃষ্টঃ ইতি তে যথা ক্রয়ুস্তথা হনুযুঞ্জীত॥"

চতুর্থ খণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, আশুমৃতক পরীক্ষাঃ, ২১৫—২১৭ পৃষ্ঠা

উদ্বন্ধনে প্রাণ হারাইলে, বা জলে ডুবিয়া মরিলে সেই মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদাগারে আনীত হইত। শ্বাস-প্রশ্বাস রোধে যত প্রকার মৃত্যু হইতে পারে, সকল স্থলেই মৃতদেহ পরীক্ষাগারে আনা হইত। যাহাতে শবদেহ পচিয়া না যায় সে জন্ত উহা তৈল বা তৈলময় পদার্থে ভিজাইয়া রাখা হইত। বিষ প্রয়োগে যাহাদের মৃত্যু হইত এবং আত্মহত্যা করিত, তাহাদের শবদেহ ব্যবচ্ছেদাগারে আনিতে হইত। মৃতদেহ উপস্থিত হইলেই চিকিৎসকগণ তাহা পরীক্ষা করিতেন। নানাপ্রকার মৃত্যুর নানা রকম লক্ষণ দেখিয়া তাঁহারা মৃত্যুর কারণ ঠিক করিবার চেষ্টা করিতেন। মৃতদেহ পরীক্ষায় অবৈধ উপায় অনিষ্ট মৃত্যুর বিষয় সপ্রমাণ হইলে তাহা বিচারকের আমলে আসিত।

ব্রাহ্মণ ও তপস্বিগণ ব্রহ্মোত্তর পাইতেন। রাজ কর্ম্মচারীরাও জায়গীর

পাইতেন। কোন রাজকর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন কালে মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ও পরিবার বর্গের ভরণ পোষণের জন্য রাজা তাঁহাদের বৃত্তি প্রদান করিতেন। মৃত কর্ম্মচারীর পরিজন মধ্যে কেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে রাজা তাহাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। কর্ম্মচারীগণ অর্থাভাব জানাইয়া আবেদন করিলে রাজা আর্থিক সাহায্য করিতেন। অবস্থা বিশেষে তাঁহারা বণ, উপবণ গৃহপালিত পশু, ও ভূমি ও প্রাপ্ত হইতেন। অন্তঃপুর চারিণী স্ত্রীলোকদিগের অভাব অভিযোগ জানিবার জন্য স্ত্রীলোকগণ দূতরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা অন্তঃপুরে অন্তঃপুরে ঘুরিয়া সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া রাজাকে জানাইতেন। যথা—

"প্রদিষ্টাভয় স্থাবর জঙ্গমানিচ ব্রাহ্মণেভ্যো ব্রহ্ম সোমারণ্যানি তপোবনানি চ তপস্বিভ্যা গোত্র (ত)পরাণি প্রযচ্ছেৎ।"—ভূমি ছিদ্র বিধানম্, ৪৯ পৃষ্ঠা—

অপিচ—"ঋত্বিগাচার্য্য মন্ত্রি পুরোহিত সেনাপতি যুবরাজ রাজমাতৃ রাজ মহিষ্যোহষ্ট চত্বারিংশৎ সাহস্রা। এতাবতা ভরণে নানা স্বদ্যত্বম কোপকং চৈষাং ভবতি। দৈবারি কান্তর্বংশিক প্রশাস্তৃ সমাহর্ত্তৃ সন্নিধাতার শ্চতুর্বিংশতি সাহস্রাঃ। এতাবতা কর্ম্মনা ভবন্তি। কুমার কুমার মাতৃ নায়কা পৌর ব্যবহারিক কার্ম্মান্তিক মন্ত্রি পরিষদ্রাষ্ট্রান্ত পালাস্ত পালাশ্চ দ্বাদশ সাহস্রাঃ। স্বামি পরিবন্ধ বল সহায়া হ্যেতাবতা ভবন্তি। শ্রেণীমুখ্যা হস্ত্যশ্বরথমুখ্যাঃ প্রদেষ্টারশ্চ অষ্ট সাহস্রাঃ। স্ববর্গানু কর্ষিণী হ্যেতাবতা ভবন্তি।......কর্ম্মসু মৃতানাং পুত্র দারা ভক্ত বেতনং লভেরন্। বালবৃদ্ধ ব্যাধিতা শ্চৈষামনুগ্রাহ্যা। প্রেত ব্যাধিত সূতিকা কৃত্যেষু চৈষামর্থ মানকর্ম্ম কুর্য্যাৎ।"

"ভৃত্যভরণীয়" প্রকরণ (২৪৫ পৃষ্ঠা)।

কৌটিল্য কীট, পতঙ্গ, মূষিকাদির উপদ্রব নিবারণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মূষিকের উপদ্রব নিবারণের জন্য মার্জ্জার ও নকুল পালন করা হইত। যথা—"মূষিক ভয়ে মার্জ্জার নকুলোৎ সর্জ্জঃ"—(উপনিপাত প্রতিকারঃ ২০৭ পৃষ্ঠা)

বাঘের উপদ্রব নিবারণে বিষ প্রয়োগের ব্যবস্থা ছিল। যথা—"লুব্ধকাঃ শ্বগণিনো বা কূটপঞ্জরাব পাতৈশ্চরেয়ুঃ। আবরণিনঃ শস্ত্র পাণয়োব্যালানভিহন্যুঃ। অনভি সর্ত্তু দ্বাদশ পণোদণ্ডঃ। স এব লাভো ব্যাল ঘাতিনঃ।"

(উপনিপাত প্রতিকারঃ, ২০৭ পৃষ্ঠা)

নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি মাদকদ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিত। পাশাপাশি একসঙ্গে অনেকগুলি মদের দোকান থাকিতে পারিত না। একপ্রস্থ বা সওয়া কাঁচ্চার অধিক মদ্য খাইলে বা বিক্রয় করিলে দণ্ডনীয় হইত। অর্থশাস্ত্রের "সুরাধ্যক্ষ" প্রসঙ্গে (১১৯ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে—

"এক মুখমণেক মুখং বা বিক্রয়ক্রয়বশেন বা ঘটছত্তম ত্যয় মদ্যএ. কভৃক্রেতৃ বিক্রেতৃণাং স্থাপয়েৎ, গ্রামাদ নির্ণয়ণম সম্পাতং চ॥" এ বিষয় "সুরাধ্যক্ষ" প্রসঙ্গে ও "বাক্য কর্ম্মানু যোগঃ" প্রসঙ্গে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

রাজা অসহায় বালক বালিকাগণের রক্ষার ভার গ্রামের বৃদ্ধদের প্রতি অর্পণ করিতেন। রাজার জন্ম দিন ও যুবরাজের জন্ম দিন উপলক্ষে এবং যৌবরাজ্যে অভিষেক কালে ও নূতন রাজ্য জয় হইলে বন্দিগণকে মুক্তি দেওয়া হইত। অনেক সময় বালক, বৃদ্ধ ও পীড়িত বন্দিগণকে তাহাদের দণ্ড কাল শেষ হইবার আগেই মুক্তি দেওয়া হইত। কারাগারে যাহারা সৎচরিত্রের পরিচয় দিতে পারিত তাহারা ও দণ্ডকাল শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বেই মুক্তিলাভ করিত। যথা,—"বন্ধনাগারে চ বালবৃদ্ধব্যাধিতানাথানাং চ জাত নক্ষত্র পৌর্ণমাসীষু বিসর্গঃ। পুণ্যশীলাস্ সময়ানু বন্ধা বা দোষনিক্রয়ং দদ্যঃ। দিবসে পঞ্চরাত্রে বা বন্ধন স্থান্ বিশোধয়েৎ। কর্মণা কায়দণ্ডেন হিরণ্যাণ্ গ্রহেন বা। অপূর্ব্ব দেশাধিগমে যুবরাজাভিষেচনে। পুত্রজন্মনি বা মোক্ষো বন্ধনস্থ বিধীয়তে॥"

অর্থশাস্ত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, (নাগরক প্রনিধিঃ ১৪৬—১৪৭ পৃষ্ঠা)

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেআরও আমরা দেখিতে পাই—রাজার কোষাগারে অর্থও সর্ব্বপ্রকার শস্য সঞ্চিত হইত। দুর্ভিক্ষের সময় ঐ সকল শস্যের অর্দ্ধেক ব্যয় করা হইত। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে রাজা প্রচুর শস্যোৎপাদনের জন্য নিজের কোষাগার হইতে শস্যের বীজ প্রদান করিতেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে রাজা নিজে সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেন। অবস্থা বিশেষে রাজা মিত্র-রাজগণের ও অর্থশালী প্রজাগণের নিকট হইতেও সাহায্য লইতেন। দুঃভিক্ষ পীড়িত লোকদের মজুরের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। আবার অনেককে বিনা পরিশ্রমেও সাহায্য প্রদান করা হইত। যে দেশে প্রচুর শস্য জন্মাইয়াছে সে দেশে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের স্থানান্তরিত করা হইত। ইহা ছাড়া

সমুদ্র বা নদীতীরে নূতন গ্রামস্থাপন করাইয়া তথায় শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করাইয়া দিতেন। নদীতীরে যাহারা বাস করিত, জল প্লাবনের সম্ভাবনা বুঝিয়া রাজা তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান করিয়া দিতেন। রাজার আদেশে তাহারা জলপ্লাবনের আগেই নদীর তীর পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ জমিতে আশ্রয় লইত। যাহাদের নৌকা প্রভৃতি থাকিত রাজার আদেশে তাহারা দেশের এইরূপ আকস্মিক বিপদে সাহায্য করিত। যথা—

"বিক্ষেপ ব্যাধিতাস্তরারম্ভশেষং চ ব্যয় প্রত্যায়ঃ।"

(কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষঃ ৯৪ পৃষ্ঠা)

"দুর্ভিক্ষে রাজা বীজভক্তোপ গৃহং কৃত্বাহনুগ্রহং কুর্য্যাৎ। দুর্গত কর্ম বা ভক্তানুগ্রহেন ভক্ত সংবিভাগং বা দেশ নিক্ষেপং বা। মিত্রাণি বা ব্যপাশ্রয়েৎ। কর্শনং বমনং বা কুর্য্যাৎ। নিষ্পন্ন সস্য মন্য বিষয়ং বা সজন পদো যায়াৎ। সমুদ্র সরস্তটাকানি বা সংশ্রয়েৎ। ধান্য শাক মূল ফলাবাপান্ সেতুষু কুর্বীত। মৃগপশু পক্ষিব্যাল মৎস্যারম্ভান্ বা।

(উপনিপাত প্রতিকারঃ ২০৭ পৃষ্ঠা)

"বর্ষারাত্র মনূপ গ্রামাঃ পুরবেলামুৎসৃজ্য বসেয়ুঃ। কাষ্ঠবেণুনাবশ্চাপ গৃহ্নীয়ুঃ।"

(উপনিপাত প্রতিকারঃ ২০৬ পৃষ্ঠা)

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে এত জানিবার বিষয় আছে যে এরূপ আরও দশটী প্রবন্ধ পঠিত হইলে তবে মোটামুটী সব বলা হইবে। এই প্রবন্ধটিকে আপনারা ভূমিকা স্বরূপ মনে করিবেন। এই কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্র লইয়া সুধীগণের মধ্যে অনেক আলোচনা চলিতেছে। অনেক শব্দের অর্থ লইয়াও মতান্তর আছে। ইহার আলোচনায় আমি কোন বাদানুবাদের মধ্যে যাই নাই, আমি সাধারণ ভাবে ইহা হইতে প্রাচীন ভারতের অসাধারণ মনীষা ও জ্ঞান গৌরব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। যদি আপনাদের অনুমতি পাই তবে বারান্তরে ইহার সবিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি—

শ্রীগিরিজা প্রসন্ন সেন।
বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর, দর্শন-নিধি।

দানবীর রাসবিহারী।*

ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের স্বর্গারোহণে কেবল মাত্র অভাগী বঙ্গ জননী যে একজন মনীষা সম্পন্ন সন্তান হারাইয়াছেন, তাহা নহে, পরন্তু সমগ্র জগৎ একজন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ব্যবহার জীবের অসামান্য প্রতিভার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ লাভে বঞ্চিত হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁহারা একবাক্যে বলিবেন রাসবিহারী তাঁহাদের আদর্শ ছিলেন, কি রাষ্ট্রনীতি, কি সমাজ নীতি কি আইনের কূটতর্ক, কি দান শৌণ্ডতা কোন বিষয়েই তাঁহার ন্যায় আর একটি দ্বিতীয় সন্তান এই বিংশ শতাব্দীতে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে কি না সন্দেহ। বস্তুতঃ সমগ্র ইউরোপ খণ্ড ও আমেরিকার ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে ও তাঁহার ন্যায় গভীর আইন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অতি অল্পই আছেন। শুধু ইহাই নহে, তাঁহার স্বাধীন তর্ক যুক্তির জন্য তিনি tiger of the High Court আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ডাক্তার ঘোষ যখন স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য দণ্ডায়মান হইতেন, তখন শিক্ষিত বিচারকেরা একাগ্র মনে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন।

রাসবিহারি যেমন ধন কুবের তেমনি জ্ঞান-কুবের ছিলেন। দিবসের গুরু-কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া রাসবিহারী গভীর নিশীথ রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন, তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র শ্রান্তি বা ক্লান্তি বোধ হইত না—এমনই অসাধারণ ও অতর্পনীয় তাঁহার জ্ঞান পিপাসা! এমন কি মহাপ্রস্থানের অব্যবহিত পূর্ব্বে পর্য্যন্ত তিনি পুস্তক অধ্যয়ন হইতে মুহূর্ত্ত কালের জন্য বিরত হন নাই—দুঃসহ ব্যাধির দংশন তাঁহাকে বাগ্দেবীর আরাধনায় নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার মানসিক শক্তির কথা আর কি বলিব? স্বয়ং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানে স্তম্ভিত, বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন—

A prodigy like Rash Behari conld flourish only one in a century.

* সাহিত্য সভায় পঠিত।

কিন্তু স্যার রাসবিহারী পাণ্ডিত্যে যেমন অসাধারণ দানেও তেমনি মুক্তহস্ত। পাশ্চাত্য দেশের প্রথা এই যে, সে দেশের অপুত্রক ধনী ও মনীষি বৃন্দ বংশ-রক্ষায় অথবা পিণ্ড লাভের চিন্তায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া দত্তক পুত্রাদি গ্রহণ করেন না, আজীবনের সঞ্চিত ধন ও স্থাবরাবস্থাবর সম্পত্তি কোন জনহিতকর কার্য্যে দান করিয়া যান। ডাক্তার রাসবিহারী পাশ্চাত্য-শিক্ষা সমুদ্রে অবগাহন করিয়া তাহাদের এই মহাগুণ টুকু আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, তিনি অপুত্রক হইলেও হিন্দুশাস্ত্রের অন্ধ অনুকরণ না করিয়া এবং পিণ্ড লাভ করিয়া স্বর্গবাসী হইবার আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া নিজের স্বোপার্জ্জিত ধন রাশি দেশের নানা জনহিতকর কার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার ঘোষ প্রায় দশ লক্ষাধিক মুদ্রা, বঙ্গে জাতীয় শিক্ষার প্রচার কল্পে দান করিয়া গিয়াছেন। প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের তোরণ দ্বারে যখন জাতীয় শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই আহ্বানে সর্ব্বপ্রথম রাসবিহারীই সাড়া দিয়াছিলেন, আবার মৃত্যুকালে সেই জাতীয় শিক্ষার জন্য প্রভূত অর্থ দান করিয়া দানবীর রাসবিহারী জাতীয়-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ শুধু আইন-সিন্ধুই ছিলেন না, বঙ্গ সাহিত্যের ও তিনি একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্র লালের শোক-সভায় তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন এবং স্বর্গীয় নাট্যকারের নাটকাবলীর সমালোচনা করিয়া যে ভাবে তাঁহার বৈশিষ্ট দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় ডাক্তার রাসবিহারী—বঙ্গ সাহিত্যের একজন পাঠক ও এক নিষ্ঠ সাধক ছিলেন। সাহিত্য সভার তিনি একজন প্রধান মেরুদণ্ড ও সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং ইংরাজি সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন।

জীবন-কথা।

স্যার রাসবিহারী ঘোষ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৺জগবন্ধু ঘোষের ঔরসে বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী তোরেকোনা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হন।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ্ এ পরীক্ষা দিয়া সর্ব্ব-

প্রধান স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৫খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৬৬খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের মধ্যে ইংরাজী সাহিত্যে এম্ এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ইহার পরবর্ত্তী বৎসরে তিনি বি এল্ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ পদ লাভ করেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে স্যার রাসবিহারী বাল্যাবধি ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। মিলটন, সেক্সপীয়র, মেকলে, বার্ক প্রভৃতির গ্রন্থাবলী তাঁহার পরম আদরের বস্তু ছিল, তিনি এই সকল বিখ্যাত গ্রন্থকার-গণের প্রতি বাক্য প্রতি ছন্দঃ যখন তখন মুখস্থ বলিতে পারিতেন এবং এই কারণেই তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতা এত হৃদয় গ্রাহী হইত যে প্রধান প্রধান ইংরাজ বিচারপতি পর্য্যন্ত মন্ত্র মুগ্ধবৎ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। কি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায়, কি প্রকাশ্য সভা সমিতিতে রাসবিহারী যে বক্তৃতা করিতেন তাহা শুনিয়া ইংরাজী শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিতগণ শতমুখে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া পারিতেন না।

১৮৬৭খ্রীষ্টাব্দে রাস বিহারী কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম এই স্বাধীন ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে তাঁহার অনেক ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল, কিন্তু রাস বিহারী সে বাধা বিঘ্নে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া "মন্ত্রং বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ" বলিয়া আপন অভীষ্ট সাধনে কৃতসংকল্প ছিলেন। ফলে অচিরে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার উপর সুপ্রসন্না হওয়ায় তিনি শনৈঃ শনৈঃ হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবের মধ্যে পরিগণিত হইলেন। ১৮৭৫—৭৬খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাস বিহারী ঠাকুর অধ্যাপকের কার্য্য করেন।

স্যার রাস বিহারী কখনও হাইকোর্টের বিচার পতির আসনে বসেন নাই, ভগবান যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্যই করেন। যদি তিনি হাইকোর্টে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার ত্যাগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট বেতনে জজীয়তি গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি দেশের শিক্ষা প্রচার

কয়ে এত লক্ষ লক্ষ টাকাও রাখিয়া যাইতে পারিতেন না, কিংবা দেশের কয়েকটী অত্যাবশ্যকীয় আইনের ও সংস্কার হইত না।

১৮৭৯খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটনের অনুরোধে—ডাক্তার রাস বিহারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য পদগ্রহণ করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সিণ্ডিকেটের মেম্বর ছিলেন। ডাক্তার রাস বিহারী যদিও শেষ জীবনে নিয়মিত রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারিতেন না, তথাপি নিতান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রায়ই তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখা যাইত না।

১৯১৩খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তার রাস বিহারীকে P.H.D. উপাধি প্রদান করেন।

স্যার রাস বিহারী ঘোষ স্ত্রী শিক্ষা বিষয়েও পরম অনুরাগী ছিলেন। তিনি ১৮৮৮খ্রীষ্টাব্দে এতদুদ্দেশ্যে কিছু দানও করিয়াছিলেন। রাস বিহারী প্রতি বৎসর তাঁহার স্নেহময়ী জননী পদ্মাবতীর নামে, যে বঙ্গ দেশবাসিনী রমনী বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা পাইবে তাহাকে একটী সুবর্ণ পদক দিতেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়েও তিনি এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।

স্যার রাস বিহারী ঘোষ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সহিত বিশেষ জড়িত ছিলেন। জীবনের রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি ধীর পন্থী দলভুক্ত থাকিলেও বিগত যুদ্ধের সময় যখন নির্ব্বিচারে বঙ্গের যুবক বৃন্দ দলে দলে অবরুদ্ধ হইতে লাগিল, তখন তিনি তাহার প্রতিবাদ ও তাহাদিগকে সাহায্য করিতেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। রাসবিহারী তখন সপ্ততির পর বৃদ্ধ। রাসবিহারী যাহা ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বুঝিতেন, মুক্তকণ্ঠে তাহা প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিতেন না।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রাসবিহারী মান্দ্রাজে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। রাস বিহারী বাক্য বাগীশ দলভুক্ত ছিলেন না, তিনি মুখে যাহা বলিতেন, কাজে তদপেক্ষা দ্বিগুণ করিতেন। তিনি জানিতেন দেশীয় শিল্প দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারিলে এবং দেশে শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন করিতে না পারিলে কোন ফলোদয় হইবে না, তাই তিনি ভবানীপুরে ত্রিশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া একটি দেশ লাইয়ের কারখানা স্থাপন করেন। ডাক্তার রাস বিহারী দেশীয় ভৈষজ্যাবলীর ও পরম উৎসাহ দাতা ছিলেন। যখন

Bengal Chemical ও Pharmaceutical works স্থাপিত হয়, তখন রাস বিহারী ইহাতে যথেষ্ট টাকা দান করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রাস বিহারী C. I. E. এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে C. S. I. উপাধি ভূষণে ভূষিত হন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি "নাইট" উপাধি প্রাপ্ত হন।

ডাক্তার রাস বিহারী মৃত্যু কালে যে অপ্রত্যাশিত দান করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেই জানেন; সুতরাং তাহার আর পুনরুক্তি করিব না। তবে এই শেষ জীবনের দান হইতে দুইটি বিষয়ে ডাক্তার রাস বিহারীর চরিত্র প্রণিধান করিবার আছে।

ডাক্তার রাস বিহারী আবাল্য কলিকাতা মহানগরীতে অতিবাহিত করিলেও তাঁহার শৈশবের ক্রীড়াভূমি জন্মভূমির কথা আদৌ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, স্বদেশের রেণু তাঁহার নিকট স্বর্ণরেণু ছিল। জন্মভূমির আকাশ বাতাস তাঁহার প্রাণে মোহন বাঁশী বাজাইত, তাই স্বগ্রামের বিদ্যালয়ে তিনি যথেষ্ট টাকা দিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার রাস বিহারীর উইলে শিবভক্তি দর্শনে বোধ হইতেছে যে তিনি প্রাণে প্রাণে হিন্দু ছিলেন।

এরূপ মহাপ্রাণ দানবীরের জীবন সকলের আদর্শ হৌক।

শ্রীশ্যাম লাল গোস্বামী।

মহাভারতীয় সারল বিরাটপর্ব্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সরল নামক জনৈক উৎকল দেশীয় ব্রাহ্মণের বিরচিত প্রাচীন কাব্য।

দুষ্টের গমন সতী জানিয়া সত্বরে। দ্রুতপদে উঠিয়া চলিলা অন্তঃপুরে॥
কীচক দেখিল তার দুখানি চরণ। দৃষ্টিমাত্র কামবাণে হইল মগন॥
কামানলে দহে চিত কহে ভগিনীরে। কে উঠিয়া গেল ভগ্নী সত্য কহ মোরে॥
ইন্দ্রের অপ্সরা কিবা নাপারি চিনিতে। গরলে ঘেরিল অঙ্গ না পারি সহিতে॥

কার কন্যা কিবা নাম কেবা সে রূপসি। জ্ঞান হয় মোর মনে যেন পূর্ণ শশী॥
ভ্রাতার বচন শুনি সুদেষ্ণা সুন্দরী। সৈরিন্ধ্রী উহার নাম আমার বেশকারী॥
আছয়ে আমার গৃহে একাদশ মাস। শুনিয়া কীচক হৈল অন্তরে উল্লাস॥
কি বাক্য বলিলে ভগ্নী কহ কহ শুনি। তব ঘরে হেনকন্যা আমি নাহি জানি॥
বেশকারী যোগ্যা এই, নহে কদাচন। বলি কহি দেহ মোর ভজুক চরণ॥
রাণী বলে ওই কথা বলিওনা ভাই। সে রীতের নারী নয় মানিবেক নাই॥
পূর্ব্বেসত্য করিয়া আছয়ে মোরঘরে। আর হেন কথা তুমি না বলিহ মোরে॥
তুমি জ্ঞানবান ভাই জানহ সকল। বিচারে পণ্ডিত তুমি বলে মহাবল॥
পরদার মহাপাপ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। মরিলে শমন দণ্ড স্পর্শেতে আয়ুক্ষয়॥
সুদেষ্ণা বুঝায় হেনবলি প্রিয়বাণী। চোর যেন নাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী॥
শুন ভগ্নী কামানলে প্রাণযায় মোর। ভ্রাতৃ হত্যা এখনি নিকটে হবে তোর॥
কহিতে যেসব কথা না বলে ভগ্নীরে। সেই কথা কহে দুষ্ট লজ্জা নাহি করে॥
যাহ কহ গিয়া তারে ভজুক এখনি। নানা অলঙ্কার দিব হবে পাটরানী॥
সুদেষ্ণা বলিল ভাই না বল এমন। পঞ্চ গন্ধর্ব্বেতে ওরে করয়ে পালন॥
গন্ধর্ব্বে করিলে ক্রোধ হইবে সংশয়। নামানিবে সৈরিন্ধ্রীসে কুরীতের নয়॥
কীচক বলিল তুমি না জানহ আমা। মোরে কি করিবে সে গন্ধর্ব্ব পঞ্চজনা॥
সৈরিন্ধ্রী বটয়েনষ্ট আমি জানিভালে। অন্তরেতে অন্য তার মুখে সতী বলে॥
পরাণ সংশয় মোর কাম সিন্ধুনীরে। বেশকারী দিয়া তুমি বাঁচাহ আমারে॥
নাদিলে সবংশে তোমা করিব নিধন। শুনিয়া সুদেষ্ণ দেবী ভয় পেল মন॥
ভ্রাতৃবাক্যে রাজরাণী চলিল বুঝিতে। সৈরিন্ধ্রী কাছে গিয়া লাগিল কহিতে॥
মধুর কোমল বাক্যে কহে মৃদুস্বরে। বেশকারী হৈয়া কেন রবে মোর ঘরে॥
আমার ভ্রাতার তুমি ভজহ চরণ। অঙ্গেতে পরিবে কত নানা আভরণ॥
ভ্রাতার আছয়ে একশত দিব্যা নারী। তাসবার উপরে হইবে পাটেশ্বরী॥
কতশত দাসী তব সেবিবেক পায়। পরাধীন হয়ে কেন বঞ্চিবে হেথায়॥
শুনিয়া দ্রৌপদী কহে অধমুখ করি। অসম্ভব কথা শুনি আমি লাজে মরি॥
পূর্ব্বে সত্যকরি আমি আছি তবঘরে। তব যোগ্যকথা নহে কহিতে আমারে॥
শুনিয়া লজ্জাতে রাণী চলিল উঠিয়া। ভগ্নীকে কীচক দেখে বলে ব্যস্ত হৈয়া॥
কহভগ্নী বাঁচাতেকি পারিবে আমারে। কি বলিল বেশকারী সত্য কহ মোরে॥

সুদেষ্ণা বলিল ভাই কহিল যতেক। প্রবন্ধ প্রকারে আমি বুঝানু অনেক॥
নামানিল বেশকারী কি হবে উপায়। কীচক বলিল তবে মোর প্রাণ যায়॥
তুমি অনুমতি দাও প্রসন্ন হইয়া। বলাৎকার করিয়া সৈরিন্ধ্রী যাই লৈয়া॥
সুদেষ্ণা বলিল ভাই লোকাচারে ডরি। পূর্ব্বে মোরে সত্য করায়েছে বেশকারী
শুনহ আমার যুক্তি কহিয়ে তোমাকে। মোরে ক্ষমাকরি তুমি যাহ নিজ গৃহে॥
আমার নিকটে বল যদি কর তুমি। ইহাতে লোকেরকাছে দোষপাব আমি॥
কালি বেশকারী পাঠাইব তব ঘরে। সুরা আনিবার ছলে প্রবন্ধ প্রকারে॥
বলে ছলে উহাকে করিবে তুমি বশ। ইহা হইলে মোর না হইবে অপযশ॥
শুনিয়া কীচক বলে আনন্দিতহইয়া। বুঝিলাম ভগ্নী মোরে আছে তব দয়া॥
এতক্ষণে মন্দকেবা বলিবে তোমারে। কহিয়া সরস বাক্য বাঁচালে আমারে॥
এতবলি প্রণমিয়া যায় নিজ পুরে। কতদূর হইতে আইল পুনঃ ফিরে॥
আবার কহিল ভগ্নীর মুখ চাই। শুন ভগ্নী মোরবাক্য বিস্মৃত হবে নাই॥
যদি রূপবতী ঘরে না যায় আমার। কালি আসি তব গোষ্ঠি করিব সংহার॥
বিরাটের রাজত্ব আমার বাহুবলে। সর্ব্বনাশ হইবেক সৈরিন্ধ্রী না গেলে॥
বিনতি শকতি বাক্য দুইমত বলি। কামানলে দগ্ধ হৈয়া গেহে গেল চলি॥

সুদেষ্ণা কর্ত্তৃক দ্রৌপদীকে সুধা আনিতে কীচকের নিকটে প্রেরণ, দ্রৌপদী কর্ত্তৃক সূর্য্য স্তব ও কীচক কর্ত্তৃক দ্রৌপদীকে রাজ সভাস্থলে পদাঘাত।

সৈরিন্ধ্রী ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে। কতক্ষণে মিলন হইবে তার সনে॥
তবে সুত পুত্র রেয়ে গৃহে আপনার। নানা মিষ্ট উপচার পূরিল উদরে॥
কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া অগুরু চন্দন। আনন্দে আপনার অঙ্গে করিল লেপন॥
সুগন্ধি চম্পক হার গাথিয়া কৌতুকে। কর্পূর তাম্বুল আর নানাবিধ রাখে॥
বিচিত্র পালঙ্কে বসি রহে একেশ্বর। বিরহ হুতাসে তার তনু জর জর॥
এক দৃষ্টে পথ পানে আছে নিরখীয়া। নিদ্রা নাহি দুনয়নে আছিল জাগিয়া॥
যেমত চাতক রহে নবমেঘ হেরি। তেমত আছয়ে দুষ্ট দিবস শর্ব্বরী॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে পথ পানে চায়। বলে কতক্ষণে আজি রজনী পোহায়॥

চারিযাম নিশি আজি চারি যুগ হৈল শশধরে চাহি দুষ্ট কহিতে লাগিল॥
আজি কার মত চন্দ্র যাহ ত্বরা করি। বিরহ হুতাশে দহে আমি প্রাণে মরি॥
উঠিয়া বসিয়া নিশি করে জাগরণ। রজনী প্রভাত হৈল উদিত তপন॥
দিবাকর পানে চেয়ে আনন্দ অপার। বলে আজি সুপ্রভাত হইল আমার॥
সৈরিন্ধ্রী সহিত আজি হইবে মিলন। এত বলি পথ পানে চাহে ঘনেঘন॥
পালঙ্কে বসিয়া দুষ্ট ভাবে মনে মনে। এতেক বিলম্ব কেন হইল এক্ষণে॥
বুঝিলাম ভগ্নি মোর রহিল পাসরী। সেনা এলে সবংশে পাঠাব যমপুরী॥
এইরূপে সাত পাঁচ ভাবে মনে মনে। যেমন বসিযা যোগী আছয়ে ধেয়ানে॥
এখানে সুদেষ্ণা দেবী প্রভাতে উঠিয়া। কালি দুষ্ট ভাই মোর গিয়াছে বলিয়া॥
সৈরিন্ধ্রী না পাঠাইলে আমার গোচরে। কালি আসি স্বগোষ্ঠীতে বধিব তোমারে॥
এত চিন্তি সুদেষ্ণা সৈরিন্ধ্রী প্রতি কয়। সুধা-আনিবারে যাহ ভ্রাতার আলয়॥
আমি ক্রিড়ারসে আছি তৃষ্ণাযুক্ত হৈয়া। ভ্রাতৃ গৃহ হৈতে সুধা শীঘ্র আন গিয়া॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি যেন বজ্রাঘাত। ভয়েতে কম্পয়ে কৃষ্ণা যেন রম্ভাপাত॥
যাজ্ঞসেনী কহিলেন শোকাতুর মনে। সুধা আনিবারে গো পাঠাও-অন্যজনে॥
কারণ সে সুতপুত্র নির্লজ্জ দুর্ম্মতি। তার কাছে যাইতে মোরে না বলহ সতি॥
প্রথমে তোমার কাছে করেছি নির্ণয়। রাখিলে আপন গৃহে করিয়া অভয়॥
আপন বচন দেবী করহ পালন। সুধা আনিবারে যেতে নারব এখন॥
আর কোন কর্ম্মে আজ্ঞা করহ আমায়। অকর্ত্তব্য হৈলে তাহা করিব নিশ্চয়॥
শুনি বিরাটের রাণী ক্রোধে হুতাশন। আরক্ত নয়নে কহে কর্কশ বচন॥
কিবাক্য বলিলে,তুমি কহ আর বার। প্রেরণী জনার কেন এত অহঙ্কার॥
যথাকারে পাঠাইব যাবে তথাকারে। বিলম্ব নাসহে সুধা আনহ সত্বরে॥
এত বলি সুধাপাত্র আনিদিল হাতে। দেখহ দৈবর এই কার্য্য বিপরীতে॥
এতশুনি যাজ্ঞসেনী কান্দিতে কান্দিতে। গোবিন্দ স্মরিয়া সুধা পাত্র নিলহাতে॥
পরাধীনা হৈয়া আছে এড়াইতেনারে। কান্দিতে ২ যায় দুষ্টের গোচরে॥
ব্যাঘ্রস্থানে যেতে,যেন ডরায় হরিণী। সেইরূপ ভয়ে চলে দ্রুপদনন্দিনী॥
চলিতে না চলে পদ কাঁপে থর হায়। কি করিব কি হইবে না দেখি উপায়॥
এমন বিপাকে কেবা করিবে নিস্তার। বিষম সঙ্কটে রক্ষা কে করিবে আর॥
গুপ্তবেশে আছে মোর স্বামী পঞ্চজন। আমার এতেক দুঃখ নাহি জানিলেন॥

অগতির গতি কৃষ্ণ জগজনে বলে। সঙ্কটে করেন রক্ষা স্মরণ করিলে॥
কাতর হইয়া যদি ডাকি নারায়ণে। এখনি করিবে রক্ষা পতিত পাবনে॥
যদি মোরে আসি রক্ষা করেন মাধব। সবেজ্ঞাত হবে এথা আছয়ে পাণ্ডব॥
যদি পুনঃ জ্ঞাত হয় অজ্ঞাত সময়। পুনঃ বারবর্ষ তবে বনে যেতে হয়॥
মোর লাগি বড় দুঃখ পাবে স্বামীগণ। সে কারণে আজি না ডাকিব নারায়ণ॥
এতভাবি ভয়াতুরে চারিপানে চেয়ে। আকাশেতে দিনমণী দেখিবারে পেয়ে॥
কাতর হইয়া দেবী কহেন তপণে। এ সময় অভাগির নাহি তোমাবিনে॥
হে দেব কমল আঁখি দেব দিবাকর। দুষ্টের দমনকর্ত্তা সংসার ভিতর॥
অগতির গতি তুমি দুঃখীর জীবন। যে উচিত হয় দেব লইনু স্মরণ॥
পাছে দুষ্ট দুরাচার বল করে মোরে। অবলা স্ত্রীজাতি আমি কি করিব তারে।
তুমি দেব অনুকূল হইয়া আমারে। কোন মতে পার কর বিপদ সাগরে॥
এইরূপে বহুস্তব করিল তপনে। অনর্গল ধারা বহে আরক্ত লোচনে॥
দ্রৌপদির করুণা শুনিয়া দিবাকর। সৌরিন্ধ্রীর সঙ্গে দিল দুইটী নফর॥
অনুচরগণে সূর্য্যবলে ডাকদিয়া। কৃষ্ণা সঙ্গে অলক্ষিতে রবে লুকাইয়া॥
কেহ যেন দেখিতে না পায় তোমা সবে। যদি বল করে দুষ্ট প্রতিফল দিবে॥
এতবলি অনুচর দিলা দিনমণি। অলক্ষিতে চলে তারা রাখিতে কামিনী॥
সূর্য্যকে স্মরিয়া দেবী যান ধীরে ধীরে। ভয়েতে আকুল প্রাণ চলিতে না পারে॥
এখানে সূতের পুত্র পালঙ্কে শুইয়া। এক দৃষ্টে নেহারিছে পথ পানে চাহিয়া॥
ছট্‌ফট্‌ করে সেই মদনের স্বরে। সদাই চঞ্চল চিত্ত কাম সিন্ধুনীরে॥
ভাবে কতক্ষণে আসিবেক বেশকারী। হেনকালে উপনীত দ্রুপদকুমারী॥
দূরে হৈতে সূত পুত্রে দেখিবারে পায়। দরশন মাত্র দুষ্টমতি কত সুখ পায়॥
সমাদর করি ডাকে মধুর বচনে। বলে দুঃখ দূরে গেল তব দরশনে॥
এস ধনী সুবদনী বৈস মোর কাছে। কহিব মনের কথা যত দুঃখ আছে॥
ধন্য ধন্য সুপ্রসন্ন হইল বিধাতা। তুয়া আগমনে মোর সব গেল ব্যথা॥
জীবন যৌবন আজি ভাগ্য করি মানি। বাম দিকে বৈস মোর জুড়াক পরাণী॥
এত বলি কামানলে দুষ্টমতি ভাসে। বাক্য শুনি যাজ্ঞসেনী কাঁপে অতি ত্রাসে॥
অশনি ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মস্তকে। সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হৈল নানি স্বরে মুখে॥
কাতর হইয়া দেবী কহে প্রিয় বাণী। আমারে পাঠায়ে দিল তোমার ভগিনী॥

বড় তৃষ্ণাতুর হইয়াছে ক্রীড়ারসে। সুধা নিতে পাঠাইয়া ছিল তব পাশে॥
আনিয়াছি সুধাপাত্র তাহার কারণ। সুধা দেহ লৈয়া শীঘ্র করিব গমন॥
কীচক বলিল কি কহিলে বিদ্যমান। বচন শুনিয়া চমকিল মোর প্রাণ॥
সুধা লৈয়া অন্যজনে যাক তথাকারে। মরুক বাঁচুক ভগ্নী কি ভয় তাহারে॥
বহুভাগ্যে তোমাকে পেয়েছি রসবতী। নানারসে কৌতুকে বঞ্চিব আজি রাতি॥
এত বলি কামবাণে অজ্ঞান হইয়া। ধরিবারে যায় দুষ্ট বাহু পাসরিয়া॥
কীচকের দুষ্টাচার দেখিয়া পাঞ্চালী। তথা হইতে পলাইল সুধাপাত্র ফেলি॥
পাছু পাছু কীচক চলিল খেদাড়িয়া। চলিল দ্রুপদসুতা বেগেতে ধাইয়া॥
দ্রৌপদী ভাবেন যদি অন্তঃপুরে যাব। সুদেষ্ণার কাছে গেলে রক্ষা নাহি পাব॥
সভামধ্যে যাই যথা বিরাট রাজন। পাত্র মিত্র সহ বৈসে সভাসদগণ॥
অবশ্য তথায় গেলে রক্ষা হবে মোর। এত বলি চলে কৃষ্ণা নেত্রে বহে নীর
কীচক পিছেতে ধায় ধরিবার আশে। ধরিতে না পারে দুষ্ট অতি ক্রোধাবেশে॥
ভয়াতুর হৈয়া কৃষ্ণা সভাতে পশিল। কীচক ধরিয়া কেশে লাথি প্রহারিল॥
সভাতলে কাঁদে দেবী দুঃখিত অন্তরে। অন্তরীক্ষে থাকি দেখি সূর্য্য অনুচরে॥
দুষ্টের চরিত্র হেরি দুই অনুচর। ক্রোধভরে দিল কিচকের স্কন্ধে ভর॥
দোঁহার দারুণ ভরে সূতপুত্র পড়ে। যেমন কদলী পড়ে বৈশাখের ঝড়ে॥
সূর্য্য অনুচর গেল দিয়া প্রতিফল। রাজাদেশে দূত গিয়া কীচকে তুলিল॥
শ্যালকে সম্মান নৃপ কৈল সভাতলে। অনাথিনী প্রায় কৃষ্ণা কান্দিকান্দি বলে॥
হে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়সেন। এ সময়ে কোথাহে গন্ধর্ব্ব পঞ্চজন॥
বীরবীর্য্য আহাদের গেল কোথাকারে। নেত্রে দেখ সূতপুত্র চরণে প্রহারে॥
ওহে মৎস্যরাজ তুমি দেখিলে নয়নে। অবলার অপমান তব বিদ্যমানে॥
বিনা অপরাধে মোরে মারিল বর্ব্বর। দাসীরে মারিতে নারে রাজার গোচর॥
রাজা হৈয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম না কৈলে বিচার। অন্তে যমদূতে তারে করয়ে প্রহার॥
দুষ্ট লোকে রাজা দণ্ড নাহি করে যদি। তবে অন্যস্থানে তারে দণ্ড দেয় বিধি॥
অনাথা দেখিয়া মোরে দুষ্ট দুরাশয়। চুলে ধরি মারিলেক নাহি ধর্ম্মভয়॥
ধর্ম্ম ন্যায়ে রাজা যদি পালে প্রজাগণ। বহুকাল বৈসে সেই ইন্দ্রভুবন॥
সুন্যায় না করে যদি উপরোধে কার। অধমুখ হৈয়া পড়ে নরক দুস্তার॥

(ক্রমশঃ)

ভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের গতি অন্যরূপ হয়। এক স্থানে বসিয়া থাকিতে আর ভাল লাগে না, দেশ পর্য্যটনে যাঁহাদের অভ্যাস তাঁহারা সর্ব্বদাই নূতন নূতন স্থান দেখিতে ব্যস্ত হইয়া থাকেন, আমারও সেইরূপ ফাল্গুণ মাসে ৺ চন্দ্র নাথ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া চৈত্র মাসটী বিশ্রাম করিয়া আবার ভ্রমনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল এবং ছেলেদের স্কুলের গ্রীষ্ম কালের ছুটী হইলেই সন ১৩২৬ সালের ২৩শে বৈশাখ মঙ্গল বার রাত্রিতে স্বপরিবারে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া ৺ সেতুবন্ধ রামেশ্বরের টিকিট খরিদ করিয়া মনের আনন্দে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া ট্রেণে উঠিলাম, গাড়ীখানি সগর্ব্বে সমস্তরাত্রি নানা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে ৭টার সময় বালেশ্বরে পৌছিল। তথায় নামিয়া ৺ক্ষীর চোরা গোপীনাথ দর্শনে যাইবার জন্য ২খানি গোশকট ভাড়া করিয়া যাত্রা করিলাম এবং তথায় পৌছিয়া সাধ্যমত ভগবানের পূজা ও ভোগাদি দিয়া প্রসাদ পাইলাম, ক্ষীর চোরা গোপীনাথ সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব প্রকাশিত অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছি সে জন্য আর এখানে কিছু লিখিলাম না। আমরা তথায় প্রসাদাদি পাইয়া পুনরায় সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বালেশ্বরের ষ্টেশনে পৌছিলাম এবং সৌভাগ্য বশতঃ ষ্টেশনে আমাদের একটী বন্ধুকে পাইলাম। তিনি ঐ ষ্টেশনের এসিষ্ট্যান্ট ষ্টেশন মাষ্টার তিনি আমাদের জন্য একখানি ছোট বগী কম্পার্টমেণ্ট ৮জন বসিবার উপযুক্ত গাড়ী রিজার্ভ করিয়া দিলেন এবং আমাকে উপদেশ দিলেন যে এই লাইনে ছোট এইরূপ কামরা যুক্ত গাড়ী প্রায়ই থাকে আপনারা ৮জন আছেন একটু চেষ্টা করিলে রিজার্ভ করিয়া লইতে পারিবেন। তাহা হইলে আর বহু দূর যাইতে আপনাদের কষ্ট হইবে না, যাহা হউক তাঁহার কৃপায় এবং সদুপদেশে আমরা ঐরূপ উপায়ে ৺ রামেশ্বর পর্য্যন্ত যাইতে একদিনও কষ্ট পাই নাই। আমরা সন্ধ্যার পর গাড়ীতে উঠিয়া পর দিবস প্রত্যুষে খুরদা জংশন ষ্টেশনে পৌছিলাম, এই স্থান হইতে পুরী যাত্রী

গণকে গাড়ী বদল করিতে হয়। আর আমরা এই গাড়ীতে বরাবর মান্দ্রাজ অভিমুখে চলিলাম বেলা প্রায় ৭টার সময় গাড়ী ছাড়িয়া ক্রমে আমরা চিল্কা হ্রদের নিকটবর্ত্তি হইয়া চিত্তার মন মুগ্ধকর সুন্দর ও গভীর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম মধ্যে মধ্যে হ্রদ বক্ষে শ্যামল বৃক্ষরাজি শোভিত কয়েকটী দ্বীপ দেখিলাম। আমাদের ট্রেণ খানি কখন উপকূল দিয়া কখন বা জলের ধার দিয়া চলিতে লাগিল। চিল্কা হ্রদ খুব প্রশস্ত, সমুদ্রের ন্যায় কূল কিনারা নাই জলে ও আকাশে যেন মিলিত হইয়া গিয়াছে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পাহাড় জলের উপর ভাষিতেছে কত রকমের জলচর পক্ষী সকল চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে। এরূপ সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া মন একেবারে আনন্দে বিভোর হইয়া যায়। চক্ষে না দেখিলে ইহা লিখিয়া বর্ণনা করা সাধ্যাতীত।

শুনিলাম যে এই হ্রদটী প্রায় ২২ ক্রোশ লম্বা প্রস্থে কোন কোন স্থানে ৮।১০ ক্রোশ কিন্তু গভীরতা ৪।৫ হাতের বেশী নহে এই হ্রদের কাঁকড়া খুব বড় এবং সুমিষ্ট সেজন্য কলিকাতার অনেক বাবুরা এই হ্রদ দেখিতে রম্ভা ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া এই হ্রদস্থ কাঁকড়া সংগ্রহ করিয়া রসনা পরিতৃপ্ত করেন এখানে মৎস্য জীবীরা চারিদিকে ছোট ছোট নৌকা করিয়া মাছ ধরিতেছে এবং অনেক গুলি ঘুনি পাতা রহিয়াছে দেখিলাম। লোক মুখে শুনিলাম যে হ্রদের চতুর্দ্দিকে বহু সহস্র শিব মন্দির ছিল এখনও কতক কতক বিদ্যমান আছে। এই চিল্কা হ্রদ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা জেলা তাহার পর গঞ্জাম জেলা। আমাদের গাড়ী ক্রমশঃ ভিজিয়ানা গ্রাম নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইল এখানকার রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি দেখিবার যোগ্য। এই ষ্টেশন হইতে কিছু দূর যাইয়া একটী নদী পার হইয়া তবে রাম তীর্থ নামক একটী তীর্থ দর্শন লাভ হইয়া থাকে। প্রবাদ ভগবান রামচন্দ্র বন গমন কালে ঐ স্থানে কতক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা বাহাদুর তথায় একটী উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ সেবা ও অতিথি গণের সেবার বন্দোবস্ত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই তীর্থ স্থানটী ষ্টেশন হইতে ৩ ক্রোশ মাত্র, যাতায়াতের বেশ রাস্তা আছে। আমরা এখান হইতে সন্ধার সময় ওয়ালটিয়ার ষ্টেশনে গিয়া পৌছিলাম। ওয়ালটেয়ার বেঙ্গল নাগপুর রেলের শেষ ষ্টেশন, স্থানটী খুব স্বাস্থ্য জনক এজন্য অনেকেই হাওয়া খাইতে এস্থানে আসিয়া থাকেন।

বিশেষ'ভাশ যোগে এই স্থানের জল বায়ু বিশেষ উপকারী সমুদ্রের ধারে অনেক গুলি ভাড়াটীয়া বাড়ী আছে নূতন লোক লইয়া টার্ণার্শ ছত্রে উপস্থিত হইয়া সেই ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইতে পারেন পরে ২।৩ দিনের মধ্যে বাটী ভাড়া করিয়া লইয়া থাকেন আমরা এই স্থানে অবতরণ পূর্ব্বক গো শকট ভাড়া করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই ছত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে ছত্র বাটী টী অতি সুন্দর ও পরিষ্কার, তবে অনেক যাত্রীতে পরিপূর্ণ। ম্যানেজার বাবু আমাদের বলিলেন যে এই ছত্রের পার্শ্বে যে বাড়ী খানি আছে তাহাতে প্রত্যহ আট আনা হিসাবে ভাড়া দিলে আপনারা একটী ঘর ও একটী রান্না ঘর পাইবেন এবং অন্য কাহার ও সহিত সংস্রব থাকিবে না আমরা তাঁহার উপদেশ মত পার্শ্বের বাটীতে যাইয়া ঐরূপ একটী ঘর ভাড়া লইয়া রন্ধনাদি করিয়া রাত্রি যাপন করিলাম, ছত্র বাটী টীর চারিদিকে সুন্দর বাগান এবং দুইটি জলের কল আছে কিন্তু সন্ধ্যার সময় জল পাওয়া যায় না আমাদের সেজন্য ছত্র মধ্যস্থ ইদারার জলে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল। জানিলাম যে ছত্রের ম্যানেজার মহাশয়ের নিকট যাত্রীগণ ইচ্ছামত বাসন ইত্যাদি লইয়া ব্যবহার করিতে পারেন এবং পরে কার্য্যান্তে ফেরত দিবার ব্যবস্থা আছে এরূপ বন্দোবস্ত অতীব সুন্দর হঠাৎ কোন ব্যক্তি এই স্থানে আসিলে আশ্রয় এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। কোন কষ্ট হইবে না। ছত্র বাটীতে এত ঘর আছে যে যাত্রীগণকে প্রায়ই ঘরের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না তবে আমরা অল্প ভাড়ায় আলাহিদা বাটী পাওয়ায় ছত্রের মধ্যে থাকি নাই নচেৎ যতই ভীড় হউক না কেন ঘরের অভাব হইত না ছত্র বাটীর চারিধারে প্রাচীর বেষ্টিত এবং পুষ্পোদ্যানে পরিশোভিত এবং যানাদি সর্ব্বদাই সেখানে পাওয়া যায়। ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল মাত্র। ছত্রের বাহিরেই কতক গুলি দোকান আছে তথায় যাত্রীগণের আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই প্রায় পাওয়া যায় এবং দর ও কলিকাতা হইতে বেশী নয় বরং সস্তা বলিয়াই বোধ হইল। এখান হইতে সমুদ্র তীর প্রায় এক মাইল পথ তথায় ধনী লোক ও ইংরাজ গণ বাস করেন সমুদ্র তীরের দৃশ্য দেখিয়া নয়ন মন মুগ্ধ হয় সমুদ্র তীরে একটী লাইট হাউস আছে এবং পোর্ট আফিসের উত্তর দিকে পর্ব্বত শৃঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ভজনালয় আছে সহরের প্রান্ত ভাগে দুই পর্ব্বতের মধ্য স্থলে একটী ভ্যালি গার্ডেন নামক সুন্দর উদ্যান আছে, তাহার শোভা সৌন্দর্য্য

দেখিয়া মন প্রাণ মোহিত হইয়া যায়। চারি ধারে নারিকেল বৃক্ষ এবং প্রান্ত ভাগে একটী ঝরণা হইতে জল নিসৃত হইতেছে, অনেকে গ্রীষ্মকালে এখানে স্নান করিতে আসেন। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণ আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের ন্যায় পর্দ্দানসীন নহে তাহারা অবাধে সমুদ্র তীরে এবং ভ্যালি গার্ডেনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। স্ত্রীলোকেরা এ দেশে পুরুষ মানুষের ন্যায় কাছা দিয়া কাপড় পরে কিন্তু পুরুষগণ অনেকেই কাছা দেন না এবং জুতা পায়ে দেন না। ব্রাহ্মনেরা মৎস্য বা মাংস ভক্ষণ করেন না অন্যান্য জাতিরা মৎস্য, মাংস মুরগী প্রচুর পরিমাণে পলাণ্ডু ও লঙ্কা খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। এখানে সকল প্রকার দ্রব্যই প্রায় পাওয়া যায় কেবল সরিশার তৈল মেলে না এবং তেলেগু ভাষা কিছু জানা না থাকিলে বড়ই বিপদে পড়িতে হয় কারণ এ দেশের লোক বাঙ্গালা বা হিন্দী ভাষা কিছু মাত্র জানে না। ভদ্রলোকেরা কতক ইংরাজি জানেন বটে কিন্তু অধিকাংশ লোকই তেলেগু ভাষা ভিন্ন কিছুই জানেন না সেজন্য কতক দ্রব্যাদির নাম ইত্যাদি তেলেগু ভাষায় না জানিলে বড়ই কষ্ট হয়। আমরা তথাকার ইংরাজী শিক্ষিত কয়েকটী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া কতকগুলি তেলেগু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম, পাঠক গণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা লিখিলাম, কারণ ইহাতে যাঁহারা কখন ঐ সব দেশে বেড়াইতে যাইবেন তাঁহাদের অনেক সহায়তা করিবে। তেলেগু ভাষার কাহারও সঙ্গে কোন অংশে মিল নাই যে আন্দাজে ও বোঝা যাইবে। এরূপ ভাষা যে সহজে মনে রাখিবার ও উপায় নাই। দোকানে দ্রব্যাদি খরিদ করিতে বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হয়। বাজারে নানা প্রকার ফল মূল এবং মৎস্য পাওয়া যায় কিন্তু সমুদ্রের মৎস্য এত আঁসিটে গন্ধ যে নূতন লোক তাহা খাইতে পারে না, তবে মধ্যে মধ্যে নিকটবর্ত্তী পুকুরের মাছ ও পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা ভাষা	তেলেগু ভাষা	বাঙ্গালা ভাষা	তেলেগু ভাষা
জল	নিলু	লবণ	উপ্পু
দুগ্ধ	পালু	ঘৃত	নেয়ী
চাউল	বিয়ম	দধি	পেরগু
দাইল	পপ্পু	ঘোল	ছাজা বা মজ্জিকা
মুগ	পেয়াসেরা	চিড়া	আটী কলু

বাঙ্গালা ভাষা	তেলেগু ভাষা	বাঙ্গালা ভাষা	তেলেগু ভাষা
অড়হর	কাঁদি	গুড়	বেল্লম
কলাই	মানাল	তেঁতুল	চিন্তা পণ্ডু
ছোলা	চ্যানাগ	কলা	আর্টি পণ্ডু
তৈল	নুনী	আম্র	মাকৃড়ী পণ্ডু
সরিষার তৈল	আওরা নুনী	কুল	পণ্ডু
নারিকেল তৈল	কবরী নুনী	কাঁটাল	পনস পণ্ডু
ক্যারাসিন তৈল	ক্যাবাছিন নুনী	তাল	তাড্ডি পণ্ডু
আগুন	নেপু	নেবু	নেমু পণ্ডু
হাঁড়ি	কুণ্ডা	নারিকেল	কব্‌রি পণ্ডু
কাঠ	কাররা	চিনি	পঞ্চ ধাব।
ঝাড়ু	ছিপুক	মিছবী	ফটিক পঞ্চ ধার।
সুজী	গোধুমন কলু	ঘোড়ার গাড়ী	ঘোবম বাণ্ডি
ময়দা	গোধুম পিণ্ডি	ডাক ঘর	টপাল
ইক্ষু	শিরুকবা	গাভি	আভু
কাঁচকলা	আন্টিকায়।	বাছুর	দুরা
বেগুণ	অংকারা	ছাড পোকা	নালি ওর্পা
লঙ্কা	মিরার কাইলু	ছাগল	মেরাকা
হলুদ	পসপু	স্ত্রী	পেলম্
সুপারি	চাক্ কলু	স্বামী	মুড়ু বা মাক্‌ডু
পান	তামপাকুলু	সিন্দূর	বট্টু
আলু	বাঙ্গালী দুমপালু	পিতা	আপমা
শাক	কোরা	মাতা	আম্মা
রাঙ্গা আলু	এরা দুম পালু	ভাই	আন্না
মোচা	আন্টিকু	ভগ্নী	আক্কা
থোড়	আন্টি তাবা	ছেলে	আয়ুলে
মৎস্ত	চাপ্পালু	মেয়ে	পুয়লে
মাংস	মাংসমু	দেবতা	দেবরু

বাঙ্গালা ভাষা	তেলেগু ভাষা	বাঙ্গালা ভাষা	তেলেগু ভাষা
কাপড়	পাইটা (বস্ত্র)	প্রদীপ	প্রসিদে
দেশলাই	আগ্নি পুল্লা	বিবাহ	পেল্লি
গোবর	পেড়া	ষাণ্ড	পো
দড়ি	তাড়ু	স্ত্রীলোক	পেন
মুড়ি	নেই এলো	বসা	উকাক
পাতা	আকু	যাওয়া	সাপট
খেজুর	ইতু পন্নু	সিদ্ধ চাউল	উপকু বিয়ম
কলাপাতা	আরাটি আকু	শয়ন	তুঙ্গু
উনান	পৈয়া	দাঁড়ান	নীল
পাখা	আলাটা	এস	যা
খেজুর রস	ইতু পন্নু	আনয়ন	কুস্তা
ধোপা	সাকলি	ঔষধ	মণ্ডু
নাপিত	মঙ্গল বাড়ু	ঘটি	চম্বু
গাড়িওয়ালা	বাণ্ডি বাড়	ঘড়া	একানা
গাড়ি	বাণ্ডি	জালা	ঝিন্দি
সন্ধ্যা	সায়ম	কর্ণ	চেবি
দুপুর বেলা	মধ্যাহ্ন	চুল	ভেণ্টকালু
সীসা বা ধাতু	সীশম্	দক্ষিণ হস্ত	কুড়ি চেইয়া
টিন	তাগরম্	বামহস্ত	গ্যায়া চেইয়া
পায়স	রসম্	পা	কালু
দোকান	আঙ্গেরী	ছত্র বা ধর্ম্মশালা	চোলট্রী, ছত্রম্
ছুচ	সুদি	কত সময়	ইনি ঘণ্টায়
সুতা	দারম্		(তামিল) এক্কিনী মানি
আমি	নেনো	মশা	দোমলু
তুমি	নিভু	পুকুর বা পুষ্করণী	চরু কোনেরু
কুয়া বা ইদারা	নুর্দ্দি	কতদূর	এস্তা দূরম্
গর্দ্দভ	গাড়িদা	কত ভাড়া	এন্তা আদ্দে

বাঙ্গালা ভাষা	তেলেগু ভাষা	বাঙ্গালা ভাষা	তেলেগু ভাষা
স্বর্ণ	বাঙ্গাবা	এখানে থাকিব	মৌয়মু উন্টালু
রৌপ্য	বেমাত	ফুল	পুপুলু
লোহ	ইনমু	টক্	উপুপু
গরুর গাড়ি	এড্ডু বাণ্ডি	মহিষ	দুন্না পড়ু
মহিষ দুগ্ধ	গেদে পালু	জানোয়ার	জন্তুলু
ভেড়া	ঘোডে	পুত্র	মডুকু
জাহাজ	পোডোয়া	দাম কত	এক্কা খরিদা
সাঁতার	ইতা	জুতা	জরু
নৌকা	বোটে	বৃষ্টি	ওভানা
সর্প	বামু	আনারস্	আনাস্
ব্যাঘ্র	কুলি	চড় মারা	থাপ্পা
শৃগাল	বেজ্জ কুলি	কীল মারা	গুদ্দ
পক্ষি	পকসী পিটা	লাটীমারা	থাড়ড়া
কুকুর	কুক্কা	চশমা	বিন্নজরা
অন্ধকার	চিয়া	চক্ষু	কাণ্ণু
সকাল	উদয়ম্	নাসিকা	মুক্কু
কষ্ট	নোপী	মিষ্টি	টিপি
দিন	পাকাহু	তিক্ত	ছেদু
সময় কত	এড়া ভেরা	বাবলা গাছ	তুকাকারা
বাড়ী কোথায়	এক কারা উণ্ডু	পাল্‌কী	সোয়াটি ভোলি
কত মাইল	এক্কা মাইল্লু	আফিং	নালাবন্দু
চাকর	নৌকরু	দুই পয়সা	রেণ্ডু কানি পাকা
মদ	সারা	তিন	মুডু
বিধবা	বিওধা	চারি	নালগু
সধবা	পুনত্রী পোনিষ্টী	পাঁচ	আইডু
গহনা	নগলু	ছয়	আড়ু
প্রবাল	পগাডম্	সাত	এঁড়ু

বাঙ্গালা ভাষা	তেলেগু ভাষা	বাঙ্গালা ভাষা	তেলেগু ভাষা
মুক্তা	মঞ্চি মুক্তিয়ন	আট	আমেদি
ফোয়ারা	এগরট	নয়	তমেদি
রাস্তা	মার্গস্ দারী	দশ	পাদি
কি চাও	এমিং কাবিকা	আনা	ওয়াক আমা
নাম	পেরু	চা	টি আকু
বিড়াল	পিল্লি	পোষ্টকার্ড	উত্তরম্
তরকারি	কুরা	খাম	সাক্কিব্যাগ
কুমড়া	আল্লাক্বায়া	লাঙ্গল	চল্লু
গাড়ী ভাড়াবাবি	বাণ্ডিকরে তোলা	ধান্য	ধানিয়ম ভারি
জলদি যাও	করোম কলু	এলাচ	এলাকি
ভাল নয়	পঞ্চতি কাডু	লবঙ্গ	ভ্রিয়ম মুয়গ
লইব না	নেডু আকোয়া	তৃষ্ণা	দাহম
আছে	উনেদা	ক্ষুধা	থাকনি
পায়খানা	গড্ডি	লালরং	এরং রা
বৃক্ষ	চট্টু	সাদা	ভেল্লা
ঝড়	গালি	কাল	নাল্লা
গাড়ী কখন ছাড়িবে	গাণ্ডি ইনিঘণ্টালু	রং	রঙ্গু
মিলিবে	গরকুতু	সবুজ	আকু পাডা
দরজা খোলা	তলপটি	ধূসর .	পণ্ডলু পচ্চন
বাড়ী কোথায়	ইল্লু একায়া	তালা চাবি	তাড কন্দী
শজনা ডাঁটা	মনাগা	কানা	গুড্ডি
সূর্য্য	সুরীর	কালা	ছেবর
চাঁদ	চন্দ্রুডু	ছুরী	কাত্তি
সাবান	গোপগম্	জাঁতি	কাত্তিধি
বন্দুক	তুপাকি	রাজা	বাছ
চোর	দক্ষা	মন্দির	আলয়ম গুড়ি
কোনজাতি	ইউকোয়াব	অসুখ	জবু

বাঙ্গালা ভাষা	তেলেগু ভাষা	বাঙ্গালা ভাষা	তৈলেঙ্গু ভাষা
মাথা ধরা	ভাগিু	বড ভাই	অন্না কামরা
বমি	কাক্কু	ভ্রাতা	তামরু
সর্দ্দি	রোম্বা	কন্যা	পুতুরু
তিল	মাভলা	ধনী	ভাগ্যম
গান	পাট্টা	গবীব	বীদা
পাই পয়সা	দামডী	পেয়ারা	যামি
আধলা	এগানি	তরমুজ ফুটী	পুর্ব্বকায়া
এক পয়সা	ওকাটি কানি	......	...

ওয়ালটেয়ার হইতে ১০ মাইল পথে সিংহাচলে প্রসিদ্ধ নরসিংহ দেবের মন্দির, ইহাকে প্রহ্লাদ পুরী কহে। ভগবান নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যরাজ হিরণ্য কশিপুকে বধ করিয়া এই নির্জ্জন পাহাড়ের উপর বিশ্রাম করিয়াছিলেন, বলিয়াই জনপ্রবাদ এবং এতদ্দেশীয়গণের ইহা একটী তীর্থ স্থান বলিয়াই পরিগণিত।• ওয়ালটেয়ারের পূর্ব্ববর্ত্তি ষ্টেশন সিংহাচলম্ এই স্থান হইতে শ্রী মন্দির ৩ মাইল মাত্র কিন্তু তথায় শকটাদি কিছুই পাওয়া যায় না সেজন্ত ওয়ালটেয়ার হইতে যাওয়াই সুবিধা জনক আমরা পর দিবস সকালে দুইখানি গো শকট (যাতায়াতের) ভাড়া করিয়া প্রত্যেক খানি ২॥• টাকা হিসাবে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিবার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া মনের সুখে ভগবানের নাম করিতে করিতে সহর ছাড়িয়া ক্রমে পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। এখানকার শকট গুলি একটী ঘোড়াতে বা একটী গরুতে টানিয়া থাকে এবং ঠিক এখানকার টম টম গাড়ীর ন্যায় ছুটীয়া থাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুদীর্ঘ পথ অতিবাহিত করে। দূর হইতে পর্ব্বত শ্রেণী যেন মেঘমালার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল স্বভাবের নয়ন মন মুগ্ধকর শোভা দেখিয়া বড়ই তৃপ্তিবোধ করিলাম এখানে শীত কি গ্রীষ্ম বেশী নাই যেন চির বসন্ত বিরাজ মান রাস্তাটী অতি সুন্দর পাকা রাস্তার মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতের অতি নিকটবর্ত্তি হইয়াছে কোথায় বা পর্ব্বত হইতে বহুদূর আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, যাহা হউক আমরা ২ ঘণ্টার মধ্যেই সীমাচলের তলদেশে উপনীত হইলাম তথায় ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজার কাছারী বাড়ী এবং বহুতর কর্ম্মচারীর বাসস্থান এবং অনেকগুলি

সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা বিদ্যমান থাকিয়া প্রায় সহরের ন্যায়ই বোধ হইতেছে এবং অনেক গুলি দোকান নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য পরিপূর্ণ হইয়া যাত্রি গণের অভাব মোচন করিতেছে এই স্থানেই আমাদের গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে হইল। এবং এই স্থান হইতে পাহাড়ের উঠিবার সোপানাবলী অরম্ভ হইল।

এই পর্ব্বতটী অন্য অন্য পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চে বড় বলিয়াও ইহার নাম সিংহল হইয়াছে—প্রাতঃস্মরণীয়া হোলকারের মহারাণী অহল্যা বাই বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই পর্ব্বতে উঠিবার সুন্দর সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া অক্ষয় কির্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতে প্রায় সমস্ত তীর্থ স্থানেই তাঁহার কৃত কূপ তড়াগ সুন্দর সুন্দর রাস্তা অদ্যাপি তাহার নাম চিরস্মরণীয়া করিয়াছে। এই সীমাচলম্ পর্ব্বত প্রায় ৮০০ ফিট উচ্চ সেজন্য বহুদূর হইতে এরূপ ভাবে সোপান গুলি প্রস্তুত হইয়াছে যে লোকের উঠিতে কষ্ট হয় না তাহা ছাড়া ১০।১২ টী সোপানের পর একটী করিয়া বিশ্রাম চাতলি প্রায় ১০।১২ হাত প্রশস্ত এবং সোপান গুলির সংখ্যা ৯৯৮ টী ও প্রায় আট হাত চওড়া যে ৭।৮ জন লোক একসঙ্গে উঠিতে পারা যায় এই সোপানের পার্শ্ব দিয়া একটি পয়ঃ প্রণালী আছে তাহা দিয়া উপর হইতে ঝরনার জল অনবরত পড়িতেছে যাত্রীগণ অনায়াসে তাহার দ্বারা হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া শ্রম নিবারণ করিতে পারেন। মধ্য পথে এক স্থানে একটী ছাদ শূন্য ঘর আছে তাহার মধ্যে প্রায় বেগে ঝরনার জল নির্গত হইতেছে তাহার কিছু উর্দ্ধে উঠিয়া একটি বৃহৎ তোরণ ঘরে দেখিলাম তাহার নাম হনুমন্ত ঘর এখানে হনুমানজী মহাবীরের মূর্ত্তি আছে এই কটকের পার্শ্ব দিয়া ২ টি ঝরণা নির্গত হইয়াছে একটির নাম আকাশধারা অন্যটি দিচিকা ধারা ইহার আশে পাশে কয়েকটা প্রকোষ্ট এবং তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রস্তর মূর্ত্তি দেখা গেল। এই স্থান হইতে কিঞ্চিত উর্দ্ধে উঠিয়া একটি ফল, ফুলের বাগানের মত দেখিলাম এবং সেটি সমতল ক্ষেত্র অনেক গুলি কুটির দেখিলাম এই স্থানটিকে সীমাচল পল্লি বলে ইহার চারিদিকেই রাস্তা এবং কতকগুলি পাকা বাড়ী আছে। এখানে সোপানাবলী শেষ হইল। যাত্রিগণ বিশ্রামের নিমিত্ত এই সকল স্থানে দুই চারি আনা দিয়া ঘর ভাড়া পাইতে পারেন ইহার উত্তর পশ্চিম কোণে ভগবান নৃসিংহ দেবের প্রকাণ্ড দেবালয় বিরাজিত পর্ব্বতের সোপানাবলির উপর

মধ্যে মধ্যে ভিখারি দীন দুঃখী ও সাধু সন্ন্যাসিগণ বসিয়া আছে যাত্রিগণ ইচ্ছামত পাই পয়সা চাউল ইত্যাদি প্রদান করিতেছে এদেশে আধলা পয়সার প্রচলন নাই কিন্তু পাই প্রচলিত আছে পর্ব্বতের নিম্নভাগে ছোট ছোট ছেলেদের কোলে করিয়া উপায় লইবার জন্য দুই আনা তিন আনা পয়সা দিয়া যাতায়াতের লোক পাওয়া যায় তাহাতে যাত্রিগণের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে আমার সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে থাকায় ঐরূপ লোক সঙ্গে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলাম তাহারা পথ প্রদর্শক ও মোটর কার্য্য উভয়ই সমাধা করিয়াছিল আমরা ক্রমে সমতল ভুমির উপর দিয়া মন্দিরের পশ্চাত ভাগে একটি বাগানের মত স্থানের মধ্য দিয়া যেখানে পর্ব্বতের গাত্র দিয়া গোমুখীর ন্যায় জল ধারা নির্গত হইতেছে তথায় উপনীত হইয়া একটী স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিয়া পরে উক্ত ঝরণার জলে স্নান করিতে প্রস্তুত হইলাম এই ঝরণার ধারাটিকে গঙ্গা ধারা কহে শুনিলাম যে এই গঙ্গাধারার সহিত আরও দুইটি ধারা মিলিত হইয়াছে একটিকে যমুনা অপরটিকে সরস্বতী ধারা কহে যাহা হউক আমরা এই পুণ্যত্রয়া পশ্চিম বাহিনী গঙ্গাধারায় স্নান করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম যে এই সুদীর্ঘ সোপানাবলী অতিক্রম করিতে ও বাড়িতে আসিতে যেরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম তাহা সমস্ত দুরীভূত হইল। এই গঙ্গাধারার জল যেমন স্বচ্ছ সুমিষ্ট ও তেমনি হজমি কারক এরূপ স্থানটিতে বহু যাত্রির ভীড় দেখিলাম এবং অনেক গুলি প্রস্তরের দেব দেবী মূর্ত্তি এবং শিব লিঙ্গ বিরাজমান, নিকটেই একটি উচ্চ ঘরের মধ্যে দেখিলাম যে বহুলোকে মস্তক মুণ্ডন করিতেছে বিধবা স্ত্রী ও পুরুষ গণ সকলেই এখানে প্রয়াগের ন্যায় মাথা মুড়াইয়া থাকে ঘরটির ভিতর এত চুন জমিয়াছে যে শতাধিক বস্তা বোঝাই করিলে শেষ হয় কিনা সন্দেহ। ক্ষেত্র মাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে ভগবান নৃসিংহ দেব এই স্থানে লক্ষ্মীর সহিত বাস করিলে পর গঙ্গা ও যমুনা ও সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়া এখানে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন এই গঙ্গাধারায় স্নান ও তর্পন করিলে সমস্ত পাপ বিদুরিত হয় সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্র তীর্থে শতভার স্বর্ণ দান করিলে যে ফল হয়। গয়া ধামে কার্ত্তিক মাসে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে ফল হয় এখানে একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গঙ্গাধারা ঝরণার জলে

তিন প্রহরে তিনবার স্নান করিলে কুষ্ঠ ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে বলিয়া জনপ্রবাদ। যাহা হউক আমরা স্নান করিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া নৃসিংহ দেবের মন্দিরে গমন করিলাম। মন্দিরের সম্মুখে দধি দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন ফল মূলাদি, পুষ্প মালাদি বিক্রয় হইতেছে এবং এই স্থানেই প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট এক আনা করিয়া মাশুল লইয়া এক এক খানি টিকিট দিতেছে; আমরা এক আনা হিসাবে পয়সা দিয়া টিকিট ক্রয় করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে পূর্ব্ব দিকে এবং সম্মুখেই একটি সুবৃহৎ ধ্বজা স্তম্ভ বা সোণার তাল গাছ। মন্দিরটি গ্রে নাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত, বহু স্তম্ভ যুক্ত বৃহৎ ও বহু পুরাতন মন্দির, গাত্র নানা কারুকার্য্যশোভিত, ভিতরে অন্ধকার ঘৃত প্রদীপালোকে আমরা ক্রমে নৃসিংহ দেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম এবং চন্দনে আবৃত ভগবানকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম, মূর্ত্তি উর্দ্ধে প্রায় চারি হাত, মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কিছুই বোঝা যায় না, মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্তই চন্দনে পরিপূরিত। শুনিলাম যে বৎসরান্তে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন চন্দন অনুলেপন খুলিয়া তাঁহার স্নান হয়, সেই দিন মাত্র তাঁহার আসল মূর্ত্তির দর্শনলাভ হয়। সেই সময় এখানে বহু লোকের সমাগম হয় এবং মহা মেলা বলিয়া থাকে। আমরা অক্ষয় তৃতীয়ার ২।৩ দিন পরে সেখানে গিয়াছিলাম, সে জন্য আসল মূর্ত্তি দর্শন ঘটে নাই, তবে মেলার দোকান পসারি সমস্তই ছিল এবং সাজ সজ্জা ইত্যাদি দেখিতে পাইয়াছিলাম, যাহা হউক আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পাণ্ডার হাতে ষোড়শ উপচারে পূজার উপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদি প্রদান করিলে তিনি আমাদের সমক্ষেই পূজা করিয়া কর্পূর আরত্তি করিলেন এবং আমাদের একটু একটু প্রসাদ দিলেন পরে আমরা ভোগের জন্য কিছু টাকা দিলে আমাদের বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিয়া ভগবানের প্রসাদ পাইয়া যাইতে বলিলেন। আমরাও মন্দির বাহিরে আসিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম এবং চতুর্দ্দিকে নানা দেব দেবী দর্শন করিতে করিতে মন্দিরের দক্ষিণে মণিক্যাক্ষ দেবীর লক্ষ্মী মন্দিরে যাইয়া তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া বড়ই তৃপ্তি বোধ করিলাম, পশ্চিম উত্তর কোণে বামা দেবী ও তারা দেবীর মূর্ত্তি ও ভাষ্যকার রামানুচার্য্যের একটি প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত। (ক্রমশঃ)

ডাঃ শ্রীখগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয়।

ব্রহ্মমীমাংসান্তর্গত চতুঃসূত্রী—দ্বারকা সারদা পীঠাধীশ্বর জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য, শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎস্বামী শান্তানন্দ সরস্বতী—প্রণীত "শঙ্কর হৃদয় বিকাশিনী" নাম্নী ব্যাখ্যা দ্বারা সমুদ্ভাসিত। বোম্বে টাইপে দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত। দুইশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য অনুল্লিখিত। ভাষা ও বিচার প্রণালী অত্যুত্তম। গ্রন্থখানি স্বচ্ছন্দগতি বিশিষ্ট সরল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। মুদ্রাকর প্রমাদের আতিশয্যে গ্রন্থখানি পাঠে বিরক্তিজনক।

বেদান্ত পরিভাষা—উক্ত জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য কৃত "পদার্থ মঞ্জুষা" নাম্নী ব্যাখ্যা দ্বারা সমলঙ্কৃত। ১৪১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ব্যাখ্যা কর্ত্তা খুব সরল ও হৃদয় গ্রাহী ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টাকরিয়াছেন বটে কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব নিবন্ধন তত সরল হয় নাই। এ গ্রন্থখানিও দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত। মুদ্রাশুদ্ধির জন্য অধ্যয়নে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে।

পঞ্চীকরণম্—উক্ত জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য কৃত "অদ্বৈতাগম হৃদয়" আখ্যাযুক্ত সংস্কৃত ও গুর্জ্জর ভাষায় লিখিত টীকা দ্বারা উজ্জলীকৃত। পরিশিষ্টে চম্পক লাল মাণিক লাল শর্ম্মা সংগৃহীত সংস্কৃত পদ্যে লিখিত "সমাধি সাধন" সংযুক্ত। ৮৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূল্য অনুল্লিখিত। ব্যাখ্যা সুষ্ঠু ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ। পরিশিষ্টের কবিতা গুলি মনোরম, হৃদ্য ও পাঠেচ্ছাবর্দ্ধক।

বিবাহ মীমাংসা—উক্ত জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য প্রণীত। ১১৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। দেব নাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থে বিবাহ লক্ষণ প্রমাণ, বিবাহ মীমাংসার আবশ্যকতা, গর্ভাধানাদি সংস্কার, উপনয়নাতি-ক্রম কাল, দ্বিজগণের ব্রাত্যত্বকাল, ব্রহ্মচারি লক্ষণ, স্ত্রীজাতির বেদা-ধ্যয়নাধিকার, হীন বর্ণের বিদ্যা গ্রহণাধিকার, ব্রহ্মচারির কর্ত্তব্যতা, স্নান-কাল, ও বিবাহ নির্ণয় প্রভৃতি বিষয় নানা শাস্ত্র হইতে যুক্তি ও প্রমাণ সাহায্যে বিচার পূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক পণ্ডিত ব্যক্তির ইহা পাঠ করা উচিত। ইহাতেও অপর্য্যাপ্ত মুদ্রাকর প্রমাদ দৃষ্ট হইল। আশাকরি পরবর্ত্তী সংস্করণে ভ্রমগুলি পরিশোধিত হইবে।

আত্মতত্ত্ব বিবেক ও মাতৃসঙ্গীত—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিরচিত। ৪৬ নং বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূল্য ৵০। ইহাতে ৮১টি ছোট বড় গান আছে। ইহাতে হরি, কালী, শিব, দুর্গা, দেহতত্ত্ব ও অধ্যাত্ম বিষয়ক গান আছে। গানগুলি সমস্তই ভক্তি ভাবের উদ্দীপক ও ভজন সাধক।

প্রদোষ সংবাদ—শ্রীআনন্দ মোহন সাহা কর্ত্তৃক প্রণীত। হরিৎবর্ণের প্রচ্ছদ পট, আর্ট পেপারে ছাপা ১৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ৬বৎসর বয়স্ক পুত্র প্রদোষের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন পিতা এই অশ্রুময়ী পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। পুত্রের গুণাবলির কথা স্মরণ করিয়া এই শোকোচ্ছাস গ্রথিত হইয়াছে। গ্রন্থের আদি ও অন্তে বড়াল কবির দুইটি প্রসিদ্ধ কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। মৃতের গুণানুকীর্ত্তনে শোকের লাঘব হইবে ভাবিয়া গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ভগবান তাঁহার শোকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

ভক্তি বিনোদ জীবনী—(সংক্ষিপ্ত)—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত ভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। ইহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত হইয়াছিল। ২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পুস্তকে ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের পবিত্র জীবন কথা ও সাহিত্য জগতে তাঁহার কৃতিত্বের কথা আলোচিত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত ভূষণ মহাশয় এই মহাপুরুষের জীবন কথা প্রকাশিত করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা অতি উপাদেয়, ঘটনাবলি সুবিন্যস্ত ও শ্রেণীবদ্ধ পরন্তু ঐতিহ্য আলোচনায় গুণপণা দেদীপ্যমান। কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি অস্মদ দেশীয় কবিগণ এবং চসার ও পোপ প্রভৃতি ইউরোপীয় কবিগণ পয়ার ছন্দে কবিতা লিখিতেন। বাঙ্গালায় সর্ব্ব প্রথম মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম মহাকবি বায়রণ পুরাতন নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করেন।

আবার শ্রদ্ধেয় ভক্তি বিনোদ ঠাকুর মিত্রাক্ষর ছন্দ রক্ষা করিয়া অমিত্রাক্ষরের তেজস্বিনী ভাষা দ্বারা বঙ্গবাণীকে নূতন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এই ছন্দের কবিতা পাঠকালীন অষ্টম অক্ষরে ও চরণে শেষ বিশ্রাম না করিয়া, স্থানে স্থানে ছেদ সকল বিবেচনা করিয়া পাঠ করিলেই কবিতার ভাব ও

পদ্যের রস উপভোগ করিতে পারিবেন। আমরা একটি কবিতা অধ্যাহার করিতেছি—

> অদূরে হইত দৃষ্ট পল্লির কামিনী
> গণ, কক্ষেতে কলসী, গজেন্দ্র গামিনী
> সবে, সরোবর তটে, লইবারে বারি
> আসিত সকলি মিলি হয়ে সারি সারি।
> দুঃখে সুখে যেইরূপ যায় দিনকর.
> সংসারের কথা সব কহি পরস্পর
> চলিত সভয়ে সদা; দেখিত যখন,
> পর পুরুষের মুখ, লাজে অচেতন
> হয়ে লুকাইত তবে, তরুগণ পাশে
> মেঘেতে তড়িত যেন লুকায় আকাশে।"

বঙ্গদেশে এখন অনেক হটাৎ কবি গজাইয়া উঠিয়াছে। অনেকেই যেন ভূই ফোঁড় বা স্বয়ম্ভু। অনেকেই ছন্দ জিনিসটা যে কি তাহা জানেন না বা মানেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা সকলেই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়াই মহাকবি। অথবা পূর্ব্ব জন্মে মহাকবি ছিলেন, সেই জন্মান্তরীন সংস্কার লইয়াই এইজন্মে মহাকবি হইয়াছেন। এই সকল মহাকবি দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা যায়, তাঁহারা যেন ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের রচিত ছন্দ অনুধ্যান করেন এবং তদনুযায়ী কবিতা রচনা করিবার প্রয়াস করেন তাহা হইলে তাঁহাদের সাধনা সিদ্ধি লাভ করিলেও করিতে পারে।

Thakur Bhakti-Vinode—By Pandit Satkari Siddhanta Bhushan. Price Rupee one only, page 60.

সিদ্ধান্ত ভূষণ মহাশয় অতি চমৎকার ইংরাজী ভাষায় এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের ইংরাজি কবিতা রচনাতেও অসামান্য অধিকার ছিল। সামান্য একটু নমুনা প্রদান করিতেছি।

> "The shining bottles charm their eyes
> And draw their heart's embrace!
> The slaves of wine can never rise
> From what we call disgrace!"

শ্রীতত্ত্বসূত্র—শ্রীভক্তি বিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত ও ব্যাখ্যাত। ২য় সংস্করণ মূল্য ।৹ আট আনা মাত্র। ১৩৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ প্রচ্ছদ পট অতি সুন্দর। ইহাতে ৫০টি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সূত্র আছে। সূত্রগুলি বাস্তবিকই স্বল্পাক্ষর, অসন্দিগ্ধ, সারবৎ ও বিশ্বতোমুখ। ইহার ভাষ্যও সংস্কৃতে লিখিত, উহা অতিশয় হৃদ্য ও সুগম। তৎপরে বাঙ্গালা ভাষায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা। ঐ ব্যাখ্যা শাস্ত্রীয় প্রমাণ যুক্ত ও প্রাঞ্জলাদি গুণোপেতঃ।

প্রাচীন নদীয়ার অবস্থিতি মীমাংসা—শ্রীযুক্ত জগদীশ দাসাধিকারী বি, এ, এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য অনুল্লিখিত। এই গ্রন্থে স্বমত সংস্থাপিত ও দৃঢ় করিবার জন্য শ্রীবিষ্ণু প্রিয়া পত্রিকা ও সজ্জন তোষিনী পত্রিকা প্রভৃতি হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সাতকড়ি সিদ্ধান্ত ভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদা কণ্ঠ পদরত্ন, শ্রীযুক্ত রাজীব লোচন দাস, শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি বি, এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় কালীময় ঘটক শ্রীযুক্ত রাধিকা নাথ শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, স্বর্গীয় শিশির কুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত হরিদাস অধিকারী, প্রভৃতি মহাশয় গণের প্রবন্ধ সকল পুনঃ মুদ্রিত করিয়াছেন। এবং ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কৃত সন্দর্ভাদি হইতেই বহু প্রমাণ অধ্যাহার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজ মোহন দাস শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম ভিটা যোগপীঠ রামচন্দ্র পুরে অবস্থিত প্রমান করিবার জন্য "নবদ্বীপ দর্পণ" নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থ ঐ গ্রন্থের প্রতিবাদার্থ রচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের ঐতিহাসিক গবেষণায় ও ভৌগলিক তত্ত্ব নিরূপণে ভ্রম হইতে পারে, তাঁহার গ্রন্থখানি হয়তো অসার কল্পনা প্রসূত কিন্তু তাঁহাকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করা ও গালাগালি দেওয়া উচিৎ নহে। মতান্তর মনান্তরে পরিণত না হওয়াই উচিৎ। শ্রীযুক্ত ব্রজ মোহন দাসকে নিম্ন লিখিত প্রকারে অভিহিত করা হইয়াছে। যথা—

"বাঁদরের হাতে খোন্তা দিলে যেরূপ অপব্যবহার করা হয়"

"শুঁড়ির সাক্ষী প্রায় মাতাল গণই হইয়া থাকেন"

"তাঁহার (গৌরাঙ্গের) নাড়ী পোতা স্থান বাহির করিব বলিয়া লম্ফ

ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠারূপ শ্বপচ নীরমকে বুকে নাচাইয়া তিতু মিয়ার গুলি খা ভালার ন্যায়”

এইরূপ গালাগালি গ্রন্থের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই আছে। কৃষ্ণ নগরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় তারাপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ঔরসে ও তাঁহার বিধবা ভাতৃজায়ার গর্ভে জাত শ্রীযুক্তা নবনলিনী দেবীর চরিত্র সম্বন্ধেও শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস মহাশয়ের চরিত্র সম্বন্ধে প্রকারান্তরে অসৎ ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আমরা সুপণ্ডিত গ্রন্থকার দ্বয়কে জিজ্ঞাসা করি ঐতিহাসিক গ্রন্থে এরূপ ব্যক্তিগত আক্রমণ কি সঙ্গত না বৈষ্ণবোচিত? কোন ভদ্র পরিবারের অশ্রদ্ধাকর কাহিনী প্রচার করা অথবা বিরুদ্ধবাদীর চরিত্রগত কলঙ্ক বার্ত্তা প্রকাশ করা সত্য হইলেও অনুচিত ও বর্ত্তমান রুচি বিগর্হিত। আশা করি আগামী সংস্করণে এসকল বর্জ্জিত হইবে।

Behula—(in English Verse) By Charu Chandra Palit. Published by the Author, 7 Kirthi Mitter's Lane, Calcutta. page 47 only, Cloth binding, printed in Art paper.

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের রচিত বেহুলা অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি রচিত। ইংরাজী পদ্য রচনায় গ্রন্থকারের অসাধারণ অধিকার। গল্পাংশের বর্ণনায়, উপমায় সংযোজনায়, ভাব মাধুর্য্যে ও শব্দ প্রাচুর্য্যে গ্রন্থকারের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। আশা করি গ্রন্থকার প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের অমূল্য রত্নগুলিকে ভাষান্তরিত করিয়া ইংরাজী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবেন।

The Devalaya its aims and objects.—By Pandit Sita Nath Tattwabhushun. Price 16 annas. Third edition, page 70, Cloth binding, published by Satindra Nath Ray Chaudhuri 210/3/2, Cornwallis Street Calcutta.

আপনারা অনেকেই বোধ হয় দেবালয় সমিতির নাম শ্রবণ করিয়াছেন। ঐ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা “ব্রহ্মর্ষি” উপাধি ধারী সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশি পদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণ কথা পরিপূর্ণ জীবনী ও তাঁহার দ্বারা কিরূপে এই দেবালয়ের এতাদৃশ উন্নতি হইয়াছে তাহার বিবরণ এবং দেবালয়ের উদ্দেশ্য

অভিপ্রায় ও নিয়মাবলী ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থখানি ইংরাজী গদ্যে লিখিত, ভাষা পণ্ডিত জনোচিত।

পল্লীস্বাস্থ্য—রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু আই, এস, ও, এম্, বি, এফ্, সি, এস্, রসায়নাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত।

প্রকাশক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃ প্রকাশ বসু এম্, বি, ২৫নং মহেন্দ্র বসুর লেন কলিকাতা। ১৩১পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য চারি আনা মাত্র।

এই গ্রন্থে খাদ্য, বায়ু, পাণীয় জল, বাসগৃহ, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা, প্লেগ, যক্ষ্মা, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি বিষয় গভীর গবেষণা, ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞান ও অপূর্ব্ব মনীষার সহিত আলোচিত হইয়াছে। পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা অতি প্রাণস্পর্শী ও করুণ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পাঠে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। পল্লীস্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য ও পল্লীর অন্যান্য উন্নতি সম্বন্ধে কয়েকটী উপায় নির্দ্দেশ যাহা করিয়াছেন তাহা বিশেষ মূল্যবান ও সারবান। প্রত্যেক স্বদেশ প্রেমিকের ইহা প্রণিধান যোগ্য।

যদি দেশবাসী অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে চাহেন, যদি কলেরার করালকবল হইতে ত্রাণ পাইতে চাহেন, যদি ম্যালেরিয়ার মরণ মঙ্গলের গীত আর শুনিতে না চাহেন, যদি প্লেগে পরলোক প্রয়ানের দৃশ্য আর দেখিতে না চাহেন, যদি যক্ষ্মা হইতে লক্ষ লক্ষ বক্ষকে রক্ষা করিতে চাহেন, যদি বসন্ত না হইয়া সুকান্ত থাকিতে চাহেন তবে এই গ্রন্থ পাঠ করুন। যদি দরিদ্র পল্লীবাসীকে দারুণ তৃষ্ণায়, দারুণ গ্রীষ্মে সুপেয় পাণীয় দিতে চান, যদি বিশুদ্ধ মলয় পবন হিল্লোলে পল্লীকে পবিত্র করিতে চান, যদি সুখাদ্য আহারে দেহকে সুপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করিতে চান, যদি বনময় বাস ভবনকে নন্দন কাননে পরিণত করিতে চান, যদি শ্মশানকে আনন্দ নৃত্য কোলাহলময় দেখিতে চান, যদি দেশের ও দশের সেবা করিতে চান, যদি দেশকে জাগরিত করিতে চান, যদি দেশকে শৌর্য্য বীর্য্যশালী দেখিতে চান, যদি ধন ধান্যে পুষ্পেভরা বসুন্ধরা দেখিতে চান, তবে এই গ্রন্থ নিজে পাঠ করুন, পরিবারের সকলকে পাঠ করিতে দিন, বালক বালিকাদিগকে ও নিরক্ষর লোকদিগকে পাঠ করিয়া শ্রবণ করান এবং দরিদ্রদিগকে ইহা বিনামূল্যে বিতরণ করুন। এই গ্রন্থের

কতকাংশ গ্রন্থকার কর্তৃক সাহিত্য সভায় আলোক চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। সে দিন সুসঙ্গের ভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় মহারাজা কুমুদ চন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বি, এ, বাহাদুর সভাপতি ছিলেন, তিনি ঐ প্রবন্ধের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন এবং ইহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর ঐ প্রবন্ধ পরিবর্দ্ধিত করিয়া এই পুস্তক রচনা করিয়া, কেবল মাত্র মুদ্রনের ব্যয় চারি আনা পয়সা লইয়া এই গ্রন্থ বিতরণ করিতেছেন।

রায় বাহাদুর দেশের সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের সহিত সংসৃষ্ট ও সংলিপ্ত। তিনি দেশের কাজে নিজের বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া থাকেন। তিনি জ্ঞানে গরীয়ান, কর্ম্মে বলীয়ান, ভাবে ববীয়ান, ঔদার্য্যে মহীয়ান। তাঁহার পুস্তক প্রত্যেক পাঠাগারে রক্ষিত হউক, প্রত্যেক পল্লীর পাঠশালায় অবশ্য পাঠ্য হউক, প্রত্যেক জমীদার বহু বহু খণ্ড পুস্তক ক্রয় করিয়া তাঁহাদের প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করুন তাহা হইলে আবার সুদিন ফিরিয়া আসিবে, আবার শ্রীবঙ্গ ভূমি সৌন্দর্য্য শ্রীতে মণ্ডিত হইবে। ঐ কুজ্ঝটিকা অন্ধকার ভেদ করিয়া আশার অরুণ আলোক দেখা যাইতেছে, ঐ জ্ঞান সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মি ছটায় সুবর্ণ রাগরঞ্জিত আমার সাধের পল্লী ভূমিকে দেখিতে পাইতেছি, ওঠো জাগো, দেখ ঐ অদূর ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দৃশ্য দেখিয়া নয়ন ও মনকে পরিতৃপ্ত কর।

Some Common Food Stuffs.—By Rai Bahadur Dr. Chuni Lall Bose I. S. O., M. B, F. C. S. Rashyanacharyya. (Reprinted form Proceedings Science convenion). page 25.

ইহাতে খাদ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক উল্লেখ যোগ্য খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্য কি পরিমানে আছে তাহা রাসায়ণিক বিশ্লেষণ করিয়া ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটী দ্রব্যের গুণ বিচার উদ্ধৃত করিয়াদিলাম।

মাংস বর্গ।

দ্রব্যের নাম	পলিয় ভাগ	চর্ব্বি ভাগ	লবন ভাগ	জলীয় ভাগ
গোমাংস	২০.০	১.৫	১.৩	৭৬.৫
মেষ মাংস	১৮.০	৫.৭	১.৬	৭৫.০

ছাগ মাংস	২৪'০৬	২'৫	১'২	৭২'০
মুর্গী মাংস	২৩'৩০	৩'১	১'০	৭০'০
হংস মা স	২২'০	৩'০	১'০	৭০'৮

মৎস্য বর্গ।

দ্রব্যের নাম	পণির ভাগ	তৈল ভাগ	লবণ ভাগ	জলীয় ভাগ
রুই মৎস্য	১৭'৫০	৭'৪০	১'০৫	৭৪'০
মাগুর মৎস্য	১৯ ৪৯	০'৫০	১'৩০	৭৮'৮৫
কই মৎস্য	১৬'৪৩	১ ৪০	১'২২	৭৮'৯৮
তপসি,মাছ	২০'১৯	১'২৬	১'১৫	৭৯'২১
টেঙ্গরা মাছ	১৭'২৮	০'৩০	...	৭৭ ৭০
সোল মাছ	১১'৯৪	০'২৫	...	৮৬'১৪

দ্বিদল বর্গ।

দ্রব্যের নাম	পণির ভাগ	তৈল ভাগ	লবণ ভাগ	শ্বেতসার ভাগ	তোয়ভাগ
মুগের ডাল	২৩'৮০	২'০	৯'০	৫৪'৮০	১১'৪০
মুসুর ডাল	২৫'১০	১'৩	৩'৪	৫৮'৪০	১১'৮০
অড়হর ডাল	১৭'১০	২'৬	১১'৩	৫৫'৭০	১৩'৩০
খেসারী ডাল	৩১'৯০	০'৯	৩'২	৫৩'৯০	১০'৭০
মাসকলাই	২২'৭০	২'২	৯'২	৫১ ৮০	১০'১০
ছোলার ডাল	২[illegible]'৬৬	৪'৩	২'৪	৬০ ০২	৯'৫৮
মটর ডাল	২২'০	২'০	২'৪	৫৩'০	১৫'০

দুগ্ধবর্গ।

দ্রব্যের নাম	পণির ভাগ	মাখন ভাগ	শ্বেতসার ভাগ	লবণ ভাগ	তোয়ভাগ
মানবী দুগ্ধ	২'৯৭	২'৯০	৫'৮৭	০'১৬	৮৮'০
গো দুগ্ধ	৪'০	৪'৫০	৪'৪০	০'৭০	[illegible]

মাহিষ দুগ্ধ	৪·৫২	৮·২০	৪·৬০	০·৮৮	৮২·৮০
ছাগী দুগ্ধ	৩·৬২	৪·২০	৪·০	০·৫৬	৮৭·৮৪
গৰ্দ্দভী দুগ্ধ	১·৭৯	১·০২	৫·৫০	০·৪২	৯১·১৭
দধি	৪·৭৭	৩·৫	...	...	—
ছানা	২২·৬২	১৮·৬৪	০·৮৮	১·৬২	৫৭·০২
সন্দেশ	১৮·১৭	১৯·৭৫	৪৭·১৮	১·৬৫	২০·২৫

গ্রন্থখানি এত তথ্য পূর্ণ ও প্রয়োজনীয় যে সমগ্র গ্রন্থখানি অনুবাদ করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সাহিত্য-সংহিতার স্থানাভাব প্রযুক্ত তাহা দিতে পারিলাম না। জ্ঞানপিপাসু পাঠকবর্গ মূলগ্রন্থখানি পাঠ করিলেই সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

The Science Association and its Founder. By Rai Bahadur Dr. Chuni Lall Bose, I. S. O., M. B., F. C. S. Rashayanacharyya. (Read at the Chemical Section of the Science convention 1918.) page 16.

ইহাতে স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার সি, আই, ই, এম্, ডি; ডি; এল্ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কর্ম্মকথা আলোচিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রূপে তিনি Science Association এর অভ্যুদয় ও অভ্যুন্নতির জন্য কিরূপ কায় মনো বাক্যে চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই কর্ম্ম বীরের আদর্শে যদি বর্ত্তমান যুবক সম্প্রদায় নিজ নিজ জীবন গঠিত করেন তাহা হইলে গ্রন্থকারের পরিশ্রম সফল হইবে।

ইন্দুমতী (কাব্য) শ্রীযুক্ত রসিক চন্দ্র রায় সাহিত্যার্ণব কাব্যতীর্থ মহাশয় কর্তৃক প্রণীত। নবম সর্গে ও ১১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। গ্রন্থের ভূমিকা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত।

ভূমিকার একস্থলে গুপ্ত মহাশয় লিখিতেছেন—"ইন্দুমতি কাব্য মহর্ষি বাল্মিকী বিরচিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্য ইতিহাস রামায়নের এক করুণ চিত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য বিভীষণাত্মজ তরণী সংহারের ঘটনাবলম্বনে এই কাব্য বিরচিত হইয়াছে। কাব্যের নাম তরণী পত্নীর কল্পিত নামানুযায়ী প্রদত্ত

হইয়াছে।" এক্ষনে সবিনয়ে ও কৃতাঞ্জলিপুটে ঐতিহাসিক গুপ্ত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি বাল্মিকী বিরচিত সংস্কৃত রামায়ণ অথবা উহার বাঙ্গালা অনুবাদ কখনও পাঠ করিয়াছেন কি? কোন্ বাল্মিকী বিরচিত রামায়ণে তরণী সেনের বধের কথা অথবা তরণী সেনের নাম উল্লিখিত আছে? আমরা কেবল বাল্মীকীর রামায়ন কেন, প্রচলিত কোন পুরাণে তবণী সেনের অস্তিত্ব সন্ধান করিয়া পাই না। উহা কৃত্তিবাসের কল্পনা প্রসূত, বাল্মীকীর নহে। গুপ্ত মহাশয় কেবল কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করিয়াই বাল্মীকীব রামায়ণ পাঠের গর্ব্ব রাখেন। এইরূপ অনুসন্ধিৎসা লইয়াই তাঁহার ইতিহাস লিখিবার ধৃষ্টতা ও অহঙ্কার!! কোন্ বাল্মীকীর বামায়ণে এই তরণী সংহার পাঠ করিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক গুপ্ত মহাশয় গুপ্ত না রাখিয়া ব্যক্ত করিবেন কি?

মূল গ্রন্থখানির ভাবও ভাষা উত্তম। ছন্দ ও লালিত্যময়। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কাবে গ্রন্থখানি সমৃদ্ধশালী। ইহা বর্ত্তমান যুগেব শ্রেষ্ঠ কাব্য গুলির মধ্যে অন্যতম।

গন্ধর্ব্ব নন্দিনী কাব্য (প্রথম ভাগ)—শ্রীযুক্ত রসিক চন্দ্র রায় সাহিত্যার্ণব কবিরত্ন, কাব্যতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত। দ্বাদশ সর্গে ও ১২৬পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। ইহা মহাকবি বাণভট্টের কাদম্বরীর পদ্যানুবাদ। গ্রন্থকার রুচি বিকার গ্রস্ত হইয়া অশ্লীলাংশ বোধে স্থানে স্থানে অনুবাদ করেন নাই। আমাদের বোধ হয় ঐ সকল অংশ তত অশ্লীল নহে, উহা অনুবাদ না করায় বর্ণনার সৌন্দর্য্য অনেক নষ্ট হইয়াছে।

প্রাচীন যুগে অনেক শব্দ অশ্লীল বলিয়া বিবেচিত হইত না কিন্তু বর্ত্তমানে অনেকে সেই সকল শব্দ অশ্লীল বলিয়া বিবেচনা করেন। এমন কি অনেকে রমণী, কামিনী প্রভৃতি শব্দ অশ্লীল মনে করেন। কাদম্বরী শিশু পাঠ্য গ্রন্থ নয়, উহাতে কিঞ্চিৎ আদি রস থাকিলেও তত দোষাবহ হয় না। বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যে রামায়ণের পরিবর্ত্তে কেবল কামায়ন রচিত হইতেছে। ঐ সকল পুস্তকের ভাষা বর্ত্তমান রুচি বাগীশদিগের মতে নির্দ্দোষ কিন্তু আমরা ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিতে পাই উহাতে কেবল কামের ক্ষুধা, কেবল আসঙ্গ লিপ্সা, কুমারীর পরপুরুষে আসক্তি, সধবার পরপুরুষে লোভ, বিধবার পরপুরুষে আকাঙ্ক্ষা। আবার এই সকল রুচিবাগীশ ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত

হইবা মাত্র আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়া মাতা, ভগ্নি ও কন্যাকে পাঠ করিতে দেন। তাঁহাদের মতে ইহা art এর চরম বিকাশ, ইহাই বাস্তববাদ। আবার কেহ কেহ ঐ সকল অসৎ গ্রন্থের লেখককে প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে "বঙ্কিম চন্দ্রের শূন্য সিংহাসনের অবিসংবাদী অধিকারী—" বলিয়া ঘোষণা করিতে দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করেন না। বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যের ঢাকাই মস্‌লিন রূপ ভাষার দ্বারা বস্ত্রাবৃতা কামলালসা ময়ী কাব্য সুন্দরীর নগ্ন সৌন্দর্য্য অপেক্ষা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের চারু চটুল রচনা, হাব-ভাব ভাষাময়ী সদ্য সুরভি গন্ধ স্নাতা, নূপুর নিক্কণা, রত্নালঙ্কৃতা, বীণা ঝঙ্কৃতা, চকিত নয়না, ললিত-লাস্য-গমনা, হেম-চারু-চন্দ্র বদনা, প্রকাশ্য আদি রসাত্মিকা কাব্য সুন্দরীর স্বভাব-দৃশ্য অনেক উৎকৃষ্ট—! সংস্কৃত সাহিত্যের আদি রস স্বীয় সৌন্দর্য্যে লোককে আকৃষ্ট, পুলকিত, মুগ্ধ ও স্বপ্নাবিষ্ট করে বটে কিন্তু কাহাকেও প্রেমে ভ্রান্ত করিয়া অগম্যা গমনে উৎসাহিত করেনা। বিশেষতঃ কাদম্বরী প্রাচীন গ্রন্থ, ইহার অনুবাদে কোন অংশ বাদ দেওয়া উচিত নহে। এই অসৎ সাহিত্যের প্রচারের দিনে এমন এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সম্পদ অসাধারণ, অলঙ্কার শাস্ত্রে ও যথেষ্ট অধিকার। অনুবাদ প্রায় সর্ব্ব স্থলেই যথাযথ ও মূলানুগত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্র প্রকাশিত হইতে দেখিলে আমরা অধিক তর সুখী হইব।

হরিদাস—(নাটক) শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন পাইন কর্ত্তৃক প্রণীত। ১২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। নগদ মূল্য এক টাকা। গ্রন্থকারের প্রপিতামহ একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি ছিলেন। তাঁহার নাম, স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর পাইন, তিনি "জগন্নাথ মঙ্গল" "সঙ্গীত মাধব" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া ছিলেন। গ্রন্থকারের পিতা পিতামহ প্রভৃতি ও কবি অতএব কবি বংশে জন্ম গ্রহণ হেতু গ্রন্থকারের স্বভাব কবি হওয়াই স্বাভাবিক। বর্ত্তমানে তাঁহার কাব্য প্রতিভা রূপ কমল যেন আধ-মুকুলিত, আধ প্রস্ফুটিত ও পরকীয়া রসোত্থিত। গ্রন্থকার জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, চৈতন্য লীলা, নসীরাম ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিয়া তদ্‌ভাব ভাবিত, তদ্গত, তচ্চিত্ত ও তদ্রসাপ্লুত হইয়া এই গ্রন্থ খানি লিখিয়াছেন তজ্জন্য এই গ্রন্থখানি অপূর্ব্ব ধর্ম্মমূলক পরকীয়

নাটক রূপে গ্রথিত হইয়া ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। মাত্র দুই রজনী হাস্য-কল-কোলাহলের সহিত অভিনীত হইবার পর সহসা উক্ত রঙ্গালয়ের সত্বাধিকারী ও পরিচালক পরিবর্ত্তন হওয়ায় উক্ত নাটক আর লোক লোচনের গোচর হয় নাই। সংস্কৃত, ইংরাজী, ও বাঙ্গালা ছন্দ শাস্ত্রে যে সকল ছন্দের উল্লেখ নাই এমন কতকগুলি নূতন ছন্দ ইনি রচনা করিয়াছেন ইহা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় সন্দেহ নাই, তবে লাইনগুলি ইঞ্চি ধরিয়া মাপিয়া সমান করিয়া দিলে ভাল হইত। গ্রন্থখানি ভক্তি মূলক কারণ ইহা পরম ভক্ত হরিদাসের করুণ কাহিনী, সে হিসাবে ইহা পরম পবিত্র ও পাঠ্য, ইহা পাঠে ভক্তিরসে আপ্লুত ও রোমাঞ্চিত হইতে হয়। গ্রন্থকার স্বয়ং সুদক্ষ অভিনেতা তাঁহার রচিত নাটক অভিনয় হিসাবে যে উপযোগী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। গ্রন্থকারের রচনা প্রাণময় ও স্বচ্ছন্দ গতি বিশিষ্ট। আশা করি তাঁহার রচনা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিশালী হইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে তিনি একজন উৎকৃষ্ট সুলেখক ও অসাধারণ কবিরূপে প্রতিপন্ন হইবেন।

শ্রীগিরিজা প্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, বিদ্যাবিনোদ,
আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকর, দর্শননিধি।

—*—

"বড় লোক কে?"

বড় লোক নাহি হয়, যদি থাকে ধন,
বড় লোক নাহি হয়, লম্বায় গঠন।
রাজ্যের ঈশ্বর নাহি হয় বড় লোক,
না করে মোচন যদি সে প্রজার শোক।
বড় লোক নাহি হয় পড়িলে পুস্তক,
বড় লোক নাহি হয় হ'লে বিচারক,
বিচারাসনে বসি, যে করে সুবিচার,
তবে ত কহিবে বড় তাঁরে সবাকার।
বড় লোক কারে কহে দেখহ এক্ষণ,
হ'তে চাও বড় লোক যদ্যপি কখন।
ক্ষমা, দয়া, ধৃতি, সত্য, অলোভ ও দান,
পরোপকার যাঁহার মনে অধিষ্ঠান,
সর্ব্বদা করেন যিনি সাধু ব্যবহার,
তিনি হন বড় লোক স্থির কর সার।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী।

সাহিত্যসভার কার্য্যবিবরণী।

সাহিত্য সভার একবিংশ বার্ষিক অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

৩০ শে মাঘ, ১৩২৭ সাল। ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯২১ খৃঃ।

শনিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা।

১। উপস্থিত সভ্যগণের নামঃ—

১। কবিবর শ্রীযুক্ত রসময় লাহা, ২। কবিরাজ অমৃত লাল চট্টোপাধ্যায়, ৩। যতীন্দ্র নাথ দত্ত, ৪। রায় ডাঃ চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, আই, এস, ও; এফ, সি, এস, রসায়নাচার্য্য, ৫। শ্যামলাল গোস্বামী, ৬। অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু এম, এ, ৭। কবিরাজ গিরিজা প্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ ইত্যাদি, ৮। নগেন্দ্র নাথ নাগ, ৯। কবিরাজ কেদার নাথ কাব্যতীর্থ, ১০। কবিরাজ শ্যামা প্রসন্ন সেন শাস্ত্রী, কবিরত্ন, ১১। জ্ঞানেন্দ্র লাল সিংহ, ১২। অধ্যাপক অমরেশ্বর নাথ ঠাকুর এম, এ, ১৩। কুমার প্রকাশ কৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ, ১৪। কালীপদ তর্কতীর্থ তর্কাচার্য্য, ১৫। আশু তোষ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ, ১৬। গোবিন্দ লাল মল্লিক, ১৭। প্রবোধ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজা প্রসন্ন সেন মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু এম, এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু এম, বি, আই, এস, ও, এফ, সি, এস; রসায়নাচার্য্য, মহাশয় উত্তর পাড়ার জমীদার রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে এবং হিন্দু স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক অভয় চরণ পাল মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের গুণের কথা আলোচনা করেন।

৪। অতঃপর সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাব দুইটী গৃহিত হইল।

(ক) "সাহিত্য সভার অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে সাহিত্য সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বহুকাল হইতে সাহিত্য সভার সভ্য ছিলেন এবং এক সময়ে সহকারী সভাপতির পদগ্রহণ করিয়া সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় "হাওড়া ডিউক্ লাইব্রেরীর" ও উত্তর পাড়া জলের কলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং বহু সদনুষ্ঠানের উৎসাহ দাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহু গ্রন্থকার তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্য পাইতেন। তিনি সাহিত্য সভার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এরূপ একজন মহানুভব দেশ হিতৈষী ব্যক্তি ও অকৃত্রিম বন্ধুর মৃত্যুতে সাহিত্য-সভা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।

এই প্রস্তাবের একখণ্ড প্রতিলিপি তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিজন বর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

(খ) "সাহিত্যসভার অন্যতম সভ্য অভয় চরণ পাল বি, এ, বি, এল মহাশয়ের মৃত্যুতে সাহিত্য সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। ইনি সাহিত্য সভার স্থাপনাবধি সভার সভ্য ছিলেন। অভয় বাবু হিন্দু স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক পদে বহুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি স্কুল পাঠ্য কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ণ ও সংকলন করিয়াছিলেন। ইনি "B Banerjee"নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ের সত্বাধিকারী ছিলেন।

অভয় বাবু নিজগুণ, শক্তি ও কর্ম্মনৈপুণ্যে ধনমান ও যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে সাহিত্য সভা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

এই প্রস্তাবের একখানি প্রতিলিপি তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

(গ) সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উভয় পরলোকগত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া উপরোক্ত দুইটী শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

(৫) অতঃপর গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

(৬) নিম্নলিখিত গ্রন্থোপহার দাতা মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

	গ্রন্থের নাম।	উপহার দাতার নাম।
১।	Glorious Exploits of the Air.	KAVIRAJ Girija Prasanna Sen.

(৭) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর নাথ ঠাকুর এম, এ, মহাশয় "প্রাচীন ভারতে সাক্ষ্যবিধি" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(৮) সমালোচনা প্রসঙ্গে :—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয় বলেন, প্রাচীন ভারতের নীতিতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব, ব্যবহারতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা করিলে আমরা আমাদের বহুদর্শী শাস্ত্রকারগণের প্রবর্ত্তিত সাক্ষ্য বিষয়ে সুন্দর ব্যবস্থা দেখিতে পাই।

সুপণ্ডিত অধ্যাপক মহাশয় আজ যে জ্ঞানগর্ভ সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহাকে আন্তরিক ধন্তবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রবন্ধ মধ্যে যে "সদৃশ" শব্দের উল্লেখ আছে উহার অর্থ আমার বোধ হয় "স্বজাতীয়" নহে।

"সদৃশ" শব্দের অর্থ "এক ব্যবসায়ীই" ঠিক, কারণ সম ব্যবসায়ী সাক্ষ্য প্রদান করিলে সত্য তথ্য নিষ্কাষিত হওয়ার অধিক সম্ভব।

(৯) রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু এম, বি, আই, এস, ও, এফ, সি, এস, রসায়নাচার্য্য মহাশয় বলেন—বর্ত্তমান সময়ে স্বচক্ষে দেখিয়া বা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া কোন ঘটনা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া সময়ে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। তবে তৃতীয় ব্যক্তির মুখে কোন কথা শ্রবণ করিয়া যে সাক্ষ্য দেওয়া যায়, তাহা সকল সময়ে গ্রাহ্য হয় না। তাঁহার বিবেচনায় কোন লোককেই সাক্ষ্য দিবার অনুপযুক্ত বলিয়া একেবারে বাদ দেওয়া উচিত নহে। কারণ অনেক সময়ে অনেক ব্যাপারে সদ্বংশজাত বা সম্ভ্রান্ত চরিত্রবান ব্যক্তির সাক্ষ্য না পাওয়া যাইতে পারে। তবে সাক্ষী সত্য বা মিথ্যা বলিল তাহা বিচারক নির্ণয় করিবেন। নীচ জাতি ও স্ত্রীজাতি মাত্রেই যে মিথ্যা কথা বলে এমন বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। যে কোন জাতি বা শ্রেণীর মধ্যেই মিথ্যাবাদী ও সত্যবাদী উভয় প্রকারের লোকই আছে।

মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে যদি লোকের প্রাণদণ্ড রহিত হয়, তাহা হইলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া দোষের নহে। প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রকারগণ এইরূপ বিধির ব্যবস্থা দিয়া ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। ইহার দ্বারায় তাঁহাদের দয়া বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইলেও অত্যাচারীর প্রতি নিরপেক্ষ সুবিচারের অভাব

লক্ষিত হয়। দণ্ডবিধি হইতে প্রাণদণ্ড একেবারে উঠাইয়া দিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, তবে মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা বিচার বিভ্রাট উপস্থিত করা ধর্ম্ম বা ন্যায়ানুমোদিত নহে। প্রবন্ধ লেখক মহাশয়কে যে ধন্যবাদ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন।

(১০)। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন :—

আমি এই সভার পক্ষ হইতে প্রবন্ধ লেখক মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি প্রাচীন ভারতের বিচার প্রণালী ও চিত্র অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। তবে প্রবন্ধ পাঠক মহাশয় সাক্ষ্য সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রথার তুলনা মূলক সমালোচনা করিলে আরো ভাল হইত। প্রাচীন ভারতের যাহা "দিব্য পরীক্ষা" বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহারই উপর এক সময়ে পৃথিবীর সকল দেশের বিচার নির্ভর করিত। পরে প্রতিবাদীদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইত এবং তাহারাই আবার পঞ্চায়েতী প্রথার বিচারও করিত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাক্ষীর প্রথা ব্যতীত জুরির দ্বারা বিচার প্রণালী ইউরোপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ইউরোপে প্রাচীন ভারতের বিচার প্রণালীর ক্রমবিকাশ হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যের কাছে "শোনা" কথা সাক্ষ্য বলিয়া গৃহীত না হইলেও মুমূর্ষের শেষ বাণী (Dying declaration) শ্রবণ করিয়া যদি কেহ সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা বর্ত্তমান কালে বিশ্বাস্য প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। "ইউরোপে দিব্য পরীক্ষা" ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভারতে ইহার বহু পূর্ব্বে "দিব্য পরীক্ষা" অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালীর প্রমাণ লইবার ব্যবস্থা নিয়মিত হইয়াছিল; ইহা আমাদের পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।

(১১)। সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিবার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীগিরিজা-প্রসন্ন সেন
সম্পাদক স্থলে

শ্রীচুনীলাল বসু,
সভাপতি।
১৭।৩।২১।

একবিংশ বার্ষিক নবম মাসিক স্থগিত অধিবেশন।

৪ ঠা বৈশাখ ১৩২৮ সাল।

ইং ১৭ই এপ্রেল ১৯২১ খৃঃ।

রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা।

১। উপস্থিত সভ্যগণেব নাম :—

১। শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজা প্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ ইত্যাদি, ২। ডাঃ খগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ৩। নগেন্দ্রনাথ নাগ, ৪। কবিরাজ অমৃত লাল চট্টোপাধ্যায় ৫। পণ্ডিত সাতকড়ি সিদ্ধান্ত ভূষণ, ৬। প্রফুল্ল কুমার বসু, ৭। কানন বিহারী বসু, ৮। যতীন্দ্রনাথ দত্ত, ৯। কুমুদ বিহারী বসু এম, এ, বি, এল, ১০। অম্বিকা চবণ দেব, ১১। কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, ১২। নৃপেন্দ্র কুমাব রায় চৌধুবী, বি, এ, ১৩। গেবিন্দলাল মল্লিক, ১৪। প্রবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

২। শ্রীযুক্ত কবিবাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়েব সমর্থনে রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু এম, বি, আই, এস, ও, এফ্, সি, এস্, রসায়নাচার্য্য মহাশয সভা- পতিব আসন গ্রহণ করিলেন।

৩। গত অধিবেশনেব কার্য্য বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতি ক্রমে পরিগৃহীত হইল।

৪। অতঃপর সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক সাহিত্য সভার ১৩২৮ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচনের ফল প্রকাশ পরিজ্ঞাপিত হইল। নিম্নে অধিক সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত সভ্যগণের নাম ও ভোটসংখ্যা প্রদত্ত হইল।

নাম।		মত সংখ্যা।
১। শ্রীযুক্ত ডাঃ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, আই, এস্, ও; এফ্ সি, এস্, রসায়নাচার্য্য	...	৩৮
২। " নাট্যাচার্য্য অমৃত লাল বসু	...	৩০
৩। " মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্ক বাগীশ	...	৩৭
৪। " কবিরাজ গিরিজা প্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ বিদ্যাবিনোদ, আয়ুর্ব্বেদরত্নাকর, দর্শননিধি	...	৩৭

৫। „ কুমার প্রফুল্ল কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এম, এ, ... ৩৬
৬। „ মহারাজ ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহবাহাদুর (নসীপুরাধিপতি) ৩৪
৭। „ সরোজ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম,এ. ... ৩৪
৮। „ কুমার প্রকাশ কৃষ্ণদেব বাহাদুর বি, এ, ... ৩৩
৯। „ বসময় লাহা (সভার আয় ব্যয় পরীক্ষক) ... ৩৩
১০। „ কুমার প্রমোদ কৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি. এ, ... ৩২
১১। „ কুমার প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ, ... ৩২
১২। „ অধ্যাপক মন্মথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস্, সিং ... ৩২
১৩। „ „ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ... ৩১
১৪। „ „ মন্মথ মোহন বসু এম, এ, ... ৩১
১৫। „ „ রজনী কান্ত দে এম, এ, বি, এস্, সি ... ৩০
১৬। „ কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন ভিষগরত্ন কবিভূষণ ... ৩০
১৭। „ সতীশ চন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এল, ... ২৯
১৮। „ ডাক্তার বিপিন বিহারী ঘোষ এম, বি, ... ২৯
১৯। „ যতীন্দ্র নাথ দত্ত (জন্মভূমি সম্পাদক) ... ২৯
২০। „ কিরণ চন্দ্র দত্ত ... ২৫
২১। „ শ্যামলাল গোস্বামী ... ২৪
২২। „ পণ্ডিত কৈলাস চন্দ্র জ্যোতিষার্ণব ... ২৪
২৩। „ ডাক্তার যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ এল্, এম, এস, ... ২৩
২৪। „ „ খগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ... ২১
২৫। „ কবিরাজ কালী ভূষণ সেন কবিরত্ন ... ১৯

৫। শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

সভার নিয়মানুসারে অদ্য ১৩২৭ সালের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি ও সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ পদত্যাগ করিলেন। পুনরায় সম্পাদক নির্ব্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত, সভা আহ্বান করিবার ও সম্পাদকের অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্য

করিবার ভার রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু এম, বি, আই, এস, ও এফ্, সি, এস্; রসায়নাচার্য্য মহাশয়ের উপর অস্থায়ী ভাবে প্রদত্ত হউক।

৬। অতপর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু মহাশয় "ইউরোপীয় সাহিত্যের ক্রম বিকাশ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন।

৭। সমালোচনা প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলেন, অদ্যকার বক্তৃতার বিষয় অতিশয় বিস্তৃত। এই বিষয়ের আলোচনা এত অল্প সময়ের মধ্যে হওয়া অসম্ভব। ইউরোপীয় সাহিত্যের আরম্ভ গ্রীস দেশ হইতে। ইউরোপে গ্রীকগণই দর্শনে বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, জ্যোতিষে ও চিকিৎসা শাস্ত্রে অসাধারণ উন্নতি করিয়াছিলেন। অনেকের মতে গ্রীকরা ভারত বাসীর নিকট জ্ঞানের জন্য অনেক পরিমাণে ঋণী। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে গ্রীকদিগের নিকট হইতে আমরাও জ্যোতিষ, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি অনেক বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। গ্রীকদিগের পরে রোমীয় সাহিত্যের ও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। জাতীয় জীবনের বিকাশ জাতীয় সাহিত্যের সহিত বিশেষভাবে সম্বদ্ধ। যখন ইউরোপীয় সাহিত্য কেবল গ্রীক ও ল্যাটীন্ ভাষার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয় জীবনের সবিশেষ বিকাশ লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু যখন ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রচলিত ভাষায় সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে লাগিল, তখন হইতে বাস্তবিক তত্তদ্দেশ বাসীগণের জাতীয় জীবনের অভ্যুদয় হইতে দেখা গেল। আমাদের দেশে সাহিত্য যখন কেবল সংস্কৃত ভাষার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তখন বর্ত্তমানের ন্যায় এত জাতীয় ভাবের বিকাশ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে লক্ষিত হয় নাই।

যখন বাঙ্গালা ভাষা, হিন্দী ভাষা, ও অন্যান্য প্রচলিত সর্ব্বসাধারণের বোধ গম্য ভাষায় সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে লাগিল, তখন হইতেই প্রকৃতভাবে জাতীয় অভ্যুদয় ও দেশ মধ্যে একটা সার্ব্বজনীন ভাবের বিকাশ আরম্ভ হইল। তখনই সাহিত্যের মধ্য দিয়া জ্ঞান, সমাজের সর্ব্বস্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে অনেক রত্ন আমাদের বঙ্গভাষায় আহরিত হইয়াছে। এবং তজ্জন্য বঙ্গভাষা সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল হইয়াছে। তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ইউরোপীয় সভ্যতার বিষ আমাদের সমাজ শরীরে সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করার কুফল

আমরা অনেক স্থলে উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইউরোপীয় সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ বা বিচার বর্জ্জিত অনুচিকির্ষা দোষাবহ। উদাহরণ স্থলে বলা যায় যে কিছু কাল পূর্ব্বে আমাদের দেশের ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি বর্গ মনে করিতেন যে মদ্য পান না করিলে ইংরাজি শিক্ষাই বৃথা হইল; প্রকাশ্যে মদ্য পান এবং নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ এক সময়ে সৎসাহসের (Moral Courage) পরিচয় বলিয়া গণ্য হইত এবং এই আহার ও পানের কথা সদর্পে ঘোষণা করিয়া বঙ্গের ইংরাজি শিক্ষিত নব্য যুবকগণ গর্ব্বানুভব করিতেন। এ সকল ইউরোপীয় সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ মাত্র, ইহার দ্বারা দেশের বিস্তর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। সুখের বিষয় যে দেশের লোকের মতি গতি ফিরিয়াছে, অন্ধ অনুকরণের উপর লোকের অনাস্থা ও বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। তিনি বক্তাকে সভার পক্ষ হইতে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

৮। শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজা প্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ দর্শন-নিধি মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিবার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচুনীলাল বসু—
সম্পাদক।

শ্রীমন্মথ মোহন বসু-
সভাপতি।

সাহিত্যসভার উদ্দেশ্য।

১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি সাধন।

২। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতাদি ভাষাসমূহের চর্চ্চা অনুশীলন এবং ঐ সকল ভাষায় লিখিত প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, মুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা ও ইংরাজী প্রভৃতি দেশীয় নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্দ ও ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষসমূহের লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ, এবং প্রচার।

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন।

৪। নানাউপায়ে স্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা ও সাহিত্যানুশীলনে উৎসাহ প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, তত্তৎ উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও অর্থসাহায্য প্রদান।

৫। উপর উক্ত উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির রচনা, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদি সংগ্রহ এবং তত্তৎ উদ্দেশ্য সাধনপযোগী অন্যান্য উপায় অবলম্বন।

শ্রীচুণীলাল বসু

সাহিত্য সভার অবৈতনিক সম্পাদক।

সাহিত্য-সভা পুস্তকালয়।—

প্রাতে সাত ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং বৈকালে পাঁচ ঘটিকা হইতে রাত্রি আট ঘটিকা পর্য্যন্ত সর্ব্ব সাধারণের জন্য খোলা থাকে। এখানে বসিয়া পাঠ করিবার জন্য চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও আলোর সুবন্দোবস্ত আছে। সম্প্রতি অনেকগুলি নূতন উপন্যাস ক্রয় করা হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত কতকগুলি পুস্তক ও উপহার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সাহিত্য সভার সভ্যগণকে এবং সর্ব্ব সাধারণকে পুস্তকাদি পাঠ করিবার জন্য—সাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।—

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন।

লাইব্রেরীয়ান।

সাহিত্য-সভা-কার্য্যালয়।

১০৬।১নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১লা চৈত্র, ১৩২৬।

সবিনয় নিবেদন,—

সাহিত্যসভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বিদ্যাসাগর বাহাদুর এম্, এ, (পি, আর, এস্) মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশার্থ গত ২৯শে বৈশাখ ১৩২৬ সাল, "সাহিত্য সভায়" তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার জন্য একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে সাহিত্য ক্ষেত্রে পণ্ডিতপ্রবর শাস্ত্রী মহাশয়ের পুণ্য-স্মৃতি জাগরুক রাখা বিধেয় বলিয়া একটী প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটী স্মৃতি রক্ষা সমিতিও গঠিত হইয়াছে। সাহিত্য-সভার সভ্য বৃন্দ এবং হিতৈষীগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই পুণ্য-স্মৃতি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। তদনুসারে আপনার নিকট সভা সাহায্য প্রার্থী হইতেছেন। আশাকরি, আপনি যথোচিত সাহায্য দানে স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের পুণ্য স্মৃতি রক্ষা বিষয়ে সাহিত্য সভাকে সহায়তা করিবেন। যে পরিমিত অর্থ সংগৃহীত হইবে, তদনুসারে স্মৃতি-চিহ্ন অনুষ্ঠিত হইবে।

বশম্বদ

শ্রীচুণীলাল বসু।

সম্পাদক।

সাহিত্য সংহিতার—

১৩২৭ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত

সূচি-পত্র

লেখক গণের নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

দ

সং

চিত্র সূচী —

বৈশাখ হইতে আষাঢ়ের সংখ্যায "দিল্লীর স্থুল দৃশ্য" নামক প্রবন্ধের প্রথমে জুম্মা মসজিদের দুই খানি ছবি ও কুতুবমিনারের এক খানি ছবি প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রাবণ হইতে আশ্বিনের সংখ্যায় "দিল্লীনগরীর প্রধান স্থান সমূহ" নামক প্রবন্ধের প্রথমে দেওয়ানি খাসের ছবি ও সাহজাদিদের খাস কামরার ছবি প্রদত্ত হইয়াছে।

নিবেদন।

সাহিত্য-সভার সভ্য, সাহিত্য-সংহিতার পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহক মহাশয়গণের নিকট, এই পত্রিকার প্রকাশের অতিরিক্ত বিলম্ব হেতু ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পত্রিকার নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্র না থাকাই ইহার প্রধান কারণ। অতঃপর পত্রিকা খানিকে নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত করিতে সচেষ্ট থাকিব। ইতি—

নিবেদক—পত্রিকা-সম্পাদক।

মুদ্রারাক্ষস।

(পঞ্চাঙ্ক নাটক)।

(যন্ত্রস্থ)।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজা প্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ,

কাব্যভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, আয়ুর্ব্বেদ-

রত্নাকর, দর্শননিধি মহাশয়

কর্ত্তৃক প্রণীত।

কাব্যের উপাধি পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ ও সংস্কৃত বি, এ, পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ ইহা পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

ইহা পণ্ডিত বিশাখ দত্ত প্রণীত বিখ্যাত রাজনীতি সম্বন্ধীয় সংস্কৃত নাটক "মুদ্রারাক্ষসের" অনুবাদ। অনুবাদ সম্পূর্ণ ইতিহাস সম্মত, সরস ও সরল হইয়াছে। নাটক খানিকে অভিনয়ের উপযোগী করিবার জন্য কয়েকটী কল্পিত চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

নবপর্য্যায়

সাহিত্য-সংহিতা।

সাহিত্য-সভার ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, বিদ্যাবিনোদ,
আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকর দর্শননিধি ও শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন
বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ কাব্যরত্ন কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

কলিকাতা ১০৬।১নং গ্রে ষ্ট্রীট, সাহিত্য-সভা হইতে

১৩২৮ সালের সাহিত্য-সংহিতার লেখকগণের নামের বিষয় সমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

ওঁ

শ্রীজগন্নাথো বিজয়তেতরাম্।

উপাধিদান পত্রম্।

শ্রীমুক্তিমণ্ডপ পণ্ডিত সভা
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পুরী।

বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরোপাধিভূষিতেন
শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয়েন কলিকাতা কুমারটুলী নিবাসিনা
দর্শন-নিধি রিতি উপাধিঃ প্রাপ্তঃ।

অম্বষ্ঠ কৌরব বিধো গিরিজা প্রসন্ন!
সংবীক্ষ্য তে বিবিধ দর্শন তত্ত্ব নিষ্ঠাং।
শ্রীমুক্তিমণ্ডপ সমিৎ খলু পণ্ডিতানাং,
তুভ্যং প্রযচ্ছতি চ দর্শন নিধ্যুপাধিং॥

১১ দিনে বর্ষ মাসে ১৮৪[illegible] শকাব্দে

শ্রীমুক্তিমণ্ডপ পণ্ডিতসভা কার্য্যালয়ঃ
শ্রীজগন্নাথ মন্দিরম্
পুরুষোত্তম ক্ষেত্রম্

শ্রীশঙ্কর বলদেবপ্রকাশ ব্রহ্মচারী
সভাপতি।
শ্রীসদাশিব মিশ্র শর্ম্মা (মহামহোপাধ্যায়)
সম্পাদক।
[মু]ক্তিমণ্ডপ পণ্ডিত সভায়াঃ।

সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী।

বঙ্গের কবিতা।

প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ,

কুমার শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব প্রণীত।

দুইভাগে প্রায় পাঁচ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ১ম ভাগ আট আনা, ২য় ভাগ দেড় টাকা মাত্র। কবিতার উৎপত্তি হইতে ইংরাজী প্রভাবের পূর্ব্বসময় পর্য্যন্ত ইহার ধারাবাহিক ইতিহাস সুন্দর ভাষায় ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থের সূচি হইতে গুণবত্তা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইবে।

স্বর্গীয় পণ্ডিত প্রবর রায়

রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বিদ্যাসাগর বাহাদুর।

এম, এ, (পি, আর, এস,) প্রণীত গ্রন্থাবলী।

১। Three Essays—মূল্য ৷৷৹ আনা।

Modern Bengali Fiction, Municipal Institution in Ancient India, The Garbhadhan Ceremony এই তিনটী নানা তথ্যপূর্ণ সুলিখিত প্রবন্ধ এই গ্রন্থে আছে।

২। ভাষা পরিচ্ছেদ, প্রথম খণ্ড ২য় সংস্করণ ১।৹ টাকা।

৩। ভাষা পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় খণ্ড ১৷৷৹ টাকা।

৪। Matriculation Sanskrit in Bengali—সন্ধি, শব্দ, ণত্ব, ষত্ব কারক সমাস স্ত্রীত্ব সম্বলিত—মূল্য ১৲ এক টাকা।

সম্পাদক সাহিত্য-সভা,

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[নব পর্য্যায়]

সাহিত্য-সংহিতা।

(সাহিত্য সভার ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

নবপর্য্যায, ১৩শ খণ্ড ' ১৩২৮, বৈশাখ—আষাঢ়। { ১ম—৩য় সংখ্যা।

ভাষার উৎপত্তি ও বিস্তার।

ভাষতে কথযতি মনোভাবং ব্যক্তীকবোতি অনয়া ইতি ভাষা।

মনুষ্যেরা যাহাব দ্বাবা হর্ষশোকাদি মনোভাবেব অভিব্যক্তি করে, উহাবই নাম "ভাষা"। পবমেশ্বব পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ-প্রভৃতি সকল প্রাণীকেই এক একটী সীমাবদ্ধ ভাষা প্রদান কবিযাছেন, কিন্তু তিনি মানব জাতিকে কোনও প্রকাব ভাষাই প্রদান করেন নাই। পশু, পক্ষীদিগেরও কি ভাষা আছে? অবশ্যই আছে। দেখ একটী কাক কা, কা, কবিয়া ধ্বনি করিলেই অমনি সহস্র সহস্র কাক আসিয়া উপনীত হয়, কেননা তাহাবা প্রথম কাকেব ধ্বনি শুনিযা বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহার কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। পিপীলিকারা সাবি দিয়া চলিযাছে, অমনি আর একটী পালেব গোদা আসিযা কি বলাবলি কবিল, অমনি পিপড়াব সারি গতি বোধ করিয়া বিপরীত দিকে চলিল। গো বৎস হাম্বা রবে ও মেষ এবং ছাগশিশুরা মে মে করিতে করিতে স্ব স্ব মাতার অনুবর্ত্তী হয়, ইহাই তাহাদিগের ভাষা। তবে এ পাশব ভাষার ব্যাকরণ বা অন্য কোনও বিধি ব্যবস্থা ও হ্রাস বৃদ্ধি নাই, এই সকল ভাষা বোবাদিগের অব্যক্ত ধ্বনি এবং ইঙ্গিতবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কিন্তু মনুষ্যের ভাষা ঈশ্বরদত্ত কিংবা প্রকৃতিসম্ভাগত নহে, ইহা স্বয়ং মনুষ্য প্রণীত। মনুষ্যগণ আপনাদিগের ভাষা আপনারা গড়িয়া লইয়াছে এবং উহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল।

"যোজনান্তর ভাষা"

এই প্রবাদ বাক্য অতীব সত্যমূলক। ফলতঃ আব হাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের ভাষার বিকার ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে! কেন না উহা মনুষ্যসৃষ্ট এবং উহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের রামদাসেরা যে ভাষায় কথোপকথন করে, আফ্রিকা এবং ইউরোপ-প্রভৃতি মহাদেশের হনুমান্, জাম্ববান্ বানর এবং গরিলারাও সেই ভাষায় কথোপ কথন করিয়া থাকে। মহাযোজনান্তরেও উহাদিগের ভাষার কোনও বিশ্লেষণ বা বিকার ঘটিয়া থাকে না। প্রকৃতি উহাকে যে অবস্থায় প্রসব করিয়াছে, উহা অদ্যাপি সেই অবস্থাতেই আছে। তবে বাঙ্গালার কুকুরেরা ভেউ ভেউ করে, আর বৈলাতিক সারমেয়গণ বাউ বাউ করে, এই যা প্রভেদ। আচ্ছা বুঝিলাম মানুষের ভাষা ঈশ্বরপ্রদত্ত কিংবা প্রকৃত-প্রদত্ত নহে, কিন্তু মানুষ কি প্রকারে আপনাদিগের ভাষা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন? অশেষ ভাষাবিৎ কোবিদবৃন্দ-গরীয়ান্ ভট্ট মোক্ষমূলর তাঁহার ভাষাগ্রন্থের প্রথম ভাগের একত্র বলিয়াছেন যে—

We cannot tell as yet what language. It may be production of nature, a work of human art, or a divine gift.

P. 3, vol. I.

অর্থাৎ আমরা এ পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা বুঝিতে পারি নাই যে ভাষাটী প্রকৃত প্রস্তাবে কি? ইহা কি প্রকৃতিসমাগত, না ইহা ভগবৎপ্রদত্ত? অথবা মনুষ্যেরা আপনাদিগের ভাষা গড়িয়া লইয়াছে? ইহা বলিয়াই তিনি স্থানান্তরে বলিতে লাগিলেন যে

Language not as a production of nature, but simply as a work of human art. P. 29.

অর্থাৎ নানা, ভাষা ঈশ্বর বা প্রকৃতিপ্রদত্ত নহে, মনুষ্যভাষা মনুষ্যেরা আপনারাই গড়িয়া লইয়াছে।

যদি একথাই সত্য হয় যে মনুষ্যভাষা মনুষ্যসৃষ্ট, তাহা হইলে কেন অশেষ ভাষাবিৎ গ্রীম-বপ ওয়েবার, মোক্ষমূলর আরল, ছেজ ও টকারপ্রভৃতি মনীষিবৃন্দ অদ্যাপি ইহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিলেন না যে কোন্ মহাজনপদের কোন্ জগদ্বরেণ্য মনীষী সেই আদিম মানব ভাষার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন?

কেবল শুনিতে নহে, আমরা অহরহঃ দেখিতেও পাইতেছি যে এ দেশের ব্রাহ্মণযুবকেরা পর্য্যন্ত বেদ ও সংস্কৃত অধ্যয়নজন্য ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড বা জর্ম্মানী গমন করিতেছেন এবং অনেকে তথা হইতে উপাধি পাইয়া এদেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন। কিন্তু ইহা কি

"ইক্ষুবণ্যে করি বাস,
অন্বেষণ অন্য ঘাস"

প্রবাদের মতন অসম্ভব ব্যাপার নহে? যদি পাশ্চাত্যগণ প্রকৃতই প্রকৃত বেদজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা "কোন্ ব্যক্তি বা কোন্ জাতি, মানবভাষার আদি উদ্‌ভাবয়িতা, তাহা অদ্যাপি নির্ণয় করিতে পারিতেন না?

ফলতঃ আমরা এই চুয়ান্ন বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই জানিতে বা বুঝিতে পারিতেছি যে, গীর্ব্বাণবাণী সংস্কৃত ভাষাই জগতের আদি মাতৃভাষা এবং দেবতা বা ব্রাহ্মণগণই সেই আদি মানবভাষার একমাত্র উদ্ভাবয়িতা।

তবে কি হাইরোগ্লিফিক, আরবী, জেন্দ, হিব্রু, গ্রীক, লাটিন, জর্ম্মান, শাকসন, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরাজী প্রভৃতি সকল ভাষাই সংস্কৃতপ্রভব? আমরা প্রবন্ধান্তরে তাহা বিশদ ভাবে প্রতিপাদন করিব। ফলতঃ আরেবিক ভিন্ন আর সকল ভাষাই সংস্কৃতপ্রভব। আরবগত যবনগণ আমাদিগের উপর বিদ্বেষ বশতঃ একটী অভিনব ভাষার সৃষ্টি করিয়া পৈতৃক দেবনাগরাক্ষরের পরিবর্ত্তে কাগাবগার ঠ্যাং দিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মৈশর যবনগণও দেবনাগর ছাড়িয়া পশু পক্ষী দিয়া কখগঘর কাজ চালাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা পৈতৃক সংস্কৃত ভাষার পরিহার করিয়াছিলেন না। একজন জর্ম্মান পণ্ডিত জর্ম্মান ভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া (উহার ইংরাজী অনুবাদও হইয়াছে) দেখাইয়াছেন যে হাইরোগ্লিফিক ভাষা গীর্ব্বাণবাণী সংস্কৃত ভাষাপ্রভব। বহু সত্যভীরু পাশ্চাত্যমনীষীও সংস্কৃতভাষাকে জগতের বর্ষীয়সী মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেবল ভারত বিদ্বেষ্টা ওয়েবার, মুইর, মোক্ষমূলর এবং ম্যাকডোনেল প্রভৃতি কতিপয় বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তিই এই নির্ব্যূঢ় সত্যের পরিপন্থী !!!

অবশ্য ইংলণ্ড ও জর্ম্মানী প্রভৃতি অভিনব জনপদ সকল এইক্ষণ আমাদিগের কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী এবং নবদ্বীপের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমরা সংস্কৃত ও বেদাধ্যয়ন করিতেও ইউরোপে গমন করিব? এমন দুর্দ্দিন কি সত্য সত্যই শুভাগমন করিবে? সাহেবেরা বেদের প্রচার করিয়া আমাদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছেন এজন্য আমরা অনেক কারণে তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ, কিন্তু তথাপি আমরা তাঁহাদিগের নিকট বেদ বুঝিতে এবং বেদ পড়িতে যাইব, তাঁহাদিগের বেদানুবাদ পাঠ করিয়া বেদজ্ঞ হইব, সে শুভ দিন বা অশুভ দিন, এখনও বহু সুদূরে বর্ত্তমান। যদি সাহেবেরা বেদ পাঠ করিয়া বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কেন মানবভাষার আদি উদ্ভাবয়িতা কাহারা সে বিষয়ে অদ্যাপি অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন; কেন সংস্কৃত ভাষাকেই জগতের সকল ভাষার জনকজননী বলিয়া স্বীকার করিতে এত শিরঃকণ্ডূয়ণ করিবেন? দেখ জগদ্বরেণ্য মহামান্য ঋগ্‌বেদ তারস্বরেই বলিতেছেন যে—

দেবীং বাচং অজনয়ন্ত দেবাঃ,
তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি। ১১।৮৯।৮ম

১। যাস্কনির্ব্বচনং............দেবীং বাচং অজনয়ন্ত দেবাঃ তাং সর্ব্বরূপাঃ পশবো বদন্তি। ব্যক্তবাচশ্চ অব্যক্তবাচশ্চ। ৩২৯ পৃ ২য় ভাগ।

২। সায়ণভাষ্যং............এষা মাধ্যমিকা বাক্ সর্ব্বপ্রাণ্যন্তর্গতা ধর্ম্মাভিবাদিনী ভবতি ইতি বিভূতিং দর্শয়তি। যাং দেবীং দ্যোতমানাং মাধ্যমিকাং বাচং দেবা মাধ্যমিকা অজনয়ন্ত জনয়ন্তি। তাং বাচং বিশ্বরূপাঃ সর্ব্বরূপাঃ ব্যক্তবাচঃ অব্যক্তবাচশ্চ পশবো বদন্তি। তৎপূর্ব্বকত্বাৎ বাক্‌প্রবৃত্তেঃ।

৩। গ্রীফিতানুবাদ—

The Deities generated Vak the goddess, and animals of every figure speech her.

N. B.—Articulately speaking men and lower animals all derive their voices from her.

৪। দত্তশাস্ত্রানুবাদ...........দেবগণ দীপ্তিমান্ বাগ্‌দেবতাকে উৎপাদন করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার পশুগণ সেই বাক্য উচ্চারণ করে।

আমরা এই সকল নির্ব্বচন, ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ এবং ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইলাম। দেখ মূল মন্ত্রে—

দেবাঃ	...	কর্ত্তা,
দেবীং বাচং	...	কর্ম্ম;
অজনয়ন্ত	...	ক্রিয়া
তাং	...	কর্ম্ম,
বিশ্বরূপাঃ পশবঃ		কর্ত্তা
বদন্তি	...	ক্রিয়া

মন্ত্রস্থ এই কর্ত্তৃপদ দেবাঃ"র অভিধেয় কি বা কে? স্বয়ং পরমেশ্বর, না কৃতবিদ্য দেবতাখ্য ব্রাহ্মণগণ? (বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ ইতি শতপথং ব্রাহ্মণং)। যদি বল দেবাঃ ব্রাহ্মনাঃ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্রাদি দেবগণ? তাহা হইলে ক্ষুদ্রশক্তি সে দেবাখ্য নরগণ কি প্রকারে পশুপক্ষীদিগের "অব্যক্ত বাক্" অর্থাৎ অব্যক্ত ভাষার স্রষ্টা বা উৎপাদয়িতা হইতে পারেন? পশুপক্ষি প্রভৃতির ভাষার স্রষ্টা কি স্বয়ং ভগবান্ই নহেন? আর মনুষ্যের ভাষার স্রষ্টাও কি স্বয়ং মনুষ্যগণই ছিলেন না? ঈশ্বর বা প্রকৃতি মনুষ্যভাষার নিদান হইলে কি জগতের সকল মনুষ্যের ভাষা সম্পূর্ণ এক হইত না? সকল দেশের গো গবয় পশ্বাদির ভাষা এক, আর সকল দেশের সকল মনুষ্যের ভাষা কেন এত বৈষম্যভাক্?

"দেবীং বাচং জিনিষটাই বা কি? উহাকে তোমরা"মাধ্যমিকা বাক্"বলিতে অধিকারী, কেন না উহা এসিয়ার নাভি বা মধ্যস্থান মঙ্গোলিয়ার (আদি স্বর্গের) ভাষা, কিন্তু সে দেবীবাক্‌কে তোমরা কেমন করিয়া অব্যক্ত বাক্যের মধ্যেও ধরিয়া লইলে? দেবীবাক্ কি দেবতাদিগের গীর্ব্বাণবাণী সংস্কৃত ভাষা নহে? বাগ্‌ভটগুপ্ত তাঁহার অলঙ্কারগ্রন্থে বলিতেছেন যে—

সংস্কৃতং স্বর্গিণাং ভাষা
শব্দশাস্ত্রেষু নিশ্চিতা।

সকল শব্দশাস্ত্রই ইহা বলিয়াগিয়াছেন যে স্বর্গবাসী দেবগণের ভাষাই সংস্কৃত ভাষা। কাব্যচন্দ্রিকাও বলিতেছিলেন যে—

সংস্কৃতং দেবতাবাণী,
কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ।

শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মুনিরা ইহা বলিয়াগিয়াছেন যে সংস্কৃত ভাষাই দেবগণের ভাষা, উহাই দেবীবাক্। অলঙ্কারাচার্য্য মহামতি দণ্ডীও বলিয়াগিয়াছেন যে—

সংস্কৃতং নাম দৈবীবাক্
অন্বাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ ॥ কাব্যাদর্শ।

মুইর—Great Rishis denominate Sanskrit, the language of the Gods. S. 7, Vol. II, P. 58.

মহর্ষিগণ ইহা বলিয়াগিয়াছেন যে সংস্কৃত ভাষার নামই "দৈবীবাক্" অর্থাৎ দেবতাদিগের ভাষা, উহাই দেবীবাক্ ?

সুতরাং যাস্ক, সায়ণ ও গ্রীফিত মহাশয় যে এই মন্ত্রের দেবী বাক্‌কে পশুদিগের অব্যক্ত বাক্ খেউ খেউ ঘেউ ঘেউ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, ইহা কি সমীচীন হইয়াছে ? হে আত্মবন্ ভ্রাতৃগণ ! তোমরা যাস্ক, সায়ণ, শঙ্করাচার্য্য এবং মোক্ষমূলর, ম্যাকডোনেল ও গ্রীফিত প্রভৃতি পাশ্চাত্যগণের নামে "তথাস্তু" বলিয়া দশায় না পড়িয়া কেন আপনারা স্বাধীনমনে বেদ-প্রযুক্ত শব্দগুলির প্রকৃতার্থ তলাইয়া দেখ না ?

ফলতঃ দেবীবাক্ কি ? উহা দেবতাদিগের গীর্ব্বাণবাণী সংস্কৃত ভাষা, পশু পক্ষি প্রভৃতির অব্যক্ত ধ্বনি দেবীবাক্ নহে। যাস্ক, সায়ণ ও গ্রীফিত এই মন্ত্রের কোন প্রকৃতার্থই বুঝিতে পারিয়াছিলেন না। দেখ জগন্মান্য স্মৃতিকর্ত্তা মহর্ষি স্বয়ং নারদ বলিতেছেন যে—

অনিযুক্তো নিযুক্তো বা শাস্ত্রজ্ঞো বক্তুমর্হতি।
দৈবীং স বাচং বদতি যঃ শাস্ত্রমনুজীবতি ॥ ৪০ পৃ জলি সংস্করণ।

যখন বিচার হয় ও কাহারও পক্ষে স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত না থাকেন, তাহা হইলে শাস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ, কেহ নিযুক্ত করুক, আর নাই করুক, যে পক্ষে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য (উকিল) নাই, তিনি দেবীবাক্ অবলম্বনপূর্ব্বক সেই পক্ষের সমর্থন করিতে পারেন।

এখানে কি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত ভাষায় অর্থী বা প্রত্যর্থীর পক্ষ সমর্থন করিতেন, না তিনি খেউ খেউ ঘেউ ঘেউ বা হাম্বা হাম্বা করিয়া পক্ষ সমর্থন করিতেন ? কেন না যাস্ক, সায়ণ ও গ্রীফিতের মতে ত পশুদিগের খেউ খেউ ঘেউ ঘেউ অব্যক্ত ধ্বনিও দেবীবাক্ ? ছি ছি ছি ! অহো ভারতের শাস্ত্রে কৃতশ্রম

কোবিদকদম্বক কেমন করিয়া এই সকল নিরুক্ত, ভাষ্য এবং বৈলাতিক অনুবাদের নিকট স্বাধীন আত্মাটাকে বলিদান করিয়া থাকেন?

ফলতঃ এই "দেবাঃ" পদে দেবাখ্য নরগণ মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষি ও বৃহস্পতি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র ও শিবাদি দেবগণই সংসূচিত হইয়াছিলেন, এবং দেবীবাক্ শব্দেও গীর্ব্বাণবাণী মহীয়সী সংস্কৃত ভাষাই সংসূচিত হইতেছিল। আমাদিগের মতে এই মন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা ইহাই—

প্রকৃতার্থবাহিনী—দেবা দেবাখ্যব্রাহ্মণাঃ দেবীং বাচং গীর্ব্বাণবাণীং দেবভাষাং অজনয়ন্ত উৎপাদিতবন্তঃ, বিশ্বরূপাঃ, সর্ব্বপ্রকারাঃ পশবো মানবাঃ তাং দেবীং বাচং বদন্তি তয়া কথোপথনং কুর্ব্বন্তি।

দেবতাখ্য ব্রাহ্মণেরা গীর্ব্বাণবাণী সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি করেন, পৃথিবীর সকল লোক সেই সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতেন।

আমরা মানবের আদি জন্মভূমি গ্রন্থে দেখাইয়াছি যে, দেবতারা নর ও মনুষ্য, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণগণই দেবতা, এ বিষয়ে বহু বৈদিক প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং দেবীবাক্ দেবাখ্য নরগণসৃষ্ট সংস্কৃতভাষা। পশুদিগেব অব্যক্ত ধ্বনি দেবীবাক্ নহে ও হইতে পারে না।

তবে কেন মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি বলিলেন যে "তাং বিশ্বরূপাঃ পশবঃ বদন্তি"? মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি অতি সত্য কথাই বলিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন যে পৃথিবীর সকল মনুষ্য সেই দেবভাষা সংস্কৃতে কথোপথন করিতেন?

পশু কত প্রকার? চতুর্দ্দশ প্রকার। সপ্ত গ্রাম্য ও সপ্ত আরণ্য। সপ্ত গ্রাম্য পশুর মধ্যে মনুষ্যগণও একতম পশু? সেই সর্ব্ব প্রকার মনুষ্য পশুগণই দেবীবাক্ সংস্কৃত ভাষায় স্ব স্ব মনোভাবের অভিব্যক্তি করিতেন। পরন্তু বাঘ ভাল্লুকেরা নহে।

তবে কি সংস্কৃতভাষা কোন একসময়ে মনুষ্যদিগের কথোপকথনের ভাষা ছিল? যাহা ভাষা পদবাচ্য, তাহা কথোপকথনের ভাষা না হইয়া উহা কি কেবল গ্রন্থের ভাষা হইতে পারে? রামায়ণে আছে যে—

মনুষ্য ইব সংস্কৃতং

হনুমান্ সীতার সহিত মনুষ্যের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় সংলাপ করেন।

তথাহি—

একো বর্ণঃ সমা ভাষা।

উত্তর কাণ্ড বলিতেছেন যে—পূর্ব্বকালে জাতি এক ও ভাষাও এক ছিল।

বাইবেলও বলিতেছেন যে—

And the whole earth was of one language, and of one speech. 1—XI Genisis.

পূর্ব্বে পৃথিবীতে ভাষা এক ছিল, উচ্চারণও এক ছিল।

সেই এক ভাষাই গীর্ব্বাণবাণী সংস্কৃত ভাষা। জগতের আদি গ্রন্থ বেদ তৎকালে অন্য কোনও স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না। এই সংস্কৃত ভাষার বিকারেই জগতের অন্যান্য সকল ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। অবশ্য মনীষী মুইর সাহেব বলিয়াছেন যে—

But it cannot be shown either that the Greek or Romans were descended from the Indians or in any way received their language from Hindustan S. Text Vol II, p. 270, foot note.

কিন্তু কেহ ইহা দেখাইতে পারেন নাই যে, গ্রীক ও রোমানগণ ভারতবর্ষ প্রসূত, কিংবা গ্রীক ও লাটিন প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃত ভাষাপ্রভব।

কিন্তু আমরা তারস্বরেই বলিতেছি যে, যদি পাশ্চাত্যগণ আমাদিগের বেদ ও অনান্য শাস্ত্র পাঠ করিয়া উহাদের প্রকৃতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এমন কথা মুখনির্গত করিতে পারিতেন না। আমরা "ইউরোপীয়গণ ভারতসন্তান" এই প্রবন্ধে এবং আমার মানবের আদি জন্মভূমি গ্রন্থে ইহা বিশদভাবেই দেখাইয়াছি যে মিশর, আরব, ব্যাবিলোনিয়া পারস্য, আফগানিস্থান, ইউরোপ, এবং আমেরিকার সকল লোকই ভূত সমগ্র পূর্ব্ব ভারতসন্তান। ভারতের সংস্কৃতভাষী লোক সকল ঐ সকল দেশে যাইয়া, অগ্র বা পশ্চাদ্‌ভাবে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ভাষাও তাঁহারা খেয়া খাটে না রাখিয়া সঙ্গে লইয়া যান। ভারতের অষ্টাদশ ভাষা যেমন মূল সংস্কৃত ভাষা প্রভব, তদ্রূপ ঐ সকল দেশের ভাষাসমূহও মূল সংস্কৃত ভাষা প্রভব। তবে এ নির্ব্যূঢ় সত্যের অপলাপ করিতেও মুইর প্রভৃতি কোবিদ বৃন্দ পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। মুইর লজ্জা পরিত্যাগ করিয়াই বলিতে ছিলেন যে—

But the few instances which can be adduced are quite insufficient to prove that even in these cases, the Greek or the Latin words are borrowed from the Sanskrit. They may with quite equal probability have been derived from an earlier language from which the Sanskrit is also drawn.

P. 270.

ইা সামান্য কতিপয় শব্দের সহিত গ্রীক ও লাটিনের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতেই ইহা মনে করা যাইতে পারে না যে গ্রীক ও লাটিন ভাষা সংস্কৃতের বিকারপ্রভব। ফলতঃ গ্রীক ও লাটিন ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষা মূলতঃ অন্য একটী প্রাচীন ভাষাপ্রসূত। তথাহি—

It is true that more may be said in favour of the hypothesis that the Zend has been derived from Sanskrit, but there are sufficient reasons for believing that Zenda is a sister and not daughter of Sanskrit, and consequeutly that both have a common mother of a more primeval date.

P. 276.

অর্থাৎ জেন্দ ভাষাও সংস্কৃতভাষাপ্রভব, এ কথা ভাবিবার পক্ষে অনেক কারণ থাকিলেও এরূপ অনেক প্রতিকূল হেতু আছে যে যাহাতে জেন্দ ভাষাকে সংস্কৃতের কন্যা না ভাবিয়া ভগিনী ভাবাই উচিত। ফলতঃ উহারা অন্য এক সাধারণ মাতৃভাষাপ্রভব।

কিন্তু আমরা যখন জানি যে ভারতসন্তানগণই অন্যান্য জনপদে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন ভারতের ভাষাও যে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছিল, ইহা ধ্রুবই। আর শব্দগত সাদৃশ্য সন্দর্শনেও এই কথা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মনে যুগপৎ জাগিয়া উঠিবে যে সংস্কৃত ভাষাই জগতের আদি মাতৃভাষা এবং সেই আদি ভাষার উৎপাদয়িতা দেবতাখ্য ব্রাহ্মণগণ।

আমরা এখানে মুইরপ্রভৃতি ভারতবিদ্বেষ্টৃগণের সত্যাপলাপের প্রতিবাদচ্ছলে বার্লিননগরপ্রবাসী আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ হেরম্বলাল গুপ্তের পত্রের কিয়দংশ অবিকল উদ্ধৃত করিব।

"বাবা সম্প্রতি আমি একখানা পুস্তকে পড়িলাম যে Esthenia (Rnsiaর উত্তর পশ্চিমে) লোকেরা নিজদিগকে Aryan বলে পরিচয় দেয় এবং

উহাদিগের ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন বলিয়া গৌরব করে। আজ ৩।৪ দিন হইল, Lithenia দেশের কয়েকটী অধিবাসী সহ কথাবার্ত্তা হইল। সময়াভাবে বিশেষ কথোপকথন করিতে পারি নাই। উহাঁরা বলিলেন যে—

উহাঁদের ভাষাও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। যথা—

দেবস্ (দেবঃ), বীরস্ (Man), এবং উহারা তিন বচন ব্যবহার করেন। যথা—

দেবস্, দেবো, দেবাঃ।

একবারে খাটী সংস্কৃত। ১, ২, ৩, প্রভৃতিও একরূপ সংস্কৃত বলিলেও চলে। বেদেও বীরস্ মনুষ্যার্থক শব্দ। ইহারা ১৪শ শতাব্দীতে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, পূর্ব্বে দেবদেবীর উপাসক ছিলেন।

সেবক শ্রীহেরম্বলাল গুপ্ত, (বি, এ, কলম্বিয়া)।

August 6, 1921, Berlin.

তবে বর্ত্তমান ইউরপীয়গণ কেন এ কথা অস্বীকার করেন? যেহেতু কালমাহাত্ম্যে এখন আর কেহ উচ্চ বর্ণের লোকদিগকেও উচ্চ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, ইউরোপীয়গণও এখন আর আপনাদিগকে কালা ভারত-বাসীর ছোট ভাই বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ। এখন যে তাঁহারা প্রভু, কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত যে, একদিন ভারতের হিন্দুরা প্রভু ও শূদ্রীভূত (ম্লেচ্ছীকৃত) তাঁহারাই ভৃত্য ছিলেন। এখন যে পাশা উলটিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, তোমরা প্রথমতঃ অদ্যাপি কেহই সেই প্রাচীনতম ভাষার নাম কি, তাহা বলিতে সমর্থ হও নাই। সেই ভাষার কোনও গ্রন্থও তোমরা আনিয়াও উপস্থাপিত করিতে পার নাই। সেই ভাষার একটী বাক্যও তোমরা হাইরোগ্লিফিক ভাষা, ব্যাবিলোনীয় ভাষা, গ্রীক বা লাটিন ভাষার কোনও গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখাইতে সমর্থ হও নাই, সুতরাং উহা তোমাদিগের কল্পনা মহাসাগরের যেন বুদ্বুদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেখ—

সংস্কৃত	পিতরঃ
গ্রীক	Pater (পেতের)
লাটিন	Peter (পেতার)
জেন্দ	Paitar (পেইতার)

এই চারিটী শব্দ একই বস্তুবোধক। ইহাদের প্রত্যেকেরই অর্থ জনয়িতা বা জনক অর্থাৎ বাপ বা পিতা।

যদি এই চারিটী ভাষার চারিটী শব্দ অন্য একটী প্রাক্তন ভাষার অন্য একটী শব্দ হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে তোমরা ও আমরা নিশ্চয়ই সে শব্দটীর সংবাদ জানিতে ও দিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা কি তোমরা ও আমরা কেহ দিতে পারিয়াছি? অপিচ তোমরা তোমাদের

Paiter, Pater, Pater ও Father

কথার কোনও নিদান জান না, দেখাইতেও পার না ও পার নাই, পক্ষান্তরে আমরা দেখাইয়াদিতেছি যে আমাদিগের "পিতরঃ" পদের নিদান—

পা + তৃচ্ = পিতৃ (প্রাতিপদিক)? তৎপর পিতা, পিতরৌ ও পিতরঃ।

এই তিনটী পদ উক্ত পিতৃ শব্দের তিন বচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে, তোমাদের কেন সেরূপ কোনও নিদানের খবর পাওয়া যায় না?

যেহেতু আমাদিগের বহুবচনান্ত "পিতরঃ" পদের বিকারেই তোমাদের ঐ সকল শব্দ গঠিত হইয়াছে। আমাদিগের অপভ্রষ্ট ভাষা বাঙ্গালাতেও "ভর্ত্তারৌ" বা "ভর্ত্তারঃ" নাই, আছে ভর্ত্তারঃ পদের বিকারপ্রভব "ভাতার" কথাটী।

এখন যেমন এই "ভাতার" ও "ভর্ত্তারঃ" কথাটীকে অন্য একটী নিদান সমুত্থ ভাবা অসঙ্গত, তদ্রূপ পেটার, ফাদার ও পিতরঃ পদকেও অন্য একটী প্রাচীন নিদানপ্রভব ভাবা অসঙ্গত।

ফলতঃ সংস্কৃত পিতরঃ শব্দটীই তোমাদের Pater, Pater, Padray ও Father শব্দের জনয়িতা। আরও দেখ।

চদি ধাতু র—চন্দ্র।

চন্দ্র = চন্দ, চন্দ = চাঁদ ও চাঁদী।

এখানেও যেমন চাঁদ, চাঁদী ও চন্দ্রকে আর একটী নিদান সমুত্থ ভাবা অনুচিত, তদ্রূপ—Paiter, Pater, Pater ও Father কেও অন্য নিদান সমুত্থ না ভাবিয়া উহাদিগকে পিতরঃ পদের আসন্ন বিকৃতি বলিয়াই ভাবা এবং স্বীকার করা সমীচীন। দেখ—

হন্ + তৃচ = হন্তৃ

হন্তৃ—হন্তা—হন্তারৌ, হন্তারঃ।

অস্+শতৃ=সৎ;

সৎ—সন্, সন্তৌ, সন্তঃ।

তোমাদের কিন্তু—হন্ ও অস্ ধাতু নাই, হন্তা, হন্তারৌ এবং সৎ, সন্ সন্তৌ নাই, আছে মাত্র Hunter ও Saint, সুতরাং এই Hunter ও Saint যে সংস্কৃত হন্তারঃ এবং সন্তঃ পদের আসন্ন বিকৃতি, ইহা কোন্ সত্যভীরু ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন? ঐরূপ লাটিন Puella, Femina, Femalla, সংস্কৃত পোত্তী (পোলা ও পুলী) ও ভাগিনী (বরবর্ণিনী) শব্দপ্রভব। ফ্রেঞ্চ Femalle ও ইংরাজী Female শব্দও উক্ত লাটিন Femalla শব্দ প্রভব সুতরাং এই সকল কারণে কেন তোমরা সংস্কৃতভাষাকেই আদি মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিবে না?

বাঙ্গালা—পাথার শব্দ, সংস্কৃত পাথস্ শব্দের বিকারপ্রভব। ঐ বাঙ্গালা পাথার হইতে লঙ্কার ওয়াথুরা ও শাকারী ভাষার ওয়াথার (পাথার=বাথার, বাথার=ওয়াথার) শব্দ উৎপাদিত। এই বাথার হইতে এঙ্গলো শাকসন—Woeter (ভিটার), জর্ম্মাণ Wasser (ভাচ্ছার), ইংরাজী Water ও গ্রীক Hyder শব্দসমুদ্ভুত। ইহার পরেও কি তোমরা গ্রীক লাটিনকে সংস্কৃত প্রভব বলিতে পশ্চাৎপদ হইবে?

সংস্কৃত ভূমিস্ (ভূমি+স্) লাটিন Humus, কেন? এখানে ভাষার বিকারে ভ—হ হইয়াছে। ভাষার বিকারে হ—জ হইয়া থাকে। তজ্জন্য ভূমিস্=জুমিস্=জুমিস্=জমিন্ (স=ন)। এই জুমিন্ হইতে জমিন ও ভূমি হইতে পারস্য ভাষায় জমি শব্দ সমাগত।

ঐরূপ সংস্কৃত চিহ্নং হইতে লাটিন Signum শব্দ উৎপন্ন। কেন? ভাষার বিকারে চ=ছ (চর্চা—search), ও জ—গ হইয়াছে। ঐ চিহ্নংই বাঙ্গালার চিন ও চিনা এবং ইংরাজীতে sign মূর্ত্তিতে বিরাজমান। ইংরাজী sign এর জ কোথা হইতে আসিল? উহা চিহ্নের হ—কার। হকার জকার হইয়াছিল।

ঐরূপ আরবি বকিল ও উকিল—সংস্কৃত বক্তারঃ।

এবং আরবি আজান—সংস্কৃত "আহ্বান" শব্দপ্রভব। অবশ্য মৌলবীগণ

আত্মানের একটী স্বতন্ত্র ধাতু প্রত্যয় দেখাইয়া থাকেন, পরন্তু উহা অলীক কল্পনা প্রসূত।

ইংরাজী comes ক্রিয়া পদের নিরুক্তি নির্দ্দেশ করিতে যাইয়াও সাহেবেরা ঐরূপ প্রমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে থার্ড পার্চ্চন ছিঙ্গুলারে একটী s এর আগম হয়। যেমন come→comes.

কিন্তু এই comes কথাটী সংস্কৃত ক্রামতি ক্রিয়ার বিকার প্রভব। ক্রামতি= কামতি, কামতি=কামচি (ত=চ, নৃত্য নাচ, সত্য সাচা, তণ্ডুল=চাউল) কামচি=কামচ্ (comes).

যাহা হউক আমরা "সংস্কৃত ভাষা জগতের আদি মাতৃ ভাষা" এই প্রবন্ধে এবিষয়ে আরও বহু কথার অবতারণা করিব। এখানে ইহাই মাত্র প্রদর্শিত হইল যে যে সংস্কৃত ভাষা গ্রীক লাটিনেরও মাতা এবং উহা জগতের আদি মাতৃভাষা, সেই সংস্কৃত ভাষার উৎপাদয়িতা ভারতীয় দেবগণ। তাঁহারা স্বর্গ হইতে ভারতে আগমনের পূর্ব্বে আদি স্বর্গ স্তো বা মঙ্গলিয়াতে বসিয়া এই সংস্কৃত ভাষা ও দেবনাগরী অক্ষরের উদ্ভাবন করেন। তখন তুরুস্ক, পারস্য, আপগানিস্থান, আরব, আফ্রিকা ও হরিয়ূপীয়া (ইউরোপ) স্থলেও পরিণত হইয়া ছিল না। আর তোমরা সাহেবদিগের ভুল ভ্রান্তি গলাধঃকরণ করিয়া এম, এ, পাশ কর ও মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে সমলঙ্কৃত হও এবং লম্বকর্ণের মতন প্রেমভরে বাহু তুলিয়া নাচিয়া বল যে জগতের জেঠা মহাশয় হিন্দু আমরা প্রপৌত্রের প্রদৌহিত্র সেমেতিক জাতি হইতে নাগরাক্ষর প্রাপ্ত হইয়াছি?

যাহা হউক ঋগ্‌বেদ বলিলেন যে—দেবতারা ভাষার উৎপাদয়িতা। কিন্তু তাঁহারা কে কি প্রকারে কবে, ভাষার উৎপাদন করেন, তাহা কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? আর যদি দেবতারা ভাষার স্রষ্টা হয়েন, তাহা হইলে কেন মহামান্য বৃহদারণ্যক ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ ঐতিহ্যের অবতারণা করিতে ছিলেন?

তং জাতং অভিব্যাদদাৎ স ভাণ্ অকরোৎ,
সা এব বাক্ অভবৎ। ৪১ পৃ জীবানন্দ সংস্করণং।

পরমেশ্বর সেই আদি মানব বিরাট্‌কে খাওয়াইবার জন্য মুখ ব্যাদান করাইলেন। অমনি তিনি "ভাণ" করিয়া শব্দ করিলেন, ইহাই ভাষা হইয়াছিল।

হঁা বৃহদারণ্যক এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইহা ও বাইবেলের পরমেশ্বর এবং আদম-ঘটিত কেচ্ছা সকল পুস্তির গল্প ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বৃহদারণ্যকের এ উক্তির প্রমাণ কি? তিনি কি উহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, না ইহা তাঁহার দৈবপ্রাপ্ত? ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ, অতএব ইহা কেহ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। ইহা ঋগবেদেরও বিরুদ্ধ বটে, সুতরাং ইহা বেদবিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য হইতেছে। মহামান্য মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন যে—

ধর্ম্মশাস্ত্রবিরোধে তু
যুক্তিযুক্তবিধিঃ স্মৃতঃ। ১৬ পৃ।

যে স্থলে উভয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিরোধ ঘটিয়া থাকে, তথায় যাহা যুক্তিসঙ্গত তাহাই বিধি বলিয়া গ্রহণীয়। পরমেশ্বর মানুষের সহিত সংলাপ করেন; মানুষের বেড়া বান্ধিয়া দেন, উক্ত মানুষের গলা চুলকাইয়া দেন, মানুষকে হা করাইয়া খাওয়াইয়া থাকেন, ইহা যুক্তি সত্য বলিয়া জানে না, সুতরাং বৃহদারণ্যক গ্রন্থপ্রণেতার এ কথা অগ্রাহ্য।

তবে দেবতারা কবে কেমন করিয়া প্রথমে ভাষার উদ্ভাবন করেন? তাহা অনধিগম্য। কেন না তখন লিখন পঠন প্রচলিত ছিল না, কেহ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াও রাখিতে পারেন নাই, তবে যখন মহামান্য বায়ুপুরাণ বলিয়া গিয়াছেন যে—

বেদাঃ সপ্তর্ষিভিঃ প্রোক্তাঃ
স্মার্ত্তং ধর্ম্মং মনুর্জগৌ।

তখন বুঝিতে হইবে যে, মরীচি, অত্রি প্রভৃতি সপ্তর্ষির পূর্ব্বে তাঁহাদিগের পিতা, পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনু, প্রজাপতি ধর্ম্ম ও প্রজাপতি দক্ষের পূর্ব্বকালীন কেহ বা কাহারা সর্ব্বাদৌ ভাষার উদ্ভাবন করিয়া থাকিবেন। তাঁহারা কি উপায়ে ভাষার উদ্ভাবন করেন? জগতের আদি গ্রন্থ সামবেদ বলিতেছেন যে—

অগ্রে বাচো, গোষু গচ্ছসি। ৫৬৫ পৃ জীবানন্দ সংস্করণ।

মানুষেরা সর্ব্বাদৌ গোরুর নিকট ভাষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথাহি ঋগবেদঃ—

বচোবিদং বাচ মুদীরয়ন্তীং বিশ্বাভি ধীভিরুপতিষ্ঠমানা।
দেবীং দেবেভ্যঃ পরি আঈয়ুষীং গা মা অমা বৃক্ত মর্ত্তো দভ্রচেতাঃ
১৬।৯০।৮ ম।

হে অল্পবুদ্ধি লোক সকল তোমরা আর এই মহোপকারকারিণী গাভীকে যজ্ঞে বলি দিও না। এই গাভী নানা প্রকারে আমাদিগের আনুগত্য করে, দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর, ছানা, নবনীত, সকল প্রকার উপাদেয় খাদ্য আমরা গাভী হইতে প্রাপ্ত হই, এই গাভী দেবীস্বরূপা, আমরা যে "অম্বা" কথাটী ব্যবহার করি, তাহা এই গাভী ও তাহার বৎসের নিকট হইতেই পাইয়াছি।

ফলতঃ গোবৎস, আমাদিগের অম্বাশব্দের প্রথম অধ্যাপক। গো বৎস হম্বা হম্বা রবে স্ব স্ব মাতার পশ্চাৎ ছুটিতেছে, আর এক এক টান মাই খাইতেছে, আমরা অমনি বুঝিয়া লইলাম যে যাহার মাই খাওয়া যায় তিনি "হম্বা"। আমাদিগের "অম্বা" এই হম্বা শব্দের সদ্যোবিকার। অবশ্য একালের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা এই অম্বা ও মা শব্দেরও ধাতু প্রত্যয় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু বলা বাহুল্য যে গোবৎস বা ছাগ ও মেষশাবকগণের কাহারই পাণিনি পড়া ছিল না। ফলতঃ আমরা আমাদিগের অম্বা ও মা শব্দ গোবৎস ও ছাগ, মেষ শিশু হইতে সংপ্রাপ্ত। এই দুইটী শব্দই মনুষ্য ভাষার প্রথম দুইটী শব্দ।

আমরা শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য হইয়া গরু বাছুরের নিকট ভাষা শিখিতে গিয়া ছিলাম, এ কেমন কথা? তাহা না হইলে সাম ও ঋগবেদ কেন তাহা লিখিতে যাইবেন? আর আমাদিগের স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, এই সপ্ত স্বরও কি আমরা পশু পক্ষীর চতুষ্পাঠী হইতে শিক্ষা করিয়া ছিলাম না? উক্তঞ্চ—

নিষাদং কুঞ্জরো রৌতি, গো রৌতি ঋষভং কিল।
অজো রৌতি চ গান্ধারং ষড়্জং রৌতি ময়ূরকঃ॥
ধৈবতং চাশ্বকো রৌতি ক্রৌঞ্চো নদতি মধ্যমং।
পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলো রৌতি পঞ্চমং॥ নারদঃ

হস্তীর বৃংহণের নাম নিষাদ স্বর (নি,) ষাঁড়ের ধ্বনির নাম ঋষভ (ঋ), ছাগের ধ্বনি গান্ধার (গ), ময়ূরের কেকা ধ্বনি ষড়্জ (ষ), অশ্বের হ্রেষা রবের

নাম ধৈবত (ধ), বকের ধ্বনির নাম মধ্যম (ম), আর পুষ্প সাধারণ বসন্তকালে কোকিল যে মধুর ধ্বনি করে, তাহার নাম পঞ্চম স্বর (প)।

অতএব আমরা গোবৎস হইতে "অম্বা" এবং ছাগ, মেষশাবক হইতে "মা" শব্দ পাইয়া আমরা প্রথম উহার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি। তৎপর তদানীন্তন সামাজিক নেতৃগণ বুদ্ধিপূর্ব্বক কতকগুলি শব্দ রচনা করেন। যেমন—

তত—পিতা, ততমহ—পিতামহ, তোক—পুত্র, তুক—পুত্র, তক্ম—পুত্র, গয়—পুত্র, অপ্ন—পুত্র, বহু—পুত্র, কন্যা, হস্ত, পদ, মস্ত (মস্তক), জল, গচ্ছ (গাছ), ঋষ—সুন্দর, জিব্রি—জরাজীর্ণ অভ্ব—মহান্। অক্তু—রাত্রি, অজ্ম—সংগ্রাম, অসু—মনুষ্য, অপঃ—কর্ম্ম, অমা—গৃহ, দম—গৃহ, নাকু—বল্মীক, অর্বা—অশ্ব, কিঃ—কর্ত্তা এবং শিরদাস্থ প্রভৃতি।

ঐরূপ তাঁহারা সকলের নাম বুঝাইবার জন্য—অস্মদ্, যুস্মদ্, যদ্ তদ্ ইদং, এতদ্ ও অদস্, প্রভৃতি আরও কতকগুলি শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, উহারাই সর্ব্বত্র সর্ব্বনাম সংজ্ঞার বিষয়ীভূত। তৎপর তাহারা ক্রিয়ার জন্য—

যা, গম্ হস্, ই, খাদ্, ক্রন্দ্, হন, বদ্, কথ, পা ও স্থা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দেরও উদ্ভাবন করিয়া লইলেন। তাহাতে সাধারণভাবে কথোপকথনের *কার্য্য চলিতে লাগিল। সেই প্রাচীনযুগের "অস্মদ্ ইষ ই" এখন ইংরাজদিগের* I wish.

অস্মদ্ গম্, অস্মদ্—যা, অস্মদ্—ই, আমি বা আমরা দুইজনে কিংবা *আমরা সকলে যাইতেছি, যাইব, বা গিয়াছিলাম।* ঐরূপ যুস্মদ্ গম্, যুস্মদ্—হস, তদ্ ইষ্ প্রভৃতি বাক্য রচিত হইতে লাগিল এবং লোকসকল তাহার দ্বারা অতি কষ্টে মনের ভাব অভিব্যক্ত করিতে লাগিলেন। কেন না তখন কাল, বচন ও পুরুষভেদে বাক্য রচনা করার কোনও কৌশল আবিষ্কৃত হইয়া ছিল না। একজন বলিল "অস্মদ্ গম্," অমনি তোমাকে বুঝিতে হইবে যে সে বলিতেছে যে—আমি যাইতেছি, বা যাইব, বা গিয়াছিলাম, বা আমার বা আমাদিগের যাওয়া উচিত।

এই ক্রিয়াবাচক গম্ ও স্থা প্রভৃতি শব্দ—মূল শব্দ, এ কারণ উহাদিগকে

বৈয়াকরণেরা শেষে ধাতু বা Root বলিয়া সংসূচিত করেন। অধ্যাপক বপ আপনার comparative grammar গ্রন্থের ভূমিকায় বলিতেছেন যে—

I shall not investigate for example, why the root i signifies, "go," and not 'stand" ; why the combination of sound stha or sta signifies "stand," and not go. .P. 3. Pref.

কিন্তু বপসাহেব যদি বেদপাঠ করিয়া বেদের প্রকৃতার্থ জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই সকল প্রশ্ন করিতে হইত না, কেন না দেবতারা ভাষা রচনা কালে—যা গতৌ, ই—গতৌ, স্থা—গতি—নিবৃত্তৌ. এই সকল অর্থ স্থির করিয়া ঐ সকল ক্রিয়াবাচক শব্দের সৃষ্টি করিয়া ছিলেন।

অতি পূর্ব্বে মানুষের কোনও ভাষা ছিল না, তাঁহারা অপগণ্ড শিশু বা বোবার ন্যায় আঁ, উঁ, প্রভৃতি অব্যক্ত শব্দে ও আকার ইঙ্গিতে কথা বলিতেন। কেনেরিদ্বীপের লোকেরা অদ্যাপি কোনও ভাষা জানেন না, তাঁহারা শিষ দিয়া কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাষাসৃষ্টির পূর্ব্বেই মানবের আদি জন্মভূমি মঙ্গলিয়া পরিত্যাগ করিয়া কেনেরি প্রভৃতি দ্বীপে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন। ঐরূপ ভাষার অপরিণত বয়সের সময়ে গার, কুকি, হাজম, আবর, সাঁওতাল ও কোল ভীল প্রভৃতি জাতিরা অসম্পূর্ণ ভাষা লইয়া দেবগণের বহু পূর্ব্বে ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়েন, তজ্জন্য তাঁহারা ভারতের আদিম নিবাসী বলিয়া পরিজ্ঞাত।

যাহা হউক ভাষার সৃষ্টির পরই মানুষের শক্তির তারতম্য এবং আব হাওয়ার বৈষম্যনিবন্ধন ভাষা বিকৃত হইয়া চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া ছিল। মহামান্য ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন যে—

চত্বারি বাক্, পরিমিতা পদানি,
তানি বিদু র্ব্রাহ্মণা, যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি,
তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥ ৪৫।১৬৪।১ম।

যাস্ক, সায়ণ ও অন্যান্য মনীষিবৃন্দ এই মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহা অতি বিস্তৃত এবং অতীব অকর্ম্মণ্য জিজ্ঞাসুগণ ইচ্ছা হইলে উহা পাঠ

করিয়া দেখিবেন। গ্রীফিত প্রভৃতি পাশ্চাত্যগণও ইহার প্রকৃতার্থ বুঝিতে পারেন নাই। আমাদিগের মতে ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা ইহাই।

প্রকৃতার্থ বাহিনী…………বাক্ সস্কৃত ভাষা—সৃষ্টা সতী চত্বারি চতস্রঃ চতুর্দ্ধা বভূব। পণ্ডিতগণপ্রযুক্তা মূলসংস্কৃতভাষা, নারীজনকথিতা সামান্য বিকারগ্রস্তা ভাষা, ভদ্রশিশুগণকথিতা ততোধিকবিকৃতা ভাষা, ইতর জনপ্রযুক্তা অত্যধিকবিকৃতা ভাষা। এতাসাং চতসৃণাং ভাষাণাং মধ্যে ত্রীণি তিস্রোভাষা গুহা গুহায়াং নিহিতা নিহিতানি স্থাপিতানি, ন ইঙ্গয়ন্তি প্রকাশন্তে স্ত্রীবালপ্রাকৃতজনানাং ভাষা তদা নাটকাদেরভাবাৎ গ্রন্থগতা ন অভবন্; অতএব তানি কুপোলচলানি বাক্যানি গুহানিহিতানি ইত্যুক্তং। পরন্তু যে পুন মনীষিণো মনীষাসম্পন্না ব্রাহ্মণা স্তে তানি সর্ব্বাণি চত্বারি বাক্যানি বিদুর্জানন্তি কথয়িতুং বোদ্ধুং বা শক্নুবন্তি ইতি। তুরীয়ং তুরীয়াং চতুর্থীং বাচঃ (ব্যত্যয়েন) বাচং মূলবিশুদ্ধসংস্কৃতভাষাং মনুষ্যাঃ সর্ব্বে সাধারণ পণ্ডিতা জনা বদন্তি কথয়ন্তি। তদা পদা পদানি পরিমিতা পরিমিতানি অল্পসংখ্যকানি আসন্। একেনৈব শব্দেন তদা বহ্বর্থা এব প্রকটিতা বভূবু রিত্যর্থঃ।

সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টির পরই উহা চারি ভাগে বিভক্ত হয়। পণ্ডিতগণ মূল সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতেন। সম্ভ্রান্তলোকদিগের নারীগণ, বালকগণ এবং ইতরলোকেরা প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিতেন, তৎকালে নাটকাদি গ্রন্থ ছিল না, অলঙ্কার গ্রন্থ ছিল না, তজ্জন্য প্রাকৃতভাষাত্রিতয় যেন গুহানিহিত ছিল। তৎকালে শব্দ অল্প ছিল, সকলে তদ্দ্বারা মনোভাবের অভিব্যক্তি করিতেন, এক কথায় বহু অর্থের অববোধ হইত। যেমন ইংরাজীভাষায় আঙ্কেল শব্দ (uncle) খুড়া, জেঠা, মামা, মেসো, সকলকেই বুঝাইয়া থাকে, তদ্রূপ বৈদিকযুগেও একটী সূনুশব্দদ্বারা পুত্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সূর্য্যের অববোধ করা হইত। (সূনুঃ পুত্রেঽনুজেঽর্কে চ'মেদিনী)।

ইউরোপীয়গণ এই সস্কৃত সূনু শব্দকেই (পাখোয়াজ কাটিয়া তবলা ও ডুগী গড়াইবার ন্যায়) দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করিয়া Sunu (পুত্র), Sunne (সূর্য্য), Son ও Sun এবং Zun. Zun প্রভৃতি শব্দ বানাইয়া লইয়াছেন। কিরূপে ভাষায় বিকার ঘটিতে ছিল? যেমন অস্মদ্—বিকারে হইল অস্মে। এই

অস্মের বিকারেই শেষে অহং হইয়া যায়। অহংহামে হান্‌;র বিকারে, আমি, ও আমির বিকারে I হইয়াছিল! ঐরূপ তোকের বিকারে তুক্ এবং তস্মের বিকারে তোক্ম ও কন্যার বিকারে কনী প্রভৃতি হইয়া ছিল।

এইরূপে ভাষার উৎপত্তি এবং বিকারদ্বারা উহার বিস্তৃতিসাধন হইতে থাকে। গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, জেন্দ, এবং জর্ম্মান প্রভৃতি সকল ভাষাই সংস্কৃতের বিকারপ্রভব। অবশ্য কতকগুলি কথার আমরা নিদান নির্দ্দেশ করিতে পারি না, উহার কারণ তিনটী। প্রথম কারণ বহু বিকারের ভিতর দিয়া ঐ সকল বৈদেশিক শব্দের সমাগম হওয়ায় উহাদের নিদান শব্দ ধরিতে সমর্থ হইতে পারি না। যেমন বরিশালের "আল্‌হে" পদটী যে সংস্কৃত আসীৎ (আছিল) পদসম্ভূত, উহা সহজ বোধ্য নহে। দ্বিতীয় কারণ প্রাদেশিকত্ব। মনে কর কলিকাতার লোকে ঝাঁটাকে বলেন "খেঙরা," বরিশালের লোকেরা বলিয়া থাকেন "পিছা" ও ময়মনসিংহের লোকেরা বলিয়া থাকেন "সাচ ইন।" এই তিনটী শব্দই বিশুদ্ধ সংস্কৃত প্রভব। পিছা—পিচ্ছা খেঙরা—খিঙ্খরী ও সাচইন সম্মার্জ্জনী শব্দপ্রভব। ব্যজন শব্দের অর্থ পাখা, ময়মনসিংহে উহাকে "বিছন" বলে, আর বিলাতে যাইয়া ব্যজন Fan এ পরিণত হইয়াছে (ব্যজন = ফ্যজন = ফ্যঅন = Fan)। অতএব বিলাতের বহু শব্দ যে প্রাদেশিকত্ব নিবন্ধন আমাদিগের সহসা অনধিগম্য হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। আমাদিগের পোত—পোলা (বিক্রমপুর), পোয়া (বরিশাল) ও পোতী—পুলী বা পীলে এবং লাটিনে উহা Puella মূর্ত্তিতে বিরাজমান। আমাদিগের সমিতি লাটিন ভাষায় Senet ও ইংরাজী ভাষায় Committee হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ আমাদিগের ভবতি, লাটিনে Havet, গথিকে Hava এবং প্রাকৃতে ভোদি ও হোদিহইয়াছিল। বাঙ্গালার হয় ও ইংরাজী is, উহারই অধস্তন সন্তান। সংস্কৃত চত্বারঃ হইতে লাটিন qauter, এবং পারসী চাহার শব্দ সমাগত। আমাদিগের দ্রাবয়িতারঃ ই ইংরাজীতে Driver এবং ভাতিগ্রভীতারঃ পদ Photographer এ পরিণত। পোত = Boat.

ভাষাগত সাম্য না বুঝিবার তৃতীয় কারণ—প্রত্যেক ভাষায় নূতন নূতন শব্দের সমাগম। তথাপি কাহারাও ইহা মনে করা উচিত নহে, যে, জগতের ভাষা সকল সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ বস্তু, অথবা গ্রীক, লাটিন, জেন্দা ও সংস্কৃত

ভাষা পরস্পর পরস্পরের ভগিনী, উহাদের আর একটী মাতৃভাষা আছে। ফলতঃ গ্রীক লাটিন প্রভৃতি ভাষার প্রায় প্রত্যেক শব্দই যখন লৌকিক সংস্কৃত প্রভব, তখন ঐ সকল বৈদেশিক ভাষার আর একটী স্বতন্ত্র নিদানের কল্পনা করা বাতুলতা বিশেষ মাত্র।

অপিচ যখন মঙ্গলিয়ার লোক সকল সর্ব্বাদৌ একমাত্র ভারতবর্ষেই আগমন করিয়াছিলেন, ও তৎপর তুরুষ্ক, পারস্য এবং আফগানিস্থানের উৎপত্তি হইলে পর ভারতবর্ষের লোকেরা ঐ সকল দেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন, কালে ইউরোপ (হরিয়ুপীয়া ৫২৭।৬ ম), আফ্রিকা, আরব এবং সাইবেরিয়া মহঃ—তপঃ—সত্য) লোক স্থলে পরিণত হইলে ভারতের লোক ঐ সকল দেশে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন ঐ সকল দেশের ভাষা কি প্রকারে সংস্কৃতের বিকার ভিন্ন অন্য কোন কোনও পদার্থ হইতে পারে?

যাহা হউক এইরূপে ভাষার উৎপত্তি ও বিকার হওয়ার পর বৃহস্পতি, ইন্দ্র, চন্দ্র ও শিব প্রভৃতি দেবগণ সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার আদেশে দেবগণের প্রার্থনায় ঐন্দ্র চান্দ্র ও মাহেশ নামে তিনখানি ব্যাকরণ রচনা করিয়া মূল গীর্ব্বাণবাণীর সংস্কারসাধন করিলে উহা সংস্কৃতভাষা নামে প্রখ্যাতিলাভ করে,মূল গীর্ব্বাণবাণী ও সংস্কৃতভাষা একই বস্তু। দাড়ি ও গোঁফ কামাইলেও রামচন্দ্র যেমন রামচন্দ্রই থাকেন, তদ্রূপ ক্রিয়া বিভক্তি, কাল, পুরুষ এবং বচনের ব্যবস্থাদ্বারা ভাষার সংস্কার সাধিত হইলেও উহা যে সেই একই গীর্ব্বাণবাণী বা দেবীবাক্, ইহা ভাবিতে হইবে।

আমরা প্রবন্ধান্তরে ভাষার সংস্কারের কথা বলিব, সম্প্রতি ভাষার উৎপত্তি এবং আংশিক বিস্তারের কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শ্রীউমেশচন্দ্রবিদ্যারত্ন।

৩৭।১ শঙ্কর হালদার লেন, কলিকাতা।

ঋগ্বেদের ভাষ্যকার ও মানবের আদি জন্মভূমি প্রণেতা।

প্রাচীন ভারতীয় কথা।

যখন আমরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উন্মোচন করি তখন দেখিতে পাই আধুনিক বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় গর্ব্বিত পাশ্চাত্য জাতি অপেক্ষা প্রাচীন ভারতীয় নর-নারীগণ জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, জ্যোতিষে কোন অংশেই ন্যূন ছিলেন না। যখন পৃথিবীর অন্যান্য জাতি তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রায়ুধ বন্য পশুর ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিত, শাখামৃগের ন্যায় বন্য ফল মূলে আপনাপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তখন ভারতবাসী উন্নত প্রণালীতে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কৃষিকর্ম্মের পরিচালনা করিত। এ কথা কবির কল্পনা নহে, ইহা বাস্তব সত্য, যথার্থ কথা। ভারতে কি না ছিল, বিরাটকায় অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া ফেণিল সমুদ্র অতিক্রম করতঃ দূর দূরান্তরে যাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য ও নবনব উপনিবেশ স্থাপন করিতেন, ভারতবাসী ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া মেঘলোক হইতে শত্রুর উপর ইরম্মদতুল্য বাণ নিক্ষেপ করিতেন, ভারতবাসী আধুনিক সুপ্রণালীসম্মত গবর্ণমেণ্টের ন্যায় অতি সুশৃঙ্খলায় রাজ্যশাসন করিতেন, কিন্তু অধুনা একথা নিশার স্বপন সম অলীক। মিসেস্ বেসাণ্ট্ তাঁহার মান্দ্রাজ বক্তৃতার একস্থলে বলিয়াছিলেন—

No living nation has a grander history behind it, stretching far and far back into the night of time than has the Indian nation, that has now awakened to the splendour of its past and is looking forward to the great splendour of its future.

পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতিরা ভারতবর্ষের অপেক্ষা প্রাচীন যুগে যে সভ্যতায় ও সমৃদ্ধিতে উচ্চতর ছিল, এই কথা বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করে। কিন্তু ভারতের প্রাচীনেতিহাস ও অন্যান্য জাতীর প্রাচীনেতিহাসের সহিত তুলনা করিলে কেহই তাহাদিগকে উচ্চাসন প্রদান করিতে পারে না। প্রাচীন ইজিপ্টের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে তাহাতে কেবল তত্রত্য রাজন্যবর্গের, পিরামিড নির্ম্মাতাগণের নাম ও যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণ ভিন্ন অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। আবার আসিরিয়া ও বাবিলনের ইতিহাসেও ঐ একই বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

এমন কি প্রাচীন চৈনিক ইতিহাসেও মানব জাতির কিরূপে ক্রমবিকাশ হইল তাহার বিন্দুমাত্র উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ভিন্ন প্রকারের। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে যদিও যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজন্য-বৃন্দের ধারাবাহিক নাম প্রভৃতি নাই, তথাপি তাহাতে যাহা আছে তাহা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির প্রাচীন ইতিহাসে নাই। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে সভ্যতার ক্রমবিকাশ, মানব-চরিত্রের ক্রমোন্নতির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত আছে। প্রস্তরে, গিরিগাত্রে, পর্ব্বতগুহায় খোদিত লিপিসমূহ ভারতের অতীত ইতিহাসকে জাজ্বল্যমানভাবে লোকলোচনের সমক্ষে স্থাপন করিয়াছে। যাহারা বলে প্রাচীন ভারতের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। প্রাচীন ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে, আমরা সেই প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাই কিরূপে একটা সুসভ্য জাতি বহির্জগৎ হইতে বিমুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণপূর্ব্বক প্রকৃতির অনুকূলে থাকিয়া আপন আপন সভ্যতা ও চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতে দেশ কি এমনি ছিল? এমন জঠরজ্বালায় লোকে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিত না, চৌর্য্যবৃত্তির নামও কেহ জানিত না, ভারতমাত সর্ব্বৈশ্বর্য্য-বিভূষিতা হইয়া স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সন্তানগণকে পেট ভরিয়া ভাত খাওয়াইতেন ও জাহ্নবী যমুনারূপী স্তনদ্বয় হইতে মধুর পিযুষধারা পান করাইতেন। ভারত তখন স্বর্গের অমরাবতীর নৈসর্গিক শোভাকেও তুচ্ছ করিয়া জগতের দ্বারে দ্বারে জ্ঞান বিজ্ঞানের স্নিগ্ধ আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করিতেন। কিন্তু যাউক সে সব কথা। প্রাচীন ভারতের কথা বলিতে গেলে প্রথমে পঞ্চনদে আর্য্যজাতির উপনিবেশ স্থাপনকাল হইতেই আরম্ভ করিতে হয়. এই সময় হইতেই বৈদিক যুগ আরম্ভ এবং এই সময় হইতেই "সাম ঝঙ্কারে মধুর ওঙ্কারে" আর্য্যগণ দিগ্বমান কম্পিত করিতেন। কিন্তু এই আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান লইয়াই মহা মতভেদ অদ্যাপিও প্রচলিত রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন ভারতবর্ষ আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান নহে। ঋগ্বেদে দস্যু, দাস, অসুর রাক্ষস আদি যে সমস্ত অনার্য্য ও অসভ্য জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় তাহারাই ভারতের আদিম অধিবাসী, আর্য্যেরা ভিন্ন দেশ হইতে আগমন করতঃ ইহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া

এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। কেহ কেহ বলেন যে আর্য্যেরা পূর্ব্ব-মধ্য এশিয়ায় বাস করিতেন, আবার লোকমান্য, তিলক প্রভৃতি মনীষীগণ বলিতে চান যে আর্য্যেরা উত্তর মেরু হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশাল সংস্কৃত সাহিত্য-সমুদ্র মন্থন করিলে আর্য্যগণ যে ভিন্ন দেশ হইতে এ দেশে আগমন করিয়াছেন তাহার বিন্দুমাত্র উল্লেখ বা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বলিয়াছেন—

It is opposed to their (Hindus) foreign origin that neither in the code of Manu nor I believe in the Vedas, nor in any book that is certainly older than the code, is there any allusion to a prior residence, or to a knowledge of more than the name of any country out of India. Even mythology goes further than the Himalayan chain, in which is fixed the habitation of the Gods!

অর্থাৎ কি মনুস্মৃতি, কি বেদ, কোন পুস্তকেই আর্য্যজাতি যে বিদেশ হইতে আসিয়া এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। হিমালয়ের পরপারে আর্য্যজাতির দেব-দেবীরও কোন আবাস স্থান ছিল এমন কোন উল্লেখও নাই।"

বস্তুতঃ ভারতবর্ষই সংসারের জন্মস্থান। ভারতবর্ষই জগতের জননীরূপে বিশ্ববাসীকে ভাষা, রীতি, নীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং মহাত্মা তিলক প্রভৃতি বেদ বিদ্‌গণ যাহাই বলুন আমাদের বিশ্বাস সরস্বতীরই প্রান্তভাগ আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান। আর্য্যজাতি অন্য কোন দেশ হইতে এ দেশে আসেন নাই, এদেশেই তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এদেশেরই নীবারকণায় তাঁহারা পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন, আবার এই দেশেই জ্ঞানবিজ্ঞানের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া জগৎকে ভারতমহিমা দেখাইয়াছিলেন। সরস্বতী আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান বলিলাম এই কারণে, সে যদি সরস্বতী আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান না হইত তাহা হইলে ঋগ্বেদে "ত্বে বিশ্বা সরস্বতি শ্রিতায়ুংষি দেব্যাম্" অর্থাৎ হে সরস্বতি তুমি দেবীরূপা, সমস্ত প্রাণী—তোমা হইতেই জীবন প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি প্রকারের স্তুতিবাচক কথা থাকিত না। যখন দেখিতে পাই আর্য্যেরা "উত ক্ষিতিভ্যো বেনীর বিন্দঃ" অর্থাৎ হে সরস্বতি

তুমি মনুষ্যদের জন্য ভূমি দান করিয়াছ, ইত্যাদি প্রকারে সরস্বতীকে বন্দনা করিয়াছেন, যখন দেখিতে পাই আর্য্যগণ সরস্বতীকে “দেবীতমে, নদীতমে, অম্বিতমে” প্রভৃতি গৌরবসূচক আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন, যখন দেখিতে পাই আর্য্যেরা কৃতাঞ্জলিপুটে সরস্বতিকে বলিতেছেন হে সরস্বতি আমাদের যশ ও প্রতাপ বাড়াও, তোমার দুগ্ধ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না, প্রসন্নতার সহিত আমাদের মৈত্রী ও সেবা কর, আমাদ্দিগকে তোমার নিজের পার্শ্ব হইতে অন্যত্র যাইতে দিও না।” ইত্যাদি প্রকারের স্তুতিবাচক সূক্ত ঋগ্বেদে ভূরি ভূরি রহিয়াছে, তখন মনে হয় “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী” বোধেই আর্য্যেরা সরস্বতীকে দেবীতমে আখ্যায় আখ্যায়িত করিতেন। আর্য্যেরা প্রথমতঃ গঙ্গার প্রান্ত হইতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কাবুল বা কুম্‌কুমা হইতে ভারতে আসেন নাই। যদি আসিতেন তাহা হইলে ঋগ্বেদে অবশ্যই গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শুতুদ্রি, পরুষ্ণী (Ravi) আর্জিকিয়ার (Bias) প্রভৃতির নাম অগ্রে ও কুভা বা কাবুল এবং গোমতী বা গোমল নদীর নাম সর্ব্বশেষে থাকিত না। মনুষ্যের স্বভাবই এই যে, যে যে বস্তুকে প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করে সর্ব্বাগ্রে সেই নামটিই উচ্চারণ করে। আমরা পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বাগ্রে “মা” “মা” বুলিই বলিতে শিখি; তৎপরে ক্রমে বাবা, দাদা, দিদি, পিসী, মাসী প্রভৃতি যাহার সহিত যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পর পর ঠিক্ সেই নামটি উচ্চারণ করিতে শিখি। ঋগ্বেদে অগ্রে গঙ্গা; তৎপর যমুনা, তৎপর সরস্বতীর নাম উল্লেখ থাকায় এবং আর্য্যগণ এই গঙ্গা যমুনা, সরস্বতী শুতুদ্রি, পরুষ্ণী, মরুদ্বৃধ অশ্নিনী, আর্জিকিয়া প্রভৃতি নদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন তোমরা কুভা বা কাবুলের সহিত মিলিত হও, ইহা দ্বারা বেশ প্রতীতি হইতেছে যে আর্য্যগণ গঙ্গার প্রান্ত হইতেই পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এবং এরূপও মনে হয় বুঝি বা আর্য্য-জাতির আদি বাসস্থান সরস্বতীর প্রান্তভাগ না হইয়া আমাদের পুণ্যসলিলা ভাগীরথীই হইবেন। নতুবা ঋগ্বেদীয় সূক্তের কোনই মূল্য থাকে না। আবার ঋগ্বেদ যে ভারতের মধ্যে—শুধু ভারতের কেন জগতের মধ্যে অতি প্রাচীনতম গ্রন্থ এ সম্বন্ধে কোনই মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। স্বয়ং মহামতি মোক্ষমুলার বলিয়াছেন—

The Vedas, I feel convinced, will occupy scholars for centuries to come and will take and maintain for years its position as the ancient books in the library of mankind.

"অর্থাৎ বেদ মনুষ্যজাতির পুস্তকালয় মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে।"

অতএব ঋগ্বেদের সদৃশ প্রাচীন গ্রন্থে অন্যান্য বিপুলকায়া নদীর পরিবর্ত্তে সরস্বতীর উল্লেখ দেখিয়া ইহাই কি প্রতীতি হয় না যে আর্য্যগণ সরস্বতীরই প্রান্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সরস্বতীর প্রান্ত হইতে আর্য্যগণ অগ্নি প্রভৃতি যজ্ঞীয় সম্ভার লইয়া সদানীরা পর্য্যন্ত আগমন করেন। "অগ্নে ত্বা পূর্ব্বমনযন্" অর্থাৎ হে অগ্নে! তুমি পূর্ব্বদিকে আর্য্যদিগকে লইয়া গিয়াছ এই ঋগ্বেদীয় সূক্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে আর্য্যগণ সরস্বতীর প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মনু ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্ত ও ম্লেচ্ছ-দেশের সীমা নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তের সীমা নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন—যে দেশের উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র বিদ্যমান সেই দেশকেই আর্য্যাবর্ত্ত বলে। "ম্লেচ্ছদেশ স্তুতঃপর" অর্থাৎ ইহা ছাড়া অন্য যে সমস্ত দেশ তাহাই ম্লেচ্ছদেশ। এখন দেখুন আর্য্য-গণ যদি ভারতে বিদেশী হইতেন, তাহা হইলে মনু কখনও "ম্লেচ্ছদেশ স্তুতঃ পর" কথা বলিতেন না। ইহা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী প্রান্তে যাহা মনুতে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ বলিয়া আখ্যায়িত হইয়াছে সেইখানেই—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রথমে সৃজন কার্য্য আরম্ভ করেন। সুতরাং মানবের আদি জন্মভূমি প্রণেতা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় যে মঙ্গোলিয়াকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন আমরা তাহা অম্লানবদনে স্বীকার করিতে পারি না। আপনারা জানেন আর্য্যেরা সোম যজ্ঞ নামে একটি যজ্ঞ করিতেন। "যজ্ঞস্য পূর্ব্বঃ" এই কথা হইতে প্রতিপাদিত হইতেছে যে সোমযজ্ঞ অতি প্রাচীন যজ্ঞ। সোমরস বলবীর্য্য বর্দ্ধক বলিয়া দেবতারা ইহা পান করিতেন। ঋগ্বেদে আছে "সোমস্যেব মৌজ্জাবতস্য ভক্ষঃ" অর্থাৎ সোমের উৎপত্তি মুজ্জাবত পর্ব্বত। এই মুজ্জাবত

পর্ব্বতের স্থান নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে মহাভারত বলিয়াছেন—"গিরিহি ভবতঃ পৃষ্ঠে মুঞ্জবান্নাম পর্ব্বতঃ" অর্থাৎ মুঞ্জাবত পর্ব্বত হিমালয়ের পৃষ্ঠ ভাগে অবস্থিত। ঋগ্বেদে কিন্তু কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী শার্য্যনাব নামক স্থানে সোমরসের উৎপত্তি স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ কি ঋগ্বেদ, কি মহাভারত কোন গ্রন্থেই এমন কোন উল্লেখ নাই যে সোমরস ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যাইত। আপনারা বিচার করুন যদি সোমযজ্ঞ আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত যজ্ঞসমূহের অতি প্রাচীনতম যজ্ঞই হয় এবং ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোথায়ও যদি সোমরস না পাওয়া যায় তাহা হইলে আর্য্যেরা কি উত্তর মেরু কিংবা মঙ্গোলিয়া হইতে পবননন্দন হনুমানের ন্যায় শূন্যভরে হিমালয়ে আগমন করিয়া সোমরস লইয়া যাইতেন? যে দেশে যে খাদ্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় তত্রত্য দেশের অধিবাসী সেই খাদ্যেই আসক্ত হয়। আমরা বাঙ্গালী, বঙ্গদেশ মৎস্যের লীলাভূমি, বাঙ্গালার জলাশয়ে, সরোবরে নদী, খালে, বিলে, তড়াগে সর্ব্বত্রই প্রচুর মৎস্য উৎপন্ন হয়, তাই আমরা চৌদ্দ আনা লোক মৎস্যাশী। আবার আমাদের হিন্দুস্থানী ভায়াদের দেশে জলাশয়ের অপ্রাচুর্য্য হেতু তাঁহারা ঝাঁটা ও শাক্ সবজীতেই পরম সন্তুষ্ট। এই প্রকার মামুলী উদাহরণ হইতেই বুঝা যায় যে আর্য্যগণ এ দেশেরই অধিবাসী হওয়ায় এবং সোমরস এদেশেই অনায়াসলভ্য ছিল বলিয়া তাঁহারা এই রসপানে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

যাঁহারা মধ্য এশিয়াতেই আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান বলিয়া উল্লেখ করেন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান নজির এই যে, ভারতীয় বৈদিক ভাষার সহিত গ্রীসীয়, রোমীয়, পারসিক প্রভৃতি প্রাচীন জাতিগণের ভাষাগত একতা আছে, সুতরাং তাঁহারা যে এক বংশ হইতে উৎপন্ন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সত্য বটে বেদে যে সপ্তসিন্ধু কথা আছে—পারসিকগণের জেন্দাবাস্তায় তাহা হপ্তহিন্দু বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সত্য বটে বৈদিক ও আবস্তিক দেবতাগণের নাম ও কার্য্য কলাপের বিস্তর সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, সত্য বটে ভারতবর্ষ ও পারশ্য দেশীয় ধর্ম্ম ও পৌরাণিক উপাখ্যানে অনেকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, সত্য বটে বেদের সপ্তসিন্ধু, সোম, অসুর, মিত্র, উশনস্ প্রভৃতি শব্দ জেন্দাবস্তায় সপ্তসিন্ধু, হোম, অহুর মিত্র, ক্রতিপ শব্দে পরিণত হইয়াছে তথাচ এমন কথা বলিতে পারিনা যে,

আর্য্যগণ পারশীক ও ইরাণীসম্প্রদায়ের সহিত ভারতের বহির্ভাগে বাস করিতেন। আধুনিক পারশী ও ইরাণী সম্প্রদায় প্রাচীন আর্য্যজাতিরই সন্তান। পারশীগণ সরস্বতীতীরে আর্য্যদের সহিত একত্রে বাস করিতেন এবং মিত্রবরুণ অর্থাৎ আকাশ ও সূর্য্যকে একত্রে উপাসনা করিতেন, কারণ বেদের বরুণ দেব ও আকাশ, ইরাণীয়দের বরুণ দেব ও আকাশ। বেদ মধ্যে বিস্তর স্থানে মিত্র এবং বরুণ একত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। মিত্র বরুণ পৃথিবী এবং আকাশের উপর আধিপত্য করেন এবং সূর্য্যকে গগনমণ্ডলে স্থাপিত করেন। ইঁহারাই পৃথিবীর রক্ষক ইহাদেরি নির্দ্দেশ অনুসারে আকাশ জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট হয় এবং মেঘ বারিবর্ষণ করে। জেন্দ অবস্থায় মিত্র স্থলে মিত্র এবং বরুণ স্থলে অহুরোমজদ নাম দৃষ্ট হয়, বলা বাহুল্য সংস্কৃত অহুরো মেধস্" শব্দ হইতেই পারসিক অহুরোমজ্‌দের কথা নিস্পন্ন হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যদি আর্য্যগণের সহিত পারশীকগণ একত্রে পঞ্চনদে বাস করিবেন তবে তাঁহারা তাঁহাদের ছাড়িয়া ইরাণদেশে গমন করিলেন কেন? ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতভেদই ইহার প্রধান কারণ। প্রথমতঃ আর্য্যগণ সূর্য্যোপাসক ছিলেন, ক্রমে বৈদিক যজ্ঞীয় কর্ম্মে তাঁহারা রত হইতে লাগিলেন, পারশীকগণ তাঁহাদের যজ্ঞীয় কর্ম্মে বাধা দিতে লাগিলেন, তখন আর্য্যগণের সহিত তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, ফলে যজ্ঞকর্ম্মের বিরোধী পারশীকগণ রণে ভঙ্গ দিয়া একেবারে পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, আর্য্যগণ ইহাদিগকে অসুর, রাক্ষস, দাস, কৃষ্ণত্বক, কৃষ্ণযোনি ইত্যাদি অভিধা দিয়া দূর করিয়া দিলেন।

যে ডাকাতি করে তাহাকে আর্য্যেরা দস্যু বলেন নাই। "অনুষ্ঠাতৃ নামুপক্ষ পয়িতার শত্রু।" অর্থাৎ যজ্ঞকারীদিগের শত্রুই দস্যু। "দাসা কর্ম্মহীনা শত্রু কর্ম্মহীন ব্যক্তিই দাস। সুতরাং দস্যু, দাস শব্দ প্রভৃতি পরাজিত ব্যক্তিবাচক শব্দ নহে, পরন্তু কর্ম্মহীন শত্রুবাচক। বৈদিক কালে আমাদের আর্য্যগণ আপনাদিগের ব্যতীত অন্য কোন ভিন্ন জাতিকে ভারতবর্ষের অধিবাসী বলিয়া জানিতেন না। এই কারণে তাঁহারা দস্যু ও শূদ্র জাতিকে কোথাও ভারতের আদিম অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কেবল মাত্র কর্ম্মহীন বা শত্রুশব্দে তাহাদিগকে অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপে ঐতিহাসিকগণ যে বলেন এদেশে আর্য্যজাতির আগমনের পূর্ব্বে অনার্য্য নামে আধুনিক কোল দ্রাবিড় তুরণীয়-

গারো কুকী প্রভৃতি অসভ্য জাতির পূর্ব্বপুরুষ "অনার্য্যেরা" বাস করিত এ কথা সর্ব্বভিত্তিহীন। অনার্য্য শব্দ জাতিবাচক নহে, উহা একটি শত্রুবাচক শব্দমাত্র। যাঁহারাই যজ্ঞীয় কর্ম্মকাণ্ডে উৎপাত উপদ্রব জন্মাইত এবং যাঁহারাই যজ্ঞীয় কর্ম্মের বিরোধী হইত তাঁহারাই অনার্য্য নামে অভিহিত হইত। পুলস্তকে বাল্মিকী ব্রহ্মর্ষি আখ্যায় আখ্যায়িত করিলেও তাঁহারই বংশধর রাবণকে "রাক্ষস" আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে কৌশল্যাকে আর্য্যা অভিধা দিয়া বাল্মিকী কৈকেয়ীকে অনার্য্যা বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। সেই কল্পনাতীত যুগে কর্ম্মকাণ্ডবিরহিত হওয়ায় আর্য্যগণ যদি পারশীক সম্প্রদায়কে যজ্ঞ কর্ম্মের বিরোধী দেখিয়া দূর করিয়া দিয়া থাকেন এবং দস্যু, অসুর প্রভৃতি মধুর বিশেষণে তাহাদিগকে আখ্যায়িত করিয়া থাকেন এবং পারশীকরা ইরাণ দেশে যাইয়াও যদি আর্য্যদের অনুসৃত সূর্য্যো পাসনা অক্ষুন্ন রাখিয়া থাকে তাহা হইলে কি বলিতে হইবে, তাহারা এদেশের অধিবাসী ছিল না, আর্য্যেরাই তাহাদের দেশের অধিবাসী? আর্য্যেরা— দিগ্বিজয় করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, কালিদাসের রঘুর দিগ্বিজয় যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন এই দিগ্বিজয় বস্তুটা কি ঘোরতর ব্যাপার ছিল। এই দিগ্বিজয় ব্যপদেশে তাঁহারা পৃথিবীর সমস্ত দেশ বিজয় করতঃ এবং প্রত্যেক দেশে আপন সভ্যতার পদচিহ্ন রাখিয়া তাঁহারা পরিশেষে উত্তর মেরুতে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। উত্তর মেরু হইতে গ্রীস দেশে গিয়াছিলেন, কুক্ টেলার প্রভৃতি ইহার জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষী। "আয়র" শব্দ আর্য্যশব্দেরই অপভ্রংশ হওয়ায় অনেকে অনুমান করেন যে আয়রলণ্ডেও আর্য্যজাতির উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। এই সেদিনও মেক্সিকোর অধিবাসীরা হস্তিশুণ্ড সমন্বিত গণপতির পূজা করিতেন। ইহা ছাড়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে আর্য্য সভ্যতার যে সমস্ত লুপ্ত কীর্ত্তি দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাতে এই সমস্ত স্থানেও যে আর্য্যজাতি গমন করিয়া সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। অনেকে আর্য্যগণ যে এ দেশের অধিবাসী নহেন পরন্তু অন্য কোন শীতপ্রধান দেশ হইতে এদেশে তাঁহারা আসিয়াছিলেন ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলেন যে আর্য্যগণ শ্বেতকায় এবং তাঁহারা যে সকল অনার্য্যদিগের

সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহারা কৃষ্ণবর্ণ। অতএব শ্বেতকায় আর্য্যজাতি কখনই এদেশের অধিবাসী হইতে পারে না।" আমরা এই শারীরিক বর্ণ দেখিয়া তাহার জন্মস্থান নিরূপণ ব্যবস্থার পক্ষপাতী নহি। এই ভারতেই এখনও স্থানভেদে শ্বেত, গৌর, কৃষ্ণ নানা বর্ণের অধিবাসী রহিয়াছে। এ দেশের কাশ্মীরের অধিবাসীগণ অনুপম সুন্দর. আবার সাঁওতাল পরগণার অসভ্য সাঁওতালীরা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। আমারই বংশে আমি সুন্দর এবং আমার সহোদর অতি কৃষ্ণবর্ণ। তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে আমি ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি আর আমার সহোদর সাঁওতাল পরগণায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমেরিকার জনৈক শ্বেতাঙ্গী মহিলার গর্ভে একটি মসীবর্ণ সন্তান প্রসূত হইয়াছিল, এ গল্প হয়ত অনেকেই জানেন। তাই বলিয়া কি শ্বেতাঙ্গী সন্তানকে দুই তিন যুগ পরে আফ্রিকার বংশোদ্ভব বলিতে হইবে? এই ভারতেই জল, বায়ু, আর হাওয়া, জীবিকানির্ব্বাহের প্রণালীভেদে কায়িক বর্ণের অনেক পার্থক্য আজও যখন চক্ষুর সম্মুখে অহঃরহ দেখিতেছি তখন আর্য্যদের বর্ণ শ্বেত আর অনার্য্যদের বর্ণ কৃষ্ণ ছিল বলিয়া আর্য্যগণ মধ্যএশিয়া হইতে এদেশে আগত এবং অনার্য্যগণ এ দেশের আদিম অধিবাসী বলিয়া যাঁহারা নিজের পিতৃপুরুষ ও স্বদেশের মুখ নত করিতে চান তাঁহারা করুন, আমরা কিন্তু ভৈরব নিনাদে বুক ফুলাইয়া বলিব—আমরা ভারতের সেই আদি অধিবাসী আর্য্য জাতিরই সন্তান। আমরা চিরদিনই গগণভেদী রবে গাহিব—

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা
করিল জয়
একদা যাহার অর্ণব পোত ভ্রমিল
ভারত সাগরময়
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে
গঠিল উপনিবেশ
তুই ত না মাগো তাদের জননী—
তুই ত না মাগো তাদের দেশ

উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা
মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার
আজিও জুড়িয়া অৰ্দ্ধ জগত ভক্তিপ্রণত
চরণে যার
অশোক যাহার কীর্ত্তি ছাইল
গান্ধার হ'তে জলধি শেষ
তুই ত না মাগো তাদের জননী
তুই ত না মাগো তাদের দেশ।

আমি এইখানেই এবিষয়ের উপসংহার করিয়া বৈদিক যুগে আর্য্যজাতির সভ্যতা ও সামাজিক, রাজনৈতিক রীতি নীতি প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। আমি এতক্ষণ আপনাদের নিকট যে অনধিকার চর্চ্চা ও ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়া প্রলাপ বকিয়াছি তাহা হইতে সম্ভবতঃ আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে আমার এই সন্দর্ভের মূলপ্রতিপাদ্য বিষয় এই যে আর্য্যগণ ও অনার্য্যগণ এই ভারতেরই অধিবাসী—বুঝিতে পারিয়াছেন যে অনার্য্য বলিয়া একটি স্বতন্ত্র জাতি ছিল না, বুঝিতে পারিয়াছেন যে যাঁহারাই বৈদিক যজ্ঞীয় কর্ম্মে আস্থাহীন ছিল এবং যাহারাই তাহাতে বাধা জন্মাইত আর্য্যগণ তাহাদিগকেই অনার্য্য আখ্যায় আখ্যায়িত করিতেন— বুঝিতে পারিয়াছেন যে পারশীক, জার্ম্মানী, গ্রীক, ইটালি প্রভৃতি যে সমস্ত জাতির ভাষার সহিত আর্য্যদিগের বৈদিক ভাষার সৌসাদৃশ্য আছে তাহারা আর্য্যদিগের সহিত এই দুঃখ দারিদ্রের কষাঘাতে জীর্ণা, অভিশপ্তা ভারত জননীর অঙ্কে বাস করিত—ভারতেরই অমৃতোপম পীযূষধারাপানে তাহারা লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল! কালক্রমে বৈদিক কর্ম্মে আস্থাহীন হওয়ায় তাহারা পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করে। এই কয়েকটি কথাই আমার উল্লিখিত প্রলাপের সারমর্ম্ম। মহাত্মা তিলক, পণ্ডিত উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন, ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহামতি ভাণ্ডার কর, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ব বিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত ও গবেষণার প্রতিকূলতাচরণ করিবার ধৃষ্টতা হৃদয়ে পোষণ করি না, তবে শাস্ত্রে আছে—

বালা দপি গৃহীতব্যং যুক্ত মুক্তং মণীষিভিঃ
রবে রুদয়ে কিংন প্রদীপস্য প্রকাশনম্

অর্থাৎ বালকও যদি যুক্তিযুক্ত কথা বলে তাহাও মণীষিগণ গ্রহণ করিবেন। আর্য্যজাতির আদিম নিবাস সম্বন্ধে এ তাবৎকাল যে সমস্ত মনীষাসম্পন্ন মহাত্মাগণ চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের বয়সের তুলনায় আমি বালক এবং তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধির তুলনায় আমার বিদ্যা বুদ্ধি বালকোচিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না. সুতরাং আশা করি আপনাদের ন্যায় মনীষিগণ উল্লিখিত শাস্ত্র বাক্যানুসারে আমাকে ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন। সত্যকথা বলিতে সকলেরই অধিকার আছে, আর্য্যগণ যে এদেশেরই সন্তান ইহা ধ্রুব, সত্য, যথার্থই অতএব এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া বঙ্গের দ্বারে দ্বারে আজ গাহিতেই হইবে—

স্বেদ-জনিত শ্রমে তুমি
উর্ব্বরা করেছ যে ভূমি
বলরে প্রণামি
তোমারি সে ভূমি।

কিন্তু যাউক এ সব কথা। আমি এখন আর্য্যজাতির সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে দুই একটি প্রলাপ বকিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পঞ্চনদে অবস্থান কালে বেদাদিসম্মত যজ্ঞীয় কর্ম্মে বিরোধী হওয়ায় আর্য্যদিগের সহিত অপর আর্য্যদিগের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়াছিল এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর্য্যেরা এই যজ্ঞীয় কর্ম্মে বিরোধীদিগকে অসুর, পিশাচ, দস্যু প্রভৃতি ঘৃণাবাচক বিশেষণে বিভূষিত করিয়া—দূর করিয়া দিলেন। আর তন্মধ্যে যাহারা আর্য্যদিগের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদের সেবক রূপে অবস্থান করিতে লাগিল আর্য্যগণ তাহাদিগকে শূদ্র অভিধা প্রদান করিলেন। সরস্বতীর ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী প্রান্ত ত্যাগ করিয়া আর্য্যেরা কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল মৎস্য ও শূরসেন এই চারিটী দেশের সমষ্টীভূত ব্রহ্মর্ষি দেশে উপস্থিত হইলেন। সে সময় সমগ্র ভারত ঘোর বনাকীর্ণ অতি ভীষণাকার ছিল। বন্য পক্ষীর কলরব ও হিংস্র জন্তুর লোমহর্ষণ গম্ভীর গর্জ্জন ভিন্ন অন্য কিছুই শ্রুতি গোচর হয় না. আর্য্যেরা তাই ভারতের যেখানেই পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন সেই খানেই প্রবল হুতাশনের দ্বারা গভীর বনানী সকল ভস্মীভূত করিয়া তাহা মনুষ্যের

বাসোপযোগী করিতে লাগিলেন। মতান্তরে এইরূপ দেখা যায়,—অতি প্রাচীন কালে মধ্য এশিয়ার বর্ত্তমান পারসীক্ জর্ম্মানী, গ্রীক প্রভৃতি জাতির পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যজাতি একত্রে বাস করিতেন। কালক্রমে তাঁহাদের বংশসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় এবং পশুচারণ ভূমির অভাব হওয়ায় ক্রমশঃ তাঁহারা দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পঞ্চনদে উপস্থিত হন। তখন হিমালয়ের পাদদেশে অনার্য্যনামে একটি অসভ্য দুর্ব্বৃত্ত অনাচারী জাতি বাস করিত। তাহাদের কর্ত্তা ছিলেন শ্মশানবিহারী, বিভূতিমণ্ডিত বাঘাম্বরধারী জটাজুটসমন্বিত মহাদেব। তিনি হিমালয়ের উপরে কৈলাস শৃঙ্গে অবস্থান করিতেন। নন্দী ভৃঙ্গী নামে তাঁহার অসংখ্য অনুচর ছিল। তিনি আর্য্যদিগের ভারত প্রবেশের সংবাদ পাইয়া অনুচর লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, ফলে সেবার মহাদেব পরাস্ত হইয়া হিমালয়ে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কিন্তু তিনি পরাস্ত হইবার লোক নহেন। যখনই তিনি সুযোগ পাইতেন তখনই আপন অনার্য্য অনুচরগণ লইয়া আর্য্যদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেন যজ্ঞ কর্ম্মাদি ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিয়া দিতেন ফলে আর্য্য নর পতি দক্ষ অনার্য্য নরপতিদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা সতীকে শিবের সহিত বিবাহ দিলেন। সকলেই জানেন দক্ষের যজ্ঞে অনার্য্যও অসভ্য বলিয়া শিব নিমন্ত্রিত হন নাই কিন্তু দক্ষের অপর সাতাইশ কন্যা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আর অনার্য্যজাতি শিব যখন আপন অসুর রূপী অনুচর লইয়া আর্য্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন দক্ষের কন্যাসতী স্বয়ং হয়ত রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া অসুরের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহাই বোধ হয় আমাদের চণ্ডীতে বর্ণিত দেবাসুরের যুদ্ধ। সকলেই জানেন সেলুকাস চন্দ্র গুপ্তের সহিত সন্ধি করিবার জন্য আপন দুহিতাকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, সকলেই জানেন মানসিংহপ্রমুখ অনেক রাজপুত কুলাঙ্গার মোগলের সহিত সন্ধি ও সৌহৃর্দ্দ্য করিবার জন্য স্বস্ব ভগ্নীকে মোগলের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং ঘোরতর দুর্দ্ধর্ষ অনার্য্য-রাজ শিবের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া তাহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য—তাঁহার সহিত সন্ধি করিবার জন্য আর্য্যরাজ দক্ষ যদি আপন কন্যাকে শিবের সহিত বিবাহ দিয়া থাকেন আর সতী যদি আর্য্য-রমণীর আদর্শ অক্ষুন্ন

রাখিয়া সেই গজিকাসেবী শিবকেই পতি-দেবতা বোধে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া থাকেন তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? আর যদি এই সন্ধির ফলে আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ থামিয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে আর্য্যগণের সংস্পর্শে আসিয়া অনার্য্যগণ সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়া থাকে তাহাতেই বা বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? যাহা হউক এই মতান্তর ঠিক কি না তাহা বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিবেন। আমি শুধু পাখীর মত বুলিই আওড়াইতে পারি, বিচারের ক্ষমতা আমার নাই।

সে যাহাই হউক আর্য্য ও অনার্য্য জাতিতে যে একটা যুদ্ধ হইয়াছিল ইহা ঠিক। তবে এই অনার্য্য কর্ম্মকাণ্ডবিরহিত বলিয়া আর্য্য সমাজ হইতে, বিতাড়িত তাহাদেরই এক শাখা কি না অথবা অনার্য্য নামে স্বতন্ত্র একটি অসভ্য জাতি ভারতবর্ষে আর্য্যগণের ভারতাগমনের পূর্ব্বে ছিল কি না তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মীমাংসা করিবেন। এইবার আমি বৈদিক সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার একটু চিত্র অঙ্কন করিব।

বৈদিক সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি প্রকারের বর্ণ বিভাগ ছিল। স্বস্ব জীবিকা নির্ব্বাহের প্রণালী ভেদে ও আপন আপন ব্যবসায়ের স্বাতন্ত্র্য হিসাবে এই বর্ণ ভেদের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এ কথার পোষকতা ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগে গীতায় বলিয়া গিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।"

বৈদিক যুগে অনেক নৃপতি ছিলেন. সুশৃঙ্খলায় রাজ্যশাসন ও প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানই তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহারা প্রজাদিগের নিকট রাজকর গ্রহণ করিতেন সত্য, কিন্তু তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে অপত্য তুল্য প্রজাদিগের সুখ সুবিধার জন্যই ব্যয় করিতেন। মহাকবি কালিদাসের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্য বলীমগ্রহীৎ
সহস্রগুণমাদ্দাতুং আদত্তে হি রসং রবি।"

রাজারা সহস্র দ্বার ও সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদে অবস্থান করিতেন এবং বৈদিক প্রণালী সম্মত প্রক্রিয়ার দ্বারা মহাসমারোহে তাঁহাদের রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইত। এ স্থলে তাঁহাদের রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৈদিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে রাজসূয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। দুই বৎসর ব্যাপিয়া এই যজ্ঞ সম্পাদিত হইত। এই দুই বৎসরের মধ্যে এই প্রসঙ্গে সাতটি সোমযজ্ঞ হইত। রাজসূয় সোমযজ্ঞের পর আরম্ভ হইত। ইহা সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে আরম্ভ হইত। এই সোম যজ্ঞের পরে চারিটী বৈদিক যজ্ঞ হইত, প্রথমটী ফাল্গুন পূর্ণিমার দিনে এবং অন্য তিনটী চারিমাস অন্তর অন্তর হইত। এই যজ্ঞের সময় রাজা নিম্নবর্ণিত একাদশ জন সভারত্নগণের গৃহে এক এক খানি করিয়া পিষ্টক পূজোপহার স্বরূপ প্রদান করিতেন। সভ্যগণের নাম—(১) সৈন্যাধ্যক্ষ (২) রাজ সভার প্রধান সভ্য (৩) রাজ্ঞী (৪) বৈতালিক (৫) গ্রামের মণ্ডল (৬) দূত (৭) সারথী (৮) রাজস্ব আদায়কারী (৯) অঙ্গরক্ষক (১০) রাজসভার শিকারী (১১) রাজসভার সংবাদ বাহক। রাজা স্বয়ং ইহাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়া এইরূপ পিষ্টক প্রদান করিতেন এবং তাহাদিগকে সখ্যতা ও প্রীতির হেম-হারে সংগ্রথিত করিতেন। রাজা উত্তরাধিকারসূত্রে নির্ব্বাচিত হইতেন সত্য কিন্তু সময়ে সময়ে প্রজাবর্গের মতামতের উপরও তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তি নির্ভর করিত। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে রাজার অভিষেক আরম্ভ হইত। অভিষেকের সময় নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইত—(১) দীক্ষা (২) জল মন্ত্রপূত করণ (৩) পার্থ তর্পণ (৪) বেশ-ভূষা ও অস্ত্র শস্ত্রাদির দ্বারা রাজাকে সজ্জিত করণ (৫) রাজার সিংহাসনে উপবেশন (৬) ব্যাঘ্র চর্ম্মে রাজার পদস্থাপন (৭) রাজ মুকুট পরিধান (৮) পুরোহিত জ্ঞাতি, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত বারি অভিষেক (৯) রথারোহণ (১০) রথ বিমোচনীয় নামক তর্পণ (১১) ব্যাঘ্র চর্ম্মোপরি স্থাপিত সিংহাসনে উপবেশন (১২) দ্যূত ক্রীড়া (১৩) যজ্ঞের তরবারির চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ।

রাজাকে পবিত্রী করণের জন্য সপ্তদশ প্রকারের জল সংগৃহীত করিতে হইত। তন্মধ্যে সরস্বতী নদীর জল সংগ্রহই প্রধান কাজ ছিল। অভিষেক উপলক্ষে রাজাকে মন্ত্রপূত বারি দ্বারা পবিত্র করিবার পূর্ব্বে পুরোহিত রাজাকে সাজ-সজ্জাদির দ্বারা সুশোভিত করিতেন। তদনন্তর রাজা ব্যাঘ্র চর্ম্মের উপরে পদস্থাপন করিতেন। তখন পুরোহিত "তুমি শক্তিশালী হও, তুমি বিজয়ী

হও, তুমি অমর হও" এই আশীর্ব্বচন বলিয়া তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট স্থাপন করিতেন। অনন্তর রাজা শস্ত্র হস্তে পূর্ব্বমুখে দণ্ডায়মান হইতেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার জ্ঞাতি, বন্ধু, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ তাঁহাকে জল সিঞ্চন দ্বারা অভিষিক্ত করিতেন। "তুমি ক্ষত্রিয়ের অধিপতি হও, প্রজাদিগকে শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার কর" ইত্যাদি আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিয়া রাজাকে পবিত্র করিতেন। রাজাকে জলাভিষিক্ত করিবার পর যে জল অবশিষ্ট থাকিত তাহা পুরোহিতের পাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হইত, পুরোহিত তাহা রাজার প্রিয়তম পুত্রের হস্তে প্রদান করিতেন।

ইহার পর চতুরশ্ব সংযুক্ত, একখানি রথ যজ্ঞ বেদীর মধ্যে আনা হইত। রাজা সেই রথে আরোহণ করিয়া "আহবনীয়" অগ্নির উত্তর দিকে অবস্থিত গো সকলের মধ্যে যাইতেন। তথায় রাজা তূণ হইতে শর বাহির করিয়া অন্য এক রাজার অঙ্গে নিক্ষেপ করিতেন, ইহাতেই তাঁহার সিংহাসনাধিকারের দাবী সূচিত হইত। রথ হইতে অবতরণ করিয়া রাজা বেদীর নিকট আনীত খদির কাষ্ঠ নির্ম্মিত একখানি সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। পুরোহিত তখন এই শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিতেন "যিনি পবিত্র নীতির মর্য্যাদা রক্ষক এই সিংহাসনে তিনি উপবেশন করিয়াছেন।" অনন্তর রাজাকে পাঁচটী অক্ষ নিক্ষেপ করিতে দেওয়া হইত। পুরোহিত ইহার পৃষ্ঠ দেশ লাঠি দ্বারা স্পর্শ করিতেন। রাজসভার সভ্যগণ এই সময়ে রাজার চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে বসিয়া তাঁহাকে সম্মান দেখাইতেন। একজন পুরোহিত রাজার হস্তে খড়্গ দিতেন, রাজা তাহা তাঁহার ভ্রাতার হস্তে দিতেন, তিনি আবার তাহা শাসন কর্ত্তার হস্তে দিতেন, শাসন কর্ত্তা আবার তাহা গ্রামের মণ্ডলকে দিতেন, মণ্ডল তদ্দ্বারা অক্ষ ক্রীড়ার স্থান অঙ্কিত করিয়া দিতেন এবং সেই অঙ্কিত স্থানের উপর পুরোহিত রাজার জন্য অক্ষ নিক্ষেপ করিতেন। খড়্গ এইরূপে এক হস্ত হইতে অন্য হস্তে হস্তান্তরের দ্বারা নূতন রাজার আধিপত্যের স্বীকৃতি সূচিত হইত। অক্ষ ক্রীড়াকে এইরূপ উচ্চাসন দেওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, বৈদিক যুগে অক্ষ ক্রীড়াই সর্ব্বপ্রধান ক্রীড়া বলিয়া পরিগণিত ছিল। অভিষেক উৎসবের সময় "দশপেয়" অর্থাৎ সোমরসাদি দশ প্রকার মাদক তরল দ্রব্য পান করা হইত। রাজ্যাভিষেকের এক বৎসর পরে অর্থাৎ বৈশাখ

পূর্ণিমায় রাজার কেশ কর্ত্তনের উৎসব সম্পাদিত হইত। বলা বাহুল্য উপরোক্ত বিবরণ হইতে আপনারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন, যখন সমগ্র জগৎ অসভ্যতা ও বর্ব্বরতার ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন ছিল, তার ডারউইনের ক্রম বিকাশের সিদ্ধান্তানুসারে যখন ভারতের বহির্ভূত দেশবাসীগণ শাখামৃগের কলেবর ত্যাগ করিয়া ক্রমে মনুষ্য পদবীতে আরোহণ করিতেছিল, তখন ভারতবর্ষে এইরূপ সুপ্রণালীতে রাজার রাজ্যাভিষেক সম্পাদিত হইত।

ইহা ছাড়া শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক ও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কথা যাঁহারা জানেন তাঁহারা কখনই আধুনিক বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় উদ্ভাসিত পাশ্চাত্য জাতির রাজ্যাভিষেক প্রথাকে উৎকৃষ্টতর বলিতে পারিবেন না। আমি অবশ্য এস্থলে রামায়ণ মহাভারতোক্ত রাজ্যাভিষেক প্রথার বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইব না, কারণ এক বৈদিক যুগের কথা বলিতে গিয়াই দেখিতেছি প্রবন্ধের কলেবর দ্রৌপদীর বস্ত্রের ন্যায় ক্রমেই বর্দ্ধিতায়তন হইতেছে, কাজেই পৌরানিক যুগের কথা আপাততঃ স্থগিত রাখিতে হইবে উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন আর্য্য নর পতি গণ কিরূপে পতির যোগ্য জাকজমকের সহিত দেশের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন। এইবার আমি তাঁহাদের যুদ্ধাদির সাজ সরঞ্জামের কথা সংক্ষেপে কিছু বলিব। আপনারা হয়ত আমার প্রবন্ধে বৈদিক গ্রন্থের সূক্তাদির উল্লেখ না দেখিয়া ইহা অপ্রামানিক বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু জানিবেন বেদের ভাষা অত্যন্ত দুরূহ বলিয়া সাধারণের বোধগম্য হইবে না বিবেচনায়, এবং কথায় কথায় বৈদিক সূক্তাদিরউল্লেখ না করিয়া তাহার সারমর্ম্ম আপনাদের নিকট পাঠ করিলে প্রবন্ধ প্রাঞ্জল ও শ্রুতি সুখকর হইবে বিবেচনায় আমি সেই দুরধিগম্য সূক্তাদি উদ্ধৃত করিতে বিরত হইয়াছি, সুতরাং বেদকে যাঁহারা অপৌরুষেয় বলিয়া মনে করেন, বেদের বাক্য "বেদবাক্যের" ন্যায় যাঁহারা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের নিকট আশা করি এই প্রবন্ধ অপ্রমাণিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। বহিঃ শত্রুর আক্রমণ ও অন্তঃশত্রুর অত্যাচার হইতে আত্ম রক্ষার জন্য আর্য্যদিগকে প্রায়ই যুদ্ধ করিতে হইত। ধনু, বান, অসি, পরশু, চক্র, শতঘ্নী প্রভৃতি অস্ত্রই তাঁহাদের রণসম্ভার ছিল। সুদৃঢ় বর্ম্ম ও তাঁহাদের কলেবর সুরক্ষিত করিত। দুইটি অশ্ব যুদ্ধের রথ

আকর্ষণ করিত. সেই রথের উপর যোদ্ধা স্বয়ং ও একজন সারথী থাকিতেন। ইহা ছাড়া পদাতিক নামে এক প্রকারসৈন্যেরও উল্লেখ বেদমধ্যে দৃষ্ট হয়। সৈন্যগণ সেনাপতির কর্ত্তৃত্বাধীনে যুদ্ধ করিতে. যাইত; বলা বাহুল্য প্রত্যেক সৈন্যের হস্তে বিজয়-বার্ত্তা জ্ঞাপন পতাকা শোভা পাইত। সকলেই জানেন এই বিশ্বের আদিতে একমাত্র ভগবান ছিলেন। তিনি প্রজা সৃষ্টির জন্য একদিন বলিলেন "একোঽহং বহুস্যাম প্রজায়ায়েঃ" সেই হইতেই জগতে লোকসৃষ্টির সূত্রপাত হইল। সুতরাং প্রজাসৃষ্টির জন্য তাঁহার দেহ হইতে যে কেবল পুরুষই সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা নহে, পরন্তু জীবসৃষ্টির আধারভূতা রমণীগণও সৃষ্ট হইয়াছিল। আবার সন্তানোৎপাদনের জন্য পুরুষ ও রমণীগণের পরস্পরে যোগাযোগ প্রয়োজন হওয়ায় বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত হয়, যে দেশের শাস্ত্রে বলিয়াছে—

ন গৃহম্ গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে

সে দেশে আর্য্যগণ যখন গৃহীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন গৃহিণী তাঁহাদের গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ সে সময়ে প্রচলিত ছিল কি না এবং কন্যাদায়ে এখনকার মত তখনকার কন্যার পিতা চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতেন কি না এবং স্নেহলতার মত অনূঢ়া ও যুবতী জ্বলন্ত হুতাশনে দেহ ভস্মীভূত করিয়া জনকজননীকে চিন্তাভার হইতে মুক্তি দিতেন কি না তাহার কোন বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদাদি পাঠে যতদূর জানা যায় তাহাতে এই অনুমান হয় স্বয়ম্বর প্রথাই অর্থাৎ পতি নির্ব্বাচন প্রথাই তখন বিদ্যমান ছিল। বিধবা চিরদিনই সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতির পাত্রী। আলুলায়িতকেশা, মলিনবসনা, বিরহব্যথা আপ্লুতা, শত অশ্রু-সমন্বিতা বিধবা চিরদিনই লোক-সমাজের হৃদয় দ্রবীভূত করিতেছে। যদিও আধুনিক নিষ্ঠুর নির্ম্মম হিন্দুসমাজ বাল-বিধবাগণের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে একটুও বিচলিত হয় না বটে, কিন্তু বৈদিক আর্য্যসমাজে বিধবা বিবাহের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তবে সাধারণতঃ এই বিবাহটা দেবরের সহিতই সমাধা হইত।' বহু বিবাহও বৈদিক সমাজকে কলঙ্কিত করিয়াছে। আর্য্যগণ একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতেন। অথর্ব্ববেদে আছে—তোমরা

ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রেম কর। পুত্র, পিতা, মাতার আজ্ঞাকারী হৌক। জায়া স্বামীকে মধুর বাক্যে সম্বোধন করুন এবং পরস্পরের মধ্যে শান্তি বিরাজ করুক। ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতি কি ভগ্নী ভগ্নীর প্রতি ঘৃণার সহিত ব্যবহার না করিয়া পরস্পরে ভদ্রভাবে আলাপ করুন।" এই সূক্ত হইতে জানা যায় আর্য্যগণ পরস্পরে ভ্রাতা, ভগ্নী, মাতা, পিতা সমন্বিত হইয়া বাস করিতেন।

আর্য্যগণ এমন বিষয় নাই যাহাতে উৎকর্ষলাভ করেন নাই। কি আয়ুর্ব্বেদ, কি রসায়ন, কি জ্যোতিষ, কি গণিত, কি বিজ্ঞান কোন বিষয়ই তাঁহাদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে পারে নাই। জীবন ধারণ করিতে গেলে রোগের আক্রমণ মানব দেহে অনিবার্য্য। কেহই সংসারে অজর, অমর, নিত্য, সত্য, শাশ্বত হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"জাতস্য হি ধ্রুবর্মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" মহাকবি মধুসূদন বলিয়াছেন—

জন্মিলে মরিতে হ'বে
অমর কে কোথা ক'বে
চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে !

সংসারে সকলকেই মরিতে হয়। কিন্তু এই মৃত্যু দুই প্রকারের। মানুষ যখন নীরোগ, নিরাময় হইয়া উপযুক্ত বয়সে মরে তখন তাহাকে "কালের মৃত্যু" বলে, আর যখন নানাপ্রকার ব্যাধিতে জর্জ্জরিত হইয়া অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন তাহাকে "অকাল মৃত্যু" বলে। এই অকাল মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আর্য্যগণ নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জাত ভেষজের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অশ্বিনগণ চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহারা নানাপ্রকার ভেষজের দ্বারা রোগাক্রান্তের রোগ নিবারণ করিতেন। আর্য্যগণ যে বৃহদাকার অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া দুস্তর জলধিবক্ষ অতিক্রমপূর্ব্বক দেশ দেশান্তরে যাইতেন তাহার উল্লেখও ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধা কুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বকীয় ship building in ancient India নামক অমূল্য গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক সেই গ্রন্থের মর্ম্মানুবাদ অর্চনা পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ

করিয়াছেন সুতরাং বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ এস্থলে করিব না। তবে কৌতূহলোদ্দীপ্ত শ্রোতাগণের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাদিগকে একেবারে বঞ্চিত না করিয়া কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া ভাল। বৈদিকযুগে যেমন আর্য্যজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, তেমনি বৃক্ষ সকলও চারিভাগে বিভক্ত ছিল। যথা :—

লঘু যৎ কোমলং কাষ্ঠং সুঘটং ব্রহ্মজাতি তৎ।
দৃঢ়াঙ্গং লঘু যৎ কাষ্ঠ মঘটং ক্ষত্রজাতি তৎ॥

তরী সকল আবার তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা—(১) সাধারণ বা সামান্য (২) বিশেষ, (৩) উন্নত। সামান্য শ্রেণীর মধ্যে মন্থরা অত্যন্ত বৃহৎ ছিল। আপনারা একটা কথা হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন আর্য্যেরা কি তবে লৌহদ্বারা জাহাজ তৈয়ারী করিতে জানিত না? হাঁ জানিতেন বৈ কি? তবে সমুদ্রপথ তখন অয়স্কান্ত গিরিসমাকুল থাকায় লৌহনির্ম্মিত অর্ণবযান হয়ত খসিয়া যাইয়া নাবিক ও আরোহীদিগকে বিপন্ন করিতে পারে এই ভয়ে আর্য্যগণ সুদৃঢ় ক্ষত্রিয় কাষ্ঠের দ্বারা অর্ণবপোত করিতেন। এখনও নোয়াখালী জেলার সমুদ্রতীরে সন্দ্বীপের চারি পার্শ্বে বেতের বন্ধনীযুক্ত নৌকা সকল সমুদ্রপথে যাতায়াত করে। বৈজ্ঞানিক জগতে আর্য্যজাতির স্থান কম উচ্চে নহে। সুসভ্য রোমও যখন অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেই প্রাচীনতম যুগে বিজ্ঞানের বলে আর্য্যেরা পৃথিবী, পৃথিবীর আকার, পৃথিবীর অবস্থান, সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি গূঢ় বৈজ্ঞানিক বিষয় সকলেরও সমাধান করিয়াছিলেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে এই পৃথিবী শূন্যে অবস্থিত রহিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের এই আবিষ্কারের বহুপূর্ব্বেই আর্য্যেরা ইহা স্থির করিয়াছিলেন। বেদের বর্ণনা পাঠ করিলে দেখা যায় যে, আদিতে এই যে পরিদৃশ্যমান জগত আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি—যে বসুন্ধরার বক্ষে আমরা হাসি ক্রড়ার অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছি, পূর্ব্বে ইহার বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব ছিল না। চারিদিকে কেবল শূন্য—শূন্য—মহাশূন্য ছিল। ক্রমে জল রাশির দ্বারা সেই শূন্যস্থান পরিপূরিত হইল। প্রজাপতি এই জলমধ্যে পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। সুতরাং বৈদিক মতকে যদি গ্রাহ্য করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে আর্য্যেরা জানিতেন যে এই সজল পৃথিবীর নিম্নে জল

এবং ইহা জলদ্বারা পরিবেষ্টিত। পৃথিবী যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া দিবারাত্র সৃষ্টি করিতেছে ইহা আর্য্যেরা জানিতেন। বেদে আছে।—সূর্য্য কখনও উদয় হন না বা অস্ত গমন করেন না। যখন লোকে মনে করে যে তিনি অস্ত গমন করিয়াছেন তখন তিনি দিবসান্ত হওয়ায় নিম্নভাগে রাত্রি ও অপরাংশে দিন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সূর্য্য কখনও অস্ত যান না।" আমি ভাস্করাচার্য্যের সূর্য্যসিদ্ধান্তের কথা বলিতেছি না। কারণ তাহা বেদের পরবর্ত্তী গ্রন্থ। ভাস্করাচার্য্যের সূর্য্যসিদ্ধান্ত ত স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে "গচ্ছতি ইতি জগৎ" শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে সূর্য্য নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, পৃথিবীই তাহাকে আবর্ত্তন করিতেছে। আমি বলিতেছি বৈদিক যুগের কথা। আপনারা উপরোক্ত বৈদিক মত শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সূর্য্য কখনও অস্তগমন করে না এবং পৃথিবীই সূর্য্য-মণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করে, এতৎ আর্য্যগণ বৈদিকযুগে জানিতেন। আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন কোপার্ণিকসের বহুপূর্ব্বে ন্যূনকল্পে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সৌর জগতের এই নিগূঢ়তত্ত্ব আর্য্যগণ বিদিত ছিলেন।

আর্য্যগণ শবদাহন ও শবসমাধি করিতেন। বেদের মধ্যে এই উভয় প্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শব সমাধির বিবরণ প্রথমে উক্ত দেখিয়া মনে হয় আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমেই শবদেহ সমাধিস্থই করিতেন। ঋগ্বেদীয় একটি সূক্তের সারমর্ম্ম এই যে, "হে বসুন্ধরা! মাতা যেমন বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা স্বীয় সন্তানের শরীর আবৃত করেন, তুমিও সেইরূপ তোমার কোমল অঙ্গে শবকে স্থান প্রদান করিয়া তাহাকে পাপের হস্ত হইতে রক্ষা কর।"

ইহার বহু পরবর্ত্তী অধ্যায়ে শবদাহন প্রথার উল্লেখ আছে। আপনারা জানেন বেদের সমুদয় অংশ এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক একই সময়ে লিখিত হয় নাই। বেদের কতকগুলি মন্ত্র অতি প্রাচীন এবং কতকগুলি বা তাহার পরবর্ত্তী-কালে রচিত। ইহাতে অনুমিত হয় আর্য্যগণ পূর্ব্বে শবদেহ মৃত্তিকা গহ্বরে প্রোথিতই করিতেন, তৎপরে ক্রমে ক্রমে শবদাহ প্রথার সূত্রপাত হয়। কিরূপে শবদাহক্রিয়া সমাধা হইত আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি। কোন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ দেহত্যাগ

করিবামাত্র একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইত। হোম-সমাধান্তে উডুম্বরকাষ্ঠ বিনির্ম্মিত খট্টাঙ্গের উপর কৃষ্ণসার চর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া তদুপরি শবদেহ স্থাপন করা হইত। শবদেহের পুত্র, ভ্রাতা বা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নববস্ত্র পরিধান করিয়া সৎকার স্থানে রোরুদ্যমানকণ্ঠে শবের অনুগমন করিতেন। বলা বাহুল্য শবদেহ জ্ঞাতিকর্ত্তৃক বাহিত না হইয়া বলীবর্দ্দযুগলকর্ত্তৃক আকর্ষিত করিয়া শ্মশানভূমে লইয়া যাওয়া হইত। যেখানে প্রাসাদবাসী ধনীর ক্ষীর-সর-নবনীত দেহ হইতে বুভুক্ষু কঙ্কালসার জীর্ণ শীর্ণ পথের ধূলিশায়ী ভিখারীর দেহের একই মূল্য, সেই পবিত্র শ্মশানভূমে তদনন্তর একটি চুল্লী প্রজ্বলিত করিয়া তদুপরি শবদেহ ও তাহার বিধবা পত্নীকে একত্র শয়ান করান হইত। সেই মহাশয্যায় উভয় দম্পতীর দেহ লেলিহান পাবকে ভস্মীভূত হইলে সৎকারকারিগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। এই সামান্য বিবরণ হইতে আপনারা বুঝিতেছেন যে, বৈদিকযুগে সহমরণ প্রথা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত ছিল। আর্য্য নারী স্বামীকে দেবতা তুল্য মনে করিতেন—স্বামি বিহীন জীবন-ভার বহন করা অপেক্ষা স্বামীর অনুগমন করাই রমণীর একমাত্র শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ কর্ম্ম ইহা তাহারা জানিতেন। তাই তাঁহারা সহাস্য আস্যে এই নশ্বর দেহ ধূলিমুষ্টির ন্যায় ত্যাগ করিয়া অবিনশ্বর জগতে স্বামীর অনুগমন করিতেন। এমনই ধারা উচ্চ আদর্শ ছিল আর্য্য ললনাগণের। এই সুন্দর প্রথা তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিয়া মহামতি আকবর ভাল করিয়াছিলেন কি মন্দ করিয়াছিলেন তাহা জানি না এবং লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক্ এই প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া ভাল করিয়াছিলেন কি মন্দ করিয়াছিলেন তাহাও জানি না, তবে এইটুকু বলিতে পারি দিন দিন জীবন্মৃত অবস্থায় দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া জগতে বাঁচিয়া থাকার চেয়ে— একটু একটু করিয়া করাতের ধারে কর্ত্তিত হইবার চেয়ে বিধবার পক্ষে একদিনেই সর্ব্ব দুঃখ কষ্টের নিবৃত্তি করাই যে ভাল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই বোধ হয় প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবার দারুণ দীর্ঘশ্বাসে সন্তাপিত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক এই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

পরলোকে হিন্দুজাতির অকাট্য বিশ্বাস। মনুষ্য ইহজীবনে যে পুণ্য বা

পাপাচরণ করে পরলোকে সেই সেই কর্ম্মানুসারে স্বর্গ বা নিরয় ভোগের অধিকারী হয়, এ বিশ্বাস হিন্দুদিগের অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট। এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই হিন্দুজাতির মধ্যে এখনও পুণ্যকার্য্যের একটু ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত হইতেছে, এ বিশ্বাস যে দিন বিনষ্ট হইবে সে দিন হিন্দুজগৎ স্বেচ্ছাচার ও পাপের প্রবল প্লাবনে প্লাবিত হইয়া যাইবে। রাম যে শ্যামের বুকে ছুরি বসাইয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে না কেবল পরকালে নরক ভোগের ভয়ে। আবার নিধিরাম পোদ্দার যথাসর্ব্বস্ব দিয়া রাস্তা, ঘাট, পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়া পল্লীবাসীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিতেছে কেবল সশরীরে স্বর্গে যাইবার আশায়। এই পরলোককে আমরা যতই ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চাই না কেন আমরা কিন্তু মৃত মাতা পিতার উদ্দেশ্য—

আকাশস্থো নিরালম্ব্য
বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ
ইদং ক্ষীরং ইদং নীরং
স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভব ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রতিনিয়ত পরলোকের ও ভৌতিক জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছি। আমাদের পরমারাধ্য আর্যগণও এই পরলোক বিষয়ে একেবারে চিন্তা বিরহিত ছিলেন না। তাঁহাদেরও দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে জীব আপনাপন সদসৎ কার্য্যের দ্বারা ইহলোকে সুখ দুঃখ এবং পরলোকে শান্তি ও অশান্তি ভোগ করে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বর্ণিত অগ্নিস্তোত্র মধ্যে পিতৃলোক, স্বর্গলোক প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বৈবস্বত যম—"পরলোকের মধ্য দিয়া মানবসমূহকে স্বর্গপথে লইয়া যান এবং সেখানে যাইয়া মানব আপন স্নেহময় জনক, স্নেহময়ী জননী, পতি-বিচ্ছেদ কাতরা জায়ার সহিত মিলিত হইতে পারে—এমনিই ধারা একটি সুক্ত ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলে আছে। এই সুক্ত হইতে ইহাই বুঝা যায় আর্য্যগণ পরলোকে অকাট্য বিশ্বাসী ছিলেন এবং কিরূপে পুণ্যময় কার্য্য করিয়া দেহান্তে স্বর্গরাজ্যে নীত হইয়া মাতা, পিতা, বনিতার সহিত মিলিত হইবেন, এই সুখের আশায় তাঁহাদের ইহলোকের জীবন অতি পবিত্রভাবে অতিবাহিত করিতেন। আর

একটি বিষয়—অথর্ব্ববেদসংহিতা ও ঋগ্বেদসংহিতায়—স্বর্গকে যেরূপ সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা পাঠে জানা যায় যে—আর্য্যগণ স্বর্গের বিলাস আমোদ, প্রমোদ, উপভোগ করিবার জন্য যেরূপ আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন তাহা যদি তাৎকালিক সমাজের চিত্রই হয়, তবে তাঁহারা যে আধুনিক ফরাসী জাতির চেয়েও সুসভ্য ছিলেন, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। মনীষী ৺অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক অমূল্য গ্রন্থে উক্ত সংহিতাদ্বয়ের স্বর্গবর্ণনার যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি—"তাঁহারা অস্থিশূন্য, পবিত্র, বায়ুদ্বারা বিশুদ্ধীকৃত এবং উজ্জ্বল হইয়া জ্যোতির্ম্ময় লোকে গমন করেন। অগ্নি তাঁহাদের শিশ্নেন্দ্রিয় দগ্ধ করেন না। তাঁহাদের সেই স্বর্গ লোকে যথেষ্ট রতিসুখসম্ভোগ হয়। যাঁহারা বিষ্টারী নামক স্থানে দ্রব্য রন্ধন করেন তাঁহাদের কখন অপ্রতুল ঘটে না। এতাদৃশ ব্যক্তি যমের সহিত বাস করেন, দেবতাদিগের সন্নিধানে গমন এবং সোমপায়ী গন্ধর্ব্বদিগের সহিত আনন্দে অবস্থান করেন। যাহারা বিষ্টারী নামক হবন দ্রব্য রন্ধন করেন, যম তাঁহাদের শিশ্নেন্দ্রিয় হরণ করেন না। এতাদৃশ মনুষ্য রথস্বামী হইয়া তদুপরি বাহিত হন ও পক্ষবিশিষ্ট হইয়া গমনমণ্ডল অতিক্রম করিয়া যান। পরলোকে ধার্ম্মিকদের নিমিত্ত ঘৃত, মধু, সুরা, দুগ্ধ এবং দধির সরোবর পূর্ণ রহিয়াছে।"

অন্যত্র "হে 'পরমান্ সোমদেব! যে লোকে অজস্র জ্যোতিঃ ও সূর্য্য তেজঃ অবস্থিত আছে, সেই অমৃত অক্ষয় লোকে—আমাকে স্থাপন কর। যে লোকে বৈবস্বত (অর্থাৎ যম) রাজার রাজত্ব, যেখান দ্যুলোকের অন্তরতমস্থান এবং বিস্তৃত সলিল পুঞ্জ অবস্থিত আছে সেই স্থানে আমাকে অমর কর। যে লোকে ইচ্ছানুরূপ আচরণ করা যায় এবং যেখানে জ্যোতিস্মান্ লোক সকল বিদ্যমান আছে দ্যুলোকের সেই ত্রিনাভিবিশিষ্ট পবিত্রতমস্থানে আমাকে অমর কর। যেখানে যথেষ্ট সুখ সম্ভোগ এবং সুধা ও তৃপ্তি আছে ও যেখানে সূর্য্যলোক বিদ্যমান রহিয়াছে সেইস্থানে আমাকে অমর কর। যে স্থানে বহুল আনন্দ ও বহুতর আমোদ প্রমোদ বিদ্যমান আছে এবং যেখানে কাম্যবস্তু সমুদায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায় আমাকে সেই স্থানে অমর কর।"

আপনারা জানেন মানুষ যতই সভ্য হইতে সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিতে থাকে, ততই তাহার হৃদয়ে সুখ-ভোগের বলবতী স্পৃহার উদয় হয়। একজন মেথরের ছেলে যদি ভাগ্যগুণে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া উচ্চ পদলাভের যোগ্য হয়,তবে বিষ্ঠা-পুরীষ ছানিতে এবং কদর্য্য গৃহে বাস করিতে তাহার আর প্রবৃত্তি হয় না। সে ক্রমশঃ প্রচলিত সভ্য সমাজের অনুকরণে উত্তম অট্টালিকায় বাস করে, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করে, অশ্বযানে আরোহণ করে এবং সুন্দর পরিচ্ছদাদি পরিধান করে। বৈদিক যুগে আর্যগণও যে অত্যন্ত সুসভ্য ছিলেন তাহার প্রমাণ এই স্বর্গবর্ণনা। অসভ্যের হৃদয়ে বিলাস-বিন্দুমাত্র স্থান পায় না, সভ্য ব্যক্তির হৃদয়ই বিলাসিতার দিকে, আমোদ-প্রমোদের দিকে আকৃষ্ট হয়। আর্য্যগণ যদি সত্য সত্যই অসভ্য বন্যপশু হইতেন, তাহা হইলে স্বর্গের সুখলাভের বাসনা এইরূপে প্রকাশ করিবেন কেন? অতএব বৈদিক যুগের আর্য্যগণ যে সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন স্বর্গবর্ণনা তাহার আর একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

বৈদিকযুগে আর্য্য রমণীগণ যে অন্তঃপুরে বন্ধনাগারে আবদ্ধ থাকিতেন না তাহার প্রমাণ অনেক আছে। সাধারণের ধারণা স্ত্রীলোক বা শূদ্রজাতির বেদাধ্যয়ন বা শ্রবণে কোন অধিকার ছিল না, কিন্তু এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। যদি স্ত্রীজাতি বেদাধ্যয়নে অধিকারিণী না হইবেন তাহা হইলে বিশ্ববারা প্রভৃতি বৈদিক বিদুষীগণের রচিত সূক্ত কিরূপে ঋগ্বেদের অঙ্গ বিভূষিত করিয়াছে? বস্তুতঃ ভারতের অতীত ইতিহাস পাঠ করিয়া বলিতেই হইবে—

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে
জ্ঞানধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী।

আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন আর্য্যগণ কি জন্যই বা প্রকৃতির উপাসক হইয়াছিলেন এবং কেনই বা তাহা সূক্তাকারে ঋগ্বেদে স্থান পাইয়াছে? ইহার উত্তর এই যে আদিমকালে আর্য্যগণ এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রকৃতির লীলা দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া থাকিতেন—প্রকৃতির প্রত্যেক হাস্য-লহরীতে

তাঁহারা বিশ্বনিয়ন্তার অজ্ঞেয় বিকাশ দেখিয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন। তাই যখন সেই প্রকৃতি সুন্দরী মনুষ্যের জীবন ধারণের অনুকূলে নিদাঘে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, শৈত্যে তাপ বিকীর্ণ করিতে লাগিল, ক্ষুধায় অন্নের সংস্থান করিতে লাগিল, তখন তাঁহারা ভক্তিপ্রণতশিরে সেই সেই প্রকৃতিকে দেবতার স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। উপাসনা করিতে গেলে উপাস্যের ধ্যান ধারণার জন্য মন্ত্র আবশ্যক, তাই তাঁহারা ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ প্রভৃতির উদ্দেশে যে মন্ত্র রচনা করেন এবং যাহা শ্রুতিধররূপে, শিষ্য-পরম্পরায় এক জনের নিকট হইতে অন্য জনে শিখিতে আরম্ভ করে। তাহাকেই বৈদিক সূক্ত বলে এবং তাহা হইতেই ঋগ্বেদের সৃষ্টি। ঋগ্বেদ যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদ সঙ্কলিত এবং তাহার বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক ঋগ্বেদের কালনিরূপণ এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে, আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান কোথায় ছিল এবং কিরূপে বৈদিক সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইল, ইহা প্রতিপাদন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বৈদিকযুগে জ্যোতিষশাস্ত্রের উদ্ভাবন হয়। যজ্ঞে বলিদানের জন্য ঠিক সময় নির্দ্ধারণের জন্য আর্য্যগণ আর্য্যঋষিগণ জ্যোতিষশাস্ত্রের সৃষ্টি করেন। তাঁহারা সমস্ত রজনী জাগরিত থাকিয়া নক্ষত্র মালার মধ্য দিয়া চন্দ্রের গতি অবলোকন করিতেন। বলা বাহুল্য ইহা হইতেই খগোল শাস্ত্রের উৎপত্তি।

পণ্ডিতগণ ২,০০০—১৪০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত বৈদিকযুগের কালনিরূপণ করিয়াছেন। বৈদকযুগের পর কাব্যযুগ। রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই খানি অমূল্য মহাকাব্যই এই কাব্যযুগের জ্বলন্ত ইতিহাস। আমার এ প্রবন্ধে কাব্যযুগে আর্য্য সভ্যতার পরিচয় দিবার সুযোগ ও সময় হইবে না। তবে কিরূপে বৈদিকযুগে আর্য্যজাতি বঙ্গদেশে আগমন করিলেন এবং কোন্ কোন্ প্রদেশে তাঁহারা আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া আমি অবসর গ্রহণ করিব। আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষগণ যে পঞ্চনদে অবস্থান করিতেন ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই পঞ্চনদ হইতে তাঁহারা পূর্ব্বদিকে অগ্রসর ও অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন এবং দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে উত্তরাপথের অধিকাংশ হস্তগত করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে প্রাচীন মগধের

নাম "কীকট" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই "কীকট" দেশই যদি সত্য সত্যই প্রাচীন মগধের নাম হয়, তাহা হইলে পাঞ্জাবে আস্থানকালে আর্য্যেরা মগধের সন্ধান রাখিতেন। অথর্ববেদ সংহিতার ৫ম কাণ্ডে অঙ্গ ও মগধদেশের নাম আছে, সুতরাং ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে অঙ্গ ও মগধদেশ আর্য্যদের নিকট পরিচিত ছিল। ঐতেরের ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রজাতির উল্লেখ আছে, পুণ্ড্রবর্দ্ধন যদি পুণ্ড্রগণের তৎকালীন বাসস্থান হয়, তাহা হইলে উত্তরবঙ্গও তখন আর্য্যগণের নিকট পরিচিত ছিল। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন—"ঐতেরেয় আরণ্যকে বঙ্গশব্দের সর্ব্ব প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। ঐতেরেয় আরণ্যকে রচনাকালে বঙ্গ, মগধ ও চের দেশবাসিগণকে আর্য্যগণ পক্ষিবৎ জ্ঞান করিতেন। বঙ্গ, বঙ্গদেশের নাম, বগধ হয় মগধদেশের নাম না হয়, মুদ্রাকর প্রমাদের ফল, এবং চের,জাতি অথবা দেশবিশেষের নাম। মধ্য প্রদেশের পার্ব্বত্য বর্ব্বর জাতিগণ আপনাদিগকে চেরজাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। চের, দক্ষিণাপথের একটি প্রাচীন রাজ্যের নাম, ইহার অপর নাম কেরল, অশোকের দ্বিতীয় গিরিশাসনে কেরলদেশের নাম আছে। যে সময়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অথবা আরণ্যকে আমরা বঙ্গ অথবা পুণ্ড্রজাতির উল্লেখ দেখিতে পাই, সে সময়ে অঙ্গে, বঙ্গে অথবা মগধে আর্য্য-জাতির বাস ছিল না। অনুসন্ধিৎসু শ্রোতৃগণ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর অনুদিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ দেখিতে পারেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঐন্দ্রমহাভিষেকের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুষ্মন্তের পুত্র ভরত একশত তেত্রিশটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অগ্নি সরস্বতী তীর হইতে সরযু, গণ্ডকী ও কুশী নদী পার হইয়া সদানীরা তীরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণে মগধে বা বঙ্গদেশে গমন করেন নাই। রাহুগণ মিথিলাদেশে আগমন করিলে উহা আর্য্যগণের বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। বৈদিক সাহিত্যে এই সকল উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে, এই সময়ে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মিথিলা প্রভৃতি উত্তরাপথের পূর্ব্ব সীমান্তস্থিত প্রদেশসমূহ নবাগত আর্য্যজাতির নিকট পরিচিত ছিল, কিন্তু তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণে মিথিলার উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয়

যে সেই সময়ে মিথিলায় আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল অথবা মিথিলা আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল (শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।১)।

আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব সীমান্ত যখন আর্য্যোপনিবেশের অন্তর্ভূত ছিল না, তখন সেই সকল দেশ কোন্ জাতির বাসস্থান ছিল? অনেকে অনুমান করেন দ্রাবিড় জাতিই বঙ্গ ও মগধের আদিম অধিবাসী। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ আধুনিক বঙ্গবাসিগণের নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাঁহারা দ্রাবিড় ও মোঙ্গোলিয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মগধে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিগণকে আর্য্যজাতীয় অথবা আর্য্যসংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বঙ্গবাসিগণকে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে দ্রাবিড় ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বলা যাইতে পারে।

উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক বিজিত হইবার বহুকাল পরেও মগধ ও বঙ্গ স্বাধীন ছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধদেশে তীর্থযাত্রা ভিন্ন অন্য কারণে গেলে পাতিত্য দোষ জন্মিত পুনরায় সংস্কার আবশ্যক হইত। সুতরাং কোন্ সময়ে আর্য্যজাতি বঙ্গ ও মগধ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সিংহলের ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজয়সিংহ নামক বঙ্গদেশীয় কোন রাজপুত্র সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে মগধে ও বঙ্গে আর্য্য সভ্যতা প্রচারিত হইয়াছিল। বিজয়সিংহ নাম অনার্য্য নাম নহে, সুতরাং তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই বঙ্গ-মগধের প্রাচীন অধিবাসিগণ পুরাতন ভাষা ও রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়া আর্য্য জাতির আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মগধ ও বঙ্গ আর্য্য-জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে, দ্রাবিড় জাতীয় আদিম অধিবাসিগণ দেশত্যাগ করেন নাই। ভারতবর্ষের অবশিষ্টাংশের ন্যায় এই দুইটি প্রদেশও ক্রমশঃ বিজেতৃগণের ধর্ম্ম, রীতি নীতি ও ভাষা অবলম্বন করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যবাসী দ্রবিড়গণ সম্পূর্ণরূপে আর্য্যভাষা গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা পুরাতন ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আর্য্যগণের অনেক আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ইহাই ঐতিহাসিক রাখাল দাসের গবেষণার ফল।

আমি এই খানেই সহৃদয় শ্রোতৃগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে চাই। আমার প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি তাহা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বলিয়াছি ঐতিহাসিকগণ যাহাই বলুন না কেন আর্য্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে ভারতে আগমন করেন নাই, এদেশেই তাঁহারা সৃষ্ট, পুষ্ট ও সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, বলিয়াছি অনার্য্যনামে একটি স্বতন্ত্র জাতি ছিল না, কর্ম্মকাণ্ডরহিত লোককেই সাধারণতঃ অনার্য্য আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইত। তবে প্রবন্ধের সৌকর্য্যার্থে আমি বিভিন্ন লেখকের মতামত উদ্ধৃত করিয়াছি, আমি উপাদান সংগ্রাহক মাত্র, বিচার ও মীমাংসার শক্তি আমার নাই, আপনারা আমার অনধিকার চর্চ্চা ক্ষমা করিবেন। আমি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ নহি, বৈদিক সাহিত্যেও আমার অধিকার অতি সামান্য, এ অবস্থায় আমি যে ধৃষ্টতার পরিচয় দিলাম তাহা অমার্জ্জনীয় সন্দেহ নাই। আমি জানি—

"মন্দঃ কবি যশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্
প্রাংশুং লভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ।"

কিন্তু তথাপি হৃদয়ে সত্য বলিয়া যাহা উপলব্ধি করিয়াছি তাহা অকপটে আপনাদের নিকট ব্যক্ত না করিলে সত্য গোপন করা হয় এই ভয়ে আমি এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছি। আপনারা গুণগ্রাহী, আশা করি আমার প্রবন্ধোক্ত দোষরাশি পরিত্যাগ করিয়া গুণের ভাগ গ্রহণ করিবেন।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

সংস্কৃত সংলাপ কাব্যম্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সংস্কৃতম্।

১৫। দ্বিতীয় কণভূতায়াং নীতৌ কর্ত্তব্যতা কর্ত্তব্যতয়ো রুপদেশঃ। অর্থাৎ ক্ষেমকামৈ র্যাদৃশং র্যাদৃশং কার্য্যং কর্ত্তব্যং। এবং যাদৃগ যাদৃক্ কার্য্যং ন কর্ত্তবা মিত্যুপদেশো যতো লভ্যতে। তাদৃশং সর্ব্ব মত্রো প বর্ণিতম্। নীতি পূর্ণত্বা দিয়ং নীতি রিতি। যস্যা এষ প্রথমঃ শ্লোকঃ।

স্রগ্ধরা ছন্দঃ।

(১) শক্তেঃ কার্য্যংহি—রক্ষা, নহি পরদলনং।

(২) সৌম্য বুদ্ধেঃ ক্রিয়াপি—সচ্চিন্তৈবে ত্য শাঠ্যং।

(৩) ধনকৃতি—রথিনা-প্যায়নং নাপকর্ম্ম।

(৪) কৃত্যা স্বীয়া—সুকৃত্যেষ্বিহ সহচরতা নাপি হিংসা কথঞ্চিৎ।

(৫) এবং সদ্-যৌবনস্যাস্পদমপি—কৃতিতা-সাধনং নো কুবৃত্তি রিতি।

অনেন শ্লোকেন—বল বুদ্ধি ধন জন যৌবনানা মেষাং পঞ্চানাং কার্য্যাকার্য্য বর্ণনেন তত্তৎসম্পত্তি মতঃ প্রত্যেত দেবো পদিষ্টম্।

তত্তদেব হি কুর্য্যু র্যে, তত্তৎ সম্পত্তি শালিন ইতি।

প্রদর্শিত শ্চাস্মিন্ ক্রিয়া বোধকানামভাব বোধকানাঞ্চ যাবতামেব শব্দানা মেকত্র ব্যবহার ইতি।

অনুবাদ।

১৫। কণ কাব্যের দ্বিতীয় কণের নাম নীতি। নীতি কাব্যে মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ মঙ্গলকামী পুরুষের যেরূপ কার্য্য কর্ত্তব্য। এবং যেরূপ কার্য্য কর্ত্তব্য নহে, এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যাহা নীতিপূর্ণ বলিয়া ইহার নাম নীতি। যাহার প্রথম শ্লোক এই।

শক্তেঃ কার্য্যং হি রক্ষেত্যাদি—উল্লিখিত। শ্লোকটি স্রগ্ধরা ছন্দে রচিত। তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। এই শ্লোকটিতে বল বুদ্ধি ধন জন ও যৌবন এই পাঁচটির

কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য বর্ণিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা সেই সেই সম্পত্তিমান্‌দিগের প্রতি এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যে যাঁহারা সেই সেই সম্পত্তিশালী। তাঁহারা এই শ্লোকোক্ত সেই সেই সম্পত্তির যাহা কার্য্য তাহাই করিবেন। এবং এই শ্লোকটিতে সংস্কৃত শিক্ষার্থীদিগের সংস্কৃত ভাষায় যাহাতে অধিক প্রবেশ হয়। তাহার জন্য ক্রিয়াবোধক ও অভাববোধক যতগুলি শব্দ এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে সেই সমস্ত গুলির একত্রে প্রয়োগেব রীতি ও প্রদর্শিত হইয়াছে ক্রিয়াবোধক শব্দ— কার্য্য, ক্রিয়া, কৃতি, কর্ম্ম, কৃত্যা, কৃত্য, ও আস্পদ এই সাতটি। অভাব-বোধক শব্দ—নহি, অ, ন, নাপি, নো এই পাঁচটি। সংস্কৃত ভাষায় যাহাদের ততদুর অভিজ্ঞতা নাই। তাঁহাদের জন্য শ্লোকটির বঙ্গ ভাষায় সংক্ষেপে অর্থ প্রকাশিত হইতেছে।

বিস্তৃত অর্থ নীতি কাব্যে দ্রষ্টব্য।

যদি কোনও ব্যক্তির শরীরে শ্রীশ্রী৺ভগবৎ কৃপায় কিছু বল জন্মে। ঐ বলদ্বারা তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য। যে সকল প্রাণী দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত কোন ও নিষ্ঠুর বলবান্ প্রাণি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া জীবন, অথবা ধন মান বা সতীত্ব হারাইতেছে, অথবা দৈবাৎ কোনও ভীষণ পঙ্কে, সুগভীর কূপে, অথবা প্রবল বেগে প্রবহমান কোনও ভীষণ নদীর স্রোতে, বা ঝঞ্ঝাবাতে, বা গৃহাদি দাহ স্থানে পতিত হইয়া, কিম্বা কোনও বৃক্ষারূঢ়, পর্ব্বতারূঢ়, বা অত্যুচ্চ প্রাসাদারূঢ় ব্যক্তি দৈববশতঃ ভ্রষ্ট হইয়া অথবা এইরূপ অন্য কোনও কারণে প্রাণ হারাইতেছে। রক্ষা করিবার উপযুক্ত বল শরীরে থাকিলে তখন ঐ বল দ্বারা ঐ সকল বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। নিষ্ঠুর হিংস্র পশু জাতীয়ের মত কোনও দুর্ব্বল প্রাণীকে পীড়ন করা মনুষ্য জাতীয়ের (আমরা বিদ্যা বুদ্ধি বিবেক ও দয়া গুণ সম্পন্ন। আমাদের সহিত অপর কোন নির্ব্বোধ নিষ্ঠুর হিংস্র জাতীয়ের তুলনা হইতে পারে না। এইরূপ অভিমান যে মনুষ্য জাতীয়ের হৃদয়ে নিরন্তর বিরাজমান তাহাদের) কর্ত্তব্য নহে।

যাঁহারা ভগবৎ প্রসাদে একটু ভালরূপ বুদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও ঐ বুদ্ধিদ্বারা শাস্ত্রচিন্তা, সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন চিন্তা, পরিবার পোষণ চিন্তা, পারলৌকিক চিন্তা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট চিন্তা, অথবা সদ্গুণ সম্পন্ন মহাত্মবর্গের চরিত্র, জনসাধারণের হিতসাধনোপায় যন্ত্রাদি সমূহ, ভগবচ্চরিত্র প্রভৃতি

উৎকৃষ্ট বিষয়ের চিন্তা, করাই কর্ত্তব্য। দুষ্টবুদ্ধিকাক শৃগালাদির ন্যায় অন্যায় রূপে অপরের বস্তু অপহরণ করা প্রভৃতি শঠতা প্রকাশ মনুষ্যবুদ্ধির কার্য্য নহে।

যাঁহারা ৺ঈশ্বরের অনুগ্রহ বশতঃ পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া অথবা স্বকীয় বল বুদ্ধি প্রভাবে ধনশালী হইয়াছেন, তাঁহাদের ঐ ধন দ্বারা কি করা উচিত যাহাতে সকল জীব আপ্যায়িত হয় (নরযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ও ব্রহ্মযজ্ঞ ইত্যাদিরূপ), কার্য্য করাই উচিত। ধন দ্বারা বশীকৃত ব্যক্তি দ্বারা বল পূর্ব্বক বা স্বয়ং ধন বা ধন দ্বারা সংগৃহীত বস্ত্র অলকারাদি প্রদান দ্বারা কোনও রূপ কুৎসিত কার্য্য (কাহারও অসম্মাননা, বা কোনও বস্তু অপহরণ বা সতীত্ব নাশাদি) সমাধা করা উচিত নহে।

জনের কার্য্য কি? অর্থাৎ ৺ভগবদনুকম্পায় যাঁহার পাঁচটা বন্ধুবান্ধব আছে, তাঁহার কিরূপ কার্য্য করা শ্রেয়স্কর। কোনও একজন মহাত্মা একটি সৎকার্য্য যাগ যজ্ঞাদি পুণ্যজনক কার্য্যই হউক, আর কোনও রূপ লোক হিতকর বস্তু নির্ম্মাণ বা সংগ্রহাদি রূপ কার্য্যই হউক), আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু লোকাভাববশতঃ তাহা সুসম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। যিনি জনসম্পৎ-সম্পন্ন, তাঁহার উচিৎ, ঐ সকল কার্য্যে সহায়তা করা। যাহাতে ঐ কার্য্যটি সুশৃঙ্খলায় সমাধা হইতে পারে।

পাঁচটা লোক আছে বলিয়া পল্লীস্থ, গ্রামস্থ বা দেশস্থ বা কাহারও সহিত অন্যায়রূপে দুরন্ত কুক্কুর জাতীয়ের মত কাহাকেও লাঞ্ছিত বা ভয় প্রদর্শন করা অথবা আপনারা আপনারাই খেকাখেকি করা কখনই সর্ব্ববিষয়ে সুবিচক্ষণ মনুষ্য জাতীয়ের কর্ত্তব্য নহে।

বল বুদ্ধি ধন ও জনের কার্য্য বিবেচিত হইল। পরিশেষে যৌবনের কার্য্য বিবেচিত হইতেছে। বাল্য যৌবন প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য এই অবস্থা চতুষ্টয়ের মধ্যে যৌবনাবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যৌবনকালে জীব সমুদায় সবল শরীর, প্রফুল্লান্তঃকরণ ও কর্ম্মঠ থাকে। সেই সময়ে যেরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করা যায়। সেইরূপ কার্য্যই অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া উঠা যায়। সেই উৎকৃষ্ট যৌবনের প্রকৃত কার্য্য কি? কৃতিত্ব সাধন করাই যৌবনের প্রকৃত কার্য্য। অর্থাৎ আত্মহিতকর অথবা লোকহিতকর যেরূপ কার্য্য (বিদ্যোপার্জ্জন, ধনোপার্জ্জন, বা কোনরূপ অদ্ভুত বস্তুর আবিষ্কার ইত্যাদি) অন্তে

অসাধ্য বা দুঃসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, সেইরূপ কার্য্য সমাধা করিয়া জনসমাজে একজন কৃতী পুরুষ বলিয়া পরিচিত হওয়াই সেই উৎকৃষ্ট যৌবনের প্রকৃত কার্য্য। বলবদিন্দ্রিয়, অনন্যকর্ম্মা, ছাগ যণ্ড ও কুক্কুটাদির মত কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা মনুষ্য যৌবনের প্রকৃত কার্য্য নহে।

আচ্ছা বেশ। বল্ বুদ্ধি প্রভৃতির প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া কার্য্য বলা হইল। তাহার মধ্যে একটি কার্য্যকে প্রকৃত কার্য্য, এবং অপর কার্য্যটিকে অপ্রকৃত কার্য্য বলা হইল। ইহাতে যুক্তি কি? দুইটাই যখন কার্য্য। তখন এই কার্য্যটিই প্রকৃত, ঐ কার্য্যটি প্রকৃত নহে, একথা কে বলিল। আমি বলি, যেটিকে অপ্রকৃত বলা হইয়াছে ঐটিই প্রকৃত। আর যেটিকে প্রকৃত বলা হইয়াছে, ঐটিই অপ্রকৃত। উত্তর! যে কার্য্যটী ভগবদভিপ্রেত সেইটি প্রকৃত কার্য্য। আর যে কার্য্যটি ভগবদভিপ্রেত নহে। সেইটি অপ্রকৃত কার্য্য। ভগবদভিপ্রেতই আবার কোনটি? যেটি তাঁহার পুত্রমাত্রের (অর্থাৎ সমস্ত জীবের) অভিপ্রেত, সেইটিই ভগবদভিমত। সমস্ত পুত্রের যাহা অনভিপ্রেত তাহা কখনই করুণাময় পিতার অভিপ্রেত হইতে পারে না। ইহা স্থির! এক্ষণে আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, কোনও সময়ে দৈবাৎ আপনি কোনও-রূপ বিপদাপন্ন হইয়াছেন! আর একজন বলবান্ পুরুষ আসিয়া আপনাকে ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার করিল। অপর এক সময় আপনি সুস্থ শরীরে নিজের বাসগৃহে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, আর একজন দুর্জ্জন বলপূর্ব্বক আপনার গৃহে প্রবেশ করিয়া আপনাকে ঐরূপ বিপদাপন্ন করিল। আপনি এক্ষণে কোন লোকটিকে এবং কোন কার্য্যটিকে প্রশংসা করিবেন। দুষ্ট ঐ চোরটিকে প্রশংসা করিবেন কি? বোধ হয় করিবেন না। আপনি যেমন প্রশংসা করেন না, আবার আমিও ঐ অবস্থাপন্ন, অর্থাৎ ঐরূপ বিপদাপন্ন হইলে আমিও তাহাকে প্রশংসা করি না, তেমনি ঐ অবস্থাপন্ন হইলে জগতে কেহই তাহাকে প্রশংসা করিবে না। সুতরাং বলের সেই কার্য্যটি সমস্ত জীবের অনভিপ্রেত। যখন আমাদের সকলের অনভিপ্রেত, তখন বুঝিতে হইবে আমাদের সকলের পিতা শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরেরও তাহা অনভি-প্রেত। যখন তাঁহার অনভিপ্রেত। তখন সেই কার্য্যটি অপ্রকৃত ইহা স্থির হইল। এবং যে কার্য্যটি প্রকৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই কার্য্যটিকে

উক্তরীতিক্রমে আমরা সকলেই প্রশংসা করি। সুতরাং জগৎপিতাও সেই কার্য্যটিকে প্রশংসা করেন। যাহা জগৎপিতার প্রশংসিত সেই কার্য্যটিই প্রকৃত, ইহা সিদ্ধ হইল। যাহার যাহা প্রকৃত কার্য্য সেই কার্য্যে তাহার ব্যবহার করিলে তাহার যথোচিত ব্যবহার করা হয়। এবং অপ্রকৃত কার্য্যে ব্যবহার করিলে সেই সেই অনর্থ বস্তুর অপব্যয় করা হয়। বস্তুর সদ্‌ব্যয় করিলে জগতের সহিত জগৎপিতা সন্তুষ্ট হন, এবং অপব্যয় করিলে সকলেই অসন্তুষ্ট হন। সকলে অসন্তুষ্ট হইলে কি ফল ফলিতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া—যাহা সকলে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাই করুন।

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীসীতানাথ ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি।

ছায়া।

তৃতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

পার্ব্বত্য প্রদেশ।

ছায়া, সুরজ ও সৈন্যগণ।

ছায়া।—
সৈন্যগণ, বন্ধুগণ, কাশ্মীর সন্তান!
জানসবে দীন হীনা কৃষক বালিকা—
আমি—জ্ঞানহীনা অবলা রমণী। কিন্তু
আজ দেবতার আদেশ বাহিনী আমি
এসেছি হেথায়—যুঝিতে ইরাণী সনে
দেবতা ইচ্ছায়। দেবতা ইচ্ছায় আজ,
অজেয় দেবতা শক্তি সঞ্চারিত ক্ষুদ্র
এরমণী দেহে; দেবজ্ঞান; জ্ঞানহীনা,
নারীর হৃদয়ে। আজি হতে দেবতেজে
তেজস্বিনী সমর রঙ্গিনী আমি, নহি
আর অবলা রমণী—জ্ঞান হীনা দীনা
কৃষক নন্দিনী। দেবভক্ত অনুগত

ক্ষত্রিয় সন্তান হয়ে, কেবা হেন হীন
কাপুরুষ—বীর দর্পে যেই বীরতেজে
তেজস্বিনী সমর রঙ্গিণী সনে নাহি
যাবে রণে, কাঁপায়ে মেদিনী নাচিবে না
সমর রঙ্গিনী সনে সমর অঙ্গনে ?

সৈন্যগণ।—

পাষণ্ড কি কাপুরুষ হেন কেহ নই
কেহ নই মোরা। দেবী তুমি আসিয়াছ
রক্ষিবারে দেশ, অনুগত দাস মোরা
ছায়াসম যেথা যাবে যাব— যা করাবে
করিব তাহাই।

ছায়া।—

অপমান অত্যাচারে
বল গর্ব্বে গর্ব্বিত শত্রুর করে,—আছে
কে এমন যার বিষময় শূল সম
বাজে না অন্তরে ? হীনচেতা কে এমন
মানব হইয়া, প্রাণ দিয়া প্রতিশোধ
না করে তাহার, নীরবে সহিয়া যায়,
অবনত হ'য়ে—সেই শত্রু পদতলে।

সৈন্য।—

কেহনা কেহনা দেবী কেহনা এমন ?

ছায়া।—

শত—শতগুণে গরীয়সী নিজ হতে
জননী সবার। যে লাঞ্ছনা নিজে নাহি
নার সহিবারে, নিতি নিতি সে লাঞ্ছনা
গর্ব্বিত শত্রুর করে সহিল জননী,
কুলাঙ্গার আছে কে এমন—হেরিবারে
পারে যে নীরবে—নিতি নিতি জননীর
সে লাঞ্ছনা, সেই অপমান ?

সৈন্য।—

যে পারে সে
যোগ্য নহে মানব নামের—ধীক্ তারে
শত ধিক্।

ছায়া।—

জননীর উদর হইতে
অবতীর্ণ অসহায় শিশুরে যে ভূমি
দিল স্থান প্রথমে আপন বক্ষে, যেই
ভূমি নিজ বক্ষ রস হ'তে, সঞ্চারিল
শিশুর জীবন সুধা জননীর বুকে,—
জিয়াইলে শস্য ফল নিজের শোণিতে,
মানবত্বে বাড়াতে শিশুরে। জননীরে,
জননীর জননীরে—অসহায় ক্ষুদ্র
শিশু হ'তে বাড়ায়ে নারীত্বে যেই ভূমি
করিল জননী—সেই ভূমি—জন্মভূমি
সেই—বল সবে নয় কি জননী ?

সৈন্য।—

সুধু—
কি জননী ? জন্মভূমি, জননী,জননী—
জননীর জননী, জননী।

ছায়া।—

লক্ষ লক্ষ
গুণে জননীর বড়,—সেই জন্মভূমি—
দেখচেয়ে, বল গর্ব্বে গর্ব্বিত অরাতি
দিবানিশি দলিছে চরণ তলে। দেখ,
দেখ চেয়ে শত শত সন্তান শোণিতে,
বহিছে মায়ের বক্ষে ভীষণ তটিনী—
মায়ের শ্মশান বক্ষে সে তটিনী তটে,—

দেখ—দেখ ওই, জ্বলিতেছে শত শত—
সন্তানের চিতা। সহিতে না পার যদি
নিজ অপমান; মাতৃদুঃখ অপমান
সহে যেই জন—সে যদি অযোগ্য হয়
মানব নামের; মাতৃ হ'তে লক্ষগুণে
বড় সেই জন্মভূমি -জননী জননী
জননীর জননী জননী :—তাঁর এই
অপমান- তাঁর এ যাতনা দিবানিশি
কেমনে নীরবে বল সহিতেছ সবে ?
জননীর এলাঞ্ছনা গর্ব্বিত শত্রুর
করে—দিবানিশি হেরিয়া নয়নে সবে
সন্তান তোমরা, কেমনে নিশ্চিন্ত মনে
রহিয়াছ গৃহে সুখে পরিজন সনে ?
কোন প্রাণে কেমনে বা দিতেছ উদরে
অন্ন ? সুখশয্যা মাঝে সবে কেমনে বা
লভিছ বিশ্রামসুখে নিদ্রাদেবী কোলে ?

সৈন্য।—
ব'লোনা ব'লোনা দেবী আর ! সহিতে
না পারি। মহাপাপি মোরা বল কি
করিলে প্রায়শ্চিত্ত হবে এ পাপের ?

ছায়া।— প্রায়শ্চিত্ত
প্রাণদান জননী উদ্ধার'তরে ! বল,
সবে প্রস্তুত কি তায় ?

সৈন্য।— প্রস্তুত, প্রস্তুত
মোরা।• চলিনু সমরে আজ উদ্ধারিব
জননীরে, নয় প্রাণনিয়ে এক প্রাণী
ফিরিবনা গেহে।

ছায়া। ধন্য, ধন্য সবে
যোগ্য বটে মায়ের সন্তান ! চল, চলতবে
বন্ধুগণ। দেখ, দেখ চেয়ে ওই দূরে
উড়িছে সারণ দুর্গে কাশ্মীর পতাকা।
নিজে মাতা উড়ায়ে অঞ্চল ডাকিছেন
আপন সন্তানে রণে। আকুল আহ্বানে
মার-শিরায় শিরায় ছুটুক শোনিত
তপ্ত সন্তান শরীরে; মাতিয়া উঠুক
প্রাণ রুদ্র রণমদে। ধর করে খর
অসি উন্মুক্ত শানিত. ঘোর জয়নাদে
কাঁপায়ে অরাতি বক্ষ, বীর দর্পে চল
রণে; নিভাইতে অরাতি শোনিতে, মার
বুকে সন্তানের চিতা। যায় যদি যাক্
প্রাণ ; মাতার আহ্বানে, ছার প্রাণে
কিসের মমতা ? একদিন যাবে প্রাণ ;
জননী উদ্ধার তরে যায় যদি আজ
মৃত্যুতে অমর হবে অনন্ত অক্ষয়
যশে এই মহীতলে, পাবে পরকালে
অনন্ত বিশ্রাম শান্তি দেবতার কোলে
চল তবে রণে সবে ছাড়িয়া হুঙ্কার
কাশ্মীরের জয়কার উঠাও গগণে,
বল সবে জয় জয় কাশ্মীরের জয়,
দেবতা সহায় রণে কি ভয়, কি ভয় ?

সৈন্য।—
জয় জয় জয় আজি কাশ্মীরের জয় !
দেবতা সহায় রণে কি ভয় কি ভয় ?

(সকলের প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালী প্রসন্ন দাশ গুপ্ত, এম, এ।

"ঊষা"

[কুমারী স্নেহলতা সেন লিখিত]

জাগরে ভগিনী,　　　গত নিশীথিনী,
　　এসেছেন ঊষারাণী।
শুন পিককুল,　　　প্রেমেতে আকুল,
　　করিছে মধুর ধ্বনি ॥
উড়িছে নিশান,　　　বাজিছে বিষান,
　　কিবা মনোহর তান।
গ্রাম্য সরোবরে,　　　যায় দ্বিজবরে,
　　করিবারে প্রাতঃস্নান ॥
পূরব অম্বরে,　　　কিবা শোভা ধরে,
　　সোণার অঞ্চল গায়।
ধীরে ধীরে ধীরে,　　　প্রজ্জলিত শিরে,
　　ভানুর বিকাশ পায় ॥
এ ঊষা সৃজন,　　　করেছে যেজন,
　　কর তাঁর গুণগান।
বিশ্বের গগনে,　　　ভাতিল তপনে,
　　হল নিশি অবসান ॥
বাঁধহে কুন্তল,　　　চঞ্চল অঞ্চল,
　　গাতোল হয়েছে ভোর।
মাগিহে আশীষ,　　　জয় জগদীশ,
　　আনন্দে বহিছে লোর ॥

(সমাপ্ত)

সারদা

[কুমারী স্নেহলতা সেন লিখিত]

(১)

আজি কিসের কারণে পুরবাসী সবে,
আনন্দেতে নিমগন।
চারিদিকে কেন, ঢাক ঢোল বীণা,
বাজিতেছে অগনণ ॥

(২)

আজি কিসের কারণে, নারীগণ মিলি,
করিতেছে "উলু" ধ্বনি।
বালকেরা কেন, নাচিতে নাচিতে,
ডাকিতেছে বীণাপাণি ॥

(৩)

আজি কিসের কারণে, প্রকৃতি সুন্দরী,
ধরিছে মোহন বেশ।
কারো মনে কেন, না পাই হেরিতে,
পাপ শোক হিংসা দ্বেষ ॥

(৪)

আজি কিসের কারণে, দেবের মন্দিরে,
সকলে যেতেছে ছুটে।
পড়িতেছে কেন, মায়ের পায়েতে,
নমস্কারি করপুটে ॥

(সমাপ্ত)

বসন্ত কোকিল।

[কুমারী সুশীল প্রতিমা সেন লিখিত]

ডাকিছ সঘনে, কুহু কুহু স্বণে,
কে তুমি কাল পাখী !
তোমার সমান, মধুময় প্রাণ,
আর নহে কোন পাখী ॥
ঋতুরাজ এলে, দিয়া মাল্য গলে,
পরে-কোথা চলে যাও।
আড়ালে থাকিয়া, থাকিয়া থাকিয়া,
রমণীয় স্বরে গাও,
কুহু কুহু রবে, গাও তুমি যবে,
তার অনুরূপ করি।
গাহে যদি কেহ, থাক নিজ গেহ,
থাক তুমি চুপকরি ॥
লজ্জাবতী বালা, কোমলা অবলা,
চুপ করে থাকে যথা।
নববধু যেমতি, তুমিও তেমতি,
কও পুনঃ কুহু কথা ॥
কলসী লইয়া, তোমারে স্মরিয়া,
পুকুরেতে যাই আমি।
আম্র বৃক্ষোপরি, বিরহি বিদরি,
কুহু কুহু গাও তুমি ॥
আম্র বৃক্ষেতান, গাও তুমি গান,
কভু বট ডালে থাকি।
বসন্তের রাণী, মুগধ পরাণী,
বিমোহিত হয়ে থাকি ॥
বিটপী অটবী, সুন্দর হে সবি,
গাহ তুমি থাকি থাকি।
মধুর আরাবে, দয়িতের ভাবে,
কে তুমি হে কাল পাখি ॥
চিনিয়াছি বধু, তুমি ওগো মধু,
কোকিল হও হে তুমি।
কোকিল সুজন, যাঁহার সৃজন,
তাঁহার চরণে নমি ॥

(সমাপ্ত

বৃহৎ পরাশর হোরা শাস্ত্রম্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

রাশীনাং কারকতাদি বিচারঃ।

মেষো বৃষশ্চ মিথুনঃ কর্কসিংহ কুমারিকাঃ। তুলালিধনুষো নক্র কুম্ভ মীনাস্ততঃ পরাঃ॥ অহোরাত্রাখ্যন্ত লোপাদ্ধোরেতি প্রোচ্যতেবুধৈঃ। তস্যহি জ্ঞানমাত্রেণ জাতকর্ম্মফলং বদেৎ॥ পদব্যক্তাত্মকো বিষ্ণুঃ কালরূপো জনার্দ্দনঃ। তস্যাঙ্গানি নিবোধ ত্বং ক্রমান্ মেষাদি রাশয়ঃ॥ শীর্ষাননৌ তথা বাহু হৃৎক্রোড়কটিবস্তয়ঃ। গুহ্যোরুযুগলে জানু যুগ্মে বৈ জঙ্ঘকে তথা॥ চরণৌ দ্বৌ তথা লগ্নাৎ জ্ঞেয়াঃ শীর্ষাদয়ঃ ক্রমাৎ। চরস্থির দ্বিস্বভাবাঃ ক্রূরাক্রূরৌ নরস্ত্রিয়ৌ॥ পিত্তানিলত্রিধাত্বৈক্যশ্লৈষ্মিকাশ্চ ক্রিয়াদয়ঃ। রক্তবর্ণো বৃহদ্গাত্রশ্চতুষ্পাদ্রাত্রিবিক্রমী॥ পূর্ব্ববাসী নৃপজ্ঞাতিঃ শৈলচারী রজোগুণী। পৃষ্ঠোদয়ী পাবকী চ মেষরাশিঃ কুজাধিপঃ॥ শ্বেতঃ শুক্রাধিপো দীর্ঘশ্চতুষ্পা-চ্ছর্ব্বরী বলী। যাম্যাট্ গ্রাম্যো বণিগ্ ভূমিব্রজী পৃষ্ঠোদয়ো বৃষঃ॥ শীর্ষোদয়ী নৃমিথুনে সগদঞ্চ সবীণকম্। প্রত্যক্ শমীদ্বিপাদ্রাত্রিবলী গ্রামব্রজোঽনিলী॥ সমগাত্রো হরিদ্বর্ণো মিথুনাখ্যো বুধাধিপঃ। পাটলো বনচারী চ ব্রাহ্মণো নিশিবীর্য্যবান্॥ বহুপাদ্বুত্তরঃ স্থূলতনুঃ সত্বগুণী জলী। পৃষ্ঠোদয়ী কর্করাশি র্মৃগাঙ্কোঽধিপতিঃ স্মৃতঃ॥ সিংহঃ সূর্য্যাধিপঃ সত্বঃ চতুষ্পাৎ ক্ষত্রিয়ো বলী। শীর্ষোদয়ী বৃহদ্গাত্রঃ পাণ্ডুঃ পূর্ব্বাট্ দ্যুবীর্য্যবান্॥ পার্ব্বতীয়াথ কণ্যাখ্যা রাশির্দ্দিন বলান্বিতা। শীর্ষোদয়া চ মধ্যাঙ্গা দ্বিপাদ্ যাম্যচরা চ সা॥ শশস্যদোহনা বৈশ্যা চিত্রবর্ণা প্রভাঞ্জিনী। কুমারী তমসাযুক্তা বালভাবা বুধাধিপা। শীর্ষোদয়ী দ্যুবীর্য্যাঢ্যস্তথা কৃষ্ণো রজোগুণী। পশ্চিমো ভূচরো ঘাতী শূদ্রো. মধ্যতনুর্দ্বিপাৎ॥ শুক্রোধিপোঽথ স্বল্পাঙ্গো বহুপাদ্ ব্রাহ্মণো বলী। সৌম্যস্থো দিনবীর্য্যাঢ্যঃ পিশঙ্গো জলভূবহঃ॥ রোমশাঢ্যোঽতিতীক্ষ্ণাঙ্গো বৃশ্চিকশ্চ কুজাধিপঃ। পৃষ্ঠোদয়ীস্বথ ধনুর্গুরুস্বামী চ সাত্বিকঃ॥ পিঙ্গলো নিশিবীর্য্যাঢ্যঃ পাবকঃ

ক্ষত্রিয়ো দ্বিপাৎ। আদাবন্তে চতুষ্পাদঃ সমগাত্রো ধনুর্দ্ধরঃ॥ পূর্ব্বস্থো বসুধাচারী তেজস্বী কুজপৃষ্ঠকঃ। মন্দাধিপস্তমী ভৌমী যাম্যাট্ চ নিশিবীর্য্যবান্॥ পৃষ্ঠোদয়ী বৃহদ্গাত্রঃ কর্ব্বুরো বনভূচরঃ। আদৌ চতুষ্পাদন্তে তু বিপদো জলগো মতঃ॥ কুম্ভঃ কুম্ভী নরো বভ্রুবর্ণমধ্যতনুর্দ্বিপাৎ। দ্যুবীর্য্যো জলমধ্যস্থো বাতশীর্ষোদয়ী তমঃ॥ শূদ্রঃ পশ্চিমদেশস্থ স্বামী দৈবাকরিঃ স্মৃতঃ। মীনৌপুচ্ছাস্য সংলগ্নৌ মীনরাশির্দ্দিবাবলী॥ জলীসত্বগুণাঢ্যশ্চ স্বস্থো জলচরোদ্বিজঃ। অপদো মধ্যদেহী চ সৌম্যস্থোহ্যভয়োদয়ী॥ সুরাচার্য্যোঽধিপশ্চাস্য মীনাম্বুভোজন প্রিয়ঃ। রাশীনাং হি গুণাবিপ্র সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া॥

রাশিদিগের কারকতাদি বিচার।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভও মীন এই দ্বাদশ রাশি। "অহোরাত্র" এই কথার আদ্য ও অন্ত্যবর্ণ লোপ করিয়া "হোরা" এই শব্দটী পাওয়া গিয়াছে; এই হোরাজ্ঞান হইলেই জন্মফল বলা কর্ত্তব্য। বিষ্ণু কাল স্বরূপ, আর তাঁহার স্বরূপ স্থানবিভাগ দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। মেষাদি দ্বাদশরাশি যথাক্রমে তাঁহার দ্বাদশ অঙ্গস্বরূপ জানিবে অতএব লগ্নাদি দ্বাদশরাশি হইতে যথাক্রমে মস্তক, মুখ, বাহুদ্বয়, হৃদয়, ক্রোড়, কটিদেশ, বস্তি অর্থাৎ তলপেট, গুহ্যপ্রদেশ, উরুযুগল, জানুদ্বয়, জঙ্ঘদ্বয় ও চরণযুগল এই দ্বাদশ অঙ্গের বিচার করিতে হয়।* মেষাদি দ্বাদশরাশি যথাক্রমে চর, স্থির ও দ্বিস্বভাব;—ক্রূর ও অক্রূর;—পুরুষ ও স্ত্রী;—পিত্ত-প্রকৃতিক, বায়ুপ্রকৃতিক, বাতপিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতিক ও শ্লেষ্মপ্রকৃতিক নামে কথিত হয়। যথা,—মেষরাশি চর, ক্রূর, পুরুষ ও পিত্তপ্রকৃতি বিশিষ্ট; বৃষরাশি স্থির, অক্রুর, স্ত্রী ও বায়ুপ্রকৃতি বিশিষ্ট—এইপ্রকার। মেষরাশি, রক্তবর্ণ, বৃহদ্গাত্র, চতুষ্পদ, রাত্রিবিক্রমী, পূর্ব্বদিগ্বাসী, নৃপজাতি, পর্ব্বতচারী, রজোগুণী, পৃষ্ঠোদয়ী ও অগ্নিবিশিষ্ট—মঙ্গলগ্রহ ইহার অধিপতি। বৃষরাশি

* যে রাশিতে ষষ্ঠ, অষ্টমও দ্বাদশাধিপতি থাকে কিম্বা যে রাশির অধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানে যায় কিম্বা যে রাশিতে পাপগ্রহ থাকে সেই রাশি সূচিত অঙ্গের পীড়া হয়।

শ্বেত, দীর্ঘ, চতুষ্পদ, রাত্রিবলী, দক্ষিণদিকের অধিপতি, গ্রামবাসী, বণিক্, ভূমিরাশি ও পৃষ্ঠোদয়—শুক্রগ্রহ ইহার অধিপতি। মিথুনরাশি শীর্ষোদয়ী, নরযুগ্ম, গদাধারী, বীণাযন্ত্র যুক্ত, পশ্চিমদিকের অধিপতি, দুইপদ বিশিষ্ট, রাত্রিতে বলশালী, গ্রামে ভ্রমণশীল, বায়ুযুক্ত, সমগাত্র ও হরিদ্বর্ণ—বুধগ্রহ ইহার অধিপতি। কর্কট রাশি পাটল, বনচারী, ব্রাহ্মণ, রাত্রিতে বিক্রমশীল, বহুচরণযুক্ত, উত্তরদিক্, স্থূলতনু, সত্ত্বগুণী, জলযুক্ত ও পৃষ্ঠোদয়ী—চন্দ্র ইহার অধিপতি। সিংহরাশি সত্ত্বগুণী, চতুষ্পদ, ক্ষত্রিয়, বলবান্, শীর্ষোদয়ী, বৃহদ্গাত্র, পাণ্ডু, পূর্ব্বদিকের অধিপতি—আর দিনে ক্ষমতাশালী—রবিগ্রহ ইহার অধিপতি। কণ্যারাশি পর্ব্বতবাসিনী, দিনে বলশালিনী, শীর্ষোদয়া, মধ্যপ্রকার শরীর বিশিষ্টা, দ্বিপাদ্, দক্ষিণদিক্ চারিণী, শশকদোহনশীলা, বৈশ্যা, বিচিত্রবর্ণবিশিষ্টা, সুন্দরী, কুমারী, তমোগুণ বিশিষ্টা ও বালকের ন্যায় স্বভাবশীলা—বুধগ্রহ ইহার অধিপতি। তুলারাশি শীর্ষোদয়ী, দিনে বলবান্, ধনী, কৃষ্ণদেহ, রজোগুণী, পশ্চিমদিক্, ভূচর, হননশীল, শূদ্র, মধ্যপ্রকার শরীর বিশিষ্ট ও দ্বিপদ্—শুক্রগ্রহ ইহার অধিপতি। বৃশ্চিক রাশি ক্ষুদ্রদেহ, বহুপদবিশিষ্ট, ব্রাহ্মণ, বলশীল, উত্তরদিগ্স্থিত, দিবাভাগে বলী, পিঙ্গলবর্ণ, জলভূমিচারী, রোমশ, ধনী ও অতি তীক্ষ্ণ শরীর বিশিষ্ট—মঙ্গলগ্রহ ইহার অধিপতি। ধনুরাশি পৃষ্ঠোদয়ী, সাত্ত্বিক, পিঙ্গলবর্ণ, রাত্রিতে বলশালী, ধনী, অগ্নি, ক্ষত্রিয়, দ্বিপদ কিন্তু আদি ও অন্তে চতুষ্পদ, সমগাত্র, ধনুর্দ্ধর, পূর্ব্বদিগ্বাসী, ভূচর, তেজস্বী ও কুব্জপৃষ্ঠ—বৃহস্পতিগ্রহ ইহার অধিপতি। মকররাশি তমোগুণ বিশিষ্ট, ভূমিশীল, দক্ষিণদিগ্বাসী, রাত্রিতে বলশীল, পৃষ্ঠোদয়ী, বৃহদ্গাত্র, রাক্ষস, বনচারী, প্রথমে চতুষ্পদ পরে পদ বিহীন ও জলে গমনশীল—শনিগ্রহ ইহার অধিপতি। কুম্ভরাশি কুম্ভ অর্থাৎ কলশযুক্ত, নর পিঙ্গলবর্ণ, মধ্যপ্রকার শরীর বিশিষ্ট, দ্বিপদ, দিনে বীর্যশীল, জলমধ্যস্থ, বায়ুরাশি, শীর্ষোদয়ী, তমোগুণ বিশিষ্ট, শূদ্র ও পশ্চিমদেশের অধিপতি—শনিগ্রহ ইহার অধিপতি। মীন রাশির আকার একটীর পুচ্ছে অপরের মুখ সংলগ্ন এইরূপ দুইটি মৎস্যের ন্যায়। ইহা দিবসে বলবান্, জলযুক্ত, * * সত্ত্বগুণ

* * মেষাদি রাশিগণ যথাক্রমে অগ্নি, পৃথ্বী, বায়ু ও জল যুক্ত রাশি বলিয়া

কথিত হয়। জল ও ভূমি রাশিতে লগ্ন হইলে বা লগ্নাধিপতি অবস্থান করিলে জাতকের শরীর স্থূল ও শক্ত হয়, অগ্নি ও বায়ু রাশিতে হইলে শরীর শীর্ণ ও শুষ্ক হয়। ঐরূপ বৃহস্পতি, শুক্র ও চন্দ্র এই তিন জলগ্রহ যদি লগ্নে থাকে বা লগ্নাধিপতির সহিত যুক্ত হয় তাহা হইলে শরীর স্থূল হয়, আর রবি, মঙ্গল, শনি, রাহু প্রভৃতি শুষ্কগ্রহযোগে শরীর শুষ্ক হয়।

অথ নিষেকলগ্নং কথ্যতে। অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব মুনিপুঙ্গব। জন্মলগ্নঞ্চ সংশোধ্য নিষেকং পরিশোধয়েৎ॥ যস্মিন্নংশে ভানবিঃ স্যাৎ তস্য মান্দে * র্যদন্তরং। লগ্নভাগ্যান্তরং যোজ্যং যচ্চ রাশ্যাদি জায়তে॥ মাসাদিস্তন্মিতং জ্ঞেয়ং জন্মতঃ প্রাক্ নিষেকজং। যদ্যদ্ দৃশ্যো দলাঙ্গেশ-স্তদিন্দোর্ভুক্তভাগযুক্॥ তৎকালে সাধয়েল্লগ্নং শোধয়েৎ পূর্ব্ববত্তনুঃ। তস্মাৎ ফলাফলং বাচ্যং গর্ভস্থস্য বিশেষতঃ॥ শুভাশুভং বদেৎ পিত্রোর্জীবনং মরণং তথা। এবং নিষেকলগ্নেন সম্যক্ জ্ঞেয়ং স্বকল্পনাৎ॥

নিষেক লগ্ন।

অনন্তর কিরূপে নিষেক অর্থাৎ গর্ভসঞ্চারের সময় নির্ণয় করিতে হয় তাহাই বলা হইতেছে। জন্ম কুণ্ডলীর যে অংশে শনি অবস্থান করে আর যে অংশে গুলিক অবস্থান করে তাহাদের বিয়োগ ফল যত অংশ হয়, সেই অংশের সহিত লগ্ন ও নবম ভাবের বিয়োগ ফল যত রাশ্যংশাদি হয়, তত রাশ্যংশাদি যোগ করিবে। যোগফল যত রাশি ও অংশ হইবে জন্মের তত মাস ও তত দিন পূর্ব্বে গর্ভসঞ্চার হইয়াছে জানিতে হইবে। (উক্ত যোগ ফলে যত কলা থাকিবে তত দণ্ড, আর যত বিকলা থাকিবে তত পল ধরিতে হইবে।) জন্মকালে চন্দ্রের যেরূপ অংশাদি ভুক্ত হইয়াছে দেখিবে, নিষেক কালেও

প্রধান, সুস্থদেহ, জলচর, দ্বিজ (ব্রাহ্মণ ও দুইবার জন্ম বিশিষ্ট) অপদ অর্থাৎ-পদবিহীন, মধ্যদেহী, উত্তর দিক্‌স্থিত, উভয়োদয়ী, জল ও মৎস্য ভোজন প্রিয়, আর—বৃহস্পতি ইহার অধিপতি।

* মান্দিঃ—মন্দস্য শনেরপত্যং পুমানিতি মন্দ শব্দাৎ ষ্ণি প্রত্যয়। গুলিকঃ ইত্যর্থম্।

চন্দ্রের সেইরূপ অবস্থা ছিল বুঝিতে হইবে। এইরূপে নিষেক কাল নির্ণয় হইলে তৎকালের লগ্নসাধন করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রাণপদাদি দ্বারা তদ্ধশোধন করিবে। এই নিষেক লগ্ন হইতে গর্ভস্থ শিশুর ও তাহার পিতামাতার শুভাশুভ প্রভৃতি যাবদীয় ফলাফল বলা চলে।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

অথ রিষ্টারিষ্টভঙ্গাধ্যায়ঃ—চতুর্ব্বিংশতিবর্ষাণি যাবদ্‌গচ্ছন্তি জন্মনঃ। জন্মারিষ্টন্তু তাবৎ স্যাদায়ুর্দ্দায়ং ন চিন্তয়েৎ॥ ষষ্ঠাষ্টরিপ্ফগশ্চন্দ্রঃ ক্রূরৈশ্চ সহ বীক্ষিতঃ। জাতস্য মৃত্যুদঃ সদ্যস্বষ্টবর্ষৈঃ শুভেক্ষিতঃ॥ শশিবন্মৃত্যুদা সৌম্যাশ্চেদ্বক্রাঃ ক্রূরবীক্ষিতাঃ। শিশোর্জাতস্য লগ্নেচ চন্দ্রে সৌম্যবিবর্জ্জিতে॥ যস্য জন্মনিধিস্থাঃস্যুঃ সূর্য্যার্কীন্দুকুজাভিধাঃ তস্য স্বাশুজনিত্রী চ ভ্রাতা চ নিধনং লভেৎ॥ পাপেক্ষিত যুতো ভৌমো লগ্নগো ন শুভেক্ষিতঃ। মৃত্যুদস্ত্বষ্টমস্থোঽপি সৌরেণার্কেণ বা পুনঃ॥ চন্দ্রঃ সূর্য্যো যদা রাহু-চন্দ্র-সূর্য্যযুতো ভবেৎ। সৌরিভৌমেক্ষিতং লগ্নং পক্ষমেকং সজীবতি॥ কর্ম্মস্থানে স্থিতঃ শৌরিঃ শত্রুস্থানে কলানিধিঃ। ক্ষিতিজে সপ্তমস্থানে সমাত্রা ম্রিয়তে শিশুঃ॥ লগ্নে ভাস্কর পুত্রশ্চ নিধনে চন্দ্রমা যদি। তৃতীয়স্থো যদা জীবঃ স যাতি যমমন্দিরম্॥ লগ্নস্য নবমে সূর্য্যঃ সপ্তমস্থঃ শনৈশ্চরঃ। একাদশে গুরুঃ শুক্রো মাসমেকং স জীবতি॥ ব্যয়ে সর্ব্বে গ্রহা নেষ্টাঃ সূর্য্যশুক্রেন্দুরাহবঃ। বিশেষান্নাশকর্ত্তারো দৃষ্ট্যা বা ভঙ্গকারিণঃ॥ পাপান্বিতঃ শশী-ধর্ম্মদ্যূনলগ্নগতো যদি। শুভৈরবীক্ষিত যুতস্তদা মৃত্যুপ্রদঃ শিশোঃ॥ সন্ধ্যায়াং চন্দ্রহোরায়াং গণ্ডান্তে নিধনায় বৈ। প্রত্যেকং চন্দ্রপাপৈশ্চ কেন্দ্রগৈঃ স্যাদ্বিনাশনম্॥ রবেস্তু মণ্ডলার্দ্ধাস্তাৎ সায়ংসন্ধ্যা ত্রিনাড়িকা। তথৈবার্দ্ধোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রাতঃসন্ধ্যা ত্রিনাড়িকা॥ চক্র পূর্ব্বাপরার্দ্ধেষু ক্রূরসৌম্যেষু কীটভে। লগ্নগে নিধনং যাতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ব্যয়শত্রুগতৈঃ ক্রূরৈর্ম্মৃত্যু দ্রব্যগতৈরপি। পাপমধ্যগতে লগ্নে সত্যমেব মৃতিং বদেৎ॥ লগ্নসপ্তমগৌ পাপৌ চন্দ্রোঽপি ক্রূরসংযুক্তঃ। যদা

রবীক্ষিতঃ সৌম্যৈঃ শীঘ্রং মৃত্যুর্ভবেত্তদা॥ জীর্ণে শশিনি লগ্নস্থে পাপৈঃ কেন্দ্রাষ্টসংস্থিতৈঃ। যো জাতো মৃত্যুমাপ্নোতি স বিপ্রেশ ন সংশয়ঃ॥ পাপয়োর্মধ্যগশ্চন্দ্রো লগ্নাষ্টান্তব্যয়ে যদা। অচিরান্মৃত্যু মাপ্নোতি যো জাতঃ স শিশুস্তদা॥ পাপদ্বয় মধ্যগতে চন্দ্রে লগ্ন সমাশ্রিতে। সপ্তাষ্টমেন পাপেন মাত্রা সহমৃতঃ শিশুঃ॥ শনৈশ্চরার্ক ভৌমেষু রিপ্ফ ধর্ম্মাষ্টমেষু চ। শুভৈরবীক্ষ্যমাণেষু যো জাতো নিধনঙ্গতঃ॥ দ্রেক্কাণে চ জামিত্রে চ যস্য স্যাদ্দারুণো গ্রহঃ। ক্ষীণ চন্দ্রো বিলগ্নস্থঃ সদ্যো হরতি জীবিতম্॥ আপোক্লিমস্থিতাঃ সর্ব্বে গ্রহা বল বিবর্জিতাঃ। ষণ্মাসং বা দ্বিমাসং বা তস্যায়ুঃ সমুদাহৃতম্॥

জন্মারিষ্ট।

যতদিন জাতকের চতুর্ব্বিংশাত বৎসর পূর্ণ না হয়, ততদিন জন্মারিষ্ট থাকে এবং ততদিন আয়ুর বিষয় চিন্তা করিবে না। যদি ষষ্ঠ, অষ্ট ও দ্বাদশগত চন্দ্র পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় তাহা হইলে জাতকের সদ্যঃ মৃত্যুলাভ হইয়া থাকে। আর যদি শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় তাহা হইলে অষ্ট বর্ষে মৃত্যু হয়। শুভগ্রহগণ ও চন্দ্রের স্থায় ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশে বক্রী ও পাপদৃষ্ট হইলে আর জাতকের লগ্নে কিম্বা চন্দ্রে শুভগ্রহের স্থিতি বা দৃষ্টি না থাকিলে জাতকের মৃত্যুপ্রদ হয়। যাহার লগ্নে সূর্য্য, চন্দ্র, শনি ও মঙ্গল অবস্থান করে তাহার পিতা মাতা ও ভ্রাতা শীঘ্র নিধন প্রাপ্ত হয়। পাপগ্রহ দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট মঙ্গল অথবা শনি অথবা রবি শুভগ্রহ দৃষ্টিবিহীন হইয়া লগ্নে কিম্বা অষ্টমে থাকিলে মৃত্যুপ্রদ হয়। চন্দ্র অথবা সূর্য্যের সহিত যদি রাহু অথবা চন্দ্র অথবা সূর্য্য মিলিত হয় আর লগ্ন যদি শনি বা মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় তাহা হইলে জাতক একপক্ষ অর্থাৎ পনর দিন মাত্র জীবিত থাকে। যদি দশমস্থানে শনি, ষষ্ঠস্থানে চন্দ্র ও সপ্তমস্থানে মঙ্গল থাকে তাহা হইলে মাতৃসহিত শিশুর মৃত্যু হয়। লগ্নে শনি, অষ্টমে চন্দ্র ও তৃতীয়ে বৃহস্পতি থাকিলে বালকের মৃত্যু হয়। লগ্নের নবমে সূর্য্য, সপ্তমে শনি আর একাদশে বৃহস্পতি ও শুক্র থাকিলে বালক একমাসমাত্র জীবিত থাকে। ব্যয়স্থানে সূর্য্য শুক্র চন্দ্র ও রাহু এই সকল গ্রহ শুভ ফলদায়ক নহে। দ্বাদশ স্থানে এই সকলগ্রহের দৃষ্টি থাকিলেও

বিশেষরূপ হানিজনক হয় অর্থাৎ শুভযোগের ভঙ্গ হইয়া থাকে। পাপযুক্ত চন্দ্র যদি নবম, সপ্তম ও লগ্নে থাকে আর শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট না হয় তাহা হইলে শিশুর মৃত্যুদায়ক হয়। সন্ধ্যাকালে চন্দ্রের হোরাতে গণ্ডশেষে জন্মগ্রহণ করিলে নিধন হয়। * এই তিনটীর প্রত্যেকটীই বিনাশ সাধন করিয়া থাকে, যদি চন্দ্রযুক্ত পাপগ্রহকেন্দ্রে অবস্থান করে। রবির অর্দ্ধমণ্ডল অস্তগত হওয়ার পর তিন দণ্ড সময় পর্য্যন্ত সায়ং সন্ধ্যা, সেইরূপ রবিমণ্ডলের অর্দ্ধোদয়ের পূর্ব্বে তিনদণ্ডকাল প্রাতঃ সন্ধ্যা নামে কথিত। প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে পাপগ্রহ কীটলগ্নে অর্থাৎ কর্কট, বৃশ্চিক ও মীনলগ্নে অবস্থান করিলে জাতকের নিধন হয়, সেইরূপ সায়ংসন্ধ্যাকালে শুভগ্রহ কীটলগ্নে অবস্থান করিলে জাতকের নিধন হয় ক্রূরগ্রহগণ ষষ্ঠ, দ্বাদশ, অষ্টম বা একাদশ থাকিলে ও লগ্ন পাপমধ্যগত হইলে অর্থাৎ লগ্নের অগ্রে ও পশ্চাতে পাপগ্রহ থাকিলে নিশ্চয়ই বালকের নিধন হয়। লগ্ন ও সপ্তমে পাপগ্রহ থাকিলে ও চন্দ্র পাপগ্রহযুক্ত হইয়া শুভগ্রহের দৃষ্টি বিবর্জ্জিত হইলে শীঘ্রই বালকের মৃত্যু হয়। ক্ষীণচন্দ্র (কৃষ্ণাষ্টমীর পর শুক্লা-সপ্তমী পর্য্যন্ত ক্ষীণচন্দ্র, অবশিষ্ট কএক তিথিতে চন্দ্র পূর্ণচন্দ্র বলিয়া কথিত হয়) লগ্নে, আর পাপগ্রহ কেন্দ্রে ও অষ্টমে অবস্থান করিলে জাতবালকের নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। দুইটী পাপগ্রহের মধ্যগত চন্দ্র যদি লগ্ন, অষ্টম, সপ্তম ও দ্বাদশে থাকে তাহা হইলে জাতবালক অচিরাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। দুইটী পাপগ্রহের মধ্যগত চন্দ্র লগ্নেথাকিলে আর সপ্তমে ও অষ্টমে পাপগ্রহ থাকিলে,

---

* অশ্বিনী, মঘা ও মূলা নক্ষত্রের প্রথম তিনদণ্ড; আর রেবতী, অশ্লেষা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের শেষ পাঁচদণ্ড কাল গণ্ডনামে অভিহিত হয়। রেবতী ও অশ্বিনী নক্ষত্রের দোষযুক্ত কাল সন্ধ্যাগণ্ড, জ্যেষ্ঠা ও মূলানক্ষত্রের দোষযুক্ত কাল দিবাগণ্ড আর অশ্লেষা ও মঘা নক্ষত্রের দোষযুক্ত কাল রাত্রিগণ্ড নামে অভিহিত হয়। প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাগণ্ডে জন্মিলে রিষ্ট হয়। নিশাকালে নিশাগণ্ডে জন্মিলে বালকের মাতার রিষ্ট হয়। দিবাভাগে নিশাগণ্ডে ও নিশাভাগে দিবাগণ্ডে জন্মিলে কোন রিষ্ট হয় না। দিবাগণ্ডে কন্যা ও রাত্রিগণ্ডে পুত্র জন্মিলে গণ্ডদোষ হয় না। কিন্তু জ্যেষ্ঠা, অশ্লেষা ও মূলা-নক্ষত্রে জাত ব্যক্তির কোনও না কোন অনিষ্ট নিশ্চয়ই হয়।

মাতার সহিত শিশুর মৃত্যু হয়। যদি শনি, রবি ও মঙ্গল শুভগ্রহের দৃষ্টি বিবর্জ্জিত হইয়া যথাক্রমে দ্বাদশ নবম ও অষ্টমে থাকে তাহা হইলে জাতবালকের নিধন হয়। যে জাতকের জন্মকালে দ্রেকাণে ও সপ্তমে পাপগ্রহ থাকে আর ক্ষীণচন্দ্র লগ্নে থাকে তাহার সদ্যঃ প্রাণনাশ হয়। বলবিবর্জ্জিত সকলগ্রহ আপোক্লিমে অবস্থান করিলে জাতকের দুইমাস আয়ুঃ জানিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

অধ্যাপক—শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়, এম, এ, জ্যোতির্ভূষণ।

---

(১) জন্মভূমি।—কবিতা।

শুভ্র চিত্তে কাহার স্মৃতি, উজলিয়া অই হৃদূরে,
মধুর ভাবে রয়েছে জাগি, নীরস নীরব অন্তরে॥
কোন অতীতের মধুর ভাষা, নীরব বীণার তানে।
কোন আবেশে জাগিয়ে মোরে, সুপ্ত লুপ্ত প্রাণে,
কোন চির পরিচিতময়, বৃক্ষ লতা ফুল।
প্রাণের মাঝে দিয়ে উঁকি, অন্তর করে আকুল॥
কাহার স্নেহ ভালবাসা, নীরব স্মৃতির মাঝে।
জন্মভূমির পূণ্য স্মৃতি, শুধুই হৃদে বাজে॥
দূর প্রবাসে আঁধার চিতে, জন্মভূমির চিত্র।
হয়ে আছে মোর হৃদয় মাঝে, সরজু সোহাগ তীর্থ॥

শ্রীকুমুদ বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়।

গীত।

রামকেলি—ঝাঁপতাল।

অনলে অনল আছে, শুনেছ মন কার কাছে?
অনলে অনলে সে যে অনলময় বিরাজে॥
অতুল অনলে হরি, অনলে অনিলে হরি,
কোন্ স্থান পরিহরি, থাকি হরি কথায় আছে॥
মহা ভ্রান্তি বশে মন, ভ্রম ত্রিভুবন বন,
যে বনে সাধনের ধন (আছে) সে বন তোর হৃদয় মাঝে॥

শ্রীঅক্ষিত্র নাথ দত্ত।
'সম্পাদক" জন্মভূমি

সাহিত্য-সংহিতা।

(সাহিত্য সভার ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

নবপর্য্যায়, ১০ম খণ্ড } ১৩২৮, শ্রাবণ—আশ্বিন। { ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সংস্কৃত সংলাপ কাব্যম্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সংস্কৃতম্।

১৬। তৃতীয় কণ নির্ণীতৌ, কিংনাম বস্তু সর্ব্বথা আদেয় মনা দেয়ং বেত্যবগতয়ে সজাতীয়েষু উৎকৃষ্টা পকৃষ্টা দয়ো নির্ণীতাঃ। নির্ণীতিশব্দঃ নির্ণয়ার্থকঃ। তন্ময়ত্বা ন্নির্ণীতিরিতি।

যথা—

স্রগ্ধরাচ্ছন্দঃ।

আম্রং শ্রেষ্ঠং ফলেষু। প্রিয়তম নিবহেষ্বাত্মজো। গোষু চক্ষুঃ।
কান্তা ভোগ্যেষু। পেয়েষতি বিমলজলং।· লোভিতাং সদ্গুণেষু।
সুপ্তি শান্তিপ্রদেষু। প্রখরতরমতিঃস্বেষু। বিদ্যাধনেষু।
হিংসা দোষেষু। তুষাম্বমলিনবসনং। মাননীয়েষু চেশ।

ইত্যাদয়ঃ॥

অনেন শ্লোকেন—এষেষু—এতদেতৎ শ্রেষ্ঠ মিতি বর্ণয়িত্বা কি মুপদিষ্টম্। আদ্রিয়স্বাং তেষু তেষু তত্তদেব, ত্যজত্ব্যেবেতি॥

অনুবাদ।

১৬। তৃতীয়কণ নির্ণীতি। নির্ণীতি কাব্যে সর্ব্বতোভাবে কোন বস্তুটি গ্রাহ্য, এবং সর্ব্ব প্রকারে কোন বস্তুটি ত্যাজ্য। ইহা সুস্থির করিবার নিমিত্ত আপন আপন

জাতীয়ের মধ্যে কোনটি বা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কোনটী বা সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট ইত্যাদি বহু বিষয়ের নির্ণয় করা হইয়াছে। নির্ণীত শব্দের অর্থ নির্ণয়। এই কাব্যখানি নির্ণয়ময় বলিয়া ইহার নাম নির্ণীতি।

শ্লো। (এই শ্লোকটি অনুষ্টুভ্ছন্দে রচিত।)

আম্রং শ্রেষ্ঠং ফলেষিত্যাদি। উপরি লিখিত।

তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। এই শ্লোকটিতে--এই এই বস্তুর মধ্যে এই এই বস্তু শ্রেষ্ঠ ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা কি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই এই শ্রেণীর মধ্যে এই এই বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা বিবেচনা করিয়া যে শ্রেণীর বস্তু গ্রাহ্য, সেই শ্রেণীর মধ্যে সেই বস্তুটিতে আদরাতিশয় করুন। এবং যে শ্রেণীর বস্তু অগ্রাহ্য অর্থাৎ ত্যাজ্য। যেমন অসদ্গুণ ও দোষ। তাহাদের মধ্যে তাহাকে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠটিকে যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করুন্।

সাধারণের শ্লোকার্থের অবগতির জন্য সংক্ষেপে বঙ্গভাষায় অনুবাদ বা মর্ম্ম প্রকাশ করা হইতেছে। বিস্তৃত ব্যাখ্যা নির্ণীতি কাব্যে দ্রষ্টব্য।

(১) ফলের মধ্যে আম্র শ্রেষ্ঠ। কেন, ফলে যে সকল গুণ থাকা উচিত, সেই সমস্ত গুণই আম্রে বিরাজমান। আম্র—সুদৃশ্য, সুস্বাদু, সৌরভযুক্ত ও সুখ-স্পর্শ। আম্র বহু পরিমাণে জন্মে, অনতি ক্ষুদ্র অনতি বৃহৎ। ক্ষুৎপিপাসা হর, মুখরোচক, কান্তি বর্দ্ধক, অপীড়াকর, অথচ সুলভ। অন্য কোনও ফলই এরূপ নহে। (২) যিনি যত প্রিয়তম থাকুন, পুত্রের কাছে কেহই নহেন। পুত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। কারণ, আত্মার শরীরের সহিত যেরূপ প্রগাঢ় সম্বন্ধ, এরূপ প্রগাঢ় সম্বন্ধ আর কাহারও সহিত নাই। আবার শরীরের সহিত পুত্রের যেরূপ প্রগাঢ় সম্বন্ধ, এরূপ প্রগাঢ় সম্বন্ধ আর কাহারও সহিত নাই। যে হেতুক পুত্র শরীর জাত। (৩) ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে চক্ষুর মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যে হেতু, চক্ষুর্ভিন্ন শ্রোত্র [illegible] নাসিকাদি যে কোনও ইন্দ্রিয়ের অভাব হউক না কেন, হইলেও [illegible] ব্যক্তির সাহায্য না পাইলেও কথঞ্চিৎ জীবিত থাকিতে পারে। কিন্তু, চক্ষু বিহীন ব্যক্তি অর্থাৎ অন্ধ অপর ব্যক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে অল্প সময়ও জীবন ধারণ [illegible] পারে না। সমস্ত ভোগ্য বস্তু অনতিদূরে থাকিলেও ক্ষুধায় তৃষ্ণায় [illegible] মরে। (৪) ভোগ্য বস্তুর মধ্যে তরুণী রমণী সব চেয়ে প্রধান। কেন না, অপর অপর ভোগ্য বস্তুর (স্রক্ চন্দন, বসন ভূষণ, [illegible] পীঠ [illegible]

ভোগে অধিকাংশে স্থলে এক একটি ইন্দ্রিয়ই পরিতৃপ্ত হয়। কোনটিতেই সকল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয় না। কিন্তু সুন্দরী রমণী সম্ভোগে স্ব স্ব ক্রিয়ার দ্বারা প্রায় সকল ইন্দ্রিয়ই পরিতৃপ্ত হয় (৫) নির্ম্মল জল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পেয়। কারণ কি? পেয় বস্তুর প্রধান কার্য্য পিপাসা শান্তি করা। নির্ম্মল জল পানে যেরূপ পিপাসার শান্তি হয়, এরূপ পিপাসা শান্তি আর কিছুতেই হয় না। (৬) অসদ্গুণের মধ্যে লোভ সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান্। কি হেতুক? লোভী লোক যেরূপ সকলের নিকটেই ঘৃণিত হয়, এরূপ সকলের নিকট ঘৃণিত আর কোনও অসদ্গুণাশ্রিত লোক হয় না। কামুক, ক্রোধী, অজ্ঞানী, অহঙ্কারী বা অন্য গুণদ্বেষী লোকেরা স্থল বিশেষে ব্যক্তি বিশেষের নিকটেই ঘৃণিত হইয়া থাকে। (৭) সুপ্তি (সুনিদ্রা) যেমন শান্তি প্রদান করে, এমন শান্তি প্রদান করিতে আর কেহই পারে না। ভোজনে ক্ষুধার শান্তি হয় বটে, কিন্তু পিপাসার শান্তি হয় না। এইরূপ পানে পিপাসার শান্তি যেরূপ হয়, সেই পরিমাণে ক্ষুধার শান্তি হয় না। রমণী মনের উদ্বেগের শান্তি করিতে পারে, ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিতে পারে না। পুত্র হইতে "আমার এত সম্পত্তি, ভোগ করিবে কে, আমার জল পিণ্ড দিবে কে, আমার অসময়ে সেবা শুশ্রূষা করিবে কে," এইরূপ মনের ব্যর্থ দীনতারই শান্তি হয়, আর কিছুরই শান্তি হয় না। ধনে দীনতার শান্তি হয়, অজ্ঞানের শান্তি হয় না। জ্ঞানে অজ্ঞানের (মিথ্যা জ্ঞানের) শান্তি হয়, দীনতার শান্তি হয় না। কিন্তু, সুষুপ্তের নিকট সকল প্রকার শান্তিই সুবিরাজমানা। ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, দীনতা নাই, ভ্রান্তি নাই, কিছুই নাই। সুতরাং তজ্জনিত ক্লেশও নাই। সেই জন্যই উক্ত হইয়াছে, শান্তিপ্রদ সকলের মধ্যে সুপ্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। (৮) নিজের সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি যেমন আত্মীয়তার কার্য্য করে, এরূপ আত্মীয়তা আর কেহই করিতে পারে না। অন্যান্য আত্মীয় স্ত্রী, পুত্র, স্বামী প্রভৃতি কোনও স্থলে কোনও সময়ে, কিছু আত্মীয়তা অর্থাৎ উপকার, করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদেশ ভ্রমণকালে, স্রোতস্বতী নদীর অবগাহন কালে, হিংস্র জন্তু সমূহের অথবা দুর্বৃত্ত জনের আক্রমণ কালে, এবং এইরূপ অন্যান্য বিপৎসময়ে তাহারা কোথায়? সেখানে কে আত্মীয়তা করে? নিজের প্রখরতর বুদ্ধিই আত্মীয়তা করে। অর্থাৎ নিজের বুদ্ধি বলেই লোকে সেই সকল স্থানে রক্ষা পায়। তাই বলা হইয়াছে, আত্মীয়গণের মধ্যে প্রখরতর বুদ্ধিই সব চেয়ে বড়। (৯) বিদ্যা দ্বারা আত্ম

সকল ধনই লাভ করা যায়। কিন্তু, বিদ্যা—ভূমি হিরণ্য মাণিক্য মুক্তা স্ত্রী পুত্র, গো মহিষ, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি কোনও ধনের দ্বারাই লাভ করা যায় না। এই জন্য ধনের মধ্যে বিদ্যা শ্রেয়সী। বিদ্যার মত ধন আর নাই। (১০) মিথ্যাবাদ চৌর্য্য, অজিতেন্দ্রিয়তা, পরিগ্রহ প্রভৃতি দোষ বটে। কিন্তু, হিংসার মত নহে। যে মিথ্যাবাদাদিতে হিংসার সম্বন্ধ নাই (যেমন পরিহাসাদি স্থলে) সেরূপ মিথ্যাবাদাদি দোষের মধ্যেই পরিগণিত নহে। হিংসার সম্বন্ধ লইয়াই তাহাদের দোষতা। এই জন্য বলা হইয়াছে দোষের মধ্যে হিংসা সর্ব্বতঃ প্রধান। (১১) নির্ম্মল বস্ত্রখানি পরিধান করিলে যেরূপ সকল অঙ্গই সুশোভিত হয়, এরূপ সকল অঙ্গ সুশোভিত কোনও অলঙ্কার দ্বারাই হয় না। হারে গলার বা বক্ষের সৌন্দর্য্য কিছু বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু হাতের কিছুই হয় না। আবার বালা অনন্ত প্রভৃতিতে হাতের সৌন্দর্য্যেরই কিছু আধিক্য হয়, কিন্তু গলদেশের বা বক্ষ প্রদেশের সৌন্দর্য্য কিছু বৃদ্ধি পায় কি? দ্বিতীয় কথা, এই সমস্ত অলঙ্কার নির্ম্মল বসনের সাহায্যেই শরীরকে বিভূষিত করে। বসনের সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুই অলঙ্কৃত করিতে পারে না। একটি সুন্দরী বয়ঃপ্রাপ্তা রমণী যদি বিবসনা বা মলিন বসনা হইয়া এই সমস্ত অলঙ্কারগুলি পরিধান করে, একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, তাহা হইলে কিরূপ দেখায়। সেই হেতুক বর্ণিত হইয়াছে, ভূষণের মধ্যে নির্ম্মল বসনই সকলের উচ্চ স্থানীয়। (১২) ঈশ্বরের নিকট হইতে যেমন ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত বস্তু পাওয়া যায়, এরূপ সকল রকমের জিনিষ (যাহার যেমন পছন্দ) কাহারও কাছ হইতে পাইবার সম্ভব নাই। এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ থাকিলে অপর সকলে বিপক্ষতাচরণ করিলেও জীব রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু, ঈশ্বর মারিতে বসিলে কেহই রক্ষা করিতে পারে না। এই যুক্তি বলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, জগতের যত माननीয় আছেন, সকল মাননীয়ের শীর্ষস্থানীয় ঈশ্বর। ঈশ্বরের মত মাননীয় আর কেহই হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীসীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি।

মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন।

(সাহিত্য সভার মাসিক অধিবেশনে পঠিত।)

(৩য় প্রবন্ধ)

মেঘদূত—মেঘোদয়ে বিরহী উন্মাদ হয়—এ কল্পনা বাঙ্গালীর নিজস্ব।

মুখবন্ধ।

কালিদাসের বিরহ এবং তাহার উন্মাদাবস্থা বুঝিতে হইলে, তাঁহার চিত্তের ক্রম বিকাশ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ তাহার চিত্তের Phycology বুঝিতে হইবে। কালিদাসের মনস্তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, তাহার গ্রন্থের অভ্যন্তর ভাগ, ধীরভাবে বুঝিতে হইবে। এবং বাঙ্গলায় বা ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে, যদি কিছু জনপ্রবাদ থাকে, তাহাও ধীরভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। কালিদাস সম্বন্ধে জনপ্রবাদ, বাঙ্গালা দেশে এবং উত্তররাঢ়ে যত অধিক, ভারতের অন্যত্র তত অধিক নহে।

কালিদাসের গ্রন্থের মনস্তত্ত্ব বা অলঙ্কার শাস্ত্রমতে কালিদাসের গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ "ধ্বনি", বুঝিতে হইলে কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ সত্য, ঐতিহাসিক সত্য এবং দার্শনিক সত্য, স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। প্রথম—কবির স্বদেশ, স্বগ্রাম এবং স্বনগর অথবা কবির অত্যন্ত পরিচিত স্থানসমূহ বা তাহার ছায়াই তাহার কাব্যের নায়কদের আবাসস্থান এবং অধ্যুষিত স্থান। দ্বিতীয়—কবির নিজের চরিত্রই অথবা আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের চরিত্রই, তাহার কাব্যের নায়ক প্রতি নায়ক উপনায়ক প্রভৃতির চরিত্র। কবির নিজের জীবনে জাত বা দৃষ্ট, শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, জুগুপ্সা, বিপ্রলম্ভই, তাঁহার কার্য্যের নায়কদের ভয়শোক ক্রোধ, হর্ষ, বিপ্রলম্ভ জুগুপ্সা। তৃতীয়—তাহার সম সাময়িক ঘটনা, তাহার সমপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা অথবা তাহার স্বদেশপ্রচলিত কোনও বিচিত্র গল্পই তাহার কাব্যের ভূমিকা। এই প্রক্রিয়ার ইংরাজি নাম Trans figured life of the Author,—এই কথার ভাবার্থ এই যে, কাব্য আর কিছুই নহে, কাব্য গ্রন্থকারের নিজের জীবন চরিত্রের বা প্রাণের প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

এই কথা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এখনও পরিস্ফুট করা যাইতে পারে—যেমন বিদ্যাপতির রাধা বিদ্যাপতির নিজেরই হৃদয়, লছিমাদেবীর প্রতি তাহার অনুরাগ রাধাভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধা, চণ্ডীদাসের নিজেরই হৃদয়, "রজকিনী রামীর" প্রতি তাহার প্রেম, রাধানামে তাহার পদাবলীতে দীপ্তি পাইতেছে। একটা অভক্তোচিত কথা বলিব - চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন তাঁহার পিতৃহীনতা ও পশ্চাৎ পত্নী হীনতার শোকই, আমি কাব্য এবং দর্শনের চক্ষুতে "হে কৃষ্ণ তুমিই আমার প্রাণনাথ" বলিয়া ক্রন্দনের হেতু বলিয়া মনে করি। Miltonএর শয়তান (satan) মিল্টন নিজেই। মেঘনাদবধের রাবন—স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন দত্ত। একটি আমাদের সাময়িক দৃষ্টান্ত দিতেছি—বিশ বৎসর পূর্ব্বে একজন স্ত্রী লেখিকার বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাহার কবিতায় প্রত্যেক বর্ণটি, তখনকার পাঠকগণ ওজন করিয়া পড়িতেন। তাঁহার একটি কবিতার এক ছত্র, তখনকার পাঠকদের বিশেষ সমালোচনার বস্তু হইয়াছিল।

"দত্ত যাহা দেবতায়, সে ফুল বালকে চায়,
জ্ঞানবান ক্ষমগো তাহায়।"

সকলেই অনুসন্ধান করিতে লাগিল, এই "বালক"টি কে? ঘটনাক্রমে Edward VIIএর রাজ্যাভিষেক অব্দে, একটি "বালক" আমাকে ফলিত জ্যোতিষের অনেক প্রশ্ন করেন, তাহাতে আমি ভাবিলাম এই "বালক" কাহাকে চায়? কিছুদিন পরে শুনিলাম বালক ও উক্ত লেখিকা একাত্ম হইয়াছেন। এ গল্পের ভাব-লেখকদের জ্ঞাতভাবে বা অজ্ঞাতভাবে, তাহাদের কলমের ডগা দিয়া, তাহাদের প্রাণের লুক্কায়িতভাব বাহির হইয়া যায়। বর্ত্তমানের একজন ব্যবহার জীবির পুস্তকের ভূমিকা, আর একজন ব্যবহারজীবির জীবন চরিত্র মাত্র। "আদর্শ ভগিনী" "সংবাদ পত্রে অভক্তি ও তাহার পরিণাম" ইত্যাদি প্রবন্ধ, সাময়িক কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বিশেষের বেনামা জীবন চরিত্র মাত্র।

এই সকল নিয়ম অনুধাবন করিলে মনে হয় কালিদাসের পুস্তক সকল, তাঁহার নিজেরই জীবন-চরিত, জীবন স্মৃতি বা বেনামা আত্মকথা। কালিদাসের গ্রন্থ সকলের পারম্পর্য্য আলোচনা করিলে মনে হয় ঋতুসংহার শ্রুতবোধ তাহার বাল্য রচনা, রঘু ও শকুন্তলা, কুমার ও বিক্রমোর্ব্বশী, মেঘদূতও মালবিকাগ্নিমিত্র তাহার

উত্তরোত্তর কালের রচনা। কালিদাসের জীবন চরিত নাই, গ্রাম্য উপকথা ও গ্রাম্যছড়াই একমাত্র আমাদের অবলম্বনীয়। বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস উদ্ধার প্রণালীতে এই সকল গ্রাম্য ছড়া ও গ্রাম্য উপকথা আপ্তবাক্যবৎ গ্রহনীয়। এই সকল উপকথা হইতে জানা যায় বাঙ্গালা দেশের কয়েকটি কলিদাস সম্বন্ধীয় জনপ্রবাদের সহিত সিংহল দেশীয় কয়েকটি জনপ্রবাদের একতা থাকার জন্য, আমি অগ্রে সিংহলের জনপ্রবাদের উল্লেখ করিতেছি। সিংহলে মুদ্রিত Buried cities of Cylon নামক পুস্তকে লিখিত আছে—কালিদাসের পিতামাতা বাল্যকালে সর্পদংশনে মৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাঢ়ের প্রবাদ অনুযায়ী, কালিদাসের পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, কালিদাসেরা সপ্ত ভ্রাতা এবং এক ভগিনী জন্মিয়াছিলেন। এই কনিষ্ঠা ভগিনীটি জন্মের পরই, মাতা গর্ভ যাতনায় মারা যান। ভগিনীটির আরোপিত নাম "শকুন্তলা"। কালিদাস সপ্তমগর্ভজ সন্তান এবং ভগিনী অপর্ না অপর্ণা, অষ্টম গর্ভজ সন্তান। কালিদাসের পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু স্ত্রীহানি হইতেই কিছু উদাসীন ভাবাপন্ন হন। এই দুই শিশু সন্তানকে তাঁহাদের আর্য্যা = আ'য়ীমা গৌতমীর নিকট প্রতিপালনার্থ রাখিয়া আসেন। ইহাই "উঝিতায়ে শরীর সম্বর্দ্ধনাহিং সে এদায়ে পিদা"—উঝিতত্ব হেতু শরীর সম্বর্দ্ধ দ্বারা তিনি ইহাদের পিতা। (শকুন্তলা ১সং)

জীবন চরিতের প্রবন্ধ।—মহাকবি কালিদাস বাল্যকালে মূর্খ ছিলেন, তাহার তৎকালীন নাম ছিল ম্যাদা বা বোকা। বিদুষী রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হইয়া, সমুদয় বিদ্বানকে পরাজিত করিলে, রাজদূতেরা একটি মহামূর্খ খুঁজিতে খুঁজিতে কালিদাসকে পাইল। কালিদাস তখন একটি গাছের ডালে বসিয়া, সেই গাছের সেই ডালের উর্দ্ধাংশ কাটিতেছিলেন। তিনি এত মন্দবুদ্ধি ছিলেন যে, তিনি সেই ডালকাটার সহিত যে পড়িয়া মরিয়া যাইবেন সে বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ছিল না। রাজদূতেরা তাহাকে মহাপণ্ডিত সাজাইয়া, রাজকন্যার নিকট উপস্থিত করিল। রাজকন্যা পণ্ডিতভ্রমে, মৌণীমন্দধীকে বরমাল্য দিলেন। বিদুষী বাসরগৃহে তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। কালিদাস মা সরস্বতীর বরে রাতারাতি বড় পণ্ডিত হইয়া, ঝড়ের মত বিদুষীর গৃহে ফিরিলেন এবং ঋতুসংহার রঘুবংশ কুমার মেঘদূত রচনা করিয়া বিদুষীকে শুনাইয়া ছিলেন।

এখন এই প্রবাদটি, বিজ্ঞান সম্মত পুরাতত্ত্ব উদ্ধার প্রণালীতে, আপ্ত বাক্যরূপে

গ্রহণ করিয়া বিশ্লেষণ করা যাউক। কালিদাস মূর্খ ছিলেন,—বেহুস মূর্খ বা ম্যাদা মূর্খ ছিলেন। এরূপ মূর্খতা অনেক পণ্ডিতেরই থাকে। হিতোপদেশে "পণ্ডিত মূর্খানাং" গল্পে একথা লেখা আছে। নবদ্বীপের বুনোরামনাথ "পাত্রাধার তৈল, কি তৈলাধার পাত্র" ইহা মীমাংসা করিতে গিয়া, তৈল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন। বাঙ্গালার দ্বিতীয় কালিদাস, মহামহোপাধ্যায় ৺অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, মসারি কাঁধে করিয়া, বিদায় হইতে গিয়া ছিলেন। জুতা পায় দিয়াই সজিনা গাছে উঠিয়া, ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া ছিলেন। ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতে পারে,—অনেক বেহুস্ লোক, জগতেরও পণ্ডিত হইয়াছেন।

রাতারাতি বড় পণ্ডিত, বাঙ্গালা দেশে অনেক হইয়াছেন—গঙ্গোপাধ্যায়—গরু গঙ্গা, রাতারাতি বড় পণ্ডিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি গবি গোত্বং? উতা গবি গোত্বং?
গবিচেৎ গোত্ব মননক মেতৎ,
অ গবিচ গোত্বং ভরতীহ সম্যক্,
ভবতি ভবত্যপি সম্প্রতি গোত্বং॥"

কথা সরিৎ সাগর প্রণেতা বররুচি, বাল্যকালে রাতারাতি একবার মাত্র শুনিয়াই মাতাকে নৃত্য গীত বাদ্য শুনাইয়া ছিলেন। Macliabakee, শঙ্করাচার্য্য, বল্লভ স্বামী—গর্ভ গৃহেই বড় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপের যশোদা কবিরাজ দ্বাদশ বর্ষ বয়সে একবার মাত্র শুনিয়াই দাশুরায়ের পাঁচালি, ফনোগ্রাফ যন্ত্রের মত মুখস্থ বলিয়া ছিলেন। গুপ্তিপাড়ার মধুরেশ, রাতারাতি বড় কবি হইয়া উঠিয়া ছিলেন। সংস্কৃত জগতে এরূপ অনেক হঠাৎ পণ্ডিতের নাম করা যাইতে পারে। এইজন প্রবাদ হইতে আর একটি তত্ত্ব বুঝা যায়—কালিদাস বিদুষীর স্বদেশীয় নহেন—বিদেশীয়। স্বদেশীয় হইলে বিদুষীর ভ্রম হইত না। বিদুষী রাজকন্যা পণ্ডিত ভ্রমে কালিদাসকে বরমাল্য দিয়াছিলেন,—এই কথাটা আমি স্বীকার করিলাম না। কারণ বিদর্ভ দেশীয় কবিতায় ইহার বিপরীত ফল আছে। শ্লোকটি এই—

"বাল্মীকের্জনিতা গলায় দুহিতা ব্যাসেন যা লালিতা বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং প্রবৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরং।"

এই শ্লোকের ভাবার্থ— বাল্মীকির রামায়ণ যাঁহার ঝড়ের মত আবৃত্তি করিবার শক্তি ছিল, যিনি বেদব্যাসের মহাভারতও অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন, সেই বিদর্ভ

দেশজা বিদুষী স্বয়ং শ্রীকালিদাসকে নিজের উপযুক্ত পতি জানিয়া বরমাল্য দিয়া ছিলেন। এই শ্লোক হইতে বুঝা গেল—কালিদাসের স্বদেশের লোক তৎকালের বাঙ্গালীরা, কালিদাস নামক একজন ম্যাদামারা লোক হঠাৎ রাজকন্যার স্বয়ম্বর সভায় বরমাল্য লাভ করিতেই ঈর্ষায় জ্বলিয়া গেল; আর বিদর্ভের স্বয়ম্বর সভায় যাহারা উপস্থিত ছিলেন—কন্যার দেশের লোকেরা বলিলেন—বিদর্ভ রাজকন্যা শ্রীকালিদাসকে, স্বীয় যোগ্য পতি জানিয়াই তাহাকে বরমাল্য দিলেন।

এখানে "শ্রীকালিদাস" পদটি কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব প্রকাশক, কারণ বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত, ভারতের অন্যত্র, নামের পূর্ব্বে "শ্রী" ব্যবহার রীতি নাই। আচার্য্য দণ্ডী কালিদাসের সমকালবর্ত্তী, তাহার কোনও গ্রন্থে, তাহার নামের পূর্ব্বে শ্রী নাই। কালিদাসের মালবিকাগ্নি মিত্রের প্রস্তাবনায় "শ্রী কালিদাস বিরচিতে" এইরূপ প্রয়োগ আছে।

কালিদাস যে বাল্যকালে মন্দ বুদ্ধি ছিলেন, তাহা তাহার রঘুবংশের তৃতীয় শ্লোক "মন্দঃ কবি যশঃ প্রার্থী" এই শ্লোক হইতেই বুঝা যায়—আমিত মন্দ বুদ্ধিঃ—ম্যাদামারা লোক, আমি যখন কাব্য লিখিতেছি, তখনত আমি জগতের নিকট উপহাস্যতা প্রাপ্ত হইবই। কিন্তু "ত্রিকাণ্ড শেষ" নামক অভিধান রঘুকর কালিদাসের আটটি নাম দিয়াছেন, তাহার মধ্যে দুইটি নামের আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি—"মেধারুদ্র" এবং "কোটিজিৎ"

এই মেধারুদ্র কথাটিতে শব্দ বিদ্যার মতে একটু রহস্য আছে। রহস্যটি এই—"মাতর্লক্ষ্মী তব প্রসাদ বসতো দোষা অপিস্যুগুণাঃ"—অর্থাৎ মালক্ষ্মীর কৃপা হলে, দোষ গুলো সব গুণ হইয়া যায়। যেমন বাল্যে বা নির্দ্ধনে যাহার নাম "ভ্যাবা" ছিল, মালক্ষ্মীর যেই কৃপা হইল, অমনি তাহার নাম "ভবনাথ" হইয়া গেল। ভূতো = ভূতনাথ, কেলো = কালীচরণ, রামা = রামচন্দ্র হইল। জাতির সম্বন্ধেও এইরূপ—গোপ পয়সা হইলেই সৎগোপ, শুঁড়ি—চালকে শুড়ি, ধোপা—চাষাধোপা। নিধিয়া—নিধিরাম মহাপাত্র, ফজু শেখ পয়সা হইলেই সৈয়দ ফজললহক; বাল্যে এবং দারিদ্রে যাহার নাম "ম্যাদা" ছিল, যৌবনে মালক্ষ্মীর কৃপায়, তাহার নাম "মেধারুদ্র ঋষি" অথবা "মেধন মুনি" হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? মেধন মুনির আশ্রম, বোলপুর ষ্টেসন হইতে এক ক্রোশ দূরে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে। এবং

কালিদাসের সিদ্ধিস্থান সরস্বতী কুণ্ড, বোলপুর হইতে পূর্ব্বে চারি কোশ দূরে রায়াল বেলুটি গ্রামে।

"ত্রিকাণ্ড শেষোক্ত" আর একটি নামেরও একটু আলোচনা করিতে হইবে।— "কোটিজিৎ" শব্দের অর্থ—অসাধারণ ধনুর্দ্ধর। জন প্রবাদ এবং গ্রাম্য ছড়া সকল আলোচনা করিলে মনে হয় যে মহা কবি কালিদাস বর্ত্তমান কালের "গুরুঠাকুর" বা "পুরুৎ ঠাকুর"দের মত, দীন হীন মলিন ক্ষীণ এবং অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ, ম্যালেরিয়ায় তনুক্ষীণ এরূপ বামুন ঠাকুর ছিলেন। যদি গ্রন্থকারের চরিত্রই নায়কের চরিত্র—এই বিশ্বজনীন সত্য স্বীকার করিতে হয়, তবে বলিতে হইবে যে কালিদাসের "শাস্ত্রে স্বকুণ্ঠিতা বুদ্ধি মৌর্ব্বী ধনুষিচাততা" ছিল—অর্থাৎ কালিদাস যেমন অসাধারণ ধনুর্দ্ধর, তেমনি অসাধারণ রাজনৈতিকও ছিলেন। তিনি ভৃগুর মত "শাস্ত্রেষু শস্ত্রেষু চ দক্ষঃ" ছিলেন। তিনি বশিষ্ঠের মত অসাধারণ লাঠিয়াল ছিলেন। নতুবা তাহার "কোটি জিৎ" নাম অন্বর্থ হয় না। কৃপাচার্য্য দ্রোণ, অশ্বথামা ব্রাহ্মণ ধনুর্দ্ধর ছিলেন। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দে সুঙ্গ বংশীয় রাজগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দে কাম্বংশীয় রাজগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাশীপ্রসাদ জায়সবাল মহাশয় ১৩২৬ শ্রাবণ সংখ্যার "প্রবাসীতে" প্রমাণ করিয়াছেন যে বিষ্ণুবর্দ্ধন যশোধর্ম্মা নামক পরাসর গোত্রীয় একজন ব্রাহ্মণ খৃঃ পঞ্চম শতাব্দে ভারতের সম্রাট হইয়াছিলেন।

পরাসর গোত্রীয় ব্রাহ্মনগণ বাঙ্গালার প্রাচীন অধিবাসী। বিষ্ণুবর্দ্ধন কালিদাসের এক শতাব্দ পরবর্ত্তীকালে জাত। কালিদাস রঘুবংশে নিজের পরিচয়ে লিখিয়াছেন "কৈলাস গৌরং বৃষ মারুরুক্ষোঃ পদার্পনানুগ্রহ পূত পৃষ্ঠং অবেহিমাং কিঙ্কর অষ্ট মূর্ত্তেঃ কুম্ভোদরং নাম নিকুম্ভ মিত্রং।" রঘু ২।৩৫। কৈলাস গৌর শব্দে যশঃ এবং বৃষ শব্দে ধর্ম্ম—ইহা হইতে বুঝা গেল "যশো ধর্ম্মা" কালিদাসের বংশেই জন্মিয়াছিলেন। কালিদাসের রাজচিহ্ন—"দ্বারোপান্তে লিখিত বপুষৌ পদ্ম শঙ্খৌ চ দৃষ্টা।" উত্তর মেঘ ১৯ শ্লোকের কালিদাস নবরত্নের একরত্ন। রত্ন ও নিধি এক [illegible]ভুক্ত। অমরের মতে "পদ্ম সংখ্যা মরো নিধেঃ" টীকাকারগণ বলেন পদ্মোঽ[illegible] মহাপদ্ম শংখো মকর কচ্ছপৌ মুকুন্দঃ কন্দোনীলশ্চ খর্চ্চোপি নিধয়ো নব"। কালিদাসের সময় ব্রাহ্মণেরা যেমন শাস্ত্র চর্চ্চা করিতেন, তেমনি কেহ কেহ ধনুশ্চর্চ্চাও করিতেন। কালিদাস রঘুবংশে যেরূপ রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা

করিয়াছেন, তাহাতেও উহা মনে হয়। তিনি তৎ-সাময়িক রাজা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের দিগবিজয়ী সৈন্যের সেনাপতি হইয়াই, সমগ্র ভারত এবং পারস্য ও তাতার পরি-ভ্রমণ করিয়াছিলেন। আর তিনি যখন যাহা দেখিতেছেন, তাহারই বর্ণনা করিতেছেন এইরূপ অভ্যস্ত দেখায় মনে হয় ইন্দুমতির স্বয়ম্বর, তাহার জীবনেরই একটি ঘটনা। তাহার জীবনের তাহার প্রথমা পত্নী বিদ্যুন্মালার স্বয়ম্বরই ইন্দুমতির স্বয়ম্বর। বিদ্যুন্মালা ও ইন্দুমতি এক ভাবার্থক শব্দ। পূর্ণিমার চন্দ্রের মত প্রভাব বিশিষ্ট মগধ রাজ পরন্তপকে ত্যাগ করিয়া ইন্দুমতি ক্ষুদ্র একটি নক্ষত্র তুল্য অজকে কেন যে বরমাল্য দিলেন, তাহা কালিদাস রঘুবংশে মীমাংসা করিতে পারেন নাই। এটুক তাহার নিজেরই প্রাণের কথা—স্বয়ম্বর সভায় সমুপস্থিত মগধ সম্রাট চন্দ্র-গুপ্ত বিক্রমাদিত্যকে ত্যাগ করিয়া, বিদ্যুন্মালা কেন যে মগধরাজের সেনাপতি বা সাময়িক কবি কালিদাসকে হঠাৎ বরমাল্য দিলেন, তাহা কালিদাস নিজেই বুঝিতে পারেন নাই।

ঋতুসংহার আলোচনা। জনপ্রবাদের মতে—কালিদাস যখন হঠাৎ পণ্ডিত হইয়া বিদ্যুন্মালার মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন বিদুষী তাঁহার পাণ্ডিত্য জানিবার জন্য, তাঁহাকে যড়ঋতু বর্ণনা করিতে বলেন। "ঋতুসংহার" পড়িলে এই জন প্রবাদ সত্য বলিয়াই মনে হয়। কারণ "ঋতুসংহারে" প্রত্যেক ঋতু বর্ণণায় প্রারম্ভে "প্রিয়ে" এই সম্বোধন আছে। ইহা পড়িয়া যেন মনে হয় নবীন কবি বিদুষী প্রিয়ার কাছে, বিদ্যার পরীক্ষা দিতেছেন। নবীন কবি বলিবার কারণ—ঋতুসংহারের ভাষা এত কর্কশ, ভাব এত কঠোর রীতি এত অত্যুক্তি অতি-শয়োক্তি, পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট যে, অনেক বড় বড় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী "ঋতুসংহার"কে কালিদাসের লিখিত পুস্তক নহে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু আমি এই পুস্তকখানি বিশেষভাবে পড়িয়া আলোচনা করিয়া এবং পদ্যে বর্ণানুবাদ করিয়া, বুঝিয়াছি—ইহা রঘুকর কালিদাসের নিজেরই লেখা, তবে প্রথম লেখা, তিনি তখন কবিতা লেখা মক্স করিতেছেন, সেই অবস্থার লেখা—তখন তিনি কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন,—জগৎকে তখনও প্রেমের চক্ষুতে দেখিতে শেখেন নাই,—আরও সরল কথায়—অবিবাহিত ব্যক্তি বা অধিক বয়স পর্য্যন্ত স্ত্রী মুখদর্শন বিরহিত ব্যক্তি, কিছু কঠোর স্বভাবই হয়, কাজেই তখনকার কালিদাসের রচনা কিছু কঠোরই হইয়াছিল।

ঋতুসংহারের একটি শ্লোক বিশেষভাবে সাক্ষ্য দিতেছে যে, ইহা কালিদাসেরই লেখা—শ্লোকটি শরৎবর্ণনার প্রথম শ্লোক—

"কাশাংশুকা বিকচ পদ্ম মনোজ্ঞ বক্ত্রা
সোন্মাদ হংসরব নূপুর নাদরম্যা
আপক্ক শালিরুচিরা তনু গাত্র যষ্টি
প্রাপ্তা শরৎ নব বধূরিব রূপরম্যা।"

ভেতো রেড়ো বাঙ্গালী, শরৎ বর্ণনাকরিবার সময় হাত খুলিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ইহার সমধ্বনি করিয়াছেন—

"রমণীয় বেশে ঋতু শরৎ আইল,
পথে আর নাহি জল পথিকের ক্লেশ দূর হ'ল" ।

এইরূপ ঋতুসংহারের অনেক শ্লোক কালিদাসের লেখা বলিয়াই সাক্ষ্য দেয়। এইভাব রঘুবংশের অজ বিলাপের সহিত কুমারের রতিবিলাপের তুলনা করিলেই এইকথা আরও পরিস্ফুট হয়। অজ বিলাপ অপেক্ষা রতিবিলাপ লিখিবার সময় কবির ভাব অভিব্যক্ত করিবার ক্ষমতা যে বাড়িয়াছিল, তাহা দুইটি কবিতাবলী পাশাপাশি করিয়া ধরিলেই বেশ বুঝা যায়। এইরূপ ভাবেই তাহার বাল্যযৌবন বার্দ্ধক্যের রচনা বেশ পরিস্ফুট করা যায়।

"ঋতুসংহার"—তিনি তাহার বিদুষী প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়াই বলিতেছেন—ইহা তিনি লিখিতেছেন না, তিনি কেবল বলিতেছেন মাত্র। আরও ঋতুসংহারের প্রত্যেক প্রত্যেক ঋতু বর্ণনারম্ভে 'প্রিয়ে!" বলিয়া সম্বোধন থাকায়, তাহার প্রিয়ার উপস্থিতিতে, তিনি যে বর্ণনা করিতেছেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। আরও প্রথম ঋতুর বর্ণন সমাপ্তিতে "তব" এই একবচনান্ত প্রয়োগ আছে। দ্বিতীয় ঋতুতেও এইরূপ "তব" এই একবচনান্ত প্রয়োগ আছে। ৩।৪।৫।৬ এই চারি ঋতুতে "ব" এই বহুবচনান্ত প্রয়োগ থাকায় অনুমান হয়—কালিদাস বিদুষী মিলনের "বাসরগৃহে" গ্রীষ্মঋতুর বর্ণনা করেন। "ফুলশয্যার" রাত্রিতে বর্ষার বর্ণনা করেন। তৃতীয় রাত্রি হইতে বিদুষীর অনেক সখী সঙ্গিনী এবং কুটুম্বিনী, তাঁহার বিলাস কুঞ্জে উপস্থিত থাকিয়া, তাহার এই অপূর্ব্ব কবিতাবলী শুনিয়াছিলেন। তাই কালিদাস বক্তা চারিঋতু বর্ণনায় "ব" এই বহুবচনান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন বর্ত্তমানকালের "বাসরগৃহে" কন্যার যাবতীয় সখীবৃন্দ "ও বর! গান কর"

বলিয়া, বরকে বিরক্ত করিয়া, গান করাইয়া তবে ছাড়েন। যে বর জীবনে কখনও গান করেন নাই, তাহাকেও এই সখীসংঘে পড়িয়া গান করিতে হয়। সে গান যত কর্কশই হউক না সেদিন সকলে তাহা শুনিয়া থাকেন। এই "ঋতুসংহার"ও যেন সেই "বাসর ঘরের রসের গান"।

এখানে আর একটি সমান্তর ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি—ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দরে" লিখিত আছে—বিদ্যা প্রশ্ন করিবামাত্র সুন্দর "ময়ূরকে" অবলম্বন করিয়া দুই শ্লোক রচনা করিলেন—

"গোমধ্য মধ্যে মৃগ গোধরেহে
সহস্র গোভূষণ কিঙ্করাণাং
নাদেষু গোভৃৎ শিখরেষু মত্তা
নদন্তি গোকর্ণ শরীর ভক্ষা।"
"স্বযোনি ভক্ষধ্বজ সম্ভবানাং
শ্রুত্বানিনাদং গিরি গহ্বরেষু
তমো বিজৃম্ভ প্রতিবিম্বধারী
রুবাব কান্তে! পবনা বা নাগঃ॥"

কালিদাস প্রথম বাসরে উষ্ট্রকে অবলম্বন করিয়া, শ্লোক রচনা করিতে না পারিলেও দ্বিতীয় বাসর রাত্রিতে গ্রীষ্মঋতু অবলম্বন করিয়া ঝড়ের মত শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতচন্দ্রের চোর কবিকে হারাইয়া দিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে আর একজন উপস্থিত কবির কথা আমি বলিতেছি ইহার নাম কেশব কাশ্মীরি, ইনি নিমাই পণ্ডিতকে (কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে) ঝড়ের মত গঙ্গার স্তব রচনা করিয়া শুনাইয়া দিয়াছিলেন।

ঋতুসংহার পড়িয়া, কালিদাসের এই মনস্তত্ত্ব পাওয়া গেল যে তিনি একজন মিলনের কবি। তিনি অনেক তপস্যা করিয়া উপস্থিত কবিত্বশক্তি লাভ করিয়া, স্বীয় প্রিয়তমাকে স্বীয় সুদুর্ল্লভা কবিত্ব শক্তি খ্যাপন করিয়াছিলেন। ঋতুসংহারে দুইস্থানে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় বিদুষী বিন্ধ্যদেশের মধ্যগত কোনও দেশের রাজকন্যা ছিলেন। কিন্তু ঋতুসংহারের প্রথম শ্লোক এবং শকুন্তলার তৃতীয় শ্লোক হইতে বুঝা যায় কালিদাসের বাড়ি বিন্ধ্যদেশে ছিল না, তিনি অন্যত্রের লোক ছিলেন। তিনি "বিদ্যাসুন্দরের" বিদ্যার মত বলিয়াছেন—

"আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর
ভাবিয়া দেখহ প্রভু কতেক অন্তর।"

তিনি উক্ত শ্লোকে, সেইরূপভাবে নিজের জন্মভূমির সহিত বিদুষীর জন্মভূমির অন্তর দেখাইয়াছেন।

"শ্রুতবোধ" আলোচনা।—শ্রুতবোধ একখানি ছন্দের লক্ষণ প্রকাশক পুস্তক। ইহাতে ৪১খানি শ্লোক আছে। ইহাতে তিনি ৩৮টি তাঁহার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বা অভ্যস্ত ছন্দের লক্ষণ দিয়াছেন। এখানে প্রীতি আরও গাঢ় হইয়াছে। ঋতুসংহারে প্রতি পঞ্চাশ শ্লোকে একবার করিয়া "প্রিয়ে!" আছে, আর এখানে এই ৩৮টি শ্লোকের প্রতি শ্লোকে তিনি দুইবার তিনবার করিয়া; প্রিয়ে, প্রিয়তমে, প্রভৃতি মধুর বচনে বিদুষীকে সম্বোধন করিয়াছেন। ছন্দের লক্ষণের মত নীরস, কঠিন, কর্কশ, বিষয়কে তিনি মধুময় ছন্দে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাও বোধ হয় স্ত্রী সাহচর্য্যে, তাঁহার হৃদয় তখন অত্যন্ত কোমল হইয়াছিল। ঋতুসংহারে একটিও কঠোর শ্লোক নাই, ইহা যে কালিদাসের রচনা নয়, তাহা বলিবার কোনও কারণ নাই। এই শ্রুতবোধ হইতেই বিদুষীর নামটি উদ্ধার করা যায়।—জনপ্রবাদের মতে বিদুষীর নাম বিদ্যা, বিদ্যোত্তমা বা বিদ্যাবতী। কিন্তু শ্রুতবোধ আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারি—বিদুষীর নাম বিদ্যুন্মালা।

"বিদ্বৎবৃন্দৈঃ বীণাবানী! বিখ্যাতা সা বিদ্যুন্মালা।" ১৩।

ইনি আমাদের কবিদায়িতা, যাঁহার দয়ায়, উৎসাহে বা গুণানুরাগিতায় আমরা কবিকে পাইয়াছি! যিনি চন্দ্রমা সদৃশ প্রভাবশালী মগধ সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যকে ত্যাগ করিয়া, একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মত ক্ষীণদ্যুতি, একজন দরিদ্র কবিকে সভামধ্যে বরমাল্য দিয়া গুণের শ্রেষ্ঠত্ব জগৎকে জানাইয়াছেন, যাহার গুণ পক্ষপাতিতায় আমরা কবিকে জগতের সমক্ষে দাঁড় করাইয়া স্পর্দ্ধা করিতেছি তাহার গুণানুরাগিতাকে তাহার "সুকবিজন মনোজ্ঞতাকে" তাহার হৃদয়ের মহত্বকে আমার কোটি কোটি প্রণাম। আমার অনুসন্ধান মতে ইনি গুজরাটের সাহা উপাধিধারী ব্যবসায়ী রাজকন্যা। ধন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলেই বড় জাতি হওয়া যায়। ধনবলে প্রথম ইহারা বৈশ্য হন, পরে ইহাদের চন্দ্রগুপ্ত প্রথম বিক্রমাদিত্য রাষ্ট্রবলে বলীয়ান হইয়া, নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল্লির বঙ্গবিজয়

জয়স্তম্ভে নিজেকে "চন্দ্রবর্ম্মা" এই কৃত্রিম আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। ধরা পরিবার ভয়ে বাপ বা অপর বংশীয়ের পরিচয় দেন নাই।

"রঘুবংশা"লোচনা—রবীন্দ্রনাথের একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ আছে—"লেখা রূপসী ও ছাপা সুন্দরী" যাহাতে তিনি বুঝাইয়াছেন—যখন কবিতার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়, তখন তাহার এক প্রকারের সৌন্দর্য্য—কোনটা ট্যারা, কোনটা বাঁকা, কোনটা দীর্ঘ, কোনটা হ্রস্ব, কোনটা উচ্চ, কোনটা নীচ। তাহার পাশে আবার পুত্র কন্যা বা প্রিয়তমারা কত হিজি মিজি আঁচড় পাঁচড়, কবির অন্যমনস্ক অবস্থাতে কাটিয়া দিয়া যায়, তাহাতে কত স্মৃতি বিজড়িত থাকে। আর যখন তাহা ছাপা সুন্দরী হইয়া, মুদ্রাযন্ত্র হইতে বহির্গত হয়, তখন তাহা "সমানি সম শীর্ষানি, ঘনানি বিরলানি চ" হইয়া বাহির হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শুভ্রকায়, কোনও দাগ নাই কোনও কাটা কুটি নাই, সকলেই যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ চোর শ্রেণীর মত বা সুসজ্জিত সৈন্যদলের মত শোভা সম্পন্ন হয়।

কালিদাসের ঋতু সংহার ও শ্রুতবোধ তাঁহার "লেখা রূপসী" আর রঘু, কুমার, মেঘ তাঁহার "ছাপা সুন্দরী" বা কালিদাসের ভাষায় পূর্ব্বদ্বয় বনলতা ও অপরত্রয় উদ্যানলতা। ঋতুসংহার ও শ্রুতবোধ তাহার আটপৌরে ভাব আর রঘু, কুমার, মেঘ তাহার পোষাকী ভাব। ঋতুসংহার তাহার কবিতার আটপৌরে ভাব বলিয়াই, ইহাতে কোন কোনও স্থলে কষ্টকল্পনা ও কঠোর কল্পনা আছে। কিন্তু রঘুবংশাদি ত্রয়ে তাহার কোনও দোষ নাই।

রঘুবংশ পড়িলেই দেখা যায়—এটি তাঁহার পোষাকী কবিতা। ঋতুসংহার ও শ্রুতবোধে মঙ্গলাচরণ নাই। রঘুবংশের আরম্ভেই মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—আমার বাক্যরূপ সম্পত্তি জগতে বিখাত হউক, এই কামনা করিয়া মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। তাহার পর নবদ্বীপ প্রচলিত বৈষ্ণবীয় দৈন্য বা ভদ্রতা, ইহা এক প্রকারের কৃত্রিমতা বা ছেঁদো কথা, তাহার পর রাজস্তুতি। এই সব দেখিয়া মনে হয় কালিদাস শুভ্র-বসনে আবৃত হইয়া, ত্রিপুণ্ড্র কাটিয়া, শিখায় পুষ্পগুচ্ছ বাঁধিয়া, শিব নামাবলী গায়ে দিয়া, দূর্ব্বা তণ্ডুল প্রভৃতি অর্ঘোপকরণ হাতে লইয়া, মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজ সভায় কবিতা শুনাইতে গিয়াছেন। সভয়ে গিয়াছেন, রাজা শুনিয়া খুসি হইয়া, যদি কিছু পুরস্কার দেন। কাজেই রঘুবংশ রচনা পরের মনোরঞ্জনার্থ যতদূর পোষাকী হইতে পারে, তাহা করা হইয়াছে। ইহার এক

একটি শ্লোক অনেক ভাবিয়া, মাত্রা গুনিয়া সভ্য জনাদৃত ভাবে, অলঙ্কার শাস্ত্র সম্মত রীতিতে, তৎকালোচিত কবি মনের ভাব অবলম্বন করিয়া, ধীরে ধীরে কবিতা লিখিতেছেন। কবি যেন বলিতেছেন "ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর" এইভাবে মগধ রাজের বংশ বর্ণনা করিতেছেন। মাগধী রাজ্ঞীর কথা হইতেই, কালিদাস যে মগধ রাজের রাজ প্রশস্তি লিখিতেছেন, বুঝা যাইতেছে। মগধের গুপ্তবংশের রাজন্যগণ যে রঘুবংশীয় বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন তাহা আমিশ্রী শিবাজি ধরমচাঁদ শেঠিয়ার নিকট হইতে জানিয়াছি। ইনি রঘুবংশীয় বৈশ্য।

এইরূপে বুঝা গেল রঘুবংশ কাব্যখানি মগধ রাজ, রঘুবংশের বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়ত্ব কামুক গুপ্তবংশের রাজাদের স্তুতি কথা মাত্র। এই রঘুবংশের প্রথম সর্গ পড়িলে আর একটি লোক ব্যবহার জানা যায়---কালিদাসের সমুদয় গ্রন্থ পাঠে দেখা যায়—তিনি ইন্দ্রবজ্রা উপেন্দ্রবজ্রা, বংশস্থবিল, বসন্ততিলক প্রভৃতি বড় বড় ছন্দে, ঝড়ের মত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। সেই তিনি রঘুবংশে দেখি অতি সহজ ছন্দঃ অনুষ্টুভে মঙ্গলাচরণ আরম্ভ করিয়াছেন ইহার ভাবার্থ কি? ইহার ভাবার্থ কালিদাসের রাজসভাসদ্ চরিত্রাভিজ্ঞতা। "Human nature being the name and equal in everywhere." মানুষের চরিত্র সর্ব্বত্র সকল যুগেই সমান। রাজসভায় প্রবেশ করিতে হইলে, রাজার সভাসদদের হাত অতিক্রম না করিয়াও যাইবার পথ নাই। ইহা শিশুজননীর সহর। রাজ সভাসদেরা কথনই নিজের অপেক্ষা প্রতিভান্বিত ব্যক্তিকে, রাজার সহিত পরিচয় করাইয়া দিবেই না। তাহারা নিজের অপেক্ষা ন্যূন প্রতিভাক, রাজার নিকট দেখিতে চায়। রাজার নিকট পরিচিত হইতে হইলে, সর্ব্বত্র রাজসভাসদদিগের নিকট "ন্যাকা" হইতে হয়। কালিদাস এই তত্ত্বটি বিশেষভাবে জানিতেন। তিনি যখন কর্ণাটরাজ দ্বিতীয় পুলিকেশিনের রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখনও সেইস্থানে এই চাতুর্য্য অবলম্বন করিলেন। সেখানকার রাজসভাসদ বলুন কবি আগে কবিতা দেখিয়া তবে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেন। (কলিকাতায় অনেক বড়লোকের বাড়ীতে এই নিয়ম আছে। আগে দারবান বা মোসাহেব দগের নিকট পরিচয় দিতে হয়, কে, কিজন্য, কোথা হইতে, কেন আসিয়াছে, একথা শুনিয়া যদি দারওয়ানজি বুঝিতে পারেন যে—এই লোকটি বাবুর নিকট

মাতৃ-পিতৃদায় জানাইয়া ভিক্ষাপ্রার্থী নহে, অথবা বাবু যে সব হ্যাণ্ডনোট কাটিয়াছেন, এই লোকটি তাহার একজন পাওনাদার নহে, তাহা জানিতে পারিলে, তবে বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেয়।)

কালিদাস তাহা বুঝিয়াই বল্লনের হাতে কবিতা দিলেন—

"উত্তিষ্টোত্তিষ্ট রাজেন্দ্র মুখং প্রক্ষালয়স্বটঃ।
রৌতিতে নগরে কুকু চবৈ তুহি, চবৈ তুহি ॥

এই ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ কবিতায় বল্লন ভ্রান্ত হইয়া, কালিদাসকে রাজ সাক্ষাৎকার করাইবামাত্র, কালিদাসের মুখ দিয়া কবিতার বন্যা বহিয়া গেল। সেই কালিদাসের যে অনুষ্টুপছন্দে, রঘুবংশ আরম্ভ করিয়াছেন সেই রাজসভাসদদের তিতিক্ষা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য। তাহার পর "রঘুবংশের" দ্বিতীয় স্বর্গ হইতে নিজমূর্ত্তি ধরিলেন।

রঘুবংশের প্রথম সর্গ পড়িয়া আমরা বুঝি—মগধরাজ সমুদ্রগুপ্ত দ্বিতীয়, বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে আসিয়াছিলেন, কালিদাস তখন বালক, তাহার মাতুলালয় বশিষ্ঠাশ্রম বা বর্ত্তমান তারাপীঠ রামপুরহাটের নিকট। কবি সেই প্রথম রাজদর্শন করিলেন। দ্বিতীয় সর্গে কালিদাসের পিতৃভূমি গাঙ্গ্যরাষ্ট্র সমুদ্রগুপ্ত আক্রমণ করেন, সিংহের নিকট পরাজিত হন। তৃতীয় সর্গ পাঠে জানিতে পারি কুমার চন্দ্রগুপ্ত কালিদাসের পিতৃভূমি বহুদিনের প্রাচীন স্বাধীন রাজ্য কপিলাশ্রম বা গাঙ্গ্যরাষ্ট্র দ্বিতীয় আক্রমণ করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া, গৃহপ্রয়াণ করেন। গাঙ্গ্যরাষ্ট্র সামান্য ধন উপহার দিয়া স্বাধীন রাজ্যই রহিল। মগধগণের দুরাকাঙ্ক্ষা "আসমুদ্রং একরাট" হইল না। চতুর্থ সর্গে দেখি কালিদাস চন্দ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ী সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমগ্র ভারত পারস্য ও মধ্যএসিয়ার অক্ষস্ (oxus) নদীর তীর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিলেন। পঞ্চম সর্গে দেখি বিদর্ভ রাজকন্যার স্বয়ম্বর সভায় চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়, বৈদর্ভীর পাণিপ্রার্থী হইয়া গিয়াছেন, কালিদাস তাহার সহযাত্রিক আছেন। ষষ্ঠে দেখি বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং প্রবৃনুতে শ্রীকালিদাসং বরং"। কালিদাস অবাক হইয়া গেলেন, তিনি মীমাংসা করিলেন "নাসৌ নকাম্যো ন চ বেদ সম্যক্ দ্রষ্টুং নাসা ভিন্নরুচির্হিলোকঃ।" জনপ্রবাদে অজ কালিদাসেরই বিদ্রূপাত্মক নাম। কারণ তিনি কৃষ্ণবর্ণ ছাগলের মত কদাকার ছিলেন। সপ্তম সর্গে ক্ষত্রিয়কুল তাহার বিরুদ্ধে সমুত্থিত। অষ্টম সর্গে বিদ্যুন্মালার মৃত্যু হইয়াছে কালিদাস

কাঁদিতেছিল! কালিদাসের পত্নী বিয়োগের কান্নাটা, যেন তিনি ফনোগ্রাফ যন্ত্রের দ্বারা ধরিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা রতিবিলাপ পড়িলেই তাহা শুনিতে পাই।

রতিবিলাপের একটি শ্লোক শুনাই—

"স্রগিয় যদি জীবিতা পহা, হৃদয়ে কিং নিহিতা নিহন্তিমাং
বিষমপ্যমৃতং ক্বচিৎ ভবেৎ, অমৃতং বা বিষমিশ্বরেচ্ছয়া।" রঘু ৮।৪৬

অনুবাদ—

এ মালা গলে দিলে পরাণ যদি চলে
এ মালা মোর গলে কেন না দহে মোরে
বিষ অমৃত হয় কখনও দেখা যায়
অমৃত কি বিষ হয় ঈশ্বর ইচ্ছায়।

নবম সর্গ হইতে গুপ্তবংশের পতনাবস্থার বর্ণনা।

কুমার সম্ভবের আলোচনা। কুমার সম্ভবের প্রথম সর্গ পড়িয়া দেখি পত্নী-বিয়োগ বিধুর কালিদাস—"রাজতরঙ্গিনীর" মতে মাতৃগুপ্ত কাশ্মীরে রাজ্য করিতেছেন। পর্ব্বত রাজনন্দিনী তাহার শুশ্রূষা করিতেছেন। দ্বিতীয় সর্গে দেখি তারকাসুর বা তুরস্কাসুরের ভীষণ উপদ্রব হইয়াছে, দেবগণ মঘকব্রহ্মা বা মগধরাজ চন্দ্রবর্ম্মার নিকট আসিয়া উপস্থিত। তৃতীয় সর্গে দেখি গিলজিট গিরি সঙ্কট পথে সৈন্যচালনা করিয়া, তুরস্কদের গতি রোধার্থ ভারপ্রাপ্ত কন্দর্প, কালিদাসের প্রেম পরিচয় (courtship) স্থলে কালিদাসকে আক্রমণ করিয়া, তৎশরে ভস্মসাৎ হইয়া যান। চতুর্থ সর্গে দেখি কন্দর্প কালিদাসেরই ভগিনীপতি—অর্পন্নার স্বামী। অপর্ন্নার কান্নাটাই রতিবিলাপ। ৫।৬।৭ সর্গ কালিদাসের সহিত কাশ্মীর রাজনন্দিনীর প্রণয় ও বিবাহ কাহিনী। কুমারের ৭ম সর্গের ৩৮।৩৯ শ্লোক হইতে বুঝা যায়—সপ্তমাতৃকা—কালিদাসেরা সাত ভাই। এবং কালীকপালাভরণা কালিদাস নিজেই। উভয় শ্লোকে একত্রে বুঝা যায়—মাতৃগুপ্ত কালিদাস এই শিবের বিবাহ-কাব্য রচনা করিয়াছেন। শাস্ত্রে ষোড়ষ মাতৃকার উল্লেখ আছে, কিন্তু কালিদাস এখানে সপ্তমাতৃকার উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রাম্যছড়াতেও কালিদাসেরা সপ্তভ্রাতা—অর্পন্না বলিতেছেন "সাতভায়ের বুন পুত্রবতী।" এই শ্লোক দুইটি যেন শিবের প্রতিমূর্ত্তি বা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার পাদপট্টের নিম্নে লিখিত হইয়াছে। মাতৃগুপ্ত কালিদাস।

মেঘদূতালোচনা !

মেঘদূত আলোচনা করিলে আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই "কশ্চিৎ যক্ষো"—মাতৃগুপ্তঃ, "স্বাধিকার প্রমত্তঃ - নবপত্নীলাভোন্মত্তঃ তৎগৃহাবস্থিতঃ কাশ্মীর রাজ্যশাসন কর্ম্মনি অনবহিত চিত্তঃ, 'বর্ষ ভোগ্যেন কান্তা বিরহ গুরুণা ভর্ত্তু কুমারগুপ্তা শাপেআদেশেন অস্তংগমিত মহিমা"—কর্ম্মভ্রষ্টঃ (suspended from the servece) "জনক তনয়া স্নান পূণ্যোদকেষু স্নিগ্ধচ্ছায়া তরুষু রামগির্য্যাশ্রমেষু"—মধ্য ভারতীয় সুরগুমা রাজ্যান্তবর্ত্তী, অদ্যাপি ভীষণারণ্য পরিবেষ্টিতে, দুর্দ্দান্ত শ্বাপদাকীর্ন্নে, মনুষ্য প্রচার রহিতে রামগড়াখ্যে পর্ব্বতে "বসতিং চক্রে"। ভাবার্থ—কোনও যক্ষঃ—মাতৃগুপ্ত, এখন যক্ষ শব্দে মাতৃগুপ্ত কি করিয়া পাওয়া যায়—শব্দবিদ্যার মতে কুবেরের নামান্তর—"যক্ষঃরাট্ গুহ্যকশ্বরঃ"—অমর! তাহা হইলে যক্ষজাতির নামান্তর গুহ্যক। গুহ্য ও গুপ্ত একার্থবাচক শব্দ। তাহা হইলে গুপ্ত কথার প্রতি সংস্কৃত যক্ষ হইতে পারে। গুপ্তঃ—মাতৃগুপ্তঃ প্রধানা প্রধানয়ো প্রধানেন ব্যবদেশা ভবন্তি" ইতি ন্যায়েন, গুপ্ত শব্দে মাতৃগুপ্তকেই লক্ষ্য করিতেছে। যেমন "বিদ্যাসাগর" বলিলে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বিদ্যাসাগর, জীবনান্দ বিদ্যাসাগর, যশোদানন্দ বিদ্যাসাগর, পঞ্চানন বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাশয়গণকে না বুঝাইয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই বুঝায়। যেমন "রাম" বলিলে ভৃগুরাম, বলরামকে না বুঝাইয়া, রঘুরামকেই বুঝায়। যেমন "কবি" বলিলে ব্রহ্মা, বাল্মীকি, ব্যাস বা কালিদাসকেও না বুঝাইয়া, শুক্রাচার্য্যকেই বুঝায়। তেমনি গুপ্ত শব্দে মাতৃগুপ্তকেই বুঝাইল। এই নামের প্রতি সংস্কৃত করিবার অভ্যাস সংস্কৃত ভাষায় বহুত্র চলিত। কালিদাসের নীপবংশীয় রাজগণ—কদম্ববংশীয় রাজগণের নামান্তর মাত্র। মৃচ্ছকটিকের মলয়কেতু selucwsএর প্রতি সংস্কৃত। ক্ষারবেলের শাসনে বৃহস্পতি মিত্র—অবন্তিরাজ সেনাপতি পুষ্যমিত্র।

কশ্চিৎ কথার এখানে ইংরাজি প্রতিশব্দ certain Yaksha,—এই certain কথা নিশ্চিৎ এবং অনিশ্চিৎ উভয়অর্থেই প্রযুক্ত হইতে পারে—অর্থাৎ বিখ্যাতনামা কোনও যক্ষ। বাঙ্গালা ভাষায় কশ্চিৎ শব্দ এইরূপ উভয়ার্থে প্রয়োগ না থাকিলেও কালিদাস নিশ্চয় সেই অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন। স্বাধিকার প্রমত্ত কালিদাস যে দ্বিতীয়বার সুন্দরী পত্নী লাভ করিলেন তাহা আমরা কুমার সম্ভব হইতে

পাইলাম। তাঁহার পর সেই পত্নী লাভ করিয়াই, তাঁহার আগারে দিবারাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন, এবং সেইজন্য রাজকার্য্যে অনবহিত হইলেন, অন্ততঃ রাজপুরুষদের সেইরূপ ধারণাবশে—অথবা তিনি যে কুমারগুপ্তের আর একজন সেনাপতিকে, দ্বৈরথ যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন, সেই রাগে—এবং রাজকার্য্যে অনবহিত এই ছলে ভর্ত্তা কুমারগুপ্তের বর্ষভোগ্য কান্তাবিরহগুরু শাপে বা আদেশে অস্তগমিত মহিমা—রাজক্ষমতারহিত হইয়া, জনক তনয়া স্নান পুণ্যোদক—এসব রাজনৈতিক চাতুরী। কালিদাসকে বলা হইল—তোমার স্বাস্থ্য বড় খারাপ হইয়াছে, তুমি একবর্ষের জন্য জনকতনয়া স্নান পুণ্যোদক, স্নিগ্ধছায়া তরুসম্পন্ন, রামগিরির পবিত্র আশ্রম সকলে বিশ্রাম সুখ অনুভব কর (take a little rest) অন্ততঃ এই বলিয়া, প্রজাদের নিকট প্রচার করা হইল। প্রকৃত পক্ষে কলিদাস অতি দুর্গম স্থানে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। রামগিরি মধ্য ভারতের সুরগুমা রাজ্যান্তর্গত, রামগড় নামক পর্ব্বত শৃঙ্গ। ইহা রাজধানী হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে, ভীষণ অরণ্য ও শ্বাপদ জন্তুতে পরিপূর্ণ। কোথাও লোকের বসতি নাই। হস্তী চড়িয়া কষ্টে সেখানে যাইতে হয়। কালিদাসের জন্মসময়ের আবিষ্কারক Dr. T. Block সেখানে গিয়াছিলেন চিত্রশিল্পী শ্রীমান অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের মুখে আমি এই সমুদয় কথা শুনিয়াছি। আমি মালব গিয়াছিলাম কিন্তু রামগিরি যাইতে সাহস করি নাই।

স্নিগ্ধছায়া তরু—আমি মালব দেশ পরিভ্রমণ করিয়া যাহা বুঝিয়াছি—তাহাতে রামগিরির আশ্রম গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে—স্নিগ্ধছায়া সম্পন্ন নহে। সে দেশে সমুদয় গাছ "বিরল পাদপ ছায়া সম্পন্ন" একথা কালিদাসও বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"বিরল পাদপ ছায়াহিং বন রায়িহিং আহিণ্ডিয়, উন্নোন্ন কভু পাইং পিজ্জন্তি গিরিনই সলিলাইং।" (শকু ২অং) বিরল পাদপ ছায়া সম্পন্ন বিন্ধ্যদেশে ভ্রমণ করিতে তিনি বড় বিরক্ত ছিলেন, আর সে দেশের উষ্ণ কটু গিরিনদী সলিল পান করিতেও মাধব্যরূপী কালিদাস বড়ই বিরক্ত ছিলেন। কালিদাসের স্বদেশ কিন্তু সেরূপ নহে। সে দেশ—"সুভগ সলিলাব গাহ" এবং "প্রচ্ছায় সুলভ নিদ্রা"—গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে আমগাছতলায় মাদুর বিছাইয়া, যেমন শোয়া অমনি ঘুম। গ্রীষ্মকালে এত ছায়া ও সুশীতল বৃক্ষতল এই সোনার বাঙ্গালা ভিন্ন আর ভারতের কোনওখানেই নাই। ভারতের সর্ব্বত্র বিহার হইতেই "বিরল

পাদপ ছায়"—"শীর্ণ শীর্ণ গাছগুলি সরু সরু পাতাগুলি তরুতলে ছুটিছে আগুন''। সেখানে সুলভ নিদ্রা—চিরনিদ্রায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। "জলতি পবন বৃদ্ধঃ পর্ব্বতানাং দরীষু" এইরূপ—গ্রীষ্ম বিন্ধ্যদেশেই সম্ভবে। কালিদাস তাহা দেখিয়া চমকাইয়া গিয়াছিলেন। তাই তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি স্থির ছায়াদ্রুমাকীর্ণ দেশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার প্রিয়ার দেশেই পর্ব্বত কন্দরেগ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে আগুন জ্বলিত, তাহার স্বদেশে নহে। দ্বিতীয় শ্লোক—তস্মিন্ অদ্রৌকামী অবলা বিপ্রযুক্তঃ কণকবলয় ভ্রংশরিক্ত প্রকোষ্ঠ স যক্ষঃ কতিচিৎ মাসান নীত্বা, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে আশ্লিষ্ট সানুং মেঘং বপ্র ক্রীড়া পরিণত গজপেক্ষনীয়ং দদর্শ। ভাবার্থ—সেই পর্ব্বতে, কামী অথচ স্ত্রীহীন কনকবলয়ভ্রংশ রিক্তাগ্রকর—অবএব অত্যন্ত শীর্ণ দেহ হইয়া সেই যক্ষ সেই পর্ব্বতে কতিচিৎমাস কয়েকমাস যাপন করিয়া আষাঢ়ের প্রথম দিবসে,—বাঙ্গালা আষাঢ় মাসের ১লা তারিখে, গিরি নিতম্ব আলিঙ্গনকারী মেঘকে, বপ্রক্রীড়াপরায়ণ মত্তগজের ন্যায় দেখিয়াছিলেন।

এখানে আমাদের "কতিচিৎ মাস" শব্দের অর্থটি বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। বারমাস বা ৩৬৫ দিন যদি তাঁহার শাপভোগের পরিমিত বা নির্দ্দিষ্ট কাল হয়, তবে কত মাস তাঁহার শাপ ভোগের পর আষাঢ়ের প্রথম দিন আসিয়া উপস্থিত হইল? শব্দ বিস্তার দিক দিয়া দেখিলে "কশ্চিৎ যক্ষ" শব্দের বাঙ্গলা প্রতিবচন "একজন যক্ষ!" কশ্চিৎ বা কিঞ্চিৎ কথার অার্থ এক। অতিচিৎ কথার আর আর কত বাড়িবে? দুই মাস বড় জোর। বারমাসের তিনমাস কিছুতেই কতিচিৎ শব্দের লক্ষ্য হইতে পারে না। বার মাসের তিনমাস কিছুতেই কিঞ্চিৎ হইতে পারে না। কিঞ্চিৎ শব্দের অর্থ এক হইতেও ন্যূন, এক হইলেও একটা পরিমাণ পাওয়া গেল, কিঞ্চিৎ বলিলে পরিমাণ হইতেও কিছু কম ইহাই বুঝাইল! কালিদাসের নিজের লেখাতেও এই কথা আরও পরিস্ফুট হয়। (পূ মেঘ ২৪) "কতিপয় দিনস্থায়ী হংসা দশানা" দশার্ণ দেশে রাজহংসগণ কতিপয় দিন স্থায়ী। পক্ষিতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয় ১৩২৬ সালের "প্রবাসী'' পত্রে" মেঘদূতের পক্ষিতত্ত্ব" নামক এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন দশার্ণ দেশে রাজহংসগণ ৮।১০ দিন মাত্র থাকে। তাহা হইলে কালিদাসের ধারণায়, কতিপয় শব্দের শক্তি, ৩৬৫র মধ্যে দশদিন বা একমাসের এক তৃতীয়াংশ।

তাহাহইলে একের ভগ্নাংশ পাওয়া গেল। তাহা হইলে "কতিচিৎ মাস" শব্দের শক্তি ১, ১॥, বড় জোর ২মাস অবধি উঠিতে পারে।

এইরূপে বুঝা গেল আষাঢ়ের প্রথম দিবসের দুইমাস পূর্ব্বে, যক্ষের কর্ম্মচ্যুতি হইয়াছিল। এখানে একটি লৌকিক ব্যবহার অনুশীলন করিতে হইবে। ভারতে পৌষমাসে ধান, যব, গম প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার পর রাজার ঘরে খাজনা আদায়ের টাকা আসিয়া, আখেরী বা শাল তামামী হইতে, চৈত্র মাস কাটিয়া যায়। এই কথা মোগল সম্রাটেরাও দেখিয়াছেন, ইংরাজেরাও দেখিতেছেন তজ্জন্য আকবর বাঙ্গালা সাল বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজেরাও এপ্রিল মাস হইতে ভারতে Official year গণনা করিয়া থাকেন। সাল তামামী না হইলে, কেহ ত আর চাকরকে জবাব দেয় না। মনুর আমল হইতে এই বিধান চলিয়া আসিতেছে। মনুও বর্ষ শেষে চাকর ছাড়াইবার বিধান দিয়াছেন। কাজেই আষাঢ়ের প্রথম দিবসের দুইমাস পূর্ব্বে বা ১লা বৈশাখ তারিখেই যক্ষের কর্ম্মচ্যুতি ঘটিয়াছিল। এই কথাটাও কালিদাসের বাঙ্গালা পাঁজি ব্যবহার সমর্থন করিতেছে। বিভিন্ন দেশে যে বিভিন্ন রীতিতে বর্ষ গননা হয়, তাহা আমি 'প্রথম দিনের প্রবন্ধে বলিয়াছি। তাহা শ্রাবণ—১৩২৭ "সাহিত্য-সংহিতায়" প্রকাশিত হইয়াছে।

"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে।" এটা যে বাঙ্গালা কথা তাহাও ঐ প্রবন্ধে বলিয়াছি। তাহাও ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ৩০শে চৈত্র সাল তামামী হইয়া গেলে যক্ষকে এক বর্ষের জন্য কর্ম্ম হইতে suspend করা হইল—এই কথা হইতে বুঝা গেল, কালিদাস বাঙ্গালা পাজি ব্যবহার করিতেন।

এইবার চতুর্থ শ্লোক। এই শ্লোক লইয়াই আমার প্রবন্ধ। ১লা আষাঢ় তারিখে মেঘ উঠিতেই, কালিদাস ত ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু ১লা শ্রাবণ না পড়িতেই কালিদাস একবারে উন্মাদ হইয়া উঠিলেন। "নভসি প্রত্যাসন্নে"—শ্রাবণ মাস আসে আসে এমন সময়ে, "দয়িতা জীবিতা লম্বনার্থী"—এই বর্ষার ঘোর দুর্দ্দিনে প্রিয়তমাত আর বাঁচিবে না, এই বর্ষার ঘোর বিরহ প্রিয়তমা কি করিয়া সহ্য করিবে? এই ভাবিয়া ব্যাকুল যক্ষ উন্মত্ত যক্ষ, কি করিয়া প্রিয়তমা বাঁচিবে তাহারই জন্য—"জীমূতেন স্বকুশলময়ীং প্রবৃত্তিং হারয়িষ্যন্" মেঘের দ্বারা নিজের কুশলময়ী বার্ত্তা প্রিয়ার নিকট পাঠাইবার জন্য—"স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজ কুসুমৈ

কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ” অভিনব কুটজ কুসুমে তিনি তাঁহার জন্য অর্ঘ্য কল্পনা করিয়া, “প্রীতঃ প্রীতি প্রমুখ বচনং স্বাগতং ব্যাজহার”—প্রীতমনে প্রীতিপ্রমুখ বচনে মেঘকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

“মেঘদূতের” কথা সর্ব্বস্ব বা মহাপ্রাণ এইখানে এবং এই শ্লোকে—মেঘ দেখিলে প্রিয়ার বিরহে যে মানুষ উন্মাদ হয়—এই কল্পনা কোন দেশের কোন জাতি যুগ যুগান্তর হইতে, এই ধারণাটি প্রাণে পোষণ করিয়া আসিতেছে? মানবের চিন্তাস্রোত ত চিরদিনই সমানই বহিতেছে। কোন দেশের চিন্তাস্রোত আবহমান-কাল, এই কথা বলিয়া আসিতেছে যে—মেঘদর্শনে বিরহীর বিরহ ব্যথা অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হয়। কোন দেশের লোকের বর্ষাকালে মিলনাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে? কোন দেশের লোক তদ্বিরহে উন্মাদ হইয়া উঠে! কোন দেশে “শাভন ঘন ঘটা শিহরে তরুলতা” সেটা কোন দেশ?

“বাঙ্গলার কবি, জগতের কবি, কবি জয়দেব কি বলেন?”—

“মেঘৈ মেদুর মম্বরং বনভুবশ্যামা স্তমাল* দ্রুমৈঃ
নক্তংভীরু রিয়ং তমেব তদিমাং রাধেংগৃহং প্রাপয়,
ইত্থংনন্দ নিদেশতঃ চলিতয়ো প্রত্যধ্ব কুঞ্জদ্রুমং
রাধা মাধবয়ো জয়ন্তি যমুনাকূলেরহকেলয়ঃ।”

জয়দেব কৃত গীত গোবিন্দের মঙ্গলাচরণ।

অনুবাদ—(বর্ণানুক্রমিক)

মেঘে মেদুর অম্বর ক্রমে
বনভুব শ্যাম তমাল দ্রুমে।
ঘোরা রজনী ভীরু ইনি যবে
তুমি এরাধারে গৃহেতে পাওয়াবে।

---

* জয়দেবের বাড়ী তমালবীথির মধ্যে, কালিদাসের বাড়ীও “তমালতালি বনরাজিনীলা” কালিদাসের সাধনপীঠ “সারস্বতকুণ্ড” রায়ান বেলুটি গ্রামে তমালবীথির মধ্যগত একখানি ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড মাত্র। এই স্থান কেঁদুলি ও নান্নুরের নিকট। কেঁদুলি জয়দেবের বাড়ী, নান্নুর চণ্ডীদাসের বাড়ী।

এরূপ নিশীথে নন্দ নিদেশেতে
চলিত পথেতে সে কুঞ্জ ক্রমেতে
রাধা মাধবের জয় জয় বলি
যমুনার কূলে নির্জ্জন কেলি ॥

বাঙ্গালার কবি, জগতের কবি, অতুলনীয় কবি, জয়দেব তাহার প্রাণের প্রতিমার, তাহার আরাধ্য দেবতার, যুগল মিলন লিখিয়া, যে মঙ্গলাচরণ করিলেন তাহা কি মাসে? সে যে শ্রাবণ মাসে, সে যে ঝুলন, সে যে রাখীপূর্ণিমার মাসে, কৈ রাসলীলা ত বলিলেন না, কৈ দোললীলা বলিলেন না, এ ঝুলনলীলা কেন গাহিলেন? তাহার প্রাণের ঝুলনায় কে দুইটি আত্মা ঝুলিতেছিল, তিনি কাহাদের কথা বলিলেন? এ যে বর্ষার মিলন, এযে বাঙ্গলার নিজস্ব, এযে গুরুপরম্পরাগত চিন্তাপ্রবাহ, এযে আত্মার মিলন, এযে যে দেশে বর্ষার জলধারার সহিত তরুলতা গুল্ম শিহরিয়া উঠে এযে সেই দেশেরই কল্পনা।

অলঙ্কার কি বলেন—

ইহ পুরোনিল কম্পিত বিগ্রহা
মিলতি কাল বনস্পতিনা লতা।
স্মরসি কিং সখি কান্ত রতোৎসবং?
নহি ঘনাগম রীতিরুদাহৃতা॥ (সাহিত্য দর্পণ)

এই পুরস্থিতা অনিল কম্পিতা
মেলে না কোন না বনস্পতি লতা।
স্মরিছ কি গো সখি কান্ত প্রেমোৎসব?
নানা ঘনাগম রীতির প্রভাব॥

পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনোমুদা।
অদ্যকান্ত কৃতান্তো বা মমত্রাতা ভবিষ্যতি॥

পড়ে অবিরত বারি নাচে শিখী সবে।
আজিকান্ত বা কৃতান্ত মম ত্রাতা হবে॥

উপরি ঘনাঘন স্তনিতং
দূরে দয়িতা কিমেত দাপতিতং।

হিমবতি দিব্যৌষধবঃ
শীর্ষে সর্প সমাবিষ্টঃ ॥
উপরে ঘনঘন ডাকিছে যবে
দূরেতে দয়িতা কি হবে এবে।
হিমবতি ঔষধ রয়েছে পড়িয়ে
মাথাতে সর্প যে রয়েছে বসিয়ে ॥

সাহিত্য দর্পণে আর একটি শ্লোক আছে তাহা এইরূপ—

নায়িকা—অপতিতয়া নৈব শকতেস্থাতুং
সখী—ভর্ত্তায় মিচ্ছসি কিমু!
নায়িকা—নহি নহি সখি পিছিলপন্থা ॥

নায়িকা বলিলেন—অপতিত্ব প্রযুক্ত আমি আর থাকিতে পারিতেছি না।

সখী—স্বামী অন্বেষণ করিতেছ নাকি!

নায়ক—না না পথ বড় পিছল হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ—

বোল ত স্বজনি এত্বরূযোগে
কুঞ্জে নিরদয় কান।
দারুন বাঁশী কৈছে বাজাওত
রাধা রাধা নাম।

সোণার তরী (রবীন্দ্র)

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
.কুলে একা বসে আছি নাহি ভরষা
রাশি রাশি ভাবা ভাবা (?) ধানকাটা হল সারা
বাঁকা নদী খুব ধারা খর পরসা
যাপিতে যাপিতে দিন এল বরষা ॥

এইবার হিন্দুস্থানের কবিদের কথা বলি—

কাঁহা শ্যাম বাজাও ত বীণা
অন্ন বিনা যে সে প্রাণ আকুলতর,
জল বিনা যে সে মীন।

ছোটকে বাল মোকো নারী আকুলভয়
ফাগুন মস্ত মহীয়া।
যাহা শ্যাম বাজাওত বীণা॥

শ্বশুর হামাক্ আশী বরষকো
শাশ হামাক্ নবীনা
সাঁইয়া হামারী পালঙ্গ ঝুলত হ্যায়,
ফাগুন মস্তমহীনা
যাহা শ্যাম বাজাওত বীণা॥

উড়ে কবি—

অস্থ মাগশিব হলা
এ বয়সে কান্ত বিদেশে গলা
মোর ঝরুদিন না সরিলা দৈব রে।

বিহারী কবি—

বিদ্যাপতির কবিতায় "বসন্তবিহার" নামক এক অধ্যায় আছে। তাহাতে পাঁচ পদ মাত্র আমি আমার পুস্তকে পাইলাম। পরন্তু বর্ষ বিহার শীর্ষক কোনও অধ্যায় নাই।

"আওল ঋতুপতি রাজবসন্ত
ধাওল অলিকুল মাধবী পন্থ।" ইত্যাদি।

"স্ব কুশল ময়ী প্রবৃত্তি"—"দেখা হলে বলো তারে ভাল আছি প্রাণে প্রাণে।" এ কথা বাঙ্গালীরই।

"সপ্রত্যগ্রৈ কুটজ কুসুমৈঃ কল্পিতা র্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতি প্রমুখ বচনাং স্বাগতং ব্যাজহার।"

এটুকু যেন কাশীরাম কৃত্তিবাস কবিকঙ্কন কবিরঞ্জন বা রায় গুণাকরের লেখা। বৈদর্ভী রীতিতে অনুপ্রাস করা বিশেষ নিষিদ্ধ। কালিদাস প্রতিজ্ঞা করিয়া কবিতা লিখিতে বসিয়াছেন—অনুপ্রাস করিবেনই না, কিন্তু তা হলে কি হয়, তাহার দেশের জল বায়ুতে অনুপ্রাণ ছড়াইয়া ছিল, তাহার কোন নিশ্বিষের ভুলে, তাহার কলমের ডগা দিয়া, এমন চমৎকার অনুপ্রাস বাহির হইয়া গিয়াছে।

আচার্য্য দণ্ডীর মতে গৌড়ী রীতিটি পৌরস্ত্য কাব্য পদ্ধতি, সে কোমল অক্ষরাম্বরমাত্র অনুপ্রাসস্ত তৎ প্রিয়—সে দেশের লোকেরা কেবল অনুপ্রাসই ভাল বাসে। কালিদাস বিদর্ভ রাজকন্যা বিবাহ করিয়া বিদর্ভবাসী হইয়াও বাংলার অনুপ্রাস, অক্ষরাড়ম্বর ভুলিতে পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে তাহার কলমের ডগা দিয়া অনুপ্রাস বাহির হইয়া যাইত।

পরাধীন বৃত্তি—পূ মে ৮—কালিদাস যে চির পরাধীন দেশের লোক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, নতুবা এক বৎসরের কাজ suspention হইতেই, এরূপ কাঁদিয়া আকুল হইবেন কেন ?

গোপ বেশস্য বিষ্ণোঃ—প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছি। রাধাকৃষ্ণ বাঙ্গালায় নিজস্ব।

বিন্ধ্য পাদে বিশীর্ণা—কালিদাস যে বিন্ধ্য পাদে বিশীর্ণা নদীর দেশের লোক নহেন, তাই এমন কথা ঋতু সংহারেও বলিয়াছেন।

উত্তর মেঘ দ্বিতীয় শ্লোক—

"হস্তে লীলাকমল"— ইত্যাদি এইটি সাওতাল কন্যার ছবি। কালিদাসের বাস-ভূমি বীরভূম জেলা সাওতাল পরগণার অন্তর্গত। রাঢ় কথা, সাওতালী "রাঢো" বা "রাঢো" কথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

"বিম্বাধরানাং"—তেলাকুচার ফল বাঙ্গালার সরস মৃত্তিকার নিজস্ব। পশ্চিমে এত সুন্দর লাল হয় না।

"লাক্ষারাগ"—আলতা বাঙ্গালার নিজস্ব। দাক্ষিণাত্যে হলুদ পায়ে দেয়, মুসলমানরা মেহেদী পাতা দিয়া রং করে।

"শুক্রগারং ধনপতি গৃহাৎ" উত্তর মেঘ ১৪ শ্লোক।

"দক্ষিণেন প্রবাত" উ, মে, ৪৭ শ্লোক।

এই উভয় শ্লোক অবলম্বন করিয়া আমি পূর্ব্বে প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছি যে—দক্ষিণানিল বাঙ্গালার নিজস্ব। আমার এই কথা মহারাষ্ট্র নিবাসী কলিকাতা ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল একজিবিসনের তত্ত্বাবধায়ক, বিলাতে শিক্ষিত পণ্ডিত রায় বাহাদুর শ্রীবালকৃষ্ণ আত্মারাম গুপ্তে F. Z. S. মহাশয় সমর্থন করিয়াছেন—তাঁহার মত "দক্ষিণানিল পশ্চিম দেশে নাই, সে দেশে পশ্চিমানিল। বঙ্গের বাড়ীর দক্ষিণ দ্বার অনর্গল বায়ু আসিবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত। এটা বাঙ্গালীর কল্পনা। পশ্চিম দেশে পশ্চিমানিল আসিবার জন্য পশ্চিম দ্বার উন্মুক্ত"। বাঙ্গালার প্রাচীন

রাজারা এবং নবাবেরা, পশ্চিম দ্বারি গৃহের খাজনা লইতেন না। আরও দেবায়তনের দক্ষিণে বাড়ী করিতে নাই এই সংস্কার ও তদন্তে স্মৃতির বচন উদ্ভাবন—ইহাও বাঙ্গালা দেশেরই নিজস্ব।

"সুরপতি ধনু শ্চারুনা তোরনেন।" গৃহের দ্বারবা তোরন, সপ্তবর্ণে রঞ্জিত করা ইহাও রাঢ়ের প্রথা। উত্তররাঢ়ে সিংড়ি গড়া গ্রামে একটি মেটে ঘরের দেওয়ালে এইরূপ সপ্তবর্ণ রঞ্জিত তোরণ বা চাল্ চিত্র করা আছে দেখিলাম। নদীয়ার ঘুলেরা এই তোরণ গাথিত এবং চিত্র করিত। তাহারা কাদা দিয়া পাঁচতলা বাড়ী গাঁথিয়া ছিল।

"তন্বী শ্যামা" ইত্যাদি উ, মে, ২১ শ্লোক।

এই যে নায়িকার বর্ণনা ইহা বাঙ্গালী নায়িকা হিন্দুস্থানী বা কাশ্মীরী নায়িকা নহে।

তন্বী—ক্ষীণা ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর মত ক্ষীণা আর রমণী নাই। উত্তর মেঘ ৪১ শ্লোক ও "শ্যামা স্বঙ্গং" ইত্যাদি স্থলে শ্যামালতার সহিত প্রণয়িনীর অঙ্গের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। এই শ্যামালতা বাঙ্গালার আদিম অধিবাসিনী। এবং কৃষ্ণবর্ণা ও মলিনা। অতএব "তন্বী শ্যামা" উ, মে, ২১ শ্লোক ইত্যাদি স্থলে কালিদাস শ্যামা—মলিনা এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। তপ্তকাঞ্চন বর্ণা-ভাশ্যামেতি কীর্ত্তিতা এই টীকাকারদেব অর্থে নহে। শ্যামা—মলিনা, কাশ্মীরী কন্যা শ্যামা নহেন শুভ্রা। বাঙ্গালার অধিকাংশ কন্যাই শ্যামা। শ্যামার পারিভাষিকার্থ, আধুনিক টীকাকারদের রচনা। শ্যামা বালিকা ত তপ্তকাঞ্চনবর্ণা নহেন। শ্যামা ও শ্রীকৃষ্ণ ও কাল। নবদুর্ব্বাদল শ্যাম রামচন্দ্র কাল। শিখরিদসনা—শেকড়দাতি, মধ্যক্ষামা বাঙ্গালী, পশ্চিমে কন্যা ঘটোদরী, নাভি বাহির করিয়া কাপড় পরাই সে দেশের সৌন্দর্য্য।

দুঃখ দুঃখেন—বাঙ্গালা ছেঁদোকথা।

বাচালং মাং— ঐ কথা।

বনী দেবতা—বন দেবী, বন বিবি বাঙ্গালার বহুত্র আছেন।

উ মেঘ ৪১—"শ্যামাস্বঙ্গং" ইত্যাদি।

এখানে চণ্ডি! কালিদাসের দ্বিতীয়া পত্নীর নাম গ্রাম্য ছড়ায়, জনপ্রবাদে, এই দ্বিতীয়া পত্নীর নাম "উগ্রতারা" ইহারই প্রতিমূর্ত্তি বশিষ্ঠাশ্রমে আছে। এখানে

টীকাকারগণ "চণ্ডী" শব্দে কোপন স্বভাবে এই অর্থ করিয়াছেন। এইরূপ স্থলে কোপন স্বভাবে বলিলে রসভঙ্গ হয়। কালিদাস ঋতু সংহারে এবং শ্রুতবোধে, বহুত্র প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়াছেন, কোনও স্থানে তাহাকে চণ্ডি! বলিয়া সম্বোধন করেন নাই। এই এক স্থানেই মাত্র তাহাকে চণ্ডি! বলিয়াছেন। শকুন্তলা "হলা চণ্ডি! নারীহসি গন্তুং"—এখানে শকুন্তলা কুপিতাই ছিলেন। কিন্তু বিরহিণী পত্নীকে কোপন স্বভাবে বলিলে—অত্যন্ত হৃদয় হীনের মত সম্বোধন করা হয়। কাজেই এই স্থানে "চণ্ডী" কালিদাসের দ্বিতীয়া পত্নীর নাম। প্রথমার নাম বিদ্যুন্মালা এবং দ্বিতীয়ার নাম চণ্ডী বা উগ্রা বা উগ্রচণ্ডী। রবীন্দ্রনাথ আমায় লিখিয়াছেন—"কোনও হিমালয় বাসিনী রমণী, তাঁহারা কালিদাসের চিন্তাশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া ছিলেন" ইহার মহত্বকেও আমার কোটি কোটি প্রণাম।

এই মেঘদূত উৎসব উপলক্ষে রায় বাহাদুর গুপ্তে আরও কয়েকটি কথা বলিয়াছেন—"কালিদাস এই নাম বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতের অন্যত্র নাই। মহারাষ্ট্রে এই প্রবাদ ও গল্প প্রচলিত আছে এক সময়ে কালিদাস ও দণ্ডী ইহাদের মধ্যেকে বড় কবি—এই বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহাতে উভয়ে কালীর নিকট মীমাংসার জন্য উপস্থিত হইলে, কালী বলিলেন—দণ্ডী কবি মাত্র, এবং কালিদাস শিব স্বরূপ। গুপ্তে বলেন—কালিদাস যদি পশ্চিম ভারতের লোক হইতেন, তবে গণেশের নিকট বিচারার্থ উপস্থিত হইতেন, গণেশ বিদ্যার দেবতা, কালী ত বিদ্যার দেবতা নহেন। এবং কালীমূর্ত্তি পশ্চিম ভারতে নাই। ইহা বাঙ্গালার নিজস্ব। কালীঘাটের কালীর মত প্রাচীন বিগ্রহ আর নাই, অতএব এই কালিঘাটের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে তাহার বাড়ী ছিল। গুপ্তে—বেলগাম হইতে Prof. কেলকারের এক পত্র আনাইয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—বিন্ধ্যাপর্ব্বতের পশ্চিমদিকে কিছুতেই কালিদাসের বাড়ী নহে। Dr. Vowdajee কালিদাসকে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর গুপ্তে কালিদাস সমিতিকে বিরহী যক্ষের এক প্রতিকৃতি, যাহা শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর সি, আই, ই, মহাশয় চিত্রিত করিয়াছেন—তাহার এক প্রতিলিপি উপহার দিয়াছেন। তাহা আপাততঃ কসবা লাইব্রেরীতে গচ্ছিত রাখা হইয়াছে। সেই প্রতিকৃতির আলম্বন সভার সভাপতি বহুগ্রন্থপ্রণেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

লেক্‌চারার শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি-এল কবিতাম্বর মহাশয় "মেঘদূত" সম্বন্ধে এক নূতন তথ্য জগৎকে শুনাইয়া দিয়াছেন।

"কালিদাসের মত একজন অসাধারণ কবি ও সাধক মেঘদূত লিখিয়াছেন, তিনি কি একজন সামান্যা নায়িকার জন্য উন্মাদ হইয়াছিলেন? তিনি পরাবিদ্যার সাধনা করিতেছিলেন। তিনি থাকেন অলকায় যেখানে যাইতে হয়, ভারতের যত কিছু সুন্দর স্থান আছে তাহার মধ্য দিয়া এবং তাহা কৈলাসের নিকট সেই অলকার কবি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সেখানে সামান্যা নায়িকার আবাস সম্ভবে না।

"আনন্দোথং নয়ন সলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈঃ
নান্যস্তাপঃ কুসুম শরজা দিষ্ট সংযোগ সাধ্যাৎ
নাপ্যান্য স্মাৎ প্রণয় কলহাৎ বিপ্রযোগোপপত্তি
বিত্তেশানাং ন চ খলুবয়ো যৌবনাদন্যদস্তি"। ৪। মেঘ।

যেখানে আনন্দোথ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারের নয়ন সলিল নাই, ইষ্টসংযোগ সাধ্য কুসুম শরজ তাপ ব্যতীত অন্য কোনও তাপ নাই, প্রণয় কলহে বিপ্রযোগ ভিন্ন আর কোনও প্রকারের বিরহ নাই, এবং যৌবন ব্যতীত অন্য কোন বয়স সে দেশে নাই।

এইরূপ স্থানে সামান্য মানবীর বাস সম্ভবে না। ইনি অসামান্যা মানবী বা পরাবিদ্যা।

শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ।

মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন কি না ?

ভারতবর্ষের গৌরব মহাকবি কালিদাস কত খৃষ্টাব্দে কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিবার জন্য বহুকাল যাবত নানাবিধ আলোচনা হইতেছে। সকল আলোচকগণই নিজ নিজ গবেষণার ফলে যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সকলের অনুমান ঠিক হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও অনুসন্ধিৎসু বিদ্বদ্‌বৃন্দের চেষ্টায় একদিন সত্যের আবিষ্কার হইবার সম্ভাবনা, এজন্য এবিষয়ে যত আন্দোলন আলোচনা হয় ততই সত্যের আবিষ্কার সন্নিহিত মনে করিয়া আমরা কতক আশ্বস্ত হই। সংপ্রতি সাহিত্য সংহিতা পত্রিকায় দেখিলাম মান্যবর পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ দশবর্ষ পরিমিত কালের গবেষণার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে "মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন"। মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন একথা শুনিলে আমাদের বিশেষ আনন্দ হয় বটে কিন্তু তিনি যে সকল যুক্তি দ্বারা মহাকবিকে বাঙ্গালী স্থির করিয়াছেন সেই সকল যুক্তি বলে বাঙ্গালী বলিয়া অবধারণ করা যায় না। আমরা বাঙ্গালী হইলেও মহাকবিকে নিজের দেশের লোক স্থির করিবার জন্য এই সকল অযুক্তিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারি না ; সেরূপ করিতে গেলে ভিন্ন দেশীয়দিগের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হয়। তাই বাধ্য হইয়া কাব্যতীর্থ মহাশয়ের যুক্তিগুলির দোষ দেখাইতে হইল। আশা করি তিনি অসন্তুষ্ট না হইয়া এতদপেক্ষা দৃঢ়তর প্রমাণ সকল আবিষ্কার করিয়া মহাকবিকে বাঙ্গালী বলিয়া অবধারণ করিতে পারিবেন। আমরাও সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় থাকিলাম।

প্রথমতঃ—কাব্যতীর্থ মহাশয় যে আদর্শ অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সেই আদর্শ সম্বন্ধে বিচার করা উচিত ছিল। একখানি মহাকাব্যের মধ্যে সমুদ্র, চন্দ্র, কুমার ইত্যাদি দ্ব্যর্থ বোধক শব্দ দেখিয়াই যদি মহাকবি গুপ্ত বংশের সময়ের লোক এইরূপ স্থির হয় তবে দীলিপ, রঘু, অজ, দশরথ, রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ইত্যাদি একার্থবোধক শব্দ দেখিয়া মহাকবি ত্রেতাযুগের লোক এইরূপ কল্পনা

করিতেই বা বাধা কি? এইস্থলে বিবেচনা করা উচিত ছিল যে মহাকবি যদি চন্দ্রগুপ্তের সভাপণ্ডিত হইতেন তবে গুপ্তবংশ অবলম্বন করিয়াই মহাকাব্য লিখিতেন, ঐ কাব্য জন সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইত রাজাও বিশেষ সন্তুষ্ট হইতেন; তাহা না করিয়া রঘুবংশ অবলম্বন করিয়া মহাকাব্য লিখিতে যাইয়া তন্মধ্যে গুপ্তভাবে গুপ্তবংশীয়দিগের নাম প্রবেশ করাণের কারণ কি? তিনি কাহার ভয়ে ভীত হইয়া নিজপ্রভু ভারতেশ্বরের নাম প্রচ্ছন্ন রাখিলেন? পক্ষান্তরে যদি মহাকাব্যের মধ্যে চন্দ্র, সমুদ্র, কুমার ইত্যাদি শব্দ বিন্যাস দেখিয়া গুপ্তবংশের সমকালীনত্বাবধারণ করিতে পারেন তবে যতগুলি কাব্য অথবা নাটকে ঐরূপ শব্দ বিন্যাস আছে তাহাদের রচয়িতারও গুপ্তবংশসমকালীনত্ব নির্ণয় করিতে হয়। "তস্মৈ গোপ্ত্রে সভার্য্যায়" এস্থলে গোপ্তৃ শব্দ দ্বারা গুপ্তবংশের কথা কিভাবে বলা হইল বুঝা যায় না; কারণ গোপ্তৃ শব্দ ও গুপ্ত শব্দ একার্থ বোধক নহে এমন কি শব্দদ্বয়ের ব্যঞ্জনগত সাদৃশ্য থাকিলেও স্বরগত সাদৃশ্যও নাই। গোপ্তৃ শব্দ দেখিয়া যিনি গুপ্তবংশের কথা মনে করিতে পারেন তিনি ভর্ত্তৃ শব্দ দেখিয়াও ভৃত্যের কথা মনে করিতে পারেন। এই সকল বিবেচনা করিলে মনে হয় কাব্যতীর্থ মহাশয় আদর্শটি সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করেন নাই। যাহা হউক তাঁহার নিজের প্রদর্শিত কারণাবলীর আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

মহাকবি গ্রীষ্মঋতু হইতে বর্ষা আরম্ভ করিয়াই যে বাঙ্গালী হইলেন এইরূপ বলা যায় না, তাহা হইলে "ভাবপ্রকাশ" রচয়িতা "ভাবমিশ্র"কেও বাঙ্গালী বলিতে হয়। কারণ তিনি ত গ্রীষ্মঋতু হইতে বর্ষা আরম্ভ করিয়াছেন। কি কারণে গ্রীষ্ম হইতে বর্ণনা আরম্ভ করিলেন তাহার বিচার করিতে হইবে। ঋতু সংহার একখানি শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্য। শৃঙ্গার রসের উদ্দীপন কালের মধ্যে বসন্তকালই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং গ্রীষ্মই সর্ব্ব নিম্ন; গ্রীষ্মকালকে কবি নিজেই "উপশান্তমন্মথঃ" লিখিয়াছেন। অতএব বিচার করিলে দেখা যায় যে "উপাশান্তমন্মথঃ" গ্রীষ্মধাতু হইতে আরম্ভ করিয়া যেকালে সকলেরই "কন্দর্পবাণ নিকরৈর্ব্যথিতং হি চেতঃ" হয় সেই বসন্ত ঋতুতে সমাপ্তি করিলেই "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করা করা হয়। এই "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করার জন্য অনেক কবি অনেক কল্পনারও অবতারণা করিয়া থাকেন। এস্থলে বর্ষ বর্ণন কবির উদ্দেশ্য নহে, ঋতু বর্ণনই উদ্দেশ্য। অতএব গ্রীষ্ম হইতে বর্ষারম্ভ করিয়াছেন একথাও বলা যায় না। মহাকবি যদি বাঙ্গালী

হইতেন তবে বঙ্গদেশের ঋতুরই বর্ণনা করিতেন কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। বাঙ্গালার গ্রীষ্মকাল দিনান্তরম্য হইলেও "ফণী ময়ূরস্য তলে নিষীদতি বিশুষ্ককণ্ঠাহৃতশীকরাম্ভসো গভস্তিভির্ভানুমতোঽভিতাপিতাঃ। প্রবৃদ্ধতৃষ্ণোপহতা জলার্থিনো ন দন্তিনঃ কেশরিণোঽপি বিভ্যতি॥ বিবস্বতা তীব্রতরাংশুমালিনা সপঙ্কতোয়াৎ সরসোঽভিতাপিতঃ। উৎপ্লুত্য ভেকস্তৃষিতস্য ভোগিনঃ ফণাতপত্রস্য তলে নিষীদতি"॥ ইত্যাদি শ্লোক বর্ণিত গ্রীষ্ম বাঙ্গালী বঙ্গদেশে থাকিয়া কোনদিন অনুভব করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যায় না। বর্ষা বর্ণনে "বনানি বৈন্ধ্যানি হরন্তি মানস" "সমুপজনিততাপং হ্লাদয়ন্তীব বিন্ধ্যম্" (ঋতুসংহার) ইত্যাদি বর্ণনা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে মহাকবি বিন্ধ্যপর্ব্বতেরই ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন। তবেই দেখা যাইতেছে ঋতুসংহার গ্রন্থদ্বারা মহাকবিকে কিছুতেই বাঙ্গালী বলা যায় না।

অভিজ্ঞান শকুন্তলে গ্রীষ্ম হইতে বর্ষারম্ভ হয় নাই বর্ণনারম্ভ হইয়াছে। সেই গ্রীষ্মকালের দিনান্তরম্যত্ব দেখিয়া বঙ্গদেশের গ্রীষ্মকাল মনে করা যায় না। কারণ প্রথমেই "অচিরপ্রবৃত্তমুপভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়মধিকৃত্য" যখন বর্ণনারম্ভ হইয়াছে তখন দিনান্তরম্যত্ব হিন্দুস্থানেও অসম্ভব নহে। অবগাহনপ্রথা কেবল বাঙ্গালায় নহে ভারতের সর্ব্বত্রই আছে। বঙ্গদেশে পুষ্করিণী বেশী আছে বটে কিন্তু হিন্দুস্থানেও "তালাও" (পুকুর) আছে এবং অবগাহনের জন্য গঙ্গা, যমুনা, সরযূ প্রভৃতি নদীও আছে। হিন্দুস্থানে গ্রীষ্মকালে "লু" চলে একথা ঠিক কিন্তু সে গ্রীষ্মের প্রথমেই নহে। আর সেই অভিজ্ঞান শকুন্তলেই "আতপলঙ্ঘনাদ্বলবদস্বস্থশরীরা শকুন্তলা" ইত্যাদি কবিবর স্বয়ং হিন্দুস্থানের "লু"এর বর্ণনা করিয়াছেন। পাটলা বা পারুলপুষ্প কেবল বাঙ্গলার সম্পত্তি নহে। এই পাটলা আয়ুর্ব্বেদোক্ত দশমূলের অন্তর্গত। ইহা সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। চরক সুশ্রুতে যে সকল ঔষধে পাটলার উল্লেখ আছে হিন্দুস্থানীদিগের ঐ সকল ঔষধ প্রস্তুত করিতে বাঙ্গলার মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। আর মহাকবির সময়ে রেল লাইন বসে নাই; কাজেই পঞ্চনদের লোক বাঙ্গালা হইতে "পাটলা" নিয়া দশমূল ব্যবহার করিতে সমর্থ হইত না। তবে শকুন্তলায় গ্রীষ্মর্ত্তুর বর্ণনার কারণ এই মনে হয় যে—বিশ্বামিত্রমুনি "বসন্তাবতাররমণীয়ে কালে" মেনকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন; বিশ্বামিত্র সংযতচিত্তমুনি, তাহাকে মুগ্ধ করিতে বসন্তাবতার

রমণীয়কাল স্বর্গীয় অপ্সরা মেনকা এমন কি বস্ত্রাপিহারক পবনদেবেরও সাহায্য আবশ্যক হইয়াছিল; কিন্তু সেই মেনকাকন্যা শকুন্তলা একজন ভোগবিলাসাসক্ত রাজাকে মুগ্ধ করিবে তজ্জন্য অন্যসহকারিকারণের আবশ্যকতা কি? কেবলমাত্র তাহার অলৌকিক রূপই অন্য নিরপেক্ষভাবে এমন কি "উপশান্তমন্মথ" কালেও রাজার মন্মথকে উদ্দীপিত করিতে পারিয়াছিল। অন্য সহকারিকারণ কলাপ থাকিলে রূপের উৎকর্ষ প্রতীত হইত না। এজন্য উপশান্ত মন্মথে কালে শমপ্রধানে তপোবনে কবিবর নায়ক নায়িকার দেখা করাইয়াছেন। এমন কি বনে এমন সুন্দর সুন্দর পুষ্প থাকিতেও শকুন্তলাকে মাত্র বল্কল পরিধান করাইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত করাইলেন। কবিবর সাজসজ্জা দ্বারা অথবা উদ্দীপক দেশকাল দ্বারা রাজার মনমুগ্ধ করিতে চেষ্টা করেন নাই। নিরাভরণা শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা একবার আক্ষেপ করিয়াছেন আবার বলিয়াছেন "কামমনহুরূপমস্যাবপুষো বল্কলং ন পুনরলঙ্কারশ্রিয়ং ন পুষ্যতি" কুতঃ—

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপিরম্যং মলিনমপিহিমাংশোর্লক্ষ্মলক্ষ্মীংতনোতি। ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপিতন্বী কিমিবহিমধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্" ॥ ইতি—দেশকাল অলঙ্কার প্রভৃতি উদ্দীপক হইলে রূপের এত উৎকর্ষ প্রতীত হইত না। অতএব দেখা যাইতেছে অভিজ্ঞান শকুন্তলেও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না যদ্দ্বারা মহাকবিকে বাঙ্গালী বলা যায় বরং আতপলঙ্ঘনাদি প্রতিকূল কারণই পাওয়া গেল।

কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সর্ব্বপ্রধান কারণটী অর্থাৎ "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" এই তারিখ নির্ণয় দেখিয়াই যে বাঙ্গালী স্থির করিয়াছেন সে সম্বন্ধে বিচার করিলে দেখা যায় তিনি পূর্ব্বাপর সমালোচনা না করিয়াই এইটিকে সর্ব্বপ্রধান কারণ বলিয়াছেন। আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে এস্থলে চান্দ্রমাস হিসাবে ব্যাখা করিয়াও মহামতি মল্লিনাথ দেখাইয়াছেন যে "শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ মাসানন্যান্ গময়চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা" এস্থলে চারিমাসের দশদিন বেশী হয়। মহাকবি সৌরমাস গণনা করিলে শাপান্তের স্থলেও সৌরমাসের উল্লেখ করিতেন। শাপান্তের স্থলে স্পষ্টই চান্দ্রমাসের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম দিবসস্থলে চান্দ্রমাস ধরিলেও দশদিন বেশী হয়। সৌরমাস ধরিলে একটা কিছু স্থিরতাই থাকে না। কোন বৎসর পাঁচমাসেরও বেশী হয়। পক্ষান্তরে সৌরমাস হিসাবে প্রক্রম করিয়া

চান্দ্রমাস হিসাবে উপসংহার করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত হয় না; এজন্য পাবনার দর্শন টোলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় ঐস্থানের ব্যাখায় বলিয়াছেন "আষাঢ়স্য অদিবসে বিষ্ণুদিবসে হরিবাসরে একাদশ্যাম্ ইত্যর্থঃ প্রথমং মেঘং দদর্শ" এইরূপ ব্যাখা করিলে আষাঢ়ের একাদশী হইতে উত্থান একাদশীর মধ্যে ঠিক চারিমাস সময় হয় এবং পাঁচদিন পরেই হিন্দি শ্রাবণ বদি আরম্ভ হওয়ায় "প্রত্যাসন্নে নভসি" ইত্যাদি বর্ণনা সুসঙ্গত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সৌরমাস গণনা বাঙ্গালা পঞ্জিকার ব্যবহার ইত্যাদি কিছুরই প্রমাণ হয় না বরং উপরি প্রদর্শিত কারণাবলী দ্বারা তাঁহার সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ এবং আনুসঙ্গিক প্রমাণগুলি খণ্ডিত হইল।

মহাকবি কালিদাসের শরদ্বর্ণনা এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্রের "বঙ্গেশরৎ" শীর্ষক প্রবন্ধ একভাবের দ্যোতক হইলেও তদ্দ্বারা মহাকবিকে বাঙ্গালী বলা যায় না। কারণ তিনি বর্ষাবর্ণনায় যখন স্পষ্টই বিন্ধ্যপর্ব্বতের বর্ণনা করিয়াছেন তখন শরদ্বর্ণনা বঙ্গের শরৎ বর্ণনা নহে ইহা সুধীমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

কাব্যতীর্থ মহাশয় একটি প্রচলিত গল্প হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন মহাকবির জন্মভূমির অক্ষাংশ ২৩।২৭। এইরূপ সিদ্ধান্ত কাব্যতীর্থ মহাশয়ের অতিরিক্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যার পরিচায়ক। কারণ "আষাঢ়স্যান্ত্যদিবসে মধ্যাহ্ন সময়ে তালবৃক্ষস্য মস্তকে বহুতরধনানি স্থাপিতানি" এই বাক্য হইতে সেইস্থানে বহু তালবৃক্ষ ছিল একথা বুঝাইলেও বাঙ্গালা পঞ্জিকার ব্যবহার অথবা অক্ষাংশ নির্ণয় প্রমাণিত হয় না। বহু ধন প্রোথিত আছে একথা দ্বারা অক্ষাংশ নির্ণয় হয় না। কারণ আষাঢ় মাসের অন্তদিবস সৌরচান্দ্র উভয় মতেই সম্ভবপর আর সেই দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে তালবৃক্ষের মস্তকের ছায়া যেরূপ স্থলে পতিত হয় সেই স্থলে তিনি বাঙ্গালায় তালগাছ দেখিয়াই এত দুরূহ তত্ত্বের নির্ণয় করিতে চাহেন হিন্দুস্থানেও তালগাছের একান্ত অভাব নাই। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এতদপেক্ষা অধিকও থাকিতে পারে। তবেই তাঁহার প্রমাণগুলি তিনি অখণ্ডনীয় মনে করিলেও বাস্তবিক সেইগুলির কোন সারবত্তা নাই।

"তাঁহার গ্রন্থের নায়ক রঘু গাঙ্গরাষ্ট্রনিবাসী একজন রাজা ছিলেন"—এই কথাটী কাব্যতীর্থ মহাশয়ের কাব্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার পরিচায়ক বটে, রঘুবংশ মহাকাব্যের নায়ক একমাত্র রঘু নহেন। কবি প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করিলেন "রঘূণামন্বয়ংবক্ষ্যে"

দিলীপ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় রাজগণ এই মহাকাব্যের নায়ক। "একবংশভবাভূপাঃ কুলজা বহবোঽপিবা" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আলঙ্কারিক-গণও একথা সমর্থন করিয়াছেন তথাপি তিনি কেবল রঘুকে নায়ক বলিয়া এবং তাঁহাকেই গাঙ্গরাষ্ট্রনিবাসী গুপ্তবংশীয় অপ্রখ্যাত নগরের রাজা কল্পনা করিয়া উদ্দাম কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে রঘুর পুত্র অজ তৎপুত্র দশরথ তৎপুত্র রাম এই সকল ও কি কাব্যতীর্থ মহাশয়ের মতে কাল্পনিক নাম? ইহারাও কি গুপ্তবংশীয় অপ্রখ্যাত নগরের রাজা অথবা রঘুবংশের নায়কদিগের মধ্যে একা রঘুই গাঙ্গরাষ্ট্রনিবাসী গুপ্তবংশীয় রাজা ছিলেন? এই রূপ উৎকট কল্পনাকে আকাশকুসুম ভিন্ন কি মনে করা যায়? একখানি মহা-কাব্যের একজন মাত্র নায়ক হইলেও তাহাতে দেশ, প্রভাত, সন্ধ্যা, বর্ষা, বসন্ত প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণনা সম্ভব হয় কিন্তু অনেকগুলি নায়ক হইলে নায়কদিগের মোটামুটি চরিত্র বর্ণনাতে গ্রন্থের কলেবর এত পুষ্ট হয় যে কেবল কবিত্ব ব্যঞ্জক দেশাদির বর্ণনার স্থান হয় না। বিশেষতঃ অযোধ্যার মত প্রখ্যাতনামানগরীর বিশেষ বর্ণনা না করিলেও সূর্য্যবংশীয় রাজার নাম করিলেই সকলে অযোধ্যার রাজা বলিয়া জানিতে পারিতেন এই জন্য অযোধ্যার বর্ণনা মহাকবি বিশেষ আবশ্যক বোধ করেন নাই। অপ্রখ্যাতনামা নগরী হইলেই বরং তাহার পরিচয়ের জন্য বিশেষ বর্ণনা আবশ্যক হইত।

"স গুপ্তমূলপ্রত্যন্তঃ শুদ্ধপার্ষ্ণিরয়ান্বিতঃ। ষড়্‌বিধংবলমাদায়প্রতস্থেদিগ্‌-জিগীষয়া॥" এই শ্লোকটীর যেরূপ অভিনব ব্যাখ্যা কাব্যতীর্থ মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা সাধারণের বোধগম্য হয় না। "গুপ্তমূলপ্রত্যন্তঃ" একই শব্দ "গুপ্তমূলঃ" এবং "প্রত্যন্তঃ" ভিন্ন শব্দ নহে। যাহা হউক তিনি যখন ভিন্ন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তখন দেখা যাউক সে ব্যাখ্যাও বোধগম্য হয় কি না? তিনি লিখিলেন "গুপ্তমূলঃ—অজ্ঞাতনামদেশোদ্ভবঃ সঙ্গঘুঃ প্রত্যন্তঃ—প্রত্যন্তদেশবাসী এইরূপ প্রতি শব্দ দিয়া অনুবাদ করিলেন "গুপ্তবংশের রঘু তাহার ম্লেচ্ছ দেশীয় রাজধানী হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইলেন," প্রতি শব্দের সঙ্গে অনুবাদের কোনও সাদৃশ্য নাই। প্রত্যন্ত এইটী রঘুর বিশেষণ হইলে ম্লেচ্ছ দেশীয় রাজধানীর সৈন্য কি করিয়া বুঝা যায় এবং অজ্ঞাতনামাদেশোদ্ভব বলিলে গুপ্তবংশের রঘু এইরূপ অর্থ কোথা হইতে আসে তাহা কাব্যতীর্থ মহাশয় সাধারণকে

ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই অভিনব ব্যাখ্যার সারবত্তা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। মগধ, অঙ্গ, বিদর্ভ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জনপদগুলির বিজয় বর্ণনা না করিয়া সুহ্ম ও বঙ্গদেশের বিজয় বর্ণনা করিয়াছেন, দেখিয়া কাব্যতীর্থ মহাশয় যে মহাভ্রমে পতিত হইয়া একটী অলীক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন একটু অভিনিবেশ সহকারে মহাকবির লেখাগুলি দেখিলেই সেই ভ্রম দূর হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে একখানি মহাকাব্যের অনেকগুলি নায়ক থাকিলে সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভবপর হয় না তাই তিনি অতি সংক্ষেপে অথচ অতি সুন্দর ভাবে সমস্ত জনপদের বিজয় বর্ণনা করিয়াছেন। অজ স্বয়ম্বরে যে সকল রাজা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সকলের রাজ্যই রঘু অধিকার করিয়াছিলেন তাহা মহাকবি নিজেই বলিতেছেন—"প্রমন্তবঃ প্রাগপি কোশলেন্দ্রে প্রত্যেক মাত্তস্বতয়া বভূবুঃ। অতোনৃপাশ্চক্ষমিরে সমেতাঃ স্ত্রীরত্নলাভং ন তদাত্মজস্য॥" রঘু ৭।৩৪ এই একটী শ্লোকেই সমস্ত প্রসিদ্ধ জনপদ বিজয়ের কথা পাওয়া যায়। দিগ্‌বিজয়েও লিখিয়াছেন "পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তান্‌তান্‌ জনপদান্‌ জয়ী"। এখানেও শুধু তান্‌ তান্‌ এই একটী তদ্‌ শব্দের বীপ্সা দ্বারা সকল প্রসিদ্ধ জনপদের উল্লেখ হইয়াছে কারণ এই স্থলে প্রক্রান্ত অথবা অনুভূতার্থ গ্রহণের সম্ভব না থাকায় তদ্‌ শব্দের প্রসিদ্ধার্থ গ্রহণ করিতে হইবে; যথা—তান্‌ তান্‌ প্রসিদ্ধান্‌ জনপদান্‌ আক্রমন্‌ জয়ী তালীবন শ্যাম মহোদধির উপকণ্ঠে উপনীত হইলেন। এইরূপে সমস্ত প্রসিদ্ধ জনপদবিজয় বর্ণনা করিয়া পৃথক ভাবে অপ্রসিদ্ধ জনপদগুলিরও বিজয় বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল কথা বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে কাব্যতীর্থ মহাশয় ভ্রমে পড়িয়া অলীক সিদ্ধান্ত করিতে অগ্রসর হইতেন না। রামায়ণে রঘুর দিগ্‌বিজয় না থাকিয়া রঘুবংশে থাকিতে পারে কারণ রামায়ণের নায়ক রাম, তাঁহার ঘটনাবলীই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। রঘুর বিষয়ে সেরূপ ভাবে আলোচনা হয় নাই; হওয়াও অপ্রাসঙ্গিক। রঘুবংশে রঘুর দিগ্‌বিজয় বাদ দিলে চলিবে কেন?

৺কাশীরাম দাস কথকের কথা শুনিয়া মহাভারত লিখিয়াছেন এই প্রবাদ সত্য হইলেও মহাকবি কথকের কথা শুনিয়া মহাকবি হইয়াছেন এইরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে, মহাকবির কি স্বাভাবিক প্রতিভা কল্পনাশক্তি কিছুই ছিল না? অথবা তিনি কি রামায়ণ মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থ দেখেন নাই?

"ধাবকসৌমিল্লককবিরত্নাকরাদীনাং প্রবন্ধান্" দেখিয়াছেন তাহা নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি তিনি কথকের কথা শুনিয়া বড় হইয়াছেন এ অদ্ভূত কল্পনা। তিনি এমন কথক শিরোমণি কে ছিলেন যাঁহার কথা শুনিয়া মহাকবি মহাকবি হইলেন? দিলীপের পিতার নাম কাকুস্থ একথা বাল্মিকী বেদব্যাস বা কালিদাস কেহই জানেন না। তবে সূর্য্যবংশীয় এক রাজা বৃষরূপা ইন্দ্রের ককুদোপরি বসিয়া যুদ্ধ করিয়া ককুৎস্থ নাম পাইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার বংশধরদিগকে গৌরবসূচক কাকুৎস্থ নামে অভিহিত করা হয়, ইহা আদি কবি বাল্মিকীও করিয়াছেন। কাব্যতীর্থ মহাশয় বাল্মিকীয় রামায়ণ দেখিলে বহুস্থলে তাহা দেখিতে পাইতেন। দুই একটী দেখান যাইতেছে। "তস্মাৎ পশ্যতু কাকুৎস্থ! ত্বাং নিষাধপতির্গুহঃ। রা।আ।৮৪।১৩। "তং নিবর্ত্তয়িতুং যামি কাকুৎস্থং বনবাসিনং। ঐ। ৮৫।১০। "অভিষেক্ষ্যন্তিকাকুৎস্থমযোধ্যায়াং দ্বিজাতয়ঃ। ঐ।৮৮।২৯। বাস্তবিক কাব্যতীর্থ মহাশয় বাল্মিক রামায়ণ দেখিয়াও যদি নিজ প্রবন্ধের গৌরব বৃদ্ধির জন্য সত্যের অপলাপ করিয়া থাকেন তবে নিতান্তই ভুল বুঝিয়াছেন। কারণ এই সকল অলীক প্রমাণ দ্বারা প্রবন্ধের হীনতাই প্রকাশ পায়।

কাব্যতীর্থ মহাশয় নিজে জ্যোতিষী তাই জ্যোতির্ব্বিদ্যাবলে স্থির করিলেন "রামের জন্ম সময়ে পঞ্চগ্রহতুঙ্গী যখন আদি কবি বাল্মিকী স্বীকার করিয়াছেন তখন তাঁহার এক শত হইতে দেড় শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী রঘুর জন্ম কালীন পঞ্চগ্রহতুঙ্গী হইতে পারে না। অতএব রঘু রামের পূর্ব্ব পুরুষ নহে। একজন কল্পিত ব্যক্তি মাত্র।" রাম হইতে রঘু মাত্র ১০০-১৫০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী এ কথা কি কেবল কলিকালের বাঙ্গালিদিগের আয়ুর পরিমাণ হিসাবে ফলিত জ্যোতিষ গণনা দ্বারা তিনি স্থির করিয়াছেন কি কোন শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক বলে স্থির করিয়াছেন? রঘু, অজ, দশরথ ইহারা ত্রেতাযুগের লোক ছিলেন। তখন লোকের পরমায়ু ছিল দশ সহস্র বৎসর। বিংশোত্তর শত বর্ষ মাত্র পরমায়ু ছিল না। কবি নিজেও লিখিয়াছেন "পৃথিবীং শাসতস্তস্য পাকশাসনতেজসঃ। কিঞ্চিদূনমনূনর্দ্ধেঃ শরদা—ময়ুতং যযৌ॥" রঘু।১০।১। কিঞ্চিদূন দশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিলেন এতাবৎ কাল মধ্যেও পুত্র জন্মিল না। পরে ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মুনিগণ যজ্ঞ করিলে পুত্র জন্মিল। শাস্ত্রকথিত ত্রেতাযুগের দশ সহস্র বর্ষ পরমায়ু এবং মহাকবির লেখা যদি অসম্ভব গুলিখোরী গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় তবে যাহা ইচ্ছা বলা

যাইতে পারে কিন্তু এই সঙ্কলের সত্যতা স্বীকার করিলে রঘু এবং রাম উভয়ের জন্ম কালীন পঞ্চগ্রহতুঙ্গী হইতে কোন বিরোধ হয় না। আদি কবি বাল্মিকী রঘুর জন্ম কালীন পঞ্চগ্রহতুঙ্গী ছিল একথা কেন লিখেন নাই তাহার উত্তর পূর্ব্বেই একরূপ দেওয়া হইয়াছে যে রামায়ণে রঘুর বিশদ বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক।

চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য প্রয়াণ পথ জনপ্রবাদে জানিয়া কালিদাস রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনার পথ নির্ণয় করিয়াছেন এইরূপ কল্পনা না করিয়া কালিদাসের বর্ণনাকে মূল করিয়া চাঁদ সদাগরের প্রয়াণ পথ প্রবাদ এবং শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার পথপ্রবাদ পরে উদ্ভূত হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ন্যায় সঙ্গত মনে হয়। মঙ্গল কোট থানার অন্তর্গত "উজানীকে" কালিদাস বর্ণিত উজ্জয়িনী মনে করিয়া প্রবন্ধে লিখিয়াও পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বিগত কার্ত্তিক মাসের অধিবেশনে তিনি নিজেই যখন তাহা অস্বীকার করিয়াছেন তখন সে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য নাই।

সূর্য্যবংশীয় রাজা ভগীরথ কপিলশাপদগ্ধসগরসন্ততিদিগের উদ্ধারের জন্য তপস্যা করিয়া ভগবতী গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। এবং তাহার নামানুসারে গঙ্গার নাম ভাগীরথী হয়। এই কথা ভারতবাসী সকলেই জানেন অথচ কাব্যতীর্থ মহাশয় খেয়ালের বশে লিখিলেন "গঙ্গার এক স্থানের নাম ভাগীরথী ইহা বাঙ্গালী ভিন্ন কেহ জানে না।" গঙ্গার নাম ভাগীরথী কেন হইল তাহা বোধ হয় তিনি নিজেও জানেন। এমন কি মহাকবিও "সসেনাং মহতীংকর্ষন্ পূর্ব্বসাগরগামিনীম্। বভৌহরজটাভ্রষ্টাংগঙ্গামিব ভগীরথঃ॥" এই একটী শ্লোক দ্বারা ভগীরথ যে গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা জানাইয়াছেন। কাব্যতীর্থ মহাশয় ঝোকের বশে শ্লোকটীর পাঠ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন "বভৌহরজটাভ্রষ্টাগঙ্গামিব ভাগীরথী।" এই শ্লোকার্দ্ধ তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন এবং ইহার অর্থ কি তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবেন। আদি কবি বাল্মিকী গঙ্গাস্তোত্রে লিখিলেন "ভগবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে" শঙ্করাচার্য্য লিখিলেন "ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতঃ" কাব্যতীর্থ মহাশয়ের মতে ইহারাও ভাগীরথী শব্দের প্রয়োগ করিয়া বাঙ্গালী হইয়াছেন কি?

বসন্ত বর্ণনে মলয়ানিল বর্ণনার কবি সময় প্রসিদ্ধি আছে। বসন্ত বর্ণনা করিতে হইলে মলয়ানিল অর্থাৎ দক্ষিণানিল সকল দেশীয় কবিরই বর্ণনা করিতে হয়। "শালিগোপ্যোজগুর্যশঃ" এখানে কাব্যতীর্থ মহাশয় চাষা গয়লা কোথায় পাইলেন

বুঝিতে পারা যায় না। শালিগোপী শব্দের অর্থ গবাদি উপদ্রব হইতে ক্ষেত্রস্থ ধান্যরক্ষয়িত্রী। হিন্দুস্থানে সমস্ত চাষা জাতীয় স্ত্রীলোকই ক্ষেত্রপার্শ্বে বসিবার স্থান নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষেত্রস্থ শস্য রক্ষা করে বরং বাঙ্গলা দেশেরই স্ত্রীলোকগণ প্রায়শঃ ক্ষেত্রে যায় না। ঘোষ বৃদ্ধ শব্দ গয়লাবুড়ো শব্দের অনুবাদ কি গয়লা বুড়ো শব্দ ঘোষ বৃদ্ধ শব্দের অনুবাদ তাহার বিনিগমনা কি? ঘোষ শব্দ বাঙ্গালাও নহে হিন্দিও নহে, সংস্কৃত শব্দ। এখানে দেখিতে হইবে বৃদ্ধাশ্চ তে ঘোষাশ্চেতি সমাসে বৃদ্ধঘোষাঃ হইতে পারে এবং ঘোষেষু বৃদ্ধাঃ ঘোষ বৃদ্ধাঃ হইতে পারে তথাপি বস্তু বৃক্ষের নাম বৃদ্ধেরাই ভালরূপ জানে কেবল ঘোষ জাতি হইলেই বস্তু বৃক্ষের পরিচয় থাকার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য প্রচ্ছ ধাতুর কর্ম্ম বৃদ্ধশব্দকেই রাখিতে হইবে। বৃদ্ধ ঘোষান্ লিখিলে সেই বৃদ্ধ শব্দ বিশেষণরূপে অপ্রধান হইয়া পড়িত এবং আলঙ্কারিক মতে বিধেয়া বিমর্শ দোষে পরিণত হইত; এই জন্য যে কোন দেশীয় কবিকে এই স্থলে ঘোষ বৃদ্ধান্ লিখিতেই হইবে। অযোধ্যা প্রভৃতি দেশে শালিধান্যের চাষা নাই এইটী কল্পিত উক্তি। এখনও ঐ সমস্ত দেশে প্রচুর শালিধান্য জন্মিয়া থাকে। মহাকবির সময় আরও অধিক জন্মিত কারণ সর্ব্বত্রই দেখা যায় প্রকৃতির নিয়মে সকল দেশের জমিই ক্রমশঃ উচ্চ ভূমিতে পরিণত হইতেছে। শত বৎসর পূর্ব্বে যে সমস্ত স্থান জলমগ্ন হইত এখন ঐ সকল স্থান সেইরূপ জলমগ্ন হয় না। এখন বঙ্গদেশ যতটা উচ্চ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে মহাকবির সময়ে এইরূপ থাকিলে বাঙ্গালীরা কেবলমাত্র নৌসাধন লইয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না। এই নিয়মানুসারে বুঝা যায় হিন্দুস্থান ইহা অপেক্ষা নিম্ন ভূমি ছিল। তখন শালিধান কেন তদপেক্ষা নিম্নভূমি সম্ভূত কলমধান্য ও প্রচুর পরিমাণে জন্মিত; নচেৎ চরক সুশ্রুতাদিগ্রন্থে ঐ সকল ধান্যের নাম ভূয়োভূয়ঃ উল্লিখিত হইত না।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ মুরলীধর শিখিপক্ষশোভিত গোপমূর্ত্তি বাঙ্গালীর নিজস্ব বলিয়া [illegible]তীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন এতাবতা বোধ হয় এই মূর্ত্তির কথা উপনিষদ পুরাণাদিতে নাই কেবল বাঙ্গালীর কল্পনা মাত্র। উপনিষদ পুরাণাদিতে যাহা নাই শুধু বাঙ্গালীর কল্পনা প্রসূত, ভগবানের এমন একটী রূপ ভারতবাসী সকলে মানিয়া লইল কেন? অবশ্য যদি কোন সাধক মহাপুরুষ অলৌকিক যোগজ প্রত্যক্ষ দ্বারা [illegible] নূতন মূর্ত্তি দেখিয়া লোকানুগ্রহার্থ সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন তবে

সকলে তাহা গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু ভগবানের এই গোপবেশের আবিষ্কর্ত্তা অথচ মহাকবির পূর্ব্ববর্ত্তী এমন কোনও সাধক মহাপুরুষ বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই। চৈতন্যদেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতি তাঁহার অল্পকাল পূর্ব্বেই জন্মিয়াছিলেন। ইহাদের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারক কোন সাধক মহাত্মার নাম শুনা যায় না। কালিদাসের সাহিত্য পরিবর্ত্তিত হইয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে পরিণত হইয়া থাকিলেও মহাকবিকে বাঙ্গালী বলা যায় না। কারণ যে অনুকরণ করে সে পরের লেখা উপাদেয় সাহিত্যের ও অনুকরণ করিয়া থাকে। নিজের ঘরের লেখা হইলেও অনুপাদেয় সাহিত্যের অনুকরণ করে না। মহাকবির অভিনয় পটুতা থাকিলে তিনি সূত্রধারের ভূমিকা কেন দুষ্মন্তের ভূমিকাও অভিনয় করিতে পারেন। ইহা কেবল বর্ত্তমান প্রথা নহে। নাট্যাচার্য্য ভরত মুনিও নিজে অভিনয় করিয়াছেন। তালীবন জয় না করা একটী কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাকবির জন্মভূমি স্থির করিলেন তালীবন শ্যাম রাঢ়দেশ, আর রঘু তালীবন শ্যাম সমুদ্রের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। এই উভয় এক স্থান নহে। বিশেষতঃ সমুদ্রের উপকণ্ঠে কোন রাজা না থাকায় তাহার বিজয় বর্ণন অসম্ভব। রঘু যদি কাব্যতীর্থ মহাশয়ের কল্পিত মহাকবি কালিদাসের প্রভু গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই হন তবে মহাকবির জন্মভূমিও তাহারই অধীন ছিল, সেই স্থান পুনরায় জয় করা কিরূপে সম্ভব হয়? রাঢ়দেশ এবং সমুদ্রের উপকণ্ঠ একই স্থান নহে তবে তালীবনশ্যাম মাত্র এই বিশেষণ দেখিয়া কাব্যতীর্থ মহাশয় মহাকবির বাসস্থান মনে করিলেও মহাকবি কিন্তু কাব্যতীর্থ মহাশয়ের মতেও সমুদ্রের উপকণ্ঠকে নিজের জন্মভূমি মনে করিতে পারেন না।

নায়ক নায়িকার আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক—গাঙ্গ্যরাষ্ট্রের মেয়েদের মত সাড়ীপরা উমারতি অথবা শকুন্তলাকে কাব্যতীর্থ মহাশয় বাঙ্গালার রঙ্গালয়ে দেখিতে পারেন। মহাকবির লেখায় কোথায়ও সেইরূপ পাওয়া যায় না। তিনি গিরিরাজনন্দিনী উমাকে একবার সর্ব্বদেশ সাধারণ তরুণার্করাগবসন পরিধান করাইলেও আবার কিছুকাল পরেই বল্কল পরিধান করাইয়া মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত করাইয়াছেন। রাজ নন্দিনী উমা তপস্যার অনুরোধে বল্কল পরিধান করিলেও বল্কল পরিধানে পটুতালাভ করিতে না পারায় হঠাৎ উঠিতে যাইয়া স্তনভিন্নবল্কলা হইতে পারেন। স্মৃতি

হিন্দুস্থানীয় রমণীদিগের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিলেও পতিশোকে বারম্বার ভূমিতে লুণ্ঠন করায় উত্তরীয় বস্ত্রের অসংস্থিতিনিবন্ধন বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী হইতে পারেন এই সকল বিশেষণ দ্বারা বাঙ্গালী বলা যায় না। শকুন্তলাও যতদিন কণ্বাশ্রমে ছিলেন ততদিন বল্কলই পরিধান করিতেন রাজাও বল্কল পরিহিতা শকুন্তলাকেই দেখিয়াছিলেন, শকুন্তলা নিজেই বলিতেছেন "অনসূএ! অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅংবদাএ নিয়ন্তিদম্হি। সিঢিলেহি দাবণং।" রাজা বলিতেছেন, "ইয়মুপহিত সূক্ষ্মগ্রন্থিনাস্কন্ধদেশে স্তনযুগপরিণাহাচ্ছাদিনাবল্কলেন ইত্যাদি"। অতএব দেখা যাইতেছে শকুন্তলা কণ্বাশ্রমে বল্কলবাসিনী ছিলেন। যখন হস্তিনাপুরে চলিলেন তখন একবারেই ক্ষৌমযুগল পরিধান করিলেন। বাঙ্গালী স্ত্রীলোক দিগের মত একখানি সাড়ী পরিধান করিলেন না। অতএব দেখা যাইতেছে শকুন্তলা কণ্বাশ্রমে একখানি সাড়ী পরিধান করিতেন একথা কাব্যতীর্থ মহাশয় স্বমত সমর্থনের জন্যই কল্পনা করিয়াছেন। রতি বসন্তকালে হিমালয়ে গিয়াছেন তখন শীতবস্ত্রের আবশ্যকতা না থাকিতেও পারে। আর সেই স্থলে রতি কবির বর্ণনীয়া নহে, তাহার সাজসজ্জা বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক, উমা তপস্যা করিতে গিয়াছেন তাঁহার দ্বন্দ্বানভিঘাত অর্থাৎ শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাসহসামর্থ্য না জন্মিলে তিনি অপর্ণা হইতে পারিতেন না। মহাকবি কাব্যতীর্থ মহাশয়ের মত একান্ত শীতভীত বাঙ্গালী হইলে তপস্যাকালেও উমাকে বাঙ্গালী মেয়েদের মত সেমিজ, জ্যাকেট, ফ্লানেলের বডি ইত্যাদি পরিধান করাইতেন। কিন্তু মহাকবি উমার মত তপস্বিনীর পক্ষে সেই সকলের আবশ্যকতা বোধ করেন নাই।

আলতাপরা এখন বাঙ্গালায় বহুপ্রচারিত হইলেও অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাঙ্গালা ভিন্ন অন্যান্য প্রাচীন দেশেও ইহার প্রচলন ছিল। কাব্যনাটকাদি লিখিতে যাইয়া সকল কবিই নায়িকাকে অলক্তক রাগ রঞ্জিত চরণা করিয়াছেন। কেবল হিন্দুস্থানীরা মেহেদী পত্রদ্বারা পদাদি রঞ্জিত করে না। বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ ছোটলোক মুসলমানও মূল্যবান অলক্তক ব্যবহার না করিয়া অনায়াসলভ্য মেহেদী পত্রদ্বারা পদাদি রঞ্জিত করিয়া থাকে। হিন্দু স্থানের ধনী লোকেরা অলক্তকই ব্যবহার করিয়া থাকেন। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের কথা স্বীকার করিলেও দেখা যায় অঙ্গরঞ্জন প্রথা সর্ব্বত্রই আছে। তাহার নানাবিধ উপকরণ থাকিলেও যেটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর কবিরা তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। অর্থাভাব বশতঃ

মূল্যবান্ দ্রব্য দ্বারা নিজের গৃহ সজ্জিত করিতে না পারিলেও পরের গৃহ বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহারা দ্রব্যের মূল্য বিবেচনা করেন না। যে স্থানে যাহা বসাইলে সুন্দর দেখা যায় তাহারই বর্ণনা করিয়া থাকেন। মাঘ লিখিয়াছেন, "চরণতল সরোজাক্রান্তিসংক্রান্তয়াসৌ, বপুষিনখবিলেখো লাক্ষয়ারক্তিতস্তে ১১।৩২ দ্রুতযাবকৈকপদ চিত্রিতাবনিং পদবীংগতেবগিরিজাহরাদ্ধতাম্ ১৩।৩৩ (যাবকঃ অলক্তকঃ) বাণভট্ট লিখিয়াছেন, "সঞ্চরতঃস্ত্রীজনস্যরাগসাগরায়মানংচরণালক্তকরসবিসরৈঃ" অতএব দেখা যাইতেছে সকল দেশের কবিই অলক্তক বর্ণনা করিয়াছেন। মহাকবির জন্মস্থান যে দেশেই হউক তিনি ভারতবর্ষের সকল স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। নচেৎ লঙ্কা হইতে অযোধ্যা, রামগিরি হইতে অলকা, বিন্ধ্য, হিমালয় প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের বর্ণণা অসম্ভব হইত। ভারতবর্ষের সকল স্থান ভ্রমণ করিয়া যেখানে যাহা সুন্দর, বর্ণণাযোগ্য দেখিয়াছেন তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব তিনি ভিন্ন দেশীয় হইলেও বাঙ্গালাদেশে কুন্তবরের "কান্তাকুচকুম্ভবাহুলতিকাহিল্লোললীলাসুখ" দেখিয়া তদ্দ্বারা একটী সমস্যাপূরণাত্মক শ্লোক লিখিতে পারেন। এতাবতা তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিতে হইলে হিমালয়ের বর্ণনা দেখিয়া হিমালয়বাসী এবং জনস্থানের বর্ণনা দেখিয়া জনস্থানবাসী মুনি ও বলা যায়।

অজ বিবাহ এবং শিব বিবাহ উভয়স্থলেরই বর্ণনা একরূপ, এমন কি একই শ্লোক উভয় স্থলে দেখা যায়। এই দুইটী বর্ণনা দেখিয়া কিছুতেই বাঙ্গালীর বিবাহ কল্পনা করা যায় না; কারণ বঙ্গদেশে প্রবাদ আছে "একবার সাতপাক ঘুরানের বন্ধন সত্তর পাকেও খুলে না।" বঙ্গদেশের বিবাহের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য সাতপাক ঘুরান এই বিবাহে নাই। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালার বিবাহে এমন কি যে কোনও মঙ্গল কার্য্যেই স্ত্রীগণ উলুধ্বনি করিয়া থাকেন এই বিবাহে তাহাও নাই। যাহা সর্ব্বত্র প্রচলিত তাহা আছে। অজ বিবাহে বাসর ঘরের উল্লেখ নাই প্রত্যুত অজকে বধূর সহিত বাঙ্গালীর অনুকরণে রাজমার্গে প্রবেশ করাইতে হইলে ইন্দুমতীর জন্য একখানি পাল্কীর প্রয়োজন হইত। কেবলমাত্র "ধ্বজচ্ছায়নিবারিতোষ্ণ" রাজপথে বিবাহ যোগ্যা রাজকন্যার বাহির হওয়া বাঙ্গালীর রুচি সম্মত নহে। মহাযোগী শিব বিবাহ করিতে গেলেও তাঁহার সেই চিরাভ্যস্ত বিষয় বৈরাগ্যের সত্তালোপ পায় নাই তাহা দেখানের জন্যই মহোক্ষাদি বরের সজ্জোপকরণ এমন কি কৌতুকাগারেও "কিরীটি-

বিরচিতশয্য"ই হইয়াছিল। কবি রাজকুমার অঙ্গকে ক্ষিতিশয্যায় শয়ন করান নাই। মহাযোগী মহেশ্বরকে ক্ষিতিশয্যায় শয়ন করাইয়াছেন। হিমালয়ের অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিলেও বাবা মহেশ্বর যে দিগম্বরভিক্ষুক "নহিস্বাত্মারামংবিষয়মৃগতৃষ্ণা-ভ্রময়তি" তাই তিনি ইন্দ্রাদিকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াও নিজে ভিক্ষুক সাজিয়াছেন। এখন বিবাহ কালে শ্বশুরালয়ে যাইয়া তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সুবর্ণখট্টাদি ব্যবহার করা সঙ্গত বোধ করেন নাই। তাই কবি বলিলেন "ক্ষিতিবিরচিতশয্যং কৌতুকাগারম্" বাঙ্গালী কোন ভিক্ষুক পুত্র ও হিমালয়ের মত রাজার জামাতা সাজিতে পারিলে নিজকে তখন মহারাজাধিরাজ মনে করিয়া বসিতেন এবং সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। বিলাসিযুবক যুবতীরশয্যা সুগন্ধি পুষ্পাদিদ্বারা সজ্জিত করা সৌন্দর্য্যপ্রিয় কবির পক্ষে স্বাভাবিক। মহাকবিও তাহাই করিয়াছেন। ইহা বিবাহের ফুলশয্যা নহে। বিবাহের ফুলশয্যা মাত্র একদিন কিন্তু কবিরা নায়ক নায়িকার শয্যা প্রত্যহই পুষ্পদ্বারা সজ্জিত করেন কারণ জড় জগতের মধ্যে পুষ্পই অধিক কামোদ্দীপক। তাই পুষ্পকে কামদেবের শররূপে কাব্যশাস্ত্রে গ্রহণ করা হইয়াছে। বাঙ্গালী ললনা ভিন্ন অন্য দেশীয়ারা গর্ভাবস্থায় "খোলা" খান না কাব্যতীর্থ মহাশয় কি করিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? তিনি কি সকল দেশের সংবাদ লইয়াছেন? একমাত্র কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন পাহাড়ের মাটীতে পাতলা "খোলা" জন্মে না। অযোধ্যায় পাহাড় কোথায়? ঐ সকল দেশে এখনও চারি পাঁচখানা পাতলা কল্‌কে এক পয়সায় পাওয়া যায়। দুধ, দধি সরবৎ দেওয়ার জন্য গোয়ালারা যে মাটীর পুরুয়া ব্যবহার করে তাহা বোধ হয় তিনি দেখেন নাই তাই এরূপ কল্পনা করিয়াছেন।

পাদাভিবন্দন বাঙ্গালীর নিজস্ব এই কথা কাব্যতীর্থ মহাশয়ের অতিরিক্ত গবেষণার উৎকট পরিণাম; কারণ এখনও বাঙ্গালী বলেন "নমস্কার" হিন্দুস্থানী ছোট লোকেরাও বলে "পায় লাগি" বর্ত্তমান প্রচলিত কথা ছাড়িয়া দিয়া রামায়ণ মহাভারত হইতে কয়েকটা প্রয়োগ উদ্ধৃত করিলাম। সুধীগণ দেখিবেন পাদগ্রহণ কেবল বাঙ্গালীর নিজস্ব কি না? "শত্রুঘ্নশ্চাপিরামস্য ববন্দচরণৌ রুদন।" রামায়ণ। অযোধ্যা। ৯৯।৫০। "অবতীর্য্য রথাৎ পাদৌ ববন্দে রঘুনন্দনঃ"। ঐ ১১৩।৬। শত্রুঘ্নশ্চ-রামাস্যাভিবাদ্যসলক্ষণম্ সীতারাশ্চরণৌবীরো বিনয়াদভ্যবাদয়ৎ। লঙ্কা। ১২৯।৪৮। ...মোমাতরমাসাদ্যাবিবর্ণাং শোককর্ষিতাম্। জগ্রাহ প্রণতঃ পাদৌ মনোমাতুঃ

প্রহর্ষয়ন্॥" ঐ ১২৯।৪৯।১০ ধৌম্যস্যপাদাবভিবাদ্যধীমান্ অজাতশত্রোস্তদনন্তরঞ্চ। বৃকোদরস্যাপিচবন্দ্যপাদৌ মাদ্রীসুতাভ্যামভিবাদিতশ্চ॥ মহা। বন। ১৬৫।৪-৫।

আমার মনে হয় কাব্যতীর্থ মহাশয় কেবল মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থ লইয়া তাহার গবেষণায় ব্যস্ত আছেন তাই রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ দেখার সময় পান নাই। নচেৎ তিনি লিখিলেন ভ্রাতৃবধূর পাদবন্দনা বাঙ্গালী ভিন্ন অন্যের পক্ষে অসম্ভব অথচ আদি কবি বাল্মিকী সূর্য্যবংশীয় কুমার শত্রুঘ্ন দ্বারা সীতার পাদ বন্দনা করাইলেন। রামায়ণ মহাভারতে শত শত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তিনি অসঙ্কোচে লিখিলেন, "কোথায়ও নাই" সকল স্থান ভাল করিয়া না দেখিয়া "কোথায়ও নাই" এইরূপ লেখা পণ্ডিত লোকের উচিত্ নহে।

কাব্যতীর্থ মহাশয় প্রথম প্রবন্ধ অপেক্ষাও দ্বিতীয় প্রবন্ধে অধিক পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "সমুদয় কালিদাসের ভাষারই এরূপ গঠন প্রণালী যে তাহার অনেক স্থলে অনুস্বার বিসর্গ তুলিয়া দিলেই বর্ত্তমান কালের বাঙ্গলা ভাষা হইয়া যায়। এইরূপ কালিদাসের ভাষার সহিত সৌসাদৃশ্য ভারতের অন্য কোন ভাষার নাই।" এ স্থলে তিনি অঘটন ঘটন পটীয়সী উদ্দাম কল্পনাশক্তি দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে মহাকবি যে কালেরই লোক হউন না কেন তিনি বিংশ শতাব্দীর মার্জ্জিত বঙ্গভাষায় কবিতার কল্পনা করিয়া অথবা কল্পনাই বা কেন রচনা করিয়া তাহার উপর অনুস্বার বিসর্গ বসাইয়া তাহাকে সংস্কৃত শ্লোকে পরিণত করিয়াছেন। কি অদ্ভুত কল্পনা? বঙ্গদেশের সৌভাগ্যবলে যদি ঐ কল্পনা নিয়া কোন মহাপুরুষ দুইশত বৎসর পরে এ দেশে আবির্ভূত হন, তিনি অনায়াসে প্রমাণ করিবেন যে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের গীতা ও চণ্ডীর শ্লোক গুলির উপর অনুস্বার বিসর্গ বসাইয়া ব্যাসদেব গীতা ও চণ্ডী রচনা করিয়াছেন অতএব ব্যাসদেব নবীনচন্দ্র সেনের পরবর্ত্তী বঙ্গদেশের লোক। কাব্যতীর্থ মহাশয় মহাকবির শ্লোকের ভাব, ভাষা, ছন্দঃ প্রভৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য রাখিয়া যে অনুবাদ করিয়াছেন কবিবর নবীন চন্দ্রের অনুবাদ তাহা হইতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। সুধীবৃন্দ সকলেই জানেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বঙ্গভাষায় যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে তাহা সংস্কৃতের সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য রাখিয়াই লিখিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় এই জাতীয় বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অন্য কবিরাও তাঁহার পদবীরই অনুসরণ

করিয়াছেন। এমন কি অনেক পুস্তক সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ মাত্র। বর্ত্তমান বঙ্গভাষা কতকগুলি ভাষার সহিত সমষ্টি ভিন্ন কিছুই নহে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত শব্দই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী একারণ সংস্কৃত ভাষাকে সহজেই বঙ্গভাষায় পরিণত করা যায়। সংস্কৃত ভাষার মধ্যে ও বাল্মিকী, বেদব্যাস কালিদাস, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের ভাষায় ক্রমিক সরলতা নিবন্ধন সহজে বঙ্গভাষায় পরিণত করা যায়। হিন্দী প্রভৃতি ভাষার আপেক্ষিক মৌলিকত্ব নিবন্ধন তন্মধ্যে সংস্কৃত শব্দের ন্যূনতাহেতু সংস্কৃত ভাষাকে হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ করিতে একটু বেশী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। কালিদাসের ভাষা অপেক্ষাও শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় বঙ্গভাষার সাদৃশ্য বেশী তাই বলিয়া শঙ্করাচার্য্যকে বাঙ্গালী বলা যায় না। যে ভাষায় কবিতা লিখিতে অথবা বক্তৃতা করিতে হয় কল্পনাও ঠিক সেই ভাষায়ই করিতে হয়। এক ভাষায় রচনা করিয়া অন্য ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া কেহ প্রকৃত কবি বা বক্তা হইতে পারেন না। তবে উভয় ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকিলে এক ভাব নিয়া উভয় ভাষায় কবিতা লেখা বা বক্তৃতা করা চলে, সে স্বতন্ত্র কথা।

মহাকবি সকল নাটকে অথবা এক নাটকের ও সকল স্থলে এক জাতীয় প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করেন নাই, করিতেও পারেন না, সকল কবিকেই অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইবে। অলঙ্কার শাস্ত্রে আছে—"পুরুষাণা মনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাম্। সৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশানাঞ্চ যোষিতাম্।" এই অনুশাসনানুসারে মহাকবি শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, গৌতমী, ধারিণী প্রভৃতির উক্তি সৌরসেনীভাষায় লিখিয়াছেন, কবিবর ভবভূতি ও সীতা কৌশল্যা প্রভৃতি উক্তি শৌরসেনী ভাষায় লিখিয়াছেন। এই শৌরসেনী ভাষা সংস্কৃতের প্রায় অনুরূপ এইজন্য বর্ত্তমান বঙ্গভাষার সঙ্গেও ইহার সাদৃশ্য উপলব্ধ হয়। বঙ্গদেশীয় ছাত্রগণ শৌরসেনী ভাষা শুনিয়াই তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না যখন শৌর সেনীকে সংস্কৃতে পরিণত করা হয় তখন অনায়াসেই বুঝিতে পারে! অনেক নাট্য সমিতি সংস্কৃত নাটক অভিনয় করিতে যাইয়া প্রাকৃত ভাষাকে সংস্কৃতে পরিণত করিয়া অভিনয় করিয়া থাকেন। ইহাতে সাধারণের বুঝিবার সুবিধা হয়। সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালী ও যখন শৌরসেনী ভাষার অর্থ গ্রহণ করিতে সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন সহজেই বুঝা যায় যে বঙ্গভাষার সঙ্গে শৌরসেনী ভাষার সাদৃশ্য

কেবল সংস্কৃতের সাদৃশ্য নিবন্ধনই বলিতে হইবে। নচেৎ শৌরসেনীর অর্থ গ্রহণ করিতে সংস্কৃতের সাহায্য আবশ্যক হইত না। অতএব দেখা যাইতেছে এই সকল ভাষা বিশ্লেষণ দ্বারা লেখকের জাতি নির্ণয় করা যায় না। কালিদাসের 'নাট্যোক্তি বলিয়া যে সকল শব্দ উক্ত হইয়াছে তাহা শুধু কালিদাসের নহে। অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুশাসনানুসারে নাটকে ঐরূপ শব্দ কালিদাসের পূর্ব্বাপর সকল কবিই করিয়াছেন। কাব্যতীর্থ মহাশয় কালিদাসের গ্রন্থাবলীর গবেষণায় দশ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছেন অন্য কবির গ্রন্থ দেখার অবসর পান নাই তাই এ গুলি কেবল কালিদাসের বলিয়া মনে করিয়াছেন। ভবভূতির উত্তর রাম চরিতে মৃতপুত্র ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক "অব্রহ্মণ্য" উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "নির্ব্বিঘ্নং সোমপীতি ভগবান "আবুত্তো" মে ঋশ্যশৃঙ্গঃ!" সীতা অনেকবার "অম্বা" সম্বোধন করিয়াছেন। এইরূপ অনেক স্থলে অনেক প্রয়োগ আছে। অমরসিংহ কালিদাসের নাটক হইতে নাট্যোক্তি সংগ্রহ করিয়াছেন এ সকল অদ্ভুত কল্পনা। অভিধানে প্রাচীন কাল হইতেই এ সকল শব্দ ছিল নচেৎ মহাকবি সংস্কৃত নাটকে এই সকল শব্দের প্রয়োগ করিতেই পারিতেন না। মহাকবি অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন না। অলঙ্কার শাস্ত্রে আছে "রাজা স্বামীতি দেবেতি ভৃত্যৈর্ভট্টেতি চাধমৈঃ॥" তাই তিনি "জয়তি জয়তি দেবঃ" এবং "জেদু জেদু ভট্টা" এইরূপ লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। আবার "সূত্রধারং বদেদ্‌ভাব ইতি বৈ পারিপার্শ্বিকঃ। সূত্রধারো মারিষেতি" এই অনুশাসনানুসারে "ভাব" ও "মারিষ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। শুধু কালিদাস নহে সংস্কৃত নাটক রচয়িতা সকল কবিকেই ঐরূপ লিখিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান কোনও কবি ও সংস্কৃত নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলে এই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন না, করিলে দোষে পরিণত হয়।

মহাকবি "সম্বন্ধী" শব্দের যৌগিকার্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল শ্যালকার্থে রূঢ়রূপে প্রয়োগ করেন নাই। তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন—"তদ্‌ভূতনাথানুন, নার্হসিত্বং সম্বন্ধিনো মে প্রণয়ং বিহন্তুম্॥" যৌগিকার্থ ধরিলে বৈবাহিক, শ্যালকাদি সকলকেই বুঝা যায়। ভবভূতি লিখিলেন "সম্বন্ধিনো বশিষ্ঠাদীনেষ তাতস্তবার্চ্চন্তি" অতএব দেখাযায় কবিরা এই শব্দটী যোগার্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। বলয় শব্দের ইংরেজী "Bangles" দেখিয়া কাব্যতীর্থ মহাশয় মনে করিয়াছেন ইহা আদেশেরই

অলঙ্কার। তিনি যদি ইংরেজী দিয়া বুঝিতে না যাইয়া প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য দেখিতেন তাহা হইলে মাঘের— "বলয়ীকৃত শ্রবণ পূরকাঃ স্ত্রিয়ঃ" "বলয়ার্পিতাসিত-মহোপলপ্রভা" ইত্যাদি প্রয়োগ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন যে অতি প্রাচীনকাল হইতে অলঙ্কার ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল। আচারং লাজঃ উড়ীধানের খৈ এ অভিনবার্থ প্রতিবাদ যোগ্য নহে। লাজশব্দ নিত্য বহুবচনান্ত ইহার এক বচনে প্রয়োগ হয় না। বাঙ্গালীরাও খৈ বলিলেও হিন্দুস্থানীরা "লাজা" ই বলিয়া থাকেন। "সঞ্চারিণীদীপশিখা" সর্ব্বত্রই আছে। পিণ্ডী খেজুর মিশর দেশীয় ভারতের সর্ব্বত্র তাহার আমদানী হয়। "গুড়" গৌড়দেশে বেশী জন্মিলেও অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সর্ব্বত্র ইহা পাওয়া যাইত। নচেৎ পঞ্চনদের লিখিত চরকাদি গ্রন্থে ইহার প্রভূত প্রয়োগ থাকিত না। মোদক শব্দও অতি প্রাচীন কাল হইতে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। জলযন্ত্র কথা ফোয়াড়ার সংস্কৃত অনুবাদ না বলিয়া ফোয়ারা কথা জলযন্ত্র শব্দের অনুবাদ বলিলে পণ্ডিতের উক্তি হইত, কারণ বঙ্গভাষা হইতে সংস্কৃতের উৎপত্তি হয় নাই সংস্কৃত হইতেই বাঙ্গালার উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ অনেকগুলি প্রয়োগ দেখাইয়াছেন যাহা সংস্কৃত হইতে অনূদিত হইয়া বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, বাঙ্গালী অতিশয় অনুকরণ প্রিয়। বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষা বঙ্গভাষায় জননী। এই কারণ কোথায়ও অনূদিতা কোথাও বা অনদিতা অবস্থায়ও সংস্কৃত ভাষা বঙ্গভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যথা "মধুরেণ সমাপয়েৎ" "চিন্তাজ্বরোমনুষ্যাণাম্" "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধিঃ" ইত্যাদি সংস্কৃত বাক্য অননূদিত অবস্থায় বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত হয়। আবার "আস্তাং কিমার্দ্রকবণিজাং বহিত্রচিন্তয়া" এই সংস্কৃত বাক্যের—"থাক্, আদার বেপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি?" এইরূপ অনুবাদ হইয়া বঙ্গভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। কালিদাসের রচনা সরল এবং উপমায় কালিদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই কারণ তাঁহার ভাষা বাঙ্গালা ভাষায় অধিক পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অপভাষা বলিয়া যে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করিতেও হাসি পায়। যিনি প্রসূতি শব্দের প্রতিশব্দ প্রসবদ্বার লিখিতে পারেন তিনি জনকশব্দের প্রতিশব্দেও জননেন্দ্রিয় লিখিতে পারেন। কি উৎকট পাণ্ডিত্য? "শ্রোত্রিয়াভ্যাগতায়মহোক্ষং বা মহাজং বা নির্বপন্তি গৃহমেধিনঃ" এই ধর্ম্মসূত্রানুসারে বশিষ্ঠের জন্য মধুপর্কার্থ গোবধ হইলেও বশিষ্ঠকে বিখ্যাত গোঘ্ন বলা

যায় না। তাহা হইলে সুরভিনন্দিনী নন্দিনীকে তিনি বিশেষ যত্নসহকারে পালন করিতেন না এবং নন্দিনীও বশিষ্ঠাশ্রমে থাকিবার লোভে স্বশরীর হইতে সৈন্য উৎপাদন করিয়া গাধিনন্দনের সহিত যুদ্ধ করাইতেন না। সূর্য্যবংশীয় রাজগণ দিঙ্নাগাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন ইহার কোনও প্রমাণ না থাকায় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ কাব্যের মধ্যে দর্শন শাস্ত্রের বিচার না আনাই ভাল মনে হয়। যাহারা শিরস্ত্রাণ (টুপী প্রভৃতি) ব্যবহার করেন তাহারাই জানেন যে যেখানে বিনয় প্রদর্শন করিতে হইবে সেইখানে শিরস্ত্রাণ খুলিয়া যাইতে হইবে। ইহা বর্ত্তমান ইংরাজ দিগের ব্যবহারেও দেখা যায়। মহাকবি ঈর্ষা করিয়া শিরস্ত্রাণ অপনীত করান নাই। জল যে শীতল তাহা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য লেখার পূর্ব্বেও লোকে অনুভব করিত। বঙ্গদেশীয় বিশ্বনাথের লেখা দেখিয়া লোক জলের শীতলত্ব অনুভব করে নাই। মৈনাক পর্ব্বত কবির কল্পনা নহে তাহা বাল্মিক রামায়ণদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। "বক্ত্রং ঢৌকতে" ইহার অর্থ মুখ ঢাকা নহে মুখ সরাইয়া নেওয়া। কারণ বল্কলবাসিনী শকুন্তলার পক্ষে বল্কলদ্বারা মুখাচ্ছাদন তত সহজসাধ্য নহে। বিশেষতঃ মুখচুম্বনার্থ রাজাকে অগ্রসর দেখিয়া মুখ সরাইয়া নেওয়াই স্বাভাবিক, ঢাকিলেন এই অর্থে ঢৌকতে এইরূপ প্রয়োগ কেহই করিতে পারেন না। এতক্ষণে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সকল গুলি যুক্তির অসারতা প্রতিপাদন করা হইল। তিনি কেবল ঝোঁকের বশে বাঙ্গালী মনে করিয়া বসিয়াছেন। এখন তিনি যাহা দেখেন তাহাই সাধক প্রমাণ মনে করেন। অন্যের নিকট প্রমাণ রূপে উপস্থিত করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা উচিত। যাহা মনে আসে তাহাই লিখিলে লোকে উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া মনে করে। নিম্নলিখিত কারণে মনে হয় কালিদাস বাঙ্গালী নহেন।

(১) বাঙ্গালী নিজের নাম বলিতে বা লিখিতে হইলে স্বজাতীয় পদবী ব্যবহার না করিয়া পারেন না। যথা গঙ্গেশ উপাধ্যায়, রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর তর্কালঙ্কার, বন্দ্যঘটীয় শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্যাত্মজ শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, কাশীরাম দাস, কীর্ত্তিবাস নন্দী, ভারতচন্দ্র রায় ত্রিলোচন দাস, শ্রীপতি দত্ত, সুষেণ আচার্য্য এইরূপ কোথারও জাতীয়োপাধি কোথায়ও বিদ্যোপাধি লিখিয়াছেন, মহাকবি কিন্তু ব্যাস, বাল্মিকী, মাঘ প্রভৃতি

ন্যায় লিখিয়াছেন "ইতি শ্রীকালিদাসকৃতৌ"। ইহাতে বোধ হয় তিনি উপাধিপ্রিয় বাঙ্গালীর দেশে জন্মেন নাই।

(২) বঙ্গদেশ তাঁহার জন্মভূমি হইলে ঐ দেশের অন্ততঃ প্রধান নগরের, তাৎকালিক রাজার এবং আচার ব্যবহারের কিছু কিছু বর্ণনা থাকিত। বঙ্গদেশে তৎকালে বর্ণন যোগ্য কি কিছুই ছিল না? যদি না থাকে তবে মহাকবিও বঙ্গদেশে জন্মিতে পারেন না।

(৩) তিনি রঘুবংশীয় কুমারদের অন্যান্য আভরণ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র কাকপক্ষেরই বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—"কাকপক্ষধরমেত্যযাচিতঃ" প্রণামচল-কাকপক্ষকম্ ইত্যাদি আবার যক্ষের হস্তে কনকবলয় পরাইয়াছেন এবং রাজা দুষ্মন্তের বর্ণনায় বলিয়াছেন, "প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধির্বামপ্রকোষ্ঠেশ্লথং, বিভ্রৎ-কাঞ্চন মেকমেববলয়মিত্যাদি" এই সকল দেখিয়া বোধ হয় মহাকবির দেশে ছেলেদের কাকপক্ষ থাকিত এবং ধনী পুরুষগণ বলয় কেয়ূর প্রভৃতি অলঙ্কার ধারণ করিতেন। এই সকল বঙ্গদেশে ছিল বলিয়া মনে হয় না।

(৪) মহাকবি গৌড়দেশীয়লোক হইলে রচনাকালে গৌড়ীরীতি পরিত্যাগ করিয়া অন্যরীতি অবলম্বন করিতেন না।

গ্রন্থের নায়ক নায়িকা যে দেশীয় হইবে তাহাদের আচার ব্যবহারও বাধ্য হইয়া সেই দেশীয়ের অনুরূপই বর্ণন করিতে হয়। সেইস্থলে কবির বিশেষ স্বাধীনতা থাকে না; কিন্তু নায়ক নায়িকা বিহীন কাব্য ঋতুসংহারে তিনি যখন ভারতের অন্যস্থান পরিত্যাগ করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের বর্ণনা করিয়াছেন তখন মনে হয় তিনি তৎসন্নিহিত কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বদেশে থাকিয়াই ঋতুসংহার লিখিয়াছিলেন, পরে তাঁহার গুণগ্রাম চতুর্দ্দিকে বিদিত হইলে উজ্জয়িনী নগরীর রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া নবরত্নের অন্যতম রত্নরূপে গ্রহণ করিয়া মহাকবিকেও উজ্জয়িনীতে স্থান দেন। তদবধি তিনি উজ্জয়িনীতে বসবাস করিতেন। উজ্জয়িনীর সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলে রামগিরি হইতে অলকা যাইতে মেঘকে বক্রপথে ঘুরাইয়া উজ্জয়িনীতে নিয়া তাহার সকল স্থান বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া দেখাইতেন না।

মহাকবি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন। যে স্থানে যাহা সুন্দর দেখিয়াছেন তাহাই নিজ গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন তিনি যে সকল বৃক্ষাদির এবং অলঙ্কারের

নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বত্র পাওয়া যাইত এখনও পাওয়া যায়। অতএব কোন বৃক্ষ বিশেষ অথবা অলঙ্কার বিশেষ দেখিয়া কবির দেশ নির্ণয় হয় না। যে পর্য্যন্ত অব্যভিচারি কারণ কলাপ পাওয়া না যাইবে সে পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালী একথা স্বীকার করা যাইবে না। বর্ত্তমান কালে এই ঐতিহাসিক সত্যের আবিষ্কারে কাহাকেও আপ্তরূপে গ্রহণ করা যায় না এবং অমুকে বাঙ্গালী বলিয়াছেন এইজন্য পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধি হইয়া তাহা স্বীকার করাও সঙ্গত নহে। মহাকবি যে দেশেরই হউন না কেন তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া নিজেরা গৌরবান্বিত হইব এইরূপ সংকীর্ণ-তাইবা কেন? তিনি বাঙ্গালী না হইয়া হিন্দুস্থানী হইলেও আমাদের দুঃখ বা অপবাদের ভয় নাই। আমরাও হিন্দুস্থান হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছি। হিন্দুস্থান আমাদেরও জন্মভূমি। পরিশেষে মাননীয় পাঠক মহোদয়গণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই আমার মত ক্ষুদ্র বুদ্ধির লিখিত প্রবন্ধে অনেক ভ্রম প্রমাদ থাকিতে পারে। সেইগুলি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিলে বাধিত হইব। মূল প্রবন্ধের সঙ্গে মিলাইয়া না দেখিলে প্রতিবাদ ঠিক হইল কি না বিচার করা কঠিন। যদি কেহ সেইরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রবন্ধের দোষ গুণ সমালোচনা করেন তাহা হইলে বিশেষ সুখী হইব। আপনাদিগকে যথোচিত সম্মাননা জানাইয়া এই স্থানে প্রবন্ধের সমাপ্তি করিলাম ইতি—

কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ সাংখ্যসাগর ভিষগাচার্য্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সারণ দুর্গ প্রাচীর।

(নেপথ্যে হিন্দু ও ইরাণীর রণ কোলাহল)

[বেগে দুর্গাধ্যক্ষ সঞ্জপাল ও কতিপয় সৈনিক পুরুষের প্রাচীরের উপরে আগমন]

সঞ্জপাল।—
সত্য সত্য আজি দেবতা প্রসন্ন ! দেখ
চেয়ে বন্ধুগণ, সত্য দেবী এসেছেন
রক্ষিয়া সারণ দুর্গে রক্ষিতে কাশ্মীর !
ওই, ওই দেখ অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি
কাশ্মীর সেনার আগে, এককরে খর
অসি-অন্য করে কাশ্মীর পতাকা। দেখ
কিবা বীরদর্পে আসে ধেয়ে তেজস্বিনী
ইরাণীর ব্যূহ পাশে। কি ভয়, কি ভয় ;
আর ? নিজে মা চণ্ডিকা আজ অবতীর্ণ
রণাঙ্গণে নাশিতে ইরাণী দৈত্য। ওই,—
ওই দেখ আসিয়া পড়িল !

(নেপথ্যে রণ কোলাহল ও জয়ধ্বনি)

সৈন্যগণ !
সৈন্যগণ ! দূত মুখে শুনেছ সংবাদ
আসিবেন দেবী এক রক্ষিতে সারণে।
সেই দেবী ওই এসেছেন আজ। তাই
দুর্গের বাহিরে, শোন কাশ্মীর ইরাণে
ওই ঘোর সঙ্ঘর্ষণ। তাই কাশ্মীরের
জয়কার ঘন ঘন উঠিছে গগনে
শোন, ডুবায়ে ইরাণী নাদে। চল চল
সৈন্যগণ ! বিলম্ব না ক'রে আর খোল
দুর্গদ্বার চল, চল, সবে, ধেয়ে রণে।
সম্মুখে ইরাণী ব্যূহ ক'রেছেন দেবী—
আক্রমণ, পশ্চাতে পরিগে মোরা ! ছিন্ন
ভিন্ন হ'ক যত ইরাণের সেনা। বল
বল সবে জয় জয় কাশ্মীরের জয় !
দেবতা সহায় রণে কি ভয় কি ভয় !

দুর্গাভ্যন্তরস্থ সৈন্যগণ।—
জয় জয় জয় আজি কাশ্মীরের জয়
দেবতা সহায় রণে কি ভয় ! কি ভয় !

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

দুর্গাভ্যন্তর।

ছায়া, সঞ্জপাল ও সৈন্যগণ।

ছায়া।—
তুমি সঞ্জপাল বীর সারণ রক্ষক ?

সঞ্জ।—
অধীন রাজার দাস, রাজার আদেশে

এতদিন এ দুর্গের আছিল রক্ষক ?
জানি না কেমনে দেবী, জানাব তোমারে
আজি হৃদয়ের ভক্তি কৃতজ্ঞতা। ক্ষুদ্র
এ সারণ দুর্গে রক্ষিয়া রক্ষিলে আজ
সমগ্র কাশ্মীর ; অদৃষ্ট চক্রের গতি
ফিরাইলে তার। অপূর্ব্ব এ দৈবলীলা,—
হেরিয়া স্তম্ভিত ভীত গর্ব্বিত ইরাণী।
হতাশ কাশ্মীর সেনা উঠেছে জাগিয়া
নব আশে নব বলে নবীন জীবনে।
আর কি ইরাণী পারে জিনিতে তাদের ?
দিনে দিনে এই বল বাড়িবে দ্বিগুণ ;—
দিনে দিনে ভগ্ন আশ ইরাণীর সেনা
হারাইবে বল বীর্য্য হটিবে পশ্চাতে।
মাগো, এতদিন অল্প সেনা লয়ে ফিরে
কষ্টে যুঝিয়াছি প্রবল ইরাণী সনে
পারি না কহিতে। প্রতিদিন যুদ্ধ শেষে
ক্লান্ত দেহ মনে, কাতরে চণ্ডিকা মায়ে
কত যে ডেকেছি, ধরায় আসিয়া পুনঃ
নাশিবারে হিংস্রভীম ইরাণী অসুরে।
তাই কি মা স্বয়ং চণ্ডিকা তুমি, কিম্বা
দেবী কেহ চণ্ডিকার শকতি প্রসূতা,
ইরাণী দানব হ'তে রক্ষিতে সন্তানে
তব, আসিয়াছ মহীতলে ?

ছায়া।—

দেবী নই

সামান্য মানবী আমি কৃষক দুহিতা।
কাশ্মীর রক্ষার ভার এ দীন বালারে
কৃপাকরে দেছেন দেবতা। দেবী ব'লে
মারে অপমান ক'রোনা দেবের

সঙ্গ।—

কেন,

এ ছলনা মাগো অধীন সন্তানে ? আজি
রণে তেজস্বিনী সমর রঙ্গিণী হ'য়ে
অতুল বিক্রমে যবে দলেছ ইরাণী,—
হেরি মাতা সে মূরতি, সে ভীম বিক্রম,
কে নাহি বলিবে তুমি চণ্ডিকা আপনি
কিম্বা দেবী চণ্ডিকার শকতি প্রসূতা।
দাস আমি তব সনে তর্ক নাহি শোভে
মোর। কি করিব আদেশ কর মা দাসে
চরিতার্থ হোক্ দাস।

ছায়া।—

আজি এ নিশায়

যুদ্ধ ক্লিষ্ট সেনাগণ লভুক বিশ্রাম।
দুর্গের বাহিরে প্রহরী রহিব শুধু
আমরা কজন। কালি প্রাতে অগ্রসর
হব সবে রাজধানী মুখে। মহারাজে
পাঠাও সংবাদ, সারণ হয়েছে রক্ষা,
পরাস্ত ইরাণী। জানায়ো প্রার্থনা মোর,
পরিজন পরিষদ সনে নিজে তিনি
আসিবেন পশ্চাতে মোদের। হস্তগত
হ'লে রাজধানী, অবিলম্বে অভিষেক
করিয়া তাঁহারে কর্ত্তব্য করিব পূর্ণ।
সৈন্যগণে জানাও আদেশ রজনীতে
ইচ্ছামত লভিয়া বিশ্রাম সবে কাল
সূর্য্যোদয়ে সশস্ত্র সকলে সমবেত
হয় যেন দুর্গের বাহিরে।

সঙ্গ।—

যথা আজ্ঞা—

(সকলের প্রস্থান)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম, এ,

যক্ষাঙ্গনা-কাব্য ।

(নব মেঘদূত)

প্রথম সর্গ ।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্, বার এট-ল্ ।)

বন্দি বিশ্ব-বন্দ্য কালিদাস ! ভারতীর
বর পুত্র !—বন্দি তব চরণারবিন্দ ।
ভারত সরোজ'রবি !—দেহ এ দাসেরে
বর, কবিবর !—যেন পারে সে চিত্রিতে
বিরহী সে যক্ষে তব নব-তুলিকায়
নবোজ্জ্বল-বর্ণে, কিন্তু কোন্ চিত্রকর
কোকনদ-রঙ পারে রাঙিতে রঞ্জনে ?
যথা শশি-কলা জলে সৌর-কর-জালে,
ধরি তব পদ চিহ্ন কাব্যের মন্দিরে,
হে কবীশ ! পশিতে এ দাসে করে আশা,
দুর আশা !—আশীষয়ো নবীন কবিরে ।
রামগিরি নামে গিরি হিমাদ্রি শিখরে,
অপ্সরার লীলা-ভূমি যেথা হেমকুট,—
সুন্দরী মাতার সুন্দরীতরা দুহিতা—
শকুন্তলা—পেয়েছিল যথায় আশ্রয়,
পতি-পরিত্যক্তা, হায় ! কোন্ পুরাকালে !
বসন্তের নব-ফুল, শরতের ফল,
স্বর্গ মর্ত্ত্য যুগপৎ যুক্ত তব নামে
শকুন্তলে !—যুক্ত তব নামে গিরিবর !
রামাচল ! গোবর্দ্ধন সম পুণ্যবান ।
রাম-পাদ শৃঙ্গে শৃঙ্গে শ্যামাঙ্গে অঙ্কিত,
ভৃগুপদ চিহ্ন যথা হরির হৃদয়ে !

নীলমণি তরু-শ্রেণী—নয়ন-রঞ্জন—
শোভে সে অচল-ভালে, নত ফল-ফুলে,
(নব-জল-ভরে যথা নব-জলধর !)
নানা জাতি লতাবলী—সুবর্ণী ব্রততী-
(যেন মরকতময় কনক-মেখলা !)—
বেড়ে তারে চারিধারে মরি ! প্রেম-ডোরে !
সু-নাদিনী-বিহঙ্গিনী, সু-নাদী-বিহঙ্গ,—
মতি-চুণি-হীরা-পান্না পক্ষে দীপ্তিমান—
(শক্র-ধনুঃ-কান্তি ম্লান যাহার আভায় !)
বরষয়ে স্বর সুধা গিরিবর কর্ণে !
ফণিনী— মণি-কুন্তলা—আলো করে নিশি
মণি-জালে—ঘোরা অমানিশি, শশী হীনা !
কুরঙ্গিণী সু-নয়ণী—বন-কমলিনী—
কুরঙ্গের সঙ্গে খেলা করে রঙ্গ-রসে
তুঙ্গ-শৃঙ্গ পরে। শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গান্তরে
পীযূষ-বর্ষিণী স্বর্ণ-নির্ঝরিণী-রাণী
হিরণ-কিরণে ঢালে তরল-কনক।
গিরি-দরী—জাহ্নবীর স্নানে পুণ্য-নীরা—
(পুণ্য-নীরা যথা তুমি জহ্নুর নন্দিনি !)
কল-স্বনে উন্মাদয়ে বিরহীর মন,
(ব্রজবালা মন যথা শ্যামের বাঁশরী !)
মরমরে পাতাকুল সেথা নিরন্তর।
রবি-তাপ সদা স্নিগ্ধ নমেরু ভূরুহে।
ফুলে ফুলে ভ্রমে অলি ঝঙ্কারি মধুর।
প্রজাপতি—ব্যোম-পুষ্প—রঙ্গ পাখা মেলি
রামধনু সম রাজে ফুল-কুল মাঝে।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য-সংহিতার

১৩২৮ সালের শ্রাবণ হইতে আশ্বিন সংখ্যার

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

Printed by G. B. Manna at the Mitra Press.
45, Grey Street Calcutta.

সাহিত্য-সংহিতা।

(সাহিত্য সভার ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

নবপর্য্যায়, ১০ম খণ্ড } কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩২৮ সাল। { ৭ম ৮ম ৯ম সংখ্যা।

সংস্কৃত সংলাপ কাব্যম্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সংস্কৃতম্।

১৭। চতুর্থ কণ প্রণুতৌ। প্রত্যক্ষদেবতায়াঃ শ্রীশ্রী৺গঙ্গাদেব্যাঃ স্তুতি ব্যাজেন একমেব বস্তু (বক্তব্য বিষয়ঃ) কথং বিবিধৈঃ প্রকারৈ রভিনবমিবকৃত্বা প্রকাশ্যত ইত্যাবেদিতম্। প্রণুতি শব্দঃ প্রকৃষ্ট স্তুতিবোধকঃ। তদাত্মকত্বাৎ প্রণুতি রিত্যা খ্যাপিতা। ধনজনাদি প্রার্থনা রাহিত্যেন, এবং একমেব বক্তব্য বিষয় মবলম্ব্য শব্দাড়ম্বরমাত্রেণ বহুধা রচনায়াঃ, ক্ষুদ্রতমেভ্য আরভ্য সুদীর্ঘতমানাং বহুবিধ সমাস গঠিত বিশেষণ পদানাং সৃষ্টৈ শ্চোপদেশকতয়া অন্যাভ্যঃ অস্যাঃ স্তুতেঃ প্রকৃষ্টতা। যস্যা অয় মাদ্য ঃ শ্লোকঃ। বসন্ত তিলক ছন্দঃ।

মাতঃ, কৃপাময়ি, শুভঙ্করি, দুঃখহন্ত্রি,
পুণ্য প্রদে, দুরিত নাশিনি, বিশ্ববন্দ্যে!

গঙ্গে, প্রসীদ, মতি ভক্তি বিকাশ হীনে,

হীনে স্বকীয় তনয়ে ময়ি বিশ্বমাতঃ॥ ইতি।

মাতঃ কৃপাময়ীত্যাদিভিঃ সপ্তত্যা শ্লোকৈরিদ মুপদিষ্টং ভবতি। যথা, "মাতর্গঙ্গে ময়ি প্রসীদে"ত্যেতাবন্মাত্রে বক্তব্যে বক্তব্য বিষয় বোধকেভ্যো ব্যতিরিক্তানি শ্লোক পূরণ মাত্র প্রয়োজনানি কেবলানি কানিচিদ্ বিশেষণ পদানি প্রক্ষিপ্য বহবঃ শ্লোকা বিনির্ম্মিতাঃ।

তথৈব কার্য্যং সর্ব্বত্র, বহুত্বং যত্র যত্রহীতি॥

অনুবাদ।

১৭। কণ কাব্যের চতুর্থ কণের নাম প্রণুতি। প্রণুতি কাব্যে প্রত্যক্ষদেবতা শ্রীশ্রী৺গঙ্গাদেবীর স্তুতি চ্ছলে একটি অতি সামান্য বক্তব্য বিষয়কে কিরূপে বারম্বার নূতনের মত করিয়া প্রকাশ করা যায়, তাহারই আবেদন করা হইয়াছে। প্রণুতি শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট স্তুতি। তন্ময় বলিয়া এই কাব্যখানির নাম প্রণুতি। অন্যান্য স্তুতি হইতে এই স্তুতির প্রকৃষ্টতা এইজন্য। এই স্তুতিতে কোনও রূপ, ধন জনাদির প্রার্থনা নাই। এবং এই স্তুতিগুলি হইতে একটি মাত্র বক্তব্য বিষয় কেবল বাক্যের আড়ম্বরে কিরূপে বহুপ্রকারে রচিত হইতে পারে, এবং ক্ষুদ্রতম হইতে আরম্ভ করিয়া বহুবিধ সমাস গঠিত সুদীর্ঘতম বিশেষণ পদগুলি কিরূপে সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার উপদেশ পাওয়া যায়। যে কাব্যের আদিম শ্লোক এই।

মাতঃ কৃপাময়ীত্যাদি। উল্লিখিত।

এই শ্লোকটি বসন্ত তিলক ছন্দে রচিত।

তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। এই কাব্য খানিতে ৭০ সত্তরটি শ্লোক দ্বারা এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যে, যেমন এই সম্পূর্ণ কাব্যখানির বক্তব্য বিষয় এইটুকুমাত্র। "মা গঙ্গে আমার প্রতি প্রসন্না হও।" এইটুকুমাত্র বিষয় অবলম্বন করিয়া বহু শ্লোক বিরচিত হইয়াছে। কিরূপে বক্তব্য বিষয়ের বোধক হইতে অতিরিক্ত কেবল কতকগুলি বিশেষণ পদ প্রক্ষেপের দ্বারা, ঐ বিশেষণ পদ গুলির প্রয়োজন কেবল শ্লোক পূরণ করা। সেইরূপ যে যে স্থলে বক্তব্য বিষয় অল্প অল্প কিন্তু বহু রচনার আবশ্যক। সেই সমস্ত স্থলে এইরূপ রীতি অবলম্বন করিতে হয়।

শ্লোকার্থ। মাগো গঙ্গে। তুমি কৃপাময়ী। পুণ্যদায়িনী। এবং কলুষ বিনাশিনী। এ কারণ তুমি জীবের পুণ্যদায়িনী, এবং দুঃখ বিনাশিনী। এই সকল কারণেই

তুমি বিশ্বের বন্দনীয়া। মাগো, আমি তোমার পুত্র। অতিদীন। পুত্র কিরূপে, যে হেতুক তুমি বিশ্বজননী। দীন কিসে। যে হেতুক আমি নির্ব্বোধ এবং ভক্তিহীন। মাগো, তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও।

(ক্রমশঃ)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি।

বৃহৎ পারাশর হোরাশাস্ত্রম্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অথ মাতৃকষ্টম্—চন্দ্রমা যদি পাপানাং ত্রিতয়েন প্রদৃশ্যতে। মাতৃনাশো ভবেত্তস্য শুভদৃষ্টে শুভং বদেৎ॥ ধনে রাহুর্বুধঃ শুক্রঃ সৌরিঃ সূর্য্যো যদা স্থিতঃ। তস্য মাতুর্ভবেন্মৃত্যুর্মৃতে পিতরি জায়তে। পাপাৎ সপ্তমরন্ধ্রস্থে চন্দ্রে পাপসমন্বিতে। বলিভিঃ পাপকৈ র্দৃষ্টে জাতো ভবতি মাতৃহা॥ উচ্চস্থো বাথ নীচস্থো সপ্তমস্থো যদা রবিঃ। পানহীনো ভবেদ্বালোহজাক্ষীরেণ জীবতি॥ চন্দ্রাচ্চতুর্থগঃ পাপো রিপুক্ষেত্রে যদা ভবেৎ। তদা মাতৃবধং কুর্য্যাৎ কেন্দ্রে যদি শুভা নচেৎ॥ দ্বাদশে রিপুভাবে চ যদা পাপগ্রহো ভবেৎ। তদা মাতুর্ভয়ং বিদ্যাচ্চতুর্থে দশমে পিতুঃ॥ লগ্নে ক্রূরো ব্যয়ে ক্রূরো ধনে সৌম্যস্তথৈব চ। সপ্তমে ভবনে ক্রূরঃ পরিবারক্ষয়ঙ্করঃ॥ লগ্নস্থে চ গুরৌ সৌরে ধনে রাহৌ তৃতীয়গে। ইতি চেজ্জন্মকালে স্যান্মাতা তস্য ন জীবতি॥ ক্ষীণ চন্দ্রাত্রিকোণস্থৈঃ পাপৈঃ সৌম্য বিবর্জ্জিতৈঃ। মাতা পরিত্যজেদ্বালং ষন্মাসাচ্চ ন সংশয়ঃ॥ একাংশকস্থৌ মন্দারৌ যত্র কুত্র স্থিতৌ যদা। শশিকেন্দ্রগতৌ বালো দ্বিমাতৃভ্যাং ন জীবতি।

মাতৃকষ্ট।

চন্দ্র তিনটী পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বালকের মাতৃনাশ হয়। উক্ত চন্দ্র শুভ দৃষ্ট হইলে ফল অশুভ হয় না। ধনস্থানে রাহু, বুধ, শুক্র, শনি ও সূর্য্য থাকিলে শিশুর গর্ব্ভাবস্থাতেই তাহার পিতার মৃত্যু হয় আর তাহার জন্মের পর মাতার মৃত্যু হয়। পাপগ্রহ হইতে সপ্তম বা অষ্টমস্থ চন্দ্র পাপযুক্ত হইয়া বলবান্ পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতবালকের মাতার মৃত্যু হয়। উচ্চস্থ কিম্বা নীচস্থ রবি যদি সপ্তমস্থ

হয় তাহা হইলে বালক তাহার মাতৃস্তন্য পান করিতে পায় না, তাহাকে ছাগীদুগ্ধে জীবন ধারণ করিতে হয়। কেন্দ্রে যদি শুভগ্রহ না থাকে আর যদি চন্দ্র হইতে চতুর্থগত পাপগ্রহ ষষ্ঠে অবস্থান করে তাহা হইলে মাতৃনাশ হয়। দ্বাদশে ও ষষ্ঠে পাপগ্রহ থাকিলে মাতৃকষ্ট আর চতুর্থে ও দশমে পাপগ্রহ থাকিলে পিতৃকষ্ট জানিতে হইবে। লগ্নে পাপগ্রহ, দ্বাদশে পাপগ্রহ, দ্বিতীয়ে শুভগ্রহ ও সপ্তমে পাপগ্রহ থাকিলে পরিবারস্থ সকলের বিনাশের সম্ভাবনা। লগ্নে বৃহস্পতি, দ্বিতীয়ে শনি ও তৃতীয়ে রাহু থাকিলে জাতকের মাতার মৃত্যু হয়। ক্ষীণ চন্দ্র হইতে ত্রিকোণস্থ পাপগ্রহগণ শুভগ্রহবর্জ্জিত হইয়া থাকিলে মাতা ছয় মাস মধ্যে শিশুকে পরিত্যাগ করে। শনি ও মঙ্গল যে কোন ও রাশিতে একই অংশগত হইয়া চন্দ্রের কেন্দ্রগত হইলে জাত বালকের নিজেরও তাহার দুই মাতার মৃত্যু হয়।

অথ পিতৃকষ্টম—লগ্নে সৌরির্মদে ভৌমঃ ষষ্ঠস্থানে চ চন্দ্রমাঃ। ইতি চেজ্জন্মকালে স্যাৎ পিতা তস্য ন জীবতি॥ লগ্নে জীবো ধনে মন্দরবিভৌমবুধাস্তথা। বিবাহ সময়ে তস্য বালস্য ম্রিয়তে পিতা॥ সূর্য্যঃ পাপেন সংযুক্তঃ সূর্য্যো বা পাপমধ্যাগঃ। সূর্য্যাৎ সপ্তমগঃ পাপস্তদা পিতৃবধো ভবেৎ॥ সপ্তমে ভবনে সূর্য্যঃ কর্ম্মস্থো ভূমিনন্দনঃ। রাহুর্ব্যয়েন যস্যৈব পিতা কষ্টেন জীবতি॥ দশমস্থো যদা ভৌমঃ শত্রুক্ষেত্র সমাশ্রিতঃ। ম্রিয়তে তস্য জাতস্য পিতা শীঘ্রং ন সংশয়ঃ॥ রিপুস্থানে যদা চন্দ্রো লগ্নস্থানে শনৈশ্চরঃ। কুজশ্চ সপ্তমে স্থানে পিতা তস্য ন জীবতি॥ ভৌমাংশক স্থিতে ভানৌ স্বপুত্রেণ নিরীক্ষিতে। প্রাক্ জন্মনো নিবৃত্তিঃ স্যান্মৃত্যুর্ব্বাপি শিশোঃ পিতুঃ॥ পাতালে চাম্বরে পাপো দ্বাদশে চ যদা স্থিতঃ। পিতরং মাতরং হত্বা দেশাদ্দেশান্তরং ব্রজেৎ॥ রাহুজীবৌ রিপুক্ষেত্রে লগ্নে বাথ চতুর্থকে। ত্রয়োবিংশে হি বর্ষে তু পুত্রস্তাতং ন পশ্যতি॥ ভানুঃ পিতা চ জন্তূনাং চন্দ্রো মাতা তথৈব চ। পাপদৃষ্টিযুতো ভানুঃ পাপমধ্যগতোঽপি বা॥ পিত্ররিষ্টং বিজানীয়া চ্ছিশোর্জাতস্য নিশ্চিতম্। ভানোঃ ষষ্ঠাষ্টমর্ক্ষ স্থৈঃ পাপৈঃ সৌম্যবিবর্জ্জিতৈঃ। চতুরস্র গতৈর্ব্বাপি পিত্ররিষ্টং বিনির্দ্দিশেৎ॥

পিতৃকষ্ট।

লগ্নে শনি, সপ্তমে মঙ্গল ও ষষ্ঠে চন্দ্র থাকিলে জাত বালকের পিতার মৃত্যু হয়। লগ্নে বৃহস্পতি, দ্বিতীয়ে শনি, রবি, মঙ্গল ও বুধ থাকিলে জাতকের বিবাহ সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। সূর্য্য পাপগ্রহের সহিত সংযুক্ত হইলে বা পাপমধ্যগত

হইলে আর সূর্য্য হইতে সপ্তমে পাপগ্রহ থাকিলে পিতৃনাশ হয়! যে বালকের সপ্তমে সূর্য্য, দশমে মঙ্গল ও ব্যয়ে রাহু থাকে তাহার পিতা কষ্টের সহিত জীবন ধারণ করিয়া থাকে। যদি দশমে মঙ্গল শক্রস্থানে থাকে, তাহা হইলে জাতকের পিতার শীঘ্রই মৃত্যু হয়। ষষ্ঠে চন্দ্র, লগ্নে শনি ও সপ্তমে মঙ্গল থাকিলে পিতার মৃত্যু হয়। মঙ্গলের অংশগত সূর্য্য যদি শনি কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হয় তাহা হইলে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই শিশুর নিধন হয় অথবা তাহার পিতার মৃত্যু হয়। সপ্তমে, দশমে ও দ্বাদশে পাপগ্রহ থাকিলে জাতকের পিতা মাতার মৃত্যু হয়, আর সে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে। রাহু ও বৃহস্পতি ষষ্ঠে, লগ্নে কিম্বা চতুর্থে থাকিলে, ত্রয়োবিংশবর্ষে পুত্র পিতাকে হারাইয়া ফেলে। রবি পিতার কারক ও চন্দ্র মাতার কারক সেইজন্য রবি পাপদৃষ্ট হইলে অথবা পাপমধ্যগত হইলে জাতশিশুর পিত্ররিষ্ট জানিতে হইবে। রবি হইতে ষষ্ঠ ও অষ্টমস্থ পাপগ্রহসকল শুভগ্রহ বর্জ্জিত হইয়া চতুরস্রে অর্থাৎ লগ্ন হইতে চতুর্থে বা অষ্টমে থাকিলে পিত্ররিষ্ট নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় এম্, এ জ্যোতির্ভূষণ।

মহাভারতীয় সারল বিরাট পর্ব্ব।

(উৎকল দেশীয় ব্রাহ্মণ সরল কবি বিরচিত প্রাচীন কাব্য।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দান যজ্ঞ আদি কর্ম্ম সব ব্যর্থ যায়।
তার পিতৃলোক অন্তে অধঃগতি হয়॥
দুষ্টে নাশে শিষ্টে পালে নৃপের এ রীতি।
পূর্ব্বাপর হেন নীতি বল প্রজাপতি॥
এত বলি কান্দে কৃষ্ণা আকুল হইয়া।
কহেন বিরাট পুত্র জনকে চাহিয়া॥

অবধান কর তাত নিবেদি চরণে।
সৈরিন্ধ্রীকে মারি গেল সভাবিদ্যমানে॥
অনাথিনী প্রায় কান্দে সভার ভিতর।
কেন গো জনক কিছু না দাও উত্তর॥
রাজ ধর্ম্ম নরপতি না কৈলে পালন।
নাহি দিলে রাজদণ্ড চোর সভা যেন॥

সবাই অধর্ম্মী বসিয়াছে যত জন।
ধর্ম্ম নাহি তেঞি কেহ না কহে বচন ॥
শুনিয়া বিরাট বলে উত্তর সমীপে।
পরোক্ষে দোঁহার দ্বন্দ্ব জানিব কিরূপে ॥
না জানিয়া না শুনিয়া কহিব কেমনে।
কিহেতু দোঁহার দ্বন্দ্ব কীচকের সনে ॥
এত বলি তনয়েরে করিল প্রবোধ।
বাক্য শুনি ভীমের হৃদয়ে হৈল ক্রোধ ॥
অধরোষ্ঠ কম্পে দুই চক্ষু রক্ত বর্ণ।
জ্বলন্ত অনলে ঘৃত ঢালি দিল যেন ॥
বিপরীত অপমান দেখি পাঞ্চালীর।
নয়ন যুগলে অগ্নি কণা হয় বার ॥
কুপাটী দশন চাপি উঠিল সভায়।
সম্মুখে আছিল বৃক্ষ লইবারে চায় ॥
কিন্তু আজ্ঞা লইতে ধর্ম্মের পানে চায়।
আঁখি চাপি যুধিষ্ঠির নিবারিল তায় ॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞাকারী পবন নন্দন।
অধোমুখ হয় ক্রোধ করি সম্বরণ ॥
কান্দয়ে সৌরিন্ধ্রী দেবি আকুল পরাণী।
বলে কেন আছে মোর কঠিন পরাণী ॥
পঞ্চজন গন্ধর্ব্ব থাকিতে মোর পতি।
দুষ্ট সুত পুত্র বিনা দোষে মেল লাথি ॥
এতবলি সৈরিন্ধ্রী কান্দয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
কঙ্ক নামে যুধিষ্ঠির কহেন তাহারে ॥
না কান্দ সৌরিন্ধ্রী তুমি পড়িয়া ভূতলে।
কি করিবে দুঃখ আছে তোমার কপালে।
না কর রাজাকে নিন্দা অজ্ঞান হইয়া।
তোমার কপালে কষ্ট কে দিবে মুছিয়া ॥
জন্ম দিনে বিধি যাহা করেছে লিখন।
হরিহর হৈতে তাহা না হয় খণ্ডন ॥
তোমার অদৃষ্টে কষ্ট শুন রূপবতী।
কি করিবে তোমার গন্ধর্ব্ব পঞ্চপতি ॥
তোমার যতেক দুঃখ দেখিল নয়নে।
অসময়ে তারা কি করিবে এইক্ষণে ॥
সময়ানুক্রমেতে দিবেক প্রতিফল।
অসময় হেতু তারা হয়েছে দুর্ব্বল ॥
উঠ উঠ সৈরিন্ধ্রী গো শোক কর দূর।
অদৃষ্টের ফের সব যাহ অন্তঃপুর ॥
প্রকারে এতেক যদি কঙ্ক কহে বাণী।
শুনিয়া প্রবোধ বাক্য উঠে যাজ্ঞসেনী ॥
সত্য বটে কঙ্ক ভাল বলিলে বচন।
আমার কপালে দুঃখ কি করে রাজন ॥
এতবলি চলিল রাজার অন্তঃপুরে।
বিরস বদনে চলে সুদেষ্ণা গোচরে ॥
কৃষ্ণা দেখি ব্যস্ত হৈয়া কহে পাটেশ্বরী।
এতেক বিলম্ব কেন হৈল বেশকারী ॥
বিরস বদন কেন সর্ব্বাঙ্গেতে ধূলি।
পদ্মনেত্রে নীর বহে আয়ুদরী চুলি ॥
শুনিয়া সৈরিন্ধ্রী কহে কোপ যুক্ত হৈয়া।
কেন মোরে জিজ্ঞাসহ জানিয়া শুনিয়া ॥
কপট চাতুরী করি কর জিজ্ঞাসন।
ভ্রাতার শ্রাদ্ধের দ্রব্য কর আয়োজন ॥
শুনিয়া সুদেষ্ণা দুখে হইয়া দুঃখিতা।
আশ্বাস করিলা দেবী মধুর বাক্যেতে ॥
তবে যাজ্ঞসেনী ক্রোধ করি সম্বরণ।
সরোবরে যেয়ে করে অঙ্গের মার্জ্জন ॥

স্নান করি ইষ্ট মন্ত্র জপে শতবার ।
পর পুরুষের স্পর্শে যেমন ব্যভার ॥
গোবিন্দে স্মরিয়া দেবী গেল যথাস্থানে ।
নিশিযোগে ভাবে নিদ্রা নাহি দুনয়নে ॥
কি করিব কোথা যাব না দেখি উপায় ।
এমন বিপত্তে কেবা তারিবে আমায় ॥
দুষ্ট মতি দুরাচার ক্রোধ করি গেছে ।
কালি প্রাতে দুষ্ট পুনঃ আসিবেক কাছে ।
এখানে আসিয়া দুষ্ট করিবেক বল ।
কি করিব অভাগীর নাহিক মঙ্গল ॥
মোর দুঃখ নিবারিতে নাহি ভীম বিনে ।
একবার যেতে হৈল ভীমের সদনে ॥
এত ভাবি দ্রৌপদী চলিল ভীম আগে ।
নিঃশব্দ যতেক লোক নিদ্রায় নিশিযে ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীবাণী প্রসাদাৎ

(উত্তরায়ণ সম্মিলনের আহ্বায়ক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের

অভিভাষণ ।)

আজ উত্তরায়ণ সংক্রান্তির মহাপবিত্র বাসরে আমাদের এই ক্ষুদ্র আবাস-কুটীর এক মনোহর কুঞ্জে পরিণত। শ্বেত-দ্বীপ-উপাসিতা-ইঙ্গবাণী-আরাধনা-সিদ্ধ সেবকগণ, গীর্ব্বাণ-বাণীর বরেণ্য উপাসক-সম্প্রদায় ও বঙ্গবাগ্দেবীর শ্রীচরণাশ্রিত সাধকমণ্ডলী বাণী-চরণ-সরোজ-মকরন্দ-গন্ধ-অন্ধ-ভৃঙ্গবৃন্দের গুঞ্জন-সমন্বয় মুখরিত যথার্থই এ কুটীর এককান্ত কমনীয় কুঞ্জে পরিণত হইয়াছে। আমি ধন্য আমরা ধন্য, এ কুটীর প্রাঙ্গন ধন্য, বাণী-ভক্ত-পদ পঙ্কজ-পরাগ মস্তকে ধারণ করিয়া আজ আমরা পবিত্র হইলাম। এই বরেণ্য বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর অগ্রণীরূপে আজ আমরা যাঁহাকে পাইয়াছি তিনি তথাকথিত বিবদমানা দুই দেব ভগিনী রমা ও বাণীর বরপুত্র, ভক্ত-দার্শনিক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ-ভক্তিভূষণ এম এ; বি এল্ মহোদয় সর্ব্বজন সুপরিচিত। আমাদের আয়োজন ক্ষুদ্র হইলেও সভাপতির গুণে ও সৌজন্যে সকল ত্রুটী উপেক্ষিত হইবে। দেশের বর্ত্তমান কালের বিরাট সমস্যার দিনে জাতীয় উন্নতির অন্যতম প্রধান অবলম্বন ও লক্ষণ

সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-প্রচলনের বাহন নির্দ্ধারণ করার সময় আসন্ন। আর বিলম্ব চলে না। বিলম্বে কার্য্যহানিঃ স্যাৎ। একদিকে চির-তুষার-মণ্ডিত-হিমগিরির নানা দেব-দেবীর আবাস-সৌন্দর্য্য ভাব-সম্পদে পরিপূর্ণা জ্ঞান-বিজ্ঞান দাত্রী সংস্কৃত-বাণী অপর দিকে নব সূর্য্য কিরণমালা বিভূষিতা, নানা প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রমাণ-বাহিনী চাকচিক্যময়ী, ইঙ্গবাণী সমুপস্থিতা। একদিকে বঙ্গীয় মনের উপর হৃদয়ের ও প্রাণের সবিরাম অথচ ঘন ঘন মৃদুমন্দ স্পন্দন অপরদিকে তাহারি উপর ভাসা ভাসা অথচ গুরু-গম্ভীর তূর্য্য-ধ্বনি। বাঙ্গালীর চক্ষু ও মন প্রতিহত। বাঙ্গালী কি বসিয়া থাকিবে? চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র, পূজিতা বঙ্গবাণী কি বাঙ্গালীর শিক্ষার তরণী হইয়া সাগরাম্বরা বসুন্ধরার বিদ্বজ্জন-সমাজে তাহাদের জাতীয় প্রতিপত্তি-প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবনে সমর্থা হইবে না? বাঙ্গলার গদাধর, জগদীশ রঘুনাথের মনীষা কি তাঁহাদের অন্তর নিহিতা মাতৃভাষা সাহায্যেই উদ্ভাবিত হয় নাই? বাঙ্গালার জয়দেবের 'ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন কোমলমলয় সমীরে'র কাব্যলক্ষ্মী-সৌন্দর্য্য প্রকাশ কি তাঁহার হৃদয় মধ্যস্থা বঙ্গবাণী-কল্পনা-কুসুম বিকশিত করে নাই? বাঙ্গালীর আয়াস-লব্ধ ইউরোপীয় ভাষা-কৃতিত্ব কি তাঁহার মাতৃভাষা সাহায্যে নহে? যিনি যে ভাবে বুঝুন বা বলুন আমরা বুঝি এবং সপ্রমাণ করিতে পারি যে মাতৃভাষা সাহায্যে জগদীশচন্দ্রের মনের ভিতর বিজ্ঞান-বাণী জাগিয়াছে। যে ভাষা সাহায্যে দিগন্তে ঝঙ্কৃত রবীন্দ্রনাথের প্রাণের স্পন্দন, আচার্য্য বিবেকানন্দের ধর্ম্ম মনীষা যে ভাষা-সাহায্যে তাঁহার হৃদয়ে প্রস্ফুটিতা, যাহার সাহায্যে আমরা দেশে ও দশে কাঁদি হাসি ভাবি ও ভাব প্রকাশ করি—তাহাই আমাদের শিক্ষার একমাত্র বাহিকা হওয়া উচিত। বাঙ্গালীর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ধুরন্ধরগণের ব্যবস্থার দিকে চাহিয়া আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আর কতকাল নিশ্চেষ্ট থাকিব? শীঘ্রই নিষ্পত্তি আবশ্যক আর কালক্ষেপ করা উচিত নহে।

ওঁ শান্তিঃ।

কালীদাস বাঙ্গালী কি না ?

(মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজকবিসম্রাট শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন)

অনেকদিন আমি সাহিত্য সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই, অনেকদিন সাহিত্য সভার সভ্যবৃন্দের নিকট অপরাধী। সকলেই মাতৃভূমির সম্পদ বাড়াইবার জন্য সচেষ্ট। পদ্ম জলে জন্মে, সেই জলে ফুটিয়া তাহারই শোভা বর্দ্ধন করে। স্থলপদ্ম, স্থলে জন্মিয়া, স্থলেরই সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া দেয়। জুই, বেল, চামেলী, গোলাপ গাছ ভরিয়া ফুটিয়া শুধু জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আত্মপ্রসাদে হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে না, আবার সুমিষ্ট সৌগন্ধ্য দিগ্ দিগন্তে ছড়াইয়া সেই দিকে সকলকে আকর্ষণ করে। মানুষ হইয়া জন্মিয়া দীর্ঘজীবন পাইয়াও সেই জন্মভূমির কিছুই করিতে পারিলাম না, জন্মের পরে প্রথমে যে ভাষায় মধুর "মা" এই ডাকটুকু শিখিয়াছি, সেই মাতৃভাষাকেও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কোন একটী উপহার দিতে পারিলাম না। রাবণের স্বর্গের সিঁড়ী বাঁধার মত কত কি করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, আজ বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হইয়া দেখিতেছি সমস্তই ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, আর আমার দ্বারা কোন কাজই হইবে না। পাঁচ মিনিট বসিয়া লিখিতে পারি না, আঙুল অসাড় হইয়া পড়ে। এখন হাতে বল নাই, পায়ে বল নাই, বাহুতে বল নাই, হৃদয়েও বল নাই। স্মরণশক্তি এত কমিয়াছে যে, শাস্ত্রার্থ স্মরণে আনা দূরের কথা, বন্ধু বান্ধবের নাম পর্য্যন্তও ভুলিয়া যাই। সুতরাং আগাগোড়া গুছাইয়া বলা বা লিখা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এমন অবস্থায় সভা সমিতিতে উপস্থিত হওয়া অপেক্ষা না হওয়াই বোধ হয় উত্তম কল্প। তারপর বাঙ্গালা ছাড়িয়া বহু দূরে অবস্থিতি করিতেছি, সে স্থান হইতে এই শরীরে কলিকাতায় আসা যাওয়া আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর। সভ্যবৃন্দের নিকটে প্রথমতঃ আমার এই কৈফিয়ৎ দাখিল করিলাম, বোধ হয় সভ্যবৃন্দ দয়া করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

এখনও একটা নূতন কথা শুনিলে মনে সাড়া পড়িয়া যায়, হৃদয় নাচিয়া উঠে, কিছু বলিবার ইচ্ছা করে। তাই আজ সভ্যবৃন্দের একটু সময় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় কালিদাস

বাঙ্গালী ছিলেন, এ বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়াছেন শুনিয়াছি, অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন শুনিয়াছি। সেই সমস্ত প্রবন্ধ দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। আমি ১৩২৭ সনের মাঘ-চৈত্রের "সাহিত্য সংহিতা"য় প্রকাশিত তাঁহার লিখিত প্রবন্ধটী মাত্র পড়িয়াছি। অবশ্য কালিদাস বাঙ্গালার কবি নহেন, পৃথিবীরও কবি নহেন, তিনি বিশ্বের মহাকবি; তাই বলিয়াই কি তাঁহার জন্মস্থানের অবধারণ করিয়া নর নারীর কৌতুহল চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য নয়? দুঃখের বিষয় কাব্যতীর্থ মহাশয় তাঁহার জন্মান্তরের দুষ্কৃতির ফলে ভারতে আসিয়া ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার যদি জন্মান্তরের তপস্যা থাকিত, তবে তিনি ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিতে পারিতেন, রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর বড়দরের একজন মেম্বর হইতেন, তিনি যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার ২।১টি মাত্র লইয়া ফেনাইয়া ফেনাইয়া প্রকাণ্ড প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন; রয়েল এসিয়াটিকের জার্ণালে তাহা বাহির হইত, তাহা দ্বারা ইতিহাসে এক নূতন যুগের অবতারণা হইত, বিশ্ববিমোহিত হইত। ইহার উদাহরণ দেখাইবার জন্য বহুদূরে যাইতে হইবে না, শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষের উক্তির কেমন মহিমা, যাহা শুনিয়া কাব্যতীর্থ মহাশয়ের মত মনীষীও নির্ব্বিচারে নিজের প্রবন্ধে— "আসমুদ্র ক্ষিতীশানাং" এই শ্লোকস্থ "সমুদ্র" এই শব্দের সাহেবি অর্থ সমুদ্রগুপ্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় "আনাকরথ বর্ত্মনাং"এর কাছে "আসমুদ্র ক্ষিতীশানাং" এই পদের সমুদ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত রাজা অর্থ করিলে কেমন বেখাপ্পা হইয়া পড়ে। যাঁহারা সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর রাজা ছিলেন, যাঁহাদের রথ-মার্গ নাক পর্য্যন্ত ছিল। "নাক" শব্দে আকাশকেও বুঝায় স্বর্গকেও বুঝায়। আর যদি কালিদাসের সমুদ্রগুপ্তের বর্ণন করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিত বা কুমার সম্ভবে কুমারগুপ্তের জন্ম বৃত্তান্ত লিখিবার অভিলাষ হইত, তবে কি তিনি রাঘব পাণ্ডবীয়ের মত, সন্ধ্যাকর নন্দীর রাম চরিতের মত এক পক্ষে রঘুবংশ অন্য পক্ষে সমুদ্রগুপ্তের বংশ, এক পক্ষে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম অন্য পক্ষে কুমার গুপ্তের জন্ম এই দুইটি অর্থ যাহাতে হয় এইরূপ মিষ্ট কবিতা লিখিয়া এই কাব্যদ্বয়ের শেষ করিতে পারিতেন না। আমিও এই সাহেবি ভাবে ভাবিত হইয়া একটি নূতন ইতিহাসের উদ্ভাবন করিতেছি, আপনারা এই নব ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিলে কৃতার্থ হইব।

রঙ্গপুরের দক্ষিণ প্রান্তে বাগ্‌দুয়ার নামে একটী স্থান আছে। লোকে ইহাকে ভবচন্দ্রের পাটও বলে। এই স্থানে বড় বড় দীঘী আছে, আধুনিক ধরণের অনেকগুলি পুরাতন পাকা রাস্তা আছে, এক সময়ে এখানে লোহা প্রস্তুত হইত, তাহার পরিচায়ক রাশি রাশি মণ্ডুর (লৌহ-বিষ্ঠা) আছে ও একটি গৃহে একটি বাগ্‌দেবীর মূর্ত্তি আছে। এই স্থানে রাজা ভবচন্দ্রের বাড়ী ছিল বলিয়া ভবচন্দ্রের পাট নাম ইহার হইয়াছে। ভবচন্দ্র রাজা, গবচন্দ্র মন্ত্রী। ভবচন্দ্র রাজার শতাধিক গল্প বাঙ্গালায় প্রচলিত। অন্ততঃ তাহার ২।১টি গল্প না জানে এরূপ বাঙ্গালার নর নারী নাই। ভবচন্দ্র রাজার প্রকৃত নাম নহে, বোকা বলিয়া তাঁহাকে এই উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃত নাম বাক্‌পাল, ইনি পালবংশীয় রাজা ছিলেন। আমি বলি কালিদাস এই রাজারই সভাপণ্ডিত ছিলেন, সেইজন্যই তিনি রঘুবংশের প্রথমে "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ" বলিয়া বাগ্‌দেবীর ও রাজা বাক্‌পালের নাম কীর্ত্তন করিয়াছে। আবার "অথবাকৃত বাগদ্বারে" বলিয়া স্পষ্টতঃ এই স্থানের বাগ্‌দুয়ার এই নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই স্থানটি কোথায়, সেইজন্য তিনি কুমারসম্ভবে প্রথমেই "অস্ত্যুত্তর স্যাংদিশি" বলিয়া তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি বিনয় সহকারে সভ্যবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, "আসমুদ্র ক্ষিতীশ" বলিয়া কালিদাস সমুদ্র গুপ্তের উল্লেখ করিয়াছেন, এই সাহেবি সিদ্ধান্ত অপেক্ষায় আমার সিদ্ধান্ত কি দুর্ব্বল? সভ্যবৃন্দের মধ্যে কেহ হয় ত বলিবেন, তোমার এ সিদ্ধান্ত সমুদ্রগুপ্তের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা দুর্ব্বল নহে, প্রত্যুত বলবান্, কিন্তু কালিদাস যে গ্রেহাম সাহেবের প্রতিষ্ঠিত গির্জ্জা দেখিয়া গ্রেহামকে রাম করিয়া শ্লোকে "রামগির্য্যাশ্রমেষু" বসাইয়াছেন, সে সিদ্ধান্ত অপেক্ষায় তোমার এ সিদ্ধান্ত নিশ্চয় দুর্ব্বল। তাহা শুনিলে আমিও মাথা হেঁট করিব, মাথা পাতিয়া সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব।

কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন এই কথা শুনিলে বাঙ্গালী কি তৃপ্তিবোধ করিবে, আমার ত বোধ হয় না; তবে কেন কাব্যতীর্থ মহাশয় মাথা ঘামাইয়া দিবা রাত্রি খাটিয়া এত প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন? উদয়নাচার্য্য বাঙ্গালী ছিলেন, চিরকাল অধ্যাপকবৃন্দের মুখে শুনিয়া আসিয়াছি, বাঙ্গালার অনেক সম্ভ্রান্তবংশ উদয়নাচার্য্যের বংশ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছেন, ঘটকের পুস্তকে পর্য্যন্ত আছে, কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্য বাঙ্গালী ছিলেন। এত প্রমাণ সত্ত্বেও মৈথিলেরা

তাঁহাকে আত্মসাৎ করিতেছেন; কেবল শিক্ষিত বাঙ্গালী নহেন এখনকার বাঙ্গালী নৈয়ায়িক যুবকবৃন্দও সেই তালে নাচিতেছেন। এখনও মহারাষ্ট্রীয়েরা গঙ্গেশকে বাঙ্গালী বলিতেছেন, পুস্তকের ভূমিকায় পর্য্যন্ত লিখিতেছেন, বাঙ্গালী যুবক নৈয়ায়িক কি তাহা শুনিবেন? এই যে আমি কাশী সরস্বতী ভবন হইতে বোপদেবের কৃত অতি প্রাচীন ৩৩খানি পুস্তক আনাইয়া সমগ্র পুস্তকগুলি পড়িয়া বোপদেব বাঙ্গালী ছিলেন, বৈদ্য ছিলেন, সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম ও "অর্চ্চনা"য় বাহির করিয়াছিলাম; কয়জন বাঙ্গালী তাহা বিশ্বাস করিয়াছেন? রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার এম্, এ নিজে বাঙ্গালী, নিজে বৈদ্য হইয়াও সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় নির্ব্বিকারে বোপদেবকে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ লিখিয়া সাহেবদিগের কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। যুক্তি দ্বারা আমার মতের খণ্ডন করা দূরে থাকুক, নগণ্য মনে করিয়া আমার নামের পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। এজন্য আমি মজুমদার মহাশয়কে দোষ দিতে পারি না, এ দোষ আমার। আমি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ বা অন্ততঃ বি, এ পাশও করিতে পারিতাম, পরে তাঁহার ন্যায় একজন প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে বসিয়া কোন একটি ভগ্ন তাম্রফলক বা প্রস্তরফলক লইয়া নাড়াচাড়া করিতাম ও "শৈশবের" "শৈ"টা "কৈ"এর মত দেখা যাইতেছে; সুতরাং এটি কেশব সেনের তাম্রশাসন অবধারণ করিয়া এইভাবে বছর দুই কাল রিশার্চ্চ করিতাম; তাহা হইলে সাইন্টিফিক ভাবে আমার শিক্ষা হইত। সেই শিক্ষা পাইয়া আমি যাহা বলিতাম, তাহার একটা মূল্য থাকিত। আমি যখন সে শিক্ষা পাই নাই, তখন আমার ত সমস্তই বাজে কথা; তখন তাহার আবার আলোচনা কি? আমার যে দোষ, কাব্যতীর্থ মহাশয়েরও সেই দোষ;—তিনিও ত সাইন্টিফিকভাবে শিক্ষা লাভ করেন নাই; আমার ন্যায় তাঁহারও যে বর্ব্বরোচিত "কাব্যতীর্থ" এই একটা উপাধি আছে। সুতরাং শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহার কথা শুনিবেন কেন? যাহা হউক, আমি বহুভাষী হইয়া পড়িয়াছি, যাহা বলিবার তাহা ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। প্রবন্ধের আলোচনা করিতে যাইয়া আমি সভ্যবৃন্দের অনেক সময় গ্রহণ করিব না, ২।৪টি কথা বলিয়া আমি আলোচনা শেষ করিব।

কাব্যতীর্থ মহাশয় কালিদাসের বাঙ্গালীত্বের যতগুলি প্রমাণ দিয়াছেন তন্মধ্যে "সম্বন্ধিনঃ সদ্ম সমাসসাদ" কালিদাস যে শ্যালক অর্থে "সম্বন্ধি" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, এইটি সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় ও সর্ব্বাপেক্ষা সবল। বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কোন

দেশেই শ্যালক অর্থে "সম্বন্ধি" শব্দের ব্যবহার ছিল না এখনও নাই। কোষকার অমরসিংহও "সম্বন্ধি" শব্দের কীর্ত্তন করেন নাই।

অন্য দেশে বৈবাহিক অর্থে "সম্বন্ধি" শব্দের ব্যবহার আছে। ভবভূতিও উত্তর রাম চরিতে জনকের মুখে "সসম্বন্ধী শ্লাঘ্যঃ" ইত্যাদি শ্লোকে দশরথকে জনকের সম্বন্ধী বলিয়াছেন। তাঁহার ২য় প্রমাণ "ঢৌকতে"; এ প্রমাণটিকেও ফেলিয়া দিতে পারা যায় না। সংস্কৃতে ঢৌক ধাতুর অর্থ—ঢাকা নয়। তাঁহার ৩য় প্রমাণ "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" এ প্রমাণটিকেও উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। যাঁহারা 'প্রথম' শব্দের পরিবর্ত্তে "প্রশম্" শব্দ বসাইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমি আর কি বলিব? তাহা হইলে কালিদাসের কবিতাটি একেবারে মাটী হইয়া যাইবে; "আষাঢ়স্যে'র পরে ও "দিবসে" এর পূর্ব্বে "প্রশম" দিলে পাকা হাতের গ্রন্থন হইবে না, সুশিক্ষিত কর্ণ ভিন্ন ইহা অন্যে বুঝিবে না। সঙ্গীতের ধারা যেমন সুশিক্ষিত কর্ণ ভিন্ন ধরিতে পারে না, সংস্কৃত কবিতারও সেইরূপ গ্রন্থন সৌন্দর্য্য সুশিক্ষিত কর্ণ ভিন্ন ধরিতে পারা যায় না। আলঙ্কারিকেরা যে সকল বর্ণ থাকিলে শ্রুতি মধুর হইবে, সুন্দর হইবে বলিয়াছেন, তাহা দিঙ্‌মাত্র নিদর্শন। ইহার প্রকৃত রুল নাই, হইতেও পারে না। মল্লিনাথ অবশ্য বলেন নাই; তিনি অন্য যুক্তি দেখাইয়া "প্রশম" পাঠের খণ্ডন করিয়াছেন।

কাব্যতীর্থ মহাশয় কালিদাসের ব্যবহৃত প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা শব্দের সাদৃশ্য দেখাইয়া কালিদাসকে বাঙ্গালী করিতে চাহিতেছেন; ইহার সমস্ত বিচার সহ নয়। ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিরাও "হদ্ধি হদ্ধি" 'অহ্মো' প্রভৃতি শব্দ নাটকে ব্যবহার করিয়াছেন। "আপ্পা" বাঙ্গালায় যেমন "আপনি" আছে, হিন্দীতেও তেমনি "আপ" আছে। উৎকলীয়েরা "আপনি" শব্দের ব্যবহার করে, আবার "অহ্মো" "তুহ্মো" এখনও তাহাদিগের ভাষায় ব্যবহৃত। তাহা হইলে কালিদাস উড়ে হইয়া যান। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে কলিঙ্গ রাজের খুব বর্ণন করিয়াছেন, গৌড় পৌণ্ড্র বঙ্গের কোন রাজার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। সে যাহা হউক, শব্দ সাম্যের উপরে আমার দৃঢ় আস্থা নাই। কোন্ শব্দ কি কারণে কোন্ দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। কোথায় উৎকল, কোথায় রঙ্গপুর, মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদী, প্রকাণ্ড দেশ ব্যবধান করিতেছে। অথচ উৎকলের অবিকল অনেক শব্দ রঙ্গপুরের ভাষায় দেখিতে পাই, অনেক শব্দের সৌসাদৃশ্যও

অনেক শব্দে দেখিতে পাই। শেউলী ফুলকে উড়িষ্যাবাসী বলে,—"শিঙ্গাহার" রঙ্গপুরের ছোট লোকেরাও বলে শিঙ্গাহার। মিঠা কুমড়া বা বিলাতী কুমড়াকে উড়িষ্যাবাসী বলে,—"বৈতাল" রঙ্গপুরের ছোট লোকেরা বলে "বৈতাল", নাটমন্দিরকে উড়িষ্যাবাসী বলে, "জগমোহন" রঙ্গপুরের ইতর ভদ্র সকলে বলে,—"জগমোহন"। ভগবন্মূর্ত্তি রথে চড়িয়া যে গৃহে যাইয়া কয়েক দিন অবস্থান করেন, তাহাকে উৎকলবাসী বলে,—"গুঞ্জাবাড়ী", রঙ্গপুরবাসীও বলে, "গুঞ্জাবাড়ী" ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার আনারসকে উড়িষ্যাবাসী বলে,—"সফরী পনস," রঙ্গপুরের ছোট লোক সেই পনসের কাঁঠাল অর্থ গ্রহণ করিয়া বলে, "কাঁঠাল সফরী"। কোথায় রঙ্গপুর, কোথায় নৈনীতাল, রঙ্গপুরের ছোট লোকে লাউকে "কদু" বলে; আমি নৈনীতাল গিয়া সে দেশের লোকের মুখে—"কদু" শব্দ শুনিয়াছি। সেদিন "মানসী"তে দেখিলাম ভূতপূর্ব্ব ডিপুটীসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় আসামী ভাষাতে "আতা" (ata) লাটিন শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছেন। লর্ড কারমাইকেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি মিষ্টার গুড়লে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হিন্দীতে প্রচলিত "হাম" শব্দের রুট্ কি ?" আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম,—"সংস্কৃত "অহং" হইতে হিন্দীতে "হাম" হইয়াছে, এই হাম হইতে রঙ্গপুরী ভাষাতে "হামি" হইয়াছে, "হামি" হইতে বাঙ্গালা ভাষায় "আমি হইয়াছে, "আমি"র ম যাইয়া ইংরেজী ভাষায় "আই" হইয়াছে।" মিষ্টার গুড়লে বলিলেন,—তবে কি বাঙ্গালা ভাষারও পরে ইংরেজী ভাষার সৃষ্টি ?" আমি বলিলাম,—"আমি কি করিব ? রুলত আমার নয়; আপনাদিগেরই আবিষ্কৃত।" শুনিয়াছি; ষ্টেট ডিনারের সময় সেই কথায় সাহেব মেমদিগের হাসির তরঙ্গে ডিনার টেবিল শুদ্ধ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

কালিদাসের লিখিত প্রাকৃত শব্দের মধ্যে অধিকাংশ শব্দের সহিতই বাঙ্গালা শব্দের সৌসাদৃশ্য আছে সত্য; বাঙ্গালার এক প্রদেশের শব্দে সেই সৌসাদৃশ্য না পাইলেও অনুসন্ধান করিলে অন্য প্রদেশের শব্দে সেই সৌসাদৃশ্য পাওয়া যাইবে। যেমন কালিদাসের ব্যবহৃত প্রভাত অর্থে,—"পোহাত" শব্দের সৌসাদৃশ্য রঙ্গপুরের ছোট লোকের ভাষায় "পৌয়াতী" শব্দ পাওয়া যাইতেছে। অদ্যাপি তাহারা ভোরে ছেলে হইলে তাহার নাম—"পৌয়াতু," মেয়ে হইলে তাহার নাম "পৌয়াতী" রাখিয়া থাকে।

বাঙ্গালা ভাষা যেমন সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অনুসরণ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, ভারতের অন্য কোন ভাষা সেরূপ করিতে পারে নাই, সেই জন্য কেবল এই কারণে কালিদাসকে বাঙ্গালী বলিতে পারা যায় না। কালিদাসের কাব্যে যে অনেক পরিমাণে বাঙ্গালা ভাব গৃহীত হইয়াছে, বাঙ্গালার আচার ব্যবহার গৃহীত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সহিত আমিও কালিদাসকে বাঙ্গালী বলিতে প্রস্তুত।

কাব্যতীর্থ মহাশয়ের প্রদর্শিত "চিন্তু অন্তম্ম মে পহাদা অচ্ছিসুং রঅনী" আমি শব্দ সাম্য দেখিয়া বলিতেছি না; ভাবের দিক হইতে বলিতেছি, এটি খাঁটী বাঙ্গালার ভাব। এখনও রাত্রে ঘুম না হইলে বাঙ্গালী বলিয়া থাকে,—"চোখের উপরে রাত পোহাইয়া গেল" কালিদাসের "অচ্ছিসুং পোহাতা রঅনীর"ও খাঁটী বাঙ্গালা অর্থ তাই। কেহ কোন এক ব্যক্তির নাম করিতেছে, সেই সময়ে যদি সেই ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে সেই নামোচ্চারণকারী ও সেই স্থানে যাহারা ছিল তাহারা সকলে ঐক্যমত্যে বিশ্বাস করে নিশ্চয় মঙ্গল হইবে। এ বিশ্বাসও বাঙ্গালার, অন্য দেশের নয়। কালিদাসও বশিষ্ঠের মুখে বলিতেছেন,—"উপস্থিতেয়ং কল্যাণী নাম্নি কীর্ত্তিত এব যৎ। অদূর বর্ত্তিনীং সিদ্ধিং রাজন্ বিগণয়াত্মনঃ" নাম করিতে করিতেই যখন এই কল্যাণী উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা জানিবে, তোমার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী। কাব্যতীর্থ মহায়য়ের এই উদ্ধৃত প্রমাণ দেখিয়া তাঁহার সহিত আমিও কালিদাসকে বাঙ্গালী বলিবার জন্য এক মত। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের উদাহৃত—"অরণ্ণেকৃখু মএ রুদিদং" এতক্ষণ আমি অরণ্যে রোদন করিলাম; বাঙ্গালী যে তাহার কথায় কাণ না দিবে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বদায় এইরূপ বলিয়া থাকে। "উড়ুপেনাস্মি সাগরং" ভেলা অন্য দেশে আছে কিনা ঠিক জানি না। আমি অন্য দেশে ভেলা কখনও দেখি নাই। "তেল্ল চিকন শীর্ষণ্ড" তেল চিক্‌নাই মাথা, এ কথাটিও খাঁটী বাঙ্গালীর কথা। আমিও এই ধরণের দুই চারিটি উদাহরণ দেখাইতে চাই। সভাবৃন্দ, আমাকে একটু সময় দিবেন।

১। "অচ্ছিং ভঞ্জির অচ্ছ কারণং পুচ্ছসি" চোখে গুতো মোর চোখের জল কেন পড়ছে জিজ্ঞাসা।

২। "ন খল্ববগচ্ছামি, ভিন্নার্থমভিধীয়তাং" বুঝতে পাচ্ছিনা, ভেঙ্গে বল, বা খুলে বল। সংস্কৃতে "ভিন্ন' শব্দের অর্থ অন্য। কালিদাস এই বাঙ্গালা ভাবের অনুবাদ করিয়াছেন।

৩। "নমে হত্থোপ্রসরদি"। আমার হাত চল্‌ছেনা বা উঠ্‌ছে না।

৪। "অথ কিং?" আর কি? অর্থাৎ ঠিক তাই। বাঙ্গালীরাই ঠিক তাই,—অর্থে আর কি কথার ব্যবহার করে।

৫। "এসদে অওণো চিত্তগদো মনোরহো তাণদে বঅণং সুণিস্সং"। এ তোমার নিজের চিত্তের ইচ্ছা; না তোমার কথা শুন্‌বনা।

৬। "তিষ্ঠ,—শৃণু মে সাবশেষং বচঃ" দাঁড়াও আমার বাকী কথাটুকু শোন। অন্য কথায় বা কাজে বাধ দেওয়ার নাম "দাঁড়াও" এটিও "বাকী" কথাটুকু শোন, এটি বাঙ্গালায় বলিবার ব্যবহার।

৭। "ইদং তাবৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং স্ত্রীণাং" "এটি স্ত্রীজাতির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব" বাঙ্গালী ভদ্রলোকের এটি চির বিশ্বাস; সময়ে তাঁহারা এই ভাবের কথা বলিয়াও থাকেন।

৮। "মা অন্তরা পড়িবন্ধেধ" "বলিতে দেও, সমস্ত বলুক, মাঝখানে বাধা দিওনা।" এটিও বাঙ্গালীর কথা।

৯। "মালেধ কুট্টেধ বা" "মার বা কুট" "মার, কাট, কুট যা হয় কর"। ইহা বাঙ্গালারই কথা। অন্য দেশে "মাছ কুটা," "তরকারি কুটা" কথার পর্য্যন্ত ব্যবহার নাই।

১০। "যদো অথং আমিষগন্ধো বা অহ্নি আগমোদাণিং এদস্স এসো বিমরিসিদব্বো" "যখন এর আঁসটা গন্ধ আস্‌ছে, তখন এখন বুঝতে হবে; এ এই ভাবেই এসেছে।" বাঙ্গালীই বলে "এ জিনিষটা কি ক'রে এল?" কালিদাসও পুনঃ পুনঃ "আগম" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। যাহারা মাছের নামে দশ হাত সরিয়া যায়, তাহারা মাছের আঁসটা গন্ধ বুঝিবে কি করিয়া? হিন্দু হিন্দুর অখাদ্য মাংসের গন্ধ কি জানে? এগুলি আন্দাজি হয় না। আবার মাছের পেটে ছিল শুনিয়া তাহার গন্ধ গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা! একটুকুও ঘৃণা হইল না! বুঝিতে হইবে,—কালিদাস মৎস্যভোজি শ্রেণী অন্তর্গত। মৈথিল ও উড়িয়ারাও মৎস্য ভক্ষণ করে; সুতরাং কালিদাস মৎস্যভোজি-শ্রেণীর অন্তর্গত হইলেও নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিতে পারা যায় না; ইহার উত্তরে আমরা কাব্যতীর্থ মহাশয়ের উদ্ধৃত,—"সম্বন্ধি" শব্দের উল্লেখ করিব। মৈথিল ও উড়িয়ারাও বৈবাহিক অর্থে "সম্বন্ধি"—শব্দের ব্যবহার করে।

১১। "কুল্লন্তি মে অগগ হত্থা ইমং গণ্ঠিচ্ছেদঅং বাবাদিতুং" দেখছ—আমার হাতখানা এগিয়ে আছে, ফুলে ফুলে উঠ্ছে, এই গাঁইট্‌কাটার মাথাটা কাট্‌তে। এও খাঁটী বাঙ্গালা ভাব; "গাঁইট কাটা" কথারও বাঙ্গালায় ব্যবহার।

১২। "সহি, অবলম্বস্ম মং যাব অগগ পদে"—ইত্যাদি সখি, আমাকে ধর, আমি যে পর্য্যন্ত পায়ের আগায় ভর করিয়া আমের মুকুল পাড়ি। এও খাঁটী বাঙ্গালা ভাব।

১৩। "শয্যোপান্ত বিবর্ত্তনৈ র্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপাঃ" শয্যার পাশে এপাশ ওপাশ করিতে করিতে না ঘুমাইয়া রাত্রি কাটাইয়া দেন। খাঁটী বাঙ্গালী ভাব।

১৪। কালিদাস করা অর্থে নানাস্থানে "বন্ধ" ধাতুর প্রয়োগ করিয়াছেন, এটিও বাঙ্গালীত্বের পরিচায়ক।

১৫। "রুদিতোচ্ছূন নেত্রং প্রিয়ায়াঃ" কাঁদিতে কাঁদিতে চোখ ফুলিয়া গিয়াছে।

১৬। "শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা" এই বাকী চারিটি মাস চোখ বুঁজে কাটাইয়া দাও। এইটি দেখিলে কালিদাসকে আর বাঙ্গালী না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। চোখ বুঁজে কাটান বাঙ্গালীরই অভ্যাস, এ ভাবের স্থান বাঙ্গালা সাহিত্যে, বাঙ্গালীর চলিত কথায়, বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষের মুখে; আর অন্যত্র নাই। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বঙ্গদেশের প্রচলিত অভিজ্ঞান শকুন্তলের সহিত উত্তর পশ্চিমের প্রচলিত অভিজ্ঞান শকুন্তলের অনেক অংশে মিল নাই। যে অভিজ্ঞান শকুন্তল লিখিয়া কালিদাস অমর হইয়াছেন, সেখানি বাঙ্গালা দেশের অভিজ্ঞান শকুন্তলই বলিতে হইবে। উত্তর পশ্চিমের অভিজ্ঞান শকুন্তলে সেরূপ গুণ ত কিছুই নাই, বরং সেখানিকে নাটক না বলিয়া চম্পূ বলা কর্ত্তব্য। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও এই মত। তিনি উত্তর পশ্চিমের অভিজ্ঞান শকুন্তল মুদ্রিত করিয়া তাহার ভূমিকায় এই মর্ম্মের কথাই বলিয়াছেন। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নয়; বাঙ্গালার ইডিয়ম্ সে দেশের পণ্ডিতেরা বুঝিতে না পারিয়া সেগুলি বাদ দিয়া লিখিয়াছেন।

এখন একবার আচারের দিক্ দিয়া দেখিতে হইবে; কোন্ দেশের আচারের সহিত কালিদাসের কাব্যোল্লিখিত আচারের মিল হয়। রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরের পর দেখিতে পাই—বিদর্ভরাজ ভগিনী ইন্দুমতীও বর অজকে লইয়া

অন্তঃপুর চত্বরে গিয়াছিলেন। পরে অজকে মহার্ঘ্য সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহাকে বস্ত্র যুগ্মদান করিয়াছিলেন। সেই বস্ত্র পরিধান করিলে তখন বরকে কন্যার নিকটে উপস্থিত করা হইয়াছিল। কুমারসম্ভবেও ঠিক এইরূপ আছে; কালিদাস মহাদেবকেও বাঘছাল ছাড়াইয়া গিরি-রাজ-দত্ত গরদের জোড় পরাইয়াছিলেন; পরে উমার নিকটে তাঁহাকে উপস্থাপিত করা হয়। কন্যাদাতার প্রদত্ত বরণের জোড় বাঙ্গালী বরই পরিধান করে; তৎপরে মুখচন্দ্রিকা হয়। মুখচন্দ্রিকার ব্যবস্থাও এই বাঙ্গালা দেশেই; অন্য দেশে নাই। অন্য দেশবাসী মুখচন্দ্রিকা কি, জানেও না। পদ্ধতিকার ভবদেব ভট্ট মুখচন্দ্রিকাকে "স্ত্র্যাচার সিদ্ধ" স্ত্রীলোকদিগের আচারসিদ্ধ বলিয়াছেন। এই মুখচন্দ্রিকাকে শাস্ত্রসিদ্ধ করিবার জন্য রঘুনন্দনকে বেগ পাইতে হইয়াছে। বরণের পরে বর ও কন্যার একবার পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে হয়; তাহারই নাম মুখচন্দ্রিকা। শিববিবাহেও তাহা হইয়াছিল, অজবিবাহেও তাহা হইয়াছিল। কালিদাস কুমারসম্ভবেও সেই সময়ের কবিতায়—"তয়া প্রবৃদ্ধানন চন্দ্রকান্ত্যা" স্পষ্টতঃ এইরূপ লিখিয়াছেন। "আনন চন্দ্রকান্তি" আর মুখচন্দ্রিকা যে এক জিনিস ইহা আর সভ্যবৃন্দকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। বিবাহে দানের পরে যে কুশণ্ডিকা করিয়া পাণিগ্রহণ, সপ্তপদী-গমন করা হয়, গৌড়ে তাহার পৌরোহিত্য কন্যার পক্ষের পুরোহিতই করেন। কালিদাসও ইন্দুমতীর বিবাহে—"তত্রার্চ্চিতো ভোজপতেঃ পুরোধা হুত্বাগ্নিং"—ইত্যাদি দ্বারা কন্যাপক্ষের পুরোহিতকে সেই ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছেন; ইহাতেও ত বাঙ্গালীত্বের পরিচয় আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই যজ্ঞে অধিকার আছে; কেবল স্ত্রী, শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার নাই। স্ত্রী ব্রত প্রতিষ্ঠাদিতে ও শূদ্র বিবাহাদিতে নিজে হোম না করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম করাইয়া থাকেন।

আশ্চর্য্যের বিষয়! কালিদাস ইক্ষাকুবংশীয় রাজকুমার অজদ্বারা হোম না করাইয়া পুরোহিত দ্বারা হোম করাইলেন; ইহাও একটি ভাবিবার বিষয়। আবার কালিদাস "পিত্র্যমংশমুপবীত লক্ষণং মাতৃকঞ্চদধদুর্জ্জিতংধনুঃ।" উপবীতচিহ্নস্বরূপ পিতার অংশ ও ধনুরূপচিহ্ন মাতার অংশ ধারণ করাইয়া শ্রীরামের সম্মুখে পরশুরামকে উপস্থাপিত করিলেন। পরশুরামের মাতৃকুল ক্ষত্রিয়; ক্ষত্রিয়োক্ত যজ্ঞোপবীত আছে, তবে কেন কালিদাস এরূপ লিখিলেন? মনু বলিয়াছেন; "পৌণ্ড্রদেশবাসী ক্ষত্রিয়েরা আচারে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন।" বঙ্গদেশবাসী সেই ক্ষত্রিয়দিগকে

দেখিয়া কি কালিদাসের ঐরূপ কল্পনা হইয়াছিল? কন্যা সম্প্রদানের পরে পুরন্ধ্রীরা বর কন্যাকে বাসর ঘরে লইয়া যান ও হাস্য কৌতুকে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দেন। এটি বাঙ্গালা দেশেরই আচার, অন্যদেশে এরূপ আচার নাই। অন্যদেশে শ্বশুর গৃহে সে রাত্রিতে বর অবস্থানই করে না। কালিদাস বিবাহান্তে বাঙ্গালীর মত হর পার্ব্বতীকে আশীর্ব্বাদ করাইয়া "কনক কলস যুক্তং ভক্তিশোভা-সনাথং ক্ষিতি বিরচিত শয্যাং কৌতুকাগার মাগাৎ" বাসর ঘরে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা আর কালিদাসের বাঙ্গালীত্বের অধিক প্রমাণ হইতে পারে কি? আর একটী আচার দেখিতেছি মহারাজ কুশ পরিত্যক্ত রাজধানী অযোধ্যায় আগমন করিয়া বাস্তু কর্ম্মবিদ্ ব্রাহ্মণ দ্বারা বাস্তু কর্ম্ম করাইলেন ও অযোধ্যায় যতগুলি প্রতিমা আছে তাহার সম্মুখে বলিদান করাইলেন "ততঃ সপর্য্যাং সপশুহারাং পুরঃ পরার্দ্ধ্যং প্রতিমা গৃহায়াঃ" ইত্যাদি। অন্যদেশে গ্রাম্য প্রতিমাই ত কম দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার সম্মুখে আবার বলিদানের ব্যবস্থা! ভারতের অন্যত্র বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীতে বলিদান আছে, কাশীধামে দুর্গাবাড়ীতে বলিদান আছে। কাশীর দুর্গাদেবী যে গৌড়েশ্বর মহীপাল দেবের প্রতিষ্ঠিত, ঐতিহাসিক তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

কালিদাস আলেয়ারই হউক, ফানুসেরই হউক, সংস্কৃতে তর্জ্জমা করিয়া "সঞ্চারিণী দীপশিখা" লিখুন আর স্বাভাবিক উৎস দেখিয়া ঋতুসংহারে "জল যন্ত্র মন্দির" ও রঘুবংশে "ধারাগৃহ" লিখুন তাহা দ্বারা কালিদাসের বাঙ্গালীত্বের প্রমাণ হয় না। যে দেশের কবির মনেতে ঐরূপ ভাব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইবে তিনিই তাহা করিতে পারেন। ইহাতে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী কিছুই নাই। "ধারাগৃহ" ও "জল যন্ত্র মন্দির" যে পূর্ব্বে ভারতে ছিল ইহার যথেষ্ট প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীতে এখনও তাহার চিহ্ন বিদ্যমান। মুসলমান সাম্রাজ্যের সময়েও স্নানাগারে জলের কল ছিল। যাঁহারা আগ্রার কোর্ট দেখিয়াছেন তাঁহারাই ইহার উপলব্ধি করিবেন। সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সময়ে Irrigation (ইরিগেশান)এর ব্যবস্থা ছিল; কৌটিল্যের অর্থনীতি হইতে আমরা জানিতে পারি, মেগাস্থিনিসের সাক্ষ্য হইতেও আমরা জানিতে পারি।

"অপনীত শিরস্ত্রাণাঃ" ইহা হইতে কালিদাস নাঙ্গা মস্তক ছিলেন বুঝা যায় না। কালিদাস ভারতের একজন সর্ব্বপ্রধান রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন, সে সময়ে

গ্রীক, পারশী ও হুন প্রভৃতি রাজদূতগণ এবং বণিকগণ প্রায়ই ভারতের রাজসভায় আসিতেন। সেই সেই দেশের পদ্ধতি, মাননীয় ব্যক্তির সম্মুখে শিরস্ত্রাণের অপনয়ন করা। আজও ইউরোপীয়দিগের সেইরূপ ব্যবহার আছে। কালিদাস বিদেশীদিগের সেই ব্যবহার দেখিয়াই কাব্যে বিদেশীদিগের বর্ণনায় "অপনীত শিরস্ত্রাণাঃ" লিখিয়াছেন। ভারতের এরূপ আচার নয়; সম্ভ্রান্তব্যক্তির সম্মুখে যাইতে হইলেই উষ্ণীষ ধারণ করা ভারতের ব্যবহার। মেয়েরা পর্য্যন্ত পূজ্যব্যক্তির সম্মুখে মাথায় কাপড় দিয়া থাকেন। যজ্ঞে বাঙ্গালী হোতাও উষ্ণীষ ধারণ করেন। বাঙ্গালীর পাগড়ী কবে হইতে গিয়াছে বলিতে পারি না, পূর্ব্বে ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাই। কালিদাস বনোন্মুখ রঘুর চরনে "বেষ্টন শোভী" ("শিরসা বেষ্টন শোভিনা সুতঃ") মস্তক লুঠাইয়াছিলেন। তবে আর কালিদাসের নাঙ্গা মস্তক বলিব কি বলিয়া? কাব্যতীর্থ মহাশয় কালিদাসের বাঙ্গালীত্বের সাধক যে সকল প্রমাণ দিয়াছেন, তাহাইত যথেষ্ট মনে করিতে পারি; তবে তিনি আবার কেন সাহেবি ভাবাপন্ন প্রমাণ আনিতেছেন, বুঝিলাম না। কালিদাস রঘুবংশে দিলীপ দ্বারা গোসেবা করাইয়াছিলেন বলিয়া বাঙ্গালী হয়েন; তবে মহর্ষি মনু প্রভৃতি ঋষিবৃন্দও বাঙ্গালী হইয়া পড়েন। তাঁহারাও যে গোসেবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, গোপূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন, মাথায় করিয়া গোগ্রাস দিবার বিধান করিয়াছেন। সাক্ষাৎ গোবধ করিলে ত কঠিন প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা অপালন নিমিত্ত গোবধ হইলেও যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় সেই সকল ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের ব্যবস্থা। গো বিক্রয় নিষিদ্ধ, বিশেষতঃ ম্লেচ্ছের নিকটে বিক্রয়, বিনিময় বা দান দ্বারা গো অর্পণ একেবারে নিষিদ্ধ। গো বধ দূরের কথা, মুষ্কচ্ছেদন ও অস্থি ভঙ্গেও যে পাপী হইতে হয় লোমোৎপাটনেও যে দোষী হইতে হয়। ঋষিরা যে গোমাংস ভক্ষককে ম্লেচ্ছ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঋষিরা বাঙ্গালায় আসিয়া কোন অনার্য্য জাতির নিকটে গোসেবা শিক্ষা করিয়াছিলেন? সাঁওতালেরা ত গোমাংস ভোজী। দ্রাবিড় জাতি যদি সাহেবদিগের মতানুসারে রাক্ষসের বংশধর হয়, তবে তাহারাও ত পূর্ব্বে গোমাংস ভোজী ছিল। বেদেও গোপূজার ব্যবস্থা ছিল, অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া ও প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হয় বলিয়া, সে সকল প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না।

কালিদাসকে বাঙ্গালী করিবার জন্য কাব্যতীর্থ মহাশয়ের একটা ঝোঁক

দাঁড়াইয়াছে; সেই ঝোঁকের মাথায় তিনি সাহেবদিগের মত আর্য্যেরা ভারতের অধিবাসী নহেন, ম্লেচ্ছদেশ হইতে এদেশে আসিয়াছেন, গোমাংস তাঁহাদিগের অতি প্রিয় খাদ্য ছিল, এই সকল অহিন্দুচিত কথা পর্য্যন্ত বলিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কোন কাজেই ঝোঁক ভাল নয়, বিশেষতঃ ইতিহাসে। ইতিহাসে ঝোঁক থাকিলে সত্য নির্দ্ধারণ হয় না। ঐতিহাসিক জজের মত প্রমাণের বলাবল পরীক্ষা করিয়া সত্য নির্দ্ধারণ করিবেন। পূর্ব্বে অশ্লীল অর্থে "প্রসূতি" শব্দের প্রয়োগ ছিল; এটি ত একেবারে আন্দাজ; ইহারও কোনও প্রমাণ নাই। বরং ভদ্র বাঙ্গালীরা পূর্ব্বে "অমুকের প্রসূতি" "খোকার প্রসূতি" ইত্যাদি বলিয়া মাতৃ অর্থে "প্রসূতি" শব্দের ব্যবহার করিতেন। সেই অর্থ গ্রহণ করিলে বরং কালিদাসের বাঙ্গালীত্বের প্রমাণ হয়। ষষ্ঠীতৎপুরুষ প্রভৃতি সমাস অপেক্ষায় কর্ম্মধারয় সমাসের বলবত্তা ন্যায় ও মীমাংসার এই সিদ্ধান্ত। "মৎ প্রসূতি" এখানেও কর্ম্মধারয় সমাস। আমি যে প্রসূতি (জননী), আমাকে আরাধনা না করিলে ইত্যাদি।

কাব্যতীর্থ মহাশয় আবার বলিতেছেন,—কালিদাসের সংস্কৃত অনুস্বার বিসর্গ উঠাইয়া দিলে একেবারে বাঙ্গলা হইয়া যায়। আমি ত এ মতের একেবারে সমর্থন করিতে পারি না। কালিদাস কি কলিকাতা ইউনিভারসিটির ছাত্র ছিলেন, "উপক্রমণিকা" পড়িয়া "নরঃ নরৌ নরাঃ" মুখস্থ করিয়াছিলেন, ও বাঙ্গালী ছাত্রের মত বাঙ্গালায় প্রবন্ধ ঠিক করিয়া অনুস্বার বিসর্গ দিয়া পরে কাগজে লিখিয়াছিলেন? তাহা হইলে ত কালিদাসের সংস্কৃত সংস্কৃতই নহে। কালিদাসের ত দূরের কথা, খাঁটী বাঙ্গালী জয়দেবের গীত গোবিন্দও তাহা নহে। সংস্কৃত ষ্টাইল ও বাঙ্গালা ষ্টাইল একেবারে পৃথক। সংস্কৃতের কথায় কথায় অনুবাদ করিলে, রাম ফেলিয়া গিয়াছে তাহার পুস্তক পেছনে (Râm has left his book behind) এর মত বাঙ্গালা হইয়া উঠে। সাহিত্য সভার সভ্য, আপনারা সকলেই সংস্কৃত জানেন, আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি আপনারা কালিদাসের একখানা কাব্য সম্মুখে রাখিয়া তাহার যে কোন শ্লোকের কথায় কথায় বাঙ্গালা করিবেন দেখিবেন আমার কথা ঠিক কিনা। যে কবি ও যে লেখকের ভাষায় জড়তা নাই, আবিলতা নাই, আড়ষ্টভাব নাই, যাহার ভাষা নির্ব্বাধ, নির্ম্মল নির্ঝরের মত তর তর বেগে চলিয়া যায় সেই কবি ও সেই লেখক যেমন নিজের কল্পনা প্রসূত ভাবরাশিকে ভাষার মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারেন সেইরূপ তাঁহারা অনুবাদ করিতে

যাইলেও সেই অনুবাদ্য গ্রন্থকে ঠিক জলের মত বুঝাইয়া দিতে পারেন এটি মূল গ্রন্থকর্ত্তার গুণ নহে; অনুবাদকের গুণ। অনুবাদ পড়িয়া পাঠক পাঠিকা যদি মূল গ্রন্থকর্ত্তাকে ভুলিয়া সেই অনুবাদকেই মূল পুস্তক মনে করেন এবং সেই অনুবাদের সৃষ্টিকর্ত্তাকে গ্রন্থকার বলিয়া ভুল করেন তবেই বুঝিব অনুবাদ খাঁটি হইয়াছে। সকলের তাহা হয় না; ভাষা সহচরীর মত যাহার অনুগমন করে তাহারই সেইরূপ শক্তি। মেঘদূতের অংশ বিশেষের কবিতায় অনুবাদ করিয়াছিলেন কবি সম্রাট, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ। সে অনুবাদ পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি, বিস্মিত হইয়াছি, কালিদাসকে ভুলিয়া গিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের শব্দের ঝঙ্কারে, রবীন্দ্রনাথকেই সেই অংশের সৃষ্টিকর্ত্তা মনে করিয়াছি। কালীদাস বাঙ্গালী বলিয়াই ইহা হয় নাই, ইহা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচায়ক। এই সঙ্গে আর একটী নামও করিতেছি; ইনি আপনাদিগের সাহিত্য সভারই অন্যতম সভ্য-সুকবি, সুরসিক শ্রীযুক্ত রসময় লাহা। এই রসময় বাবুও ঋতুসংহারের কবিতায় অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি নিজের কৃতিত্ব, কবিত্ব, শব্দরাশির উপরে নিজের প্রভুত্ব দেখাইয়াছেন। অনেকেই হয়ত পড়িয়াছেন, না পড়িয়া থাকেন পড়িয়া দেখিবেন।

মহামহোপাধ্যায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ সি, আই, ই মহাশয় উজ্জয়িনী দেখিতে গিয়াছিলেন; তাঁহার মুখে শুনিয়াছি কালিদাসের কাব্যে যত গাছ-পালার উল্লেখ আছে সেইগুলি উজ্জয়িনীতে আছে কিনা তাহারই অনুসন্ধানে। এ অনুসন্ধানে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন আমি জানি না। আমি কিন্তু জানি, কালিদাসের কাব্যোল্লিখিত সমস্ত গাছপালা বাঙ্গালায় পর্য্যাপ্তরূপে আছে। বৃক্ষশূন্য কলিকাতায় বসিয়া, কলিকাতায় নাই বলিয়া, বাঙ্গালায় নাই সিদ্ধান্ত করিলে চলিবে না, বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে যাইতে হইবে; পল্লীবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া, প্রত্যেক তরুলতা গুল্মের পরিচয় লইতে হইবে; নাম শুনিতে হইবে; কোন্ সময় তাহার পুষ্পোদ্গম হয়, কোন্ সময় তাহার ফলোদ্গম হয় জানিতে হইবে। কালিদাস কুটজ কুসুম দিয়া অর্ঘ্য সাজাইয়াছিলেন, টীকাকার মল্লিনাথের দেশে কুটজ বৃক্ষ নাই, তাই তিনি কুটজ পুষ্পের প্রতিশব্দে "গিরিমল্লিকা" লিখিয়াছেন। শুনিয়াছি কোন এক অধ্যাপক "চক্রস্ত" তাহার প্রতিশব্দ "গ্রাবঃ" দিয়াছিলেন। এটিও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। বাঙ্গালায় পল্লীতে পল্লীতে কুটজ

বৃক্ষ আছে ; সেকালের গৃহিণীরা ইহার ছাল উঠাইয়া রক্ত আমের ঔষধে দিতেন, কবিরাজেরা এখনও ব্যবহার করিয়া থাকেন। কালিদাসের আর একটী প্রিয় পুষ্প "কুরবক," কুরবক আর কিছুই নয়, রক্তঝিণ্টি। তারপর "কর্ণিকার," সোঁধালু ; হরিদ্রাবর্ণ পুষ্পে সোঁধালুর গাছ ভরিয়া যায় ; কালিদাস মোহিত হইয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ জয়পালকেও "কর্ণিকার" বলেন, তাহারও অপর্য্যাপ্ত পুষ্পে বৃক্ষের শোভা হয়। "সায়ন্তন মল্লিকা" হুগলী, ২৪ পরগণায় যাহাকে কৃষ্ণকলি পুষ্প বলে, রঙ্গপুরে যাহাকে সন্ধ্যামালতী বা সন্ধ্যামল্লিকা বলে, তাহাকেও "সায়ন্তন মল্লিকা" বলিতে পারি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস নাই। সন্ধ্যামল্লিকার গন্ধ অতি অল্প। কালিদাস "সায়ন্তন মল্লিকার" ভরপুর সৌরভের কথা বলিয়াছেন। আমার বোধ হয় আর কিছুই নয়,—হাঁচনা-হাঁনা ইহা পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় ছিল, এখনও বাঙ্গালায় আছে ; কোনও দেশ হইতে আসে নাই। যাঁহারা গোলাপকে ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়াছে বলেন, তাঁহাদিগকে আমি অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন তীর্থযাত্রার জন্য নয়, এই তথ্য জানিবার জন্য একবার উত্তরা পথে ভ্রমণ করেন, দেখিবেন রাস্তার ধারে, বন জঙ্গলে বড় বড় গোলাপে গাছ ভরিয়া ফুটিয়া বন আলো করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং কালিদাসের "পাটল"ও যে গোলাপ, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। তারপর কালিদাসের "বন্ধুজীব ও বন্ধুক" যে বান্ধুলী তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে প্রচুর পরিমাণে তিলের আবাদ ছিল তাহা বোধ হয় আপনারাও জানেন, আমিও ছোট বেলায় দেখিয়াছি, সুতরাং তিল পুষ্পে ভ্রমর পড়াতে যে মুক্তার সহিত নীলকান্তমণির সমাবেশ হইয়াছে কালিদাস লিখিয়াছেন, তাহা দেখিলেই বুঝা যায় যে তিলের ফুল ; আর কিছুই নয়। যুইফুলের কলি দিয়া যে এখনও হস্তাভরণ প্রস্তুত করিবার রীতি আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। মালতী, মল্লিকা (বেলফুল), নবমল্লিকা, বকুল, কেশর, নাগ কেশর, কেতকী, কদম্ব, কুন্দ, অশোক, কিংশুক (পলাশ) কুসুম্ভ (কুসুমফুল) লোধ্র (লোধ) আম্র মুকুল, শেফালিকা, কহ্লার, কুমুদ, পদ্ম, সপ্তচ্ছদ (ছেতন), কাশপুষ্প, (কেশের ফুল) শালিধান্য ও ইক্ষু সর্ব্বজন পরিচিত। কালিদাস সর্জ্জপুষ্প (সজিনার ফুল) পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই। এক সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে দুইটীমাত্র অর্জ্জুন বৃক্ষ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যমলার্জ্জুন ভঞ্জন করিয়া তাহারও উচ্ছেদ করিয়াছেন। বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র অর্জ্জুন বৃক্ষ আছে ;

কবিরাজেরা এখনও অর্জ্জুন ঘৃত প্রস্তুত করেন। ফুল ফুটিলে অর্জ্জুন বৃক্ষের অত্যন্ত শোভা হয়। কালিদাসের ককুভ যে অর্জ্জুন বৃক্ষেরই নামান্তর তাহা আর বলিবার প্রয়োজন করে না। অবশ্য কালিদাসের পুস্তকে জবা, অপরাজিতা, করবীর পুষ্পের নাম নাই, থাকিলেই বা কি হইত? এসকল পুষ্প ভারতের সর্ব্বত্র রহিয়াছে। কেন নাই ইহার উত্তর ভাল জানি না। কালীদাস উপবন পুষ্প অপেক্ষা বনপুষ্পের অধিক আদর করিতেন। তাঁহার মতে "বনলতা দ্বারা উদ্যান লতা পরাজিত" তাই হয়ত তিনি জবা, করবী, অপরাজিতার নাম করেন নাই। ইন্দ্র গোপ কীট "সোণাপোকা" নামে বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইহা সোণার মত চকচক করে। ছোট মেয়েরা ইহাকে ধরিয়া পূর্ব্বে কপালের টিপ দিত। ইহার এক নাম "অগ্নিকণঃ"। কালিদাস অগ্নিকণার সহিত তুলনাও করিয়াছেন, অন্যত্র বর্ণনও করিয়াছেন। আর একটী কথা, "বৃদ্ধৌনদী মুখে নৈব প্রস্থানং লবণাম্ভসঃ" কালিদাস রঘুবংশে এই দুই চরণে জোয়ার ভাটার কথা বলিয়াছেন। এইমাত্র প্রমাণ দ্বারা আমি কালিদাসকে বাঙ্গালী বলিতে পারি না। বাঙ্গালা দেশেও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রের জোয়ার ভাটা খেলে, এটা ঠিক। কালিদাস যব, গোধূম ক্ষেত্রের কুত্রাপি বর্ণনকরেন নাই, এটিও একটী ব্যতিরেকী হেতু। তারপর কালিদাসের জীবন চরিত সম্বন্ধে যে সকল আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে সে গুলিও কালিদাসের বাঙ্গালীত্বের সাধক আমি অবশ্য বাঙ্গালা দেশের প্রচলিত গল্প লইয়া বলিতেছি না, অন্য দেশের প্রচলিত আখ্যায়িকা লইয়াই বলিতেছি। যিনি গল্পের তোড়ে, গল্পের ইন্দ্রজালে মুহূর্ত্তে নরনারীকে একটা নূতন রাজ্যে লইয়া যাইতে পারেন সেই প্রভাতকুমারের নূতন প্রচারিত 'গহনার বাক্সে'র শেষ অংশ পড়িয়া দেখিলেই সভ্যবৃন্দ আমার মতের সহিত একমত হইবেন। কালিদাসের বাঙ্গালীত্বের সাধক যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, আর অধিক দিতে চাই না। ইহার বিরুদ্ধেও দুই চারিটি যুক্তি আছে; তাহার উত্তরও আছে, সেইজন্য সেইগুলি উদ্ধৃত করিয়া আর শ্রোতৃমণ্ডলীর বিরক্তি উৎপাদন করিলাম না। বৃদ্ধের অবশ হস্তের অবশ লেখনী আর চলিতে চাহে না; সুতরাং সুকবি বিহারীলাল সরকারের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া—

যার কাব্য কীর্ত্তি জগৎ জুড়িয়ে
যার পূর্ণ স্মৃতি ভুবন ভরিয়ে

* * *

কবি কালিদাসে কেবা নাহি জানে?

এই বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।*

---

* ২৭শে কার্ত্তিক "সাহিত্য সভা"র বিশেষ অধিবেশনে "অর্চ্চনা" সম্পাদক শ্রীকেশবচন্দ্রগুপ্ত এম্ এ, বি, এল্ কর্ত্তৃক পঠিত।

ছায়া।

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

দুর্গদ্বারের সম্মুখ।

ছায়া, সঙ্গপাল ও সৈন্যগণ।

সৈন্য।—

জয় মা চণ্ডিকার জয়! জয় কাশ্মীরের জয়!
জয় মহারাজ মুকুলদেবের জয়!

সঙ্গ।—

সত্য চণ্ডিকা এই অবতীর্ণ হের
ভূমণ্ডলে দলিবারে ইরাণী দানবে।
কি ভয় মোদের আর অচিরে কাশ্মীরে
লুপ্ত হবে ইরাণীর নাম। শান্তিময়
কাশ্মীরে রহিবে সুখে কাশ্মীর-সন্তান।
মুক্তকণ্ঠে জয়কার উঠাও গগনে,
বল সবে জয়, জয়, কাশ্মীরের জয়!
দেবতা সহায় রণে কি ভয় কি ভয়!

সৈন্য।—

জয় জয় জয় আজি কাশ্মীরের জয়!
দেবতা সহায় রণে কি ভয় কি ভয়!

ছায়া।—

বৎসগণ! চণ্ডিকা নহিক আমি, দেবী
নই, সামান্য মানবী। দেবতা কৃপায়
শুধু পাইয়াছি দেব শক্তি, ইরাণীর
কর হ'তে রক্ষিতে কাশ্মীর।

সঙ্গ।— দেবতার
কৃপায় মানবী যেই, দেবশক্তি বলে
শক্তি মতী—পালিবারে দেবতা আদেশ
দেবী সেও পূজ্য মানবের। মাগো, ভ্রান্ত
হই, এই ভ্রান্তি প্রাণে বল। দীনহীন
মূর্খ মোরা, কিবা ক্ষতি ভ্রান্তিতে মোদের?
ভেঙ্গোনা এ ভ্রান্তি মাগো মিনতি সবার।

ছায়া।—

ভাল তাই হবে, ভেবো তাই, প্রাণে বল
পাওয়া ভাবিয়া, কিবা ক্ষতি? নিজে
আমি চিনিত নিজেরে? যাক্ এ কথা
এখানে থাক্। শোন বন্ধুগণ, আজি
অগ্রসর হব মোরা রাজধানী মুখে।
গিয়া সেথা সিংহাসনে বসায়ে রাজারে,
অভিষেক করিব তাঁহার। পথি মাঝে
ইরাণীর সেনা আসি জানিও নিশ্চয়,
বার বার গতিরোধ করিবে মোদের।
দিন দিন কত হবে রণ। কালি দেখিয়াছ
সবে, দেবতা সহায় হ'লে রণে নাহি ভয়।
এখনো সহায় জেনো দেবতা মোদের।

বুকে রেখে দৃঢ় এ বিশ্বাস—প্রাণ দিয়া
মাতৃভূমি উদ্ধার করিব পণ এস—
সবে হই অগ্রসর।
সঙ্ঘ।— যাত্রাকালে এস
সবে ডাকি মোরা মহামায়া মহাশক্তি
শক্তি প্রদায়িনী—দানব দলনী মাতা-
রণচণ্ডিকায়। বলবীর্য্য শক্তি আর
সমরে বিজয় বর—এস মেগে লই।

(সকলের জানুপাতিয়া উপবেশন ও গান)

জয় রণ চণ্ডিকে জয় মা কালিকে জয় মহারুদ্রে জয় জয় জয়!
(জয় জয়—জয় জয়—জয়—জয়—জয়!)
জয় জয় ধ্বনিত কম্পিত ত্রাসিত হোক্‌মা ধরার যত অরাতি ক্ষয়।
ঘোর ঘন হুঙ্কারা—খড়্গ ধরা!
মুণ্ড মালিনী ঘোরা—মুণ্ড করা!
রক্ত দশনা রক্ত রসনা রক্ত লোচনা—ভয়ঙ্করা।
আয় রণ তাণ্ডবে দলিয়া মা দানবে নাচ্‌মা নাচ্‌মা ভীমা রণভূমিময়!
দনুজ শোণিতে রঞ্জিত চরণে,
লুটায়ে ললাট নমি জনে জনে;
অরাতি রক্তে পদরজ সিক্তে দেওমা ভক্তে দীক্ষা রণে।
বাজ রণ রঙ্গিনী হৃদে হৃদে খড়্গিনী, অশনি শিখায় প্রাণ কর তেজোময়।
যাই সবে ধাইয়া রণমদে মাতিয়া পদতলে দলিয়া অরাতি চয়।
জয় জয় জয় রণে চণ্ডিকার জয়!

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্‌-এ।

অভিজ্ঞান শকুন্তলে দুটি চিত্র।

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা।

(সাহিত্য সভার মাসিক অধিবেশনে পঠিত)

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা লইয়াই শকুন্তলা। তপোবনবাসিনী শকুন্তলার স্বভাব সরল কোমল ভাবই অনসূয়া। দুষ্মন্ত মহিষী শকুন্তলার আহার্য্য শোভাময় উজ্জ্বল ভাবই প্রিয়ম্বদা। অনসূয়াভাবে শকুন্তলা হাবভাববর্জ্জিতা আশ্রমবাসিনী কিশোরী। প্রিয়ম্বদাভাবে শকুন্তলা হাবভাবময়ী বিলাস বিভ্রমবতী তরুনী। চিৎশক্তি ও অচিৎশক্তিকে না বুঝিলে যেমন মহাশক্তিকে বুঝা যায় না; তদ্রূপ অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাভাব না বিশ্লেষণ করিলে শকুন্তলা চরিত্রের জ্ঞান হয় না।

অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে শকুন্তলা মূল নায়িকা। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা দুটী উপনায়িকা মাত্র। অনসূয়ার মধ্যে মুগ্ধা নায়িকার ভাব। স্বভাবতঃ সরলা মৃদুলজ্জাশীলা; প্রীতির মাধুর্য্যমূর্ত্তি। পূর্ণচন্দ্রপ্রভামূর্ত্তি ধরিয়া যেন ধরায় অবতীর্ণা। নবস্ফুট মল্লিকার মত পরিমলময়ী। প্রিয়ম্বদার মধ্যে মধ্যা নায়িকার ভাব। প্ররূঢ় স্মর যৌবনা, ঈষৎ প্রগল্‌ভবচনা, মধ্যম ব্রীড়িতা। স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অতি চতুরা। আদিরসের অধিদেবতা। নবোদিত সূর্য্যরশ্মি শরীরিনী হইয়া সঞ্চরমাণা পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদ্মিনীর মত সৌরভময়ী।

অনসূয়া।

অনসূয়া আশ্রমের শান্তিময়ী লক্ষ্মী। প্রিয়ম্বদা নগরের ভোগময়ী সম্রাজ্ঞী। একটী তরুচ্ছায়া স্নিগ্ধা বননদীর মত ধীরে ধীরে বহিয়া যায়। অপরটী বর্ষার রঙ্গভঙ্গে নর্ত্তনশীলা বিশালোরস্কা গিরিনদীর মত সবেগে সগর্ব্বে ছুটিয়া চলে। একটী জ্যোৎস্নামধুর শারদীয়া রাত্রি। অন্যটী তপনালোক সমুজ্জ্বল প্রভাতমূর্ত্তি। একটী ভাবপ্রধানা কর্ম্মময়ী বালা। অপরটী কর্ম্মপ্রধানা ভাবময়ী রমনী।

অনসূয়ার সৌন্দর্য্য ব্রীড়াসঙ্কুচিত; তাহাতে মাধুর্য্য আছে কিন্তু দাহ নাই। সে সৌন্দর্য্যে মানব মুগ্ধ হয় কিন্তু পুড়িয়া মরে না। দেহে যৌবনের শ্যামশোভা মুখখানি কিন্তু বালিকার মত কোমল সারল্যেভরা। হৃদয়ও কুন্দফুলের মত স্বচ্ছ সুবাসময়। অনসূয়ার প্রীতি বালচন্দ্র জ্যোতির মত সুমধুর ও সুশীতল। সে

প্রীতি হৃদয়ের বিশ্রাম। তাহার দ্বারা দেখার তৃপ্তি হয়, খেলার সাধ মেটে, কিন্তু সে প্রীতি সংসারে সুদৃঢ় উপযোগিনী নহে, জীবনসংগ্রামে সহায়রূপা হয় না, অবসন্ন প্রাণে উদ্দীপনা আনে না। সে আবেশের মত, স্বপ্নের মত। তাহার স্থির চক্ষুতে বিদ্যুদ্দামস্ফুরণ চকিত কটাক্ষ খেলে না। তাহা সায়াহ্ন আকাশের মত প্রশান্ত, সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত তাহার গতি; তাহা হেলিয়া দুলিয়া চলে না। তাহা শুধু কোমল মকমলের আস্তরনেরই যোগ্য। তাহার হাসিটি স্বচ্ছজলে চন্দ্রকর রশ্মির মত বড় মধুর, বড় কোমল, বড় উজ্জ্বল। সে হাসির মত যুবতীর লালসা নাই, চতুরার কুটিলতা নাই, বিলাসিনী ছলাকলা নাই। তাহা অমৃতের মত পবিত্র, মুক্তাফলের মত স্বচ্ছ, শিশুর মত নিষ্কলঙ্ক। অনসূয়া কথা কহে যেন বীণা। বীণা ঝঙ্কার দেয়। তাহাতে সরলতা মাধুর্য্যই উচ্ছলিত হয়। সে যেন শ্রমাবশানে বিশ্রান্তির মত, যুদ্ধশেষে শান্তির মত।

প্রিয়ম্বদা।

প্রিয়ম্বদার সৌন্দর্য্য নব তপন কিরণ ফুল্ল শতদলের মত। তাহা যেমন সুবাসময় তেমনই মত্ততাজনক। সে সৌন্দর্য্যে নর মুগ্ধও হয়, আবার দগ্ধও হয়। প্রিয়ম্বদার হৃদয়ে গোলাপের সৌরভ যুথিকার কোমলতা, পদ্মবৃন্তের কর্কশতাও বিদ্যমান। যেমন রসভাবজ্ঞা ব্যঙ্গপরায়ণা, তেমনই মধুর হাসিনী প্রিয়বাদিনী। সে যেমন প্রেম গীতির মত মনোহারিণী, তেমনই ভেরীধ্বনির মত উদ্দীপনা দাত্রী। তাহার প্রাণ নদীতরঙ্গের মত চঞ্চল দৃশ্যও কথঞ্চিৎ আবিলতাময়, কিন্তু তার অভ্যন্তর ভাগ যেমন স্বচ্ছ তেমনই শীতল। তাহাতে ভালবাসার সাধ মেটে, খেলার সুখ চলে আবার লালসা ক্ষুধারও শান্তি হয়। সে শ্রান্ত হৃদয়ের বিশ্রামরূপা, জীবন যুদ্ধের সঙ্গিনী। তপোবনের পবিত্রতার সঙ্গে রাজান্তঃপুরের রসভাব চাতুর্য্যের যুগপৎ মিলন প্রিয়ম্বদাকে এক অপূর্ব্ব শ্রী সম্পৎ দান করিয়াছে। তাহার প্রেম মধুর অথচ তীব্র। তাহার দৃষ্টি সরল অথচ অন্তর্ভেদিনী। সে দৃষ্টি বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ মেঘবৎ চঞ্চল। তাহার ভঙ্গীটি লীলাময়ী সঙ্গীত মধুরা, সম্রাজ্ঞীরই উপযুক্ত। তাহার হাসিটি জ্যোৎস্নাকর দীপ্ত সুন্দর, দর্শনমাত্র প্রাণ মন হরণ করে। সে হাসির ভিতর দিয়া রসতরঙ্গ দিবা রাত্র চলে। তাহার বাণী নদী পার শ্রুত সঙ্গীতের মত শ্রবণ মনোহারী। প্রিয়ম্বদার হৃদয়ের বিশ্রান্তি অবসাদের উন্মাদনা, বীরত্বের উদ্দীপনা, স্বর্গের সুখ, চিত্তের ভোগ ভালবাসার বিলাস।

অনসূয়া।

অনসূয়া অসূয়া শূন্যা সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি। চাতুর্য্য জানে না ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণবাণ যোজনা করিতে সে আদৌ শেখে নাই, প্রাণটি ছলাকলা বিহীনা সহানুভূতিময়। তাই শকুন্তলা যা কিছু মনের কথা নির্ভয়ে অসঙ্কোচে অগ্রে অনসূয়াকেই বলে বক্ষের বল্কল মোচন করিবার জন্য শকুন্তলা অনসূয়াকেই অনুরোধ জানায় *। আবার প্রিয়ম্বদার উপর কৃত্রিম রাগের ভাণ করিয়া লজ্জা-কোপজড়িত-নেত্রে অনসূয়াকেই কহে "অনসূয়ে, আমি চলিলাম।"

আশ্রমের ক্ষুদ্র তরুগুলিতে জল দিবার জন্য শকুন্তলা সহ অনসূয়া প্রিয়ম্বদা উপস্থিত। তিন জনের কক্ষে ক্ষুদ্র সেচন কলস, অধরে মধুর হাসি, ললাটে স্বচ্ছ স্বেদ বিন্দু। তিন জনের বয়স প্রায় সমান তন্মধ্যে অনসূয়া কিছু ছোট প্রিয়ম্বদা কিছু বড়। প্রিয়ম্বদা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মত শকুন্তলাকে স্নেহ করে; অনসূয়া কিশোরী নববধূর মত (ঠিক উপমান না হইলেও) শকুন্তলাকে ভালবাসে। শকুন্তলা তার প্রাণটি ঢালা। তার ভালবাসা কত গাঢ়, সহানুভূতি কত প্রবল, এবং হৃদয়টি কত কোমল—তাহা প্রথম কথাটিতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

"সখি শকুন্তলে, পিতা কণ্ব তোমার চেয়ে আশ্রমের তরুগুলিকে অধিক ভালবাসেন, নতুবা নবমল্লিকার মত কোমলা তোমাকে দিয়া আলবাল পরিপূরণে নিযুক্ত করিয়াছেন কেন?" কি মধুর কোমলা বাণি। বাণির ভিতর দিয়া অনসূয়ার কোমল ছবিটি সুন্দররূপে সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

শকুন্তলা যখন উত্তরে বলিল—"সখি অনসূয়া, কেবল পিতার নিয়োগ বলিয়া নহে; উহাদের উপর আমার সহোদরের স্নেহ আছে।" তখন অনসূয়া আর সে কথার উত্তর দিল না। নিস্তব্ধে জলসেচন করিতে লাগিল।

প্রিয়ম্বদা যখন জিজ্ঞাসা করিবে "অনসূয়ে জান কি, কেন বনতোষিণী নব সলিলাকে শকুন্তলা এত আগ্রহ ভরে দেখিতেছে?" অনসূয়া সরলপ্রাণা, প্রিয়ম্বদার বাক্‌চাতুরীর মধ্যে প্রবেশ করে সাধ্য কি? অত বুঝেও না। উত্তরে বলিল মাত্র "আমি জানি না।"

রাজা দুষ্মন্তের গম্ভীর আকৃতি দেখিয়া, স্নিগ্ধ মধুর আলাপ শুনিয়া, ঐশ্বর্য্য ও দাক্ষিণ্যের অপূর্ব্ব সন্নিবেশ লক্ষ্য করিয়া প্রিয়ম্বদার জানিতে ইচ্ছা হইল "ইনি

---

* অনসূয়ে, বড় দৃঢ় করিয়া প্রিয়ম্বদা আমার বল্কল বাঁধিয়া দিয়াছে, তুমি শিথিল করিয়া দাও।

কে ?” সে ইচ্ছা প্রিয়ম্বদা দমন করিল; অনসূয়া কিন্তু কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল। সে জিজ্ঞাসার মধ্যে ঋষিকন্যাগণের সভ্যতা, শিষ্টাচার, সদালাপ ও সুশিক্ষার প্রভাব পরিস্ফুট; বিনয়ের সঙ্গে অকৃত্রিম ভাবের মিলন অভিব্যক্ত।

“আর্য্যের মধুরালাপ জনিত বিশ্বস্ততা আমাকে আলাপে প্রণোদিত করিয়াছে। আর্য্য, কোন্ রাজর্ষিবংশ আপনার দ্বারা অলঙ্কৃত; কোন দেশ সম্প্রতি আপনা কর্ত্তৃক বিরহোৎকণ্ঠিত, কি নিমিত্তই বা আপনি এমন সুকুমার আত্মাকে তপোবনাগমনশ্রমে উপনীত করিয়াছেন ?” পরিচয় লইবার ভঙ্গীটি কি সুন্দর! ইহার মধ্যে কৃত্রিম আদপ কায়দা নাই, যুবতী জনোচিত ছলাকলা নাই; ইহা অকৃত্রিম সরল হৃদয়ের স্বতোনিসৃতবাণি। কে বলিবে প্রাচীন কালের রমণীরা শিক্ষাদীক্ষা হীনা সভ্যতা বর্জ্জিতা এবং শিষ্টাচার শূন্যা।

রাজা শকুন্তলার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। প্রিয়ম্বদা সে পরিচয় দিল না। সে পরিচয় দিবার সময়ে কি বাধা উপস্থিত হইবে, ইহা সে অগ্রেই বুঝিয়াছিল, এবারও সরল প্রাণা অনসূয়াই পরিচয় দিল।

“রাজর্ষি মহাপ্রভাব বিশ্বামিত্রই ইহার জনক। পিতৃমাতৃ ত্যক্তা কন্যার কণ্বঋষি প্রতিপালক পিতা।” ... ... “বসন্তোদয় সময়ে অপ্সরার উন্মাদক রূপ দেখিয়া এইরূপে জন্ম ব্যাপার বলিতে গিয়া রমণী হৃদয়ের স্বাভাবিক লজ্জার জন্য অনসূয়া আর বলিতে পারিল না। এ লজ্জা স্বভাব সরলার পক্ষেও স্বাভাবিক। বয়সের ধর্ম্মে সুশিক্ষার গুণে, প্রিয়ম্বদার মত রস ভাবতা, শকুন্তলার মত ভাব প্রবণা সখীদের সাহচর্য্যে রমণী হৃদয়ের স্বাভাবিক লজ্জা আরও বৃদ্ধিই পাইয়াছে। শকুন্তলা ও প্রিয়ম্বদার মত সঙ্গিণী পাইয়াছিল, তপোবনের রমণী ধর্ম্ম শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া অনসূয়া মিরণ্ডা হইয়া উঠে নাই। অনসূয়ার অবস্থায় মিরণ্ডা গড়িয়া উঠে না। তপোবন নির্জ্জন দ্বীপ বা অরণ্য নহে। খাঁটী বন্যভাব তথায় জন্মান সম্ভব নহে।

শকুন্তলা অনসূয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলে—“সখি অনসূয়ে, অভিনব কুশকণ্টকে (সূচী-ছুঁচ) আমার চরণ ক্ষত বিক্ষত; কুরুবক তরুশাখায় আমার বল্কল পরিলগ্ন, অপেক্ষা কর, আমি ছাড়াইয়া লই।”

অনসূয়া অত বুঝিল না। সে দাঁড়াইল। সম্ভবত, প্রিয়ম্বদা অগ্রসর হইয়াছিল—তাই এখন অবসরে তাহার মুখে কোন বাহ্যবাণী ফুটিয়া উঠিল না।

দুষ্মন্ত বিরহে কাতরা শকুন্তলা কুসুমাস্তরণে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া শয়ানা। শরীরের তাপ এত অসহ্য মন এত অন্য মনস্ক যে, সখীরা যে নলিনী পত্রের দ্বারা বাতাস দিতেছে—সে উদ্দেশই নাই। প্রিয়ম্বদার চক্ষুতে শকুন্তলার অসুস্থতা ধরা পড়িয়াছিল। অনসূয়ার ক্ষীণ আশঙ্কা জন্মিয়াছিল মাত্র। আর সে আশঙ্কারও কারণ তাহার শিক্ষা আর পারিপার্শিক অবস্থার সমাবেশ। প্রিয়ম্বদার মুখে—দুষ্মন্তের বিরহের ফলেই শকুন্তলার এই অবস্থা, ইহা শুনিয়া অনসূয়া বুঝিল—"তবে ইহাই ঠিক।"

অনসূয়া যতই স্বভাব সরলা হউক; কিন্তু সে সুশিক্ষিতা। ইতিহাস কথা প্রবন্ধে তার অধিকার আছে। তাহার মুখের কথাতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

"সখি শকুন্তলে, তোমার মনোগত ভাবটি ঠিক কি তাহা সবিশেষ অবগত নহি। তবে ইতিহাস কথা শ্রবণেও কামীগণের যেরূপ অবস্থার কথা অবগত হওয়া যায় তাহাতে মনে হয়, তোমার সেই অবস্থাই হইয়াছে। বল কি নিমিত্ত এ আয়াস? রোগ না জানিলে চিকিৎসা কি করিব?"

শকুন্তলা নিজ মুখে রোগটি ব্যক্ত করে এবং প্রার্থনা জানাইলেন—"যদি ভাল বোঝ, তবে কর যাহাতে আমি সেই রাজর্ষির অনুকম্পার পাত্রী হই, তাহা কর।" নতুবা আমি শুধু তোমাদের কাছে স্মৃতি পথেই থাকিব। প্রিয়ম্বদা তখনও অনসূয়াকে জানাইল—"অনসূয়ে, আকাঙ্ক্ষা (অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে) চরমে উঠিয়াছে, আর কাল হরণ করা চলে না।" সরল প্রকৃতি অনসূয়ার প্রাণে কোন বিতর্ক উঠিল না; একেবারেই পূর্ণ সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল। ব্যগ্রস্বরে তাড়াতাড়ি প্রিয়ম্বদাকে ধরিয়া বলিল—

"প্রিয়ম্বদে, কি উপায় হইবে? কি উপায়ে শীঘ্র অথচ বিরলে সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা যায়?"

প্রিয়ম্বদা বুঝাইল "নির্জ্জনে সেইটিই চিন্তার বিষয়; শীঘ্র ইহা দুষ্কর নহে।" এ কথার তাৎপর্য্য অনসূয়া বুঝিল না। প্রিয়ম্বদা বুঝাইয়া দিলে তবে সে বুঝিল। পত্র লিখিয়া তাহা আবার পুষ্পরাশি মধ্যে লুকাইয়া দেব সেবা ছলে রাজার নিকট দেওয়ার পরামর্শ অনসূয়ার মাথায় আইসে নাই, প্রিয়ম্বদারই আসিল। সরল ভাবে যে কথা বলা আবশ্যক অনসূয়া তৎক্ষণাৎ সেই কথাগুলি বলিয়া ফেলে। কথা চাপিয়া রাখিতে সে জানে না, চাহেও না। অনসূয়া তাই অনুরোধ করিল—

"শুনিয়াছি রাজাদিগের বহু পত্নী থাকে; সখী আমাদের যাহাতে বন্ধুগণের অনুশোচনার কারণ না হয়, তাহা করিবেন।

তৃতীয়াঙ্কে দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয়ালাপের মধ্যে থাকা আর সঙ্গত নহে—ইহাও অনসূয়ার মাথায় অগ্রে আইসে নাই। সময় মত রসভাব চতুরা প্রিয়ম্বদাই কৌশলে মৃগশিশু ধরিবার চ্ছলে অনসূয়াকে লইয়া প্রস্থান করেন।*

প্রিয়ম্বদা।

প্রিয়ম্বদা মর্ম্মপুটে সযত্ন গুপ্ত ভালবাসার ক্ষীণ রশ্মিটুকু পর্য্যন্ত দেখিতে পায়; নব প্রণয়বতী মুগ্ধা কুমারীর আধপ্রেম আধ লজ্জার লুকোচুরী সে সহজেই ধরিয়া ফেলে। সাত্বিক ভাব, দুরুদুরু কম্প, স্বেদজল প্রভৃতি, ভূমিপানে আনত দৃষ্টি এবং লীলাপত্র চ্ছেদন—কিছুই তার এড়াইয়া যাইতে পারে না।

শকুন্তলা যখন প্রিয়ম্বদার দোষ দিয়া বক্ষোদেশে দৃঢ়বদ্ধ বল্কল মোচনের জন্য অনুসূয়াকে অনুরোধ করে, তখন প্রিয়ম্বদা হাসিতে হাসিতে বলিল—

"এ স্থলে পয়োধর বিস্তার জনক নিজের যৌবনকে তিরস্কার কর"—এই বয়স সুলভ, কালোচিত ব্যঙ্গটি সৌন্দর্য্যে জ্বল জ্বল করিতেছে। এই ব্যঙ্গে যে শুধু আত্মদোষ স্খলন এবং শিষ্ট রসিকতা মাত্র করা হইয়াছে তাহা নহে। নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেম তৃষ্ণা যে বনবাসেও হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, যৌবনের রসালাপ যে তপোবনের চতুঃসীমার মধ্যেও ফুটিয়া উঠে। স্বভাবের কোলে বর্দ্ধিতা বনলতিকা যে উদ্যান লতিকার গুণ প্রাপ্ত হয়। আশ্রমের বেদ সঙ্গীতের মধ্যে ও যে প্রণয় দেবতার মধুময়ী গীতির ঝঙ্কার ও শোনা যায়—তাহা আজ প্রত্যক্ষ করা হইল। রক্ত মাংসে গড়া মানবীর হৃদয় সর্ব্বত্রই সমান। যৌবনের প্রভাব সর্ব্বত্রই অবারিত দ্বার। শকুন্তলা পূর্ণ যৌবনা এ ইঙ্গিত স্পষ্টই "পয়োধর বিস্তারয়িতা" যৌবন কথাটিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

শকুন্তলা যখন -"ঐ চুতবৃক্ষ বায়ু কম্পিত পল্লবাঙ্গুলি দ্বারা আমাকে কি যেন বলিতেছে; আমি যাই তাহাকে আদর করি গে" তখনই প্রিয়ম্বদা মৃদুহাস্যে শকুন্তলাকে বলিল—"

---

* অনসূয়াই প্রথমে "হরিণ শিশুকে" চল তার মায়ের নিকট রাখিয়া আসি বলে—কোন কোন পুস্তকে এইরূপ পাঠান্তর আছে। ইহা অনসূয়া চরিত্রের ঠিক উপযোগী নহে।

"শকুন্তলে, এই তরুটির নিকট তুমি মুহূর্ত্তের জন্য, দাঁড়াও। তুমি সম্মুখে দাঁড়াইলে তরুটি লতা সনাথ হইয়া শোভা পাইবে।

ভিতরে ভিতরে অদম্য প্রেমতৃষা অন্তঃসলিলা সরস্বতীর মত বহমানা তাহা অগ্রেই জানা গিয়াছে এক্ষণে আবার সেই তৃষা উপশমের পাত্রটি সম্বন্ধেও * যে তাহাদের দিব্যজ্ঞান বিদ্যমান—ইহা বুঝা গেল। শকুন্তলার বিবাহের ফুল ফুটিবার বয়স অনেকদিন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ভ্রমর আসিলেই হয়। তাহারও আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। প্রিয়ম্বদার ফুল ফুটিয়াছে, অনসূয়ারও ফুলও ফুটিবার অবস্থায় আসিয়াছে—তাহাও উপলব্ধ হইল।

বনতোষিনী নবমালিকার অঙ্গে নূতন কুসুম ফুটিয়াছে! আর সেই "নবকুসুম-যৌবনা" আপনার বাহুআলিঙ্গনে সহকার তরুটিকে জড়াইয়া আছে,—শকুন্তলা একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিল। প্রিয়ম্বদা তাহার মধ্যে এক নূতন সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিল হাসিতে হাসিতে বলিল—"অনসূয়ে, জান কি, শকুন্তলে কেন বড় আগ্রহভরে বনতোষিনীর পানে চাহিয়া আছে (অনসূয়া তার কি জানিবে) "আমিও কি এই প্রকার অনুরূপ বর লাভ করিতে পারিব?"

শকুন্তলা প্রিয়ম্বদাকে এক নূতন প্রিয়সংবাদ দিল যে মাধবীলতা আমূল মুকুলিতা হইয়াছে। প্রিয়ম্বদা তাহা শুনিয়া শকুন্তলাকে "প্রতিপ্রিয়" উল্টা প্রিয়সংবাদ দিল যে—"তুমি আসন্ন পাণিগ্রহণা হইয়াছ"। মাধবীলতা মুকুলিতা—ইহা শুভসূচনা। শকুন্তলার বিবাহ যে সকলেরই প্রার্থী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে।

প্রিয়ম্বদা রসিকতায় নব নব রস ঢালিয়া দেয়; নূতন নূতন বৈচিত্রও সৃষ্টি করে। শকুন্তলার রসময় প্রাণে রস ঢালিয়া দিয়া সে বড় তৃপ্তি পায়। কিন্তু প্রিয়ম্বদার দ্বারা কবি আর একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিলেন। ইহার রসসলিল ধারা রাজা দুষ্মন্তের বাসনা বীজটিকে অঙ্কুরিত করিয়া তরুর আকারে পরিণত করিতেছে। অবশ্য পল্লবিতা, ফুলে ফুলে সুসজ্জিতা করিবে সে শকুন্তলা।

উহা তোমার নিজেরই মনের সাধ" বলিয়া শকুন্তলা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিল। প্রিয়ম্বদা ত তাহাই চাহে; তাহাতেই তাহার তৃপ্তি। বাস্তবিক শকুন্তলা যে

* "বহুফলতয়া উপভোগক্ষম সহকার"।

পতি সমাগমাশায় ব্যাকুলা বা উৎকন্ঠিতা হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে। তপোবনের পবিত্রতার মধ্যে যে বাস করে, সে ত আর বিলাসক্রোড়ে লালিতপালিতা বিলাসিনী যুবতী নহে যে, "বৃষস্যন্তী" হইয়া উঠিবে। তবে শকুন্তলার সুপরিপুষ্ট নিটোল অঙ্গ, কুসুমিত উন্মাদক যৌবন, প্রেমেরমোজ্জ্বল মধুর রসালাপ স্পষ্টই জানাইয়া দেয় যে, শকুন্তলার অন্তরের অন্তঃস্থল পতিসমাগমাশায় ব্যাকুল। শকুন্তলা তজ্জন্য ব্যাকুলা হউক বা না হউক, তবে তাহার ফুল্লরক্তিম কপোল বিদ্যুদ্দামচকিত কটাক্ষ "মদনের রঙ্গভূমি" সমুন্নত বক্ষ যে চঞ্চল উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আর সংশয় নাই। অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র কোন ক্ষেত্রে * বলিয়া গিয়াছেন "লাবণ্য চঞ্চল কিন্তু লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে।" এ ক্ষেত্রে লাবণ্য যতটা চঞ্চল, লাবণ্যময়ী ততটা চঞ্চলা নহে।

প্রিয়ম্বদা যখন শকুন্তলার চুরি করিয়া সেই চাহিয়া দেখাটি লক্ষ্য করিল, প্রিয়বাণি শোণার প্রত্যাশায় কর্ণকে সাবধান ও স্থিরলক্ষ্য দেখিল, প্রণয় আর "শৃঙ্গার লজ্জা"র লুকোচুরী স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তখন সে নিশ্চিত করিল—শকুন্তলা রাজার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছে। আবার যখন সে শকুন্তলার প্রতি রাজার করুণ সহানুভূতি, পরিচয় জানার অদম্য কৌতুহল, অহেতুক ভালবাসা বা চক্ষুরাগের তীব্র আকর্ষণ দেখিল—তখন ইহাও বুঝিল—মৃগয়াবিহারী সম্রাট আজ হরিণ শিকার করিতে আসিয়া হরিণনয়নার কটাক্ষশরে বিদ্ধ হইয়াছেন, শকুন্তলার প্রভাতরল অপার্থিব সৌন্দর্য্যের ভিখারী সাজিয়াছেন।

বেতসলতাসন্তাপে শিলাপট্টের উপর ফুল বিছাইয়া প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে শোয়াইয়া রাখিয়াছে। নলিনীপত্রের বাতাস দিয়া তার তপ্তঅঙ্গ শীতল করিবার জন্য যত্ন লইতেছে। ভিতরের তীব্রতাপ সে বাতাসে কিছুমাত্র নরম পড়িতেছে না। শকুন্তলা প্রথম প্রণয়ে এমনই বিহ্বলা, গাঢ় চিন্তায় এমনই আত্মহারা যে, সখীরা যে বাতাস দিতেছে, তাহার উদ্বোধ পর্য্যন্ত নাই। "প্রিয়সখী, তোমরা কি বাতাস দিতেছ? প্রিয়ম্বদা সবিষাদে অনসূয়ার প্রতি চাহিল। জনান্তিকে বুঝাইয়া দিল—এ বিকারের মূলই রাজর্ষির প্রতি সখীর অনুরাগ। রাজর্ষির সহিত সমাগমই এ মৃত্যুরোগের মৃতসঞ্জীবন ঔষধ।

রাজা ও আচম্বিতে বেতস লতামণ্ডপে আসিয়া উপনীত হইলেন। বিরহে উভয়ের সাক্ষাতের শুভ অবসর মিলিল, দুষ্মন্ত "উপভোগ ক্ষম" সহকার শকুন্তলা

* দেবী চৌধুরাণী।

নবকুসুম যৌবনা মুকুলিতা মাধবীলতা, সহকার শাখাবাহু আলিঙ্গনে লতাটিকে আবদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে, মাধবীলতাও তাহার বিস্তৃত বক্ষে আশ্রয় লইবার আশায় কম্পিতা হইয়া উঠিয়াছে। দুইখানি মেঘই বিদ্যুতে ভরা। তখন সময়াভিজ্ঞা প্রিয়ম্বদা—"চল সখি, হরিণ শিশুকে তাহার মায়ের নিকট রাখিয়া আসি" বলিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

দুই জনে দুই জনকে গাঢ় ভালবাসিয়াছে, রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার অনুরূপ পাত্র। হৃদয়ের মিলনের মধ্য দিয়া বিধাতা অগ্রেই তাহাদের মিলন ঘটাইয়াছেন। এক্ষণে ফুলমালা দিয়া চন্দ্র তারা সাক্ষী করিয়া উভয়ের গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন হইল মাত্র। প্রিয়ম্বদা উভয়ের অন্তরে উক্ত বীজটিকে সলিল দানে অঙ্কুরিত করিয়া সাহায্য করে মাত্র। আর এই নির্জ্জন লতামণ্ডপে সেই অঙ্কুরিত বীজটি দেখিতে দেখিতে ফলপুষ্প সমন্বিত বৃক্ষরূপে দেখা দিল। উভয়ের মিলন আকাঙ্খিত—তাই প্রিয়ম্বদা শকুন্তলার অনিচ্ছাকৃত গমনে বাধা জন্মাইয়া দেয়; এমন কি দূতা গিরি করিতে লজ্জা বোধ করে নাই।

শকুন্তলার সৌভাগ্য দেবতার পূজার জন্য সখীদ্বয় তখন "মালিনী" তীরে পুষ্প চয়নে ব্যগ্র—এমন সময়ে "অয়মহং ভোঃ" এক বজ্র নির্ঘোষ ধ্বনি উত্থিত হইল। শকুন্তলা যে গৃহে আসীনা, সেই গৃহ দ্বারেই এই ভীষণ নিনাদ! হায়, শকুন্তলার মনটি তখন কল্পনার লীলাঞ্চিত স্পর্শসুখে বিভোর হইয়া হস্তিনাপুরে দুষ্মন্ত গৃহে আবদ্ধ, সে ভীষণ স্বরে অধীরা মালিনী নদী ক্ষণেকের জন্য গতিহীনা হইল; সারা বনভূমি এক অজানা ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। হরিণের দল অর্দ্ধভুক্ত তৃণ কবলে মুখে করিয়া বিস্মিত নয়নে ইতঃস্তত চাহিয়া রহিল। সে ভৈরব গর্জ্জন পতি চিন্তন রতার চিত্তে একটি স্পন্দন উঠাইতে না পারিয়া আকাশের গায় মিলাইয়া গেল। সে গর্জ্জন শকুন্তলার তন্ময়তার মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। "ভৈরব গর্জ্জন মিশে গেল তন্ময়তা সনে, সিন্ধু বেগ বালুকায় হল প্রবাহিত" সিন্ধু বেগ বালুকায় প্রহত হইল।

সখীদ্বয় শব্দলক্ষ্যে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল—পদভরে ভূমি কাঁপাইয়া ক্রোধারুণ নেত্র দুর্ব্বাসা ঋষি প্রধাবিত, তখন সহচরীদ্বয় শকুন্তলার বিপৎ সম্ভাবনা করিয়া ছিন্ন পক্ষ পক্ষিনীর মত ঋষি চরণে লুটাইয়া পড়িল। ক্রোধাবতার ঋষির কঠিন মর্ম্মতারে একটী ক্ষীণ রাগিণী (সহানুভূতির) বাজিয়া উঠিল। তপস্বিনী নিষ্পাপা ঋষি

কন্যাদের করুণ পরিদেবনে ঋষি এইটুকু মাত্র সান্ত্বনা দিলেন—অভিজ্ঞান চিহ্ন দেখাইতে পারিলে শকুন্তলার স্মৃতি দুষ্মন্তের চিত্তে ভাসিয়া উঠিবে। বলা বাহুল্য—এই অভিজ্ঞানই শেষে মিলনের হেতু হয় বলিয়া তাই মহাকবি কালিদাসের নাটকখানির নাম অভিজ্ঞান শকুন্তলা।

চতুর্থ অঙ্কে প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে সংবাদ দিল—"তাতকণ্ব শকুন্তলার এই আত্মনিবেদনে বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। অদ্য প্রাতে লজ্জাবনতমুখী শকুন্তলাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিয়াছেন"—

"বৎসে, ভাগ্য বশতঃ ধূমনিরুদ্ধ দৃষ্টি যজমানের আহুতি ঠিক যজ্ঞীয়াগ্নিতেই পতিত হইয়াছে। সৎশিষ্য পরিগৃহিতা বিদ্যার মত তুমি অননু শোচনীয়া—সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। ঋষিগণের সাহায্যে আজই তোমাকে আমি পতি গৃহে প্রেরণ করিতেছি।"

সূর্য্যোদয়ে কৃতস্নানা শকুন্তলাকে তপস্বিনীরা স্তুতি বাদ, আশীর্ব্বাদ করিল। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা আসিয়া তাহাদের অন্তরের স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল। এক প্রাণী, সমদুঃখ সুখা সখীদের ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে—দুই চারি বৎসরের জন্য নহে—কত কালের জন্য এই তপোবন ত্যাগ করিতে হইবে শকুন্তলা কাঁদিতে লাগিল। সখীরা মঙ্গল কার্য্যে রোদন অনুচিত বলিয়া বুঝাইতেছিল, আবার নিজেরাও চক্ষুতে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে বসিল। এ অশ্রু উষ্ণশীতল; আনন্দের আবার বিষাদের। "শকুন্তলা পতিগৃহে যাইবে; রাজরাণী হইবে"—ইহাতে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার কত সুখ। শিশুকাল হইতে একত্র লালিত পালিতা সেই প্রাণ প্রতিমা প্রিয়সখী তপোবন ছাড়িয়া যাইবে—ইহাতে কত দুঃখ!

প্রিয়ম্বদা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—একি "উদ্গীর্ণ গর্ভকবল।" মৃগী, "পরিত্যক্ত নর্ত্তনা" ময়ূরী; "অপসৃত পাণ্ডুপত্রা" লতা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। হরিনীরা চর্ব্বণ করে না, ময়ূরীরা নাচে না, লতারা জীর্ণপত্র ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে থাকে—প্রিয়ম্বদাই প্রথম এই গুলি লক্ষ্য করিল।

শকুন্তলা আশ্রম ত্যাগ করিয়া "শার্ঙ্গরব" ও "শারদ্বত" দুইজন ভক্ত শিষ্য ও কণ্বভগ্নী স্নেহময়ী গৌতমীর অনুসরণ করত ধীরে ধীরে হস্তিনাপুর অভিমুখে যাত্রা করিল। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার কার্য্য ও শেষ হইল, শকুন্তলা যখন তপোবনে নাই, তখন অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাও থাকিয়াও যেন নাই। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার বিরক্ত আবির্ভাব দেখা গেল না।

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা যে যোগ্য পাত্রে সমর্পিতা হইবে—ইহা আমরা ঋষি কণ্ঠের মুখ হইতেই শুনিতে পাইয়াছি। সে যোগ্য বর ঋষি কুমার—ইহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয়—ঋষির বড় আদরের শকুন্তলার সখী অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে ভক্তশিষ্য শারদ্বত ও শার্ঙ্গরবের সহিতই পরিণীতা করিবেন। "শারদ্বতের" যোগ্যা অনসূয়া "শার্ঙ্গরবের" যোগ্যা অনুরূপা প্রিয়ম্বদা।

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা শকুন্তলার দুইটি দিক্ মাত্র। শকুন্তলার ভাবই উঁহাদের ভাব, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা ভাব ত্যাগ করিয়া শকুন্তলার নিজস্ব ভাবটুকু আমরা ঠিক করিতে পারি নাই। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাই অসি বরণার মত শকুন্তলারূপা জাহ্নবীকে বিশ্বেশ্বরোভিমুখে ফিরাইবার জন্য দুই পার্শ্বে বিরাজমানা। শকুন্তলাকে ফোটানই ইহাদের কার্য্য। শকুন্তলা চরিত্রটি উজ্জ্বল এবং সম্যক বোধগম্য করিবার জন্যই ইহাদের আবির্ভাব। আবার বলি—তপোবন বাসিনী শকুন্তলার স্বভাব সরল কোমল দিকটি অনসূয়া, রাজ অন্তঃপুরবাসিনী দুষ্মন্ত মহিষী শকুন্তলার আলোকমালা দীপ্ত জ্যোতির্ম্ময়ী দিকটিই প্রিয়ম্বদা।

শ্রীরামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

সাহিত্য-সভা-কার্য্যালয়।

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১লা চৈত্র, ১৩২৬।

সবিনয় নিবেদন,—

সাহিত্যসভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বিদ্যাসাগর বাহাদুর এম্, এ, (পি, আর, এস্) মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশার্থ গত ২৯শে বৈশাখ ১৩২৬ সাল, "সাহিত্য-সভায়" তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার জন্য একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে সাহিত্য-ক্ষেত্রে পণ্ডিতপ্রবর শাস্ত্রী মহাশয়ের পুণ্য-স্মৃতি জাগরূক রাখা বিধেয় বলিয়া একটী প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটী স্মৃতি রক্ষা সমিতিও গঠিত হইয়াছে। সাহিত্য-সভার সভ্য বৃন্দ এবং হিতৈষীগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই পুণ্য-স্মৃতি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। তদনুসারে আপনার নিকট সভা সাহায্য প্রার্থী হইতেছেন। আশাকরি, আপনি যথোচিত সাহায্য দানে স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের পুণ্য স্মৃতি রক্ষা বিষয়ে সাহিত্য সভাকে সহায়তা করিবেন। যে পরিমিত অর্থ সংগৃহীত হইবে, তদনুসারে স্মৃতি-চিহ্ন অনুষ্ঠিত হইবে।

বশম্বদ

শ্রীচুণীলাল বসু।

সম্পাদক।

সাহিত্য-সংহিতা।

(সাহিত্য সভার ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

নবপর্য্যায়, ১০ম খণ্ড } মাঘ – চৈত্র। ১৩২৮ সাল। { ১০ম ১২শ সংখ্যা।

সংস্কৃত সংলাপ কাব্যম্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সংস্কৃতম্।

১৮। পঞ্চম কণ বিনুতৌ। জগৎ প্রসবিতু র্ভগবতো মহেশ্বরসস্য, তদীয় কার্য্য সমুদয় সাধন প্রধানোপকরণ ভূতস্য ভগবতঃ সবিতুঃ শ্রীসূর্য্যদেবস্যচ স্তুতি মবলম্ব্য যত্র যাদৃশং লম্বমান ক্রিয়া বিশেষণ পদং ব্যবহর্ত্তব্যম্। এবং যথা যথং সুব্‌ বিভক্তয়ঃ প্রয়োক্তব্যা স্তৎ সর্ব্বমুপদিষ্টম্। বিনুতি শব্দঃ বিশিষ্ট স্তুতি প্রকাশকঃ। তৎ স্বরূপত্বা দিয়ং বিনুতি রিত্যুদাহৃতা। ভগবতো জগৎ প্রসবিতুঃ সবিতুশ্চ স্তুতিরূপত্বাৎ সাধারণাবশ্য জ্ঞাতব্য সুব্‌ বিভক্ত্যর্থ প্রকাশকত্বাচ্চ অন্যস্তুত্যপেক্ষয়া এতস্যাঃ স্তুতে বিশিষ্টতা। যস্যা এষ প্রথম শ্লোকঃ।

শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দঃ।

ধৃবন্তে যাবত গর্ব্ব চূর্ণন মদং শীর্ষে ধৃতা জাহ্নবী,
ভালে চন্দ্র কলা ধৃতা, বিগলিত প্রালেয় দ্যুতি প্রভম্।
উদ্যদ্‌-দাহ ভয় চ্ছিদা নত জগৎ, নেত্রং ললাটে ধৃতং
কণ্ঠে যেন বিষং ধৃতং, বিমলিত ব্যালোঘ, মর্চ্চোহস্তু সঃ।

অনেন পরবর্ত্তিনা চেত্যুভয়েন শ্লোকেন জগৎ প্রসবিতুর্ভগবতো মহেশ্বরস্য শীর্ষ প্রদেশা দারভ্য পাদ প্রদেশ পর্য্যন্তস্য অঙ্গ সমূহস্য পরিচিহ্নানি পরিদর্শ্য কথ মসৌ ধ্যেয়ইত্যুপদিষ্টম্। উপদিষ্টাচ প্রত্যেকং সর্ব্বাসু ক্রিয়াসুত্রকেকং লম্বমান বিশেষণ পদং প্রক্ষিপ্য সুদীর্ঘ ক্রিয়া বিশেষণ পদ নির্ম্মাণ রীতি রিতি ॥

অনুবাদ।

১৮। কন কাব্যের পঞ্চম কণের নাম বিভূতি। বিভূতি কাব্যে জগৎ প্রসবিতা ভগবান্ মহাদেবের এবং তাঁহার কার্য্য সমুদয় সাধনের প্রধান উপকরণ ভগবান্ সবিতা শ্রীসূর্য্যদেবের স্তুতি অবলম্বন করিয়া যে স্থানে যেরূপ লম্বমান ক্রিয়া বিশেষণ পদের ব্যবহার করিতে হয়। এবং যেখানে যেরূপ সুব্ বিভক্তির প্রয়োগ করিতে হয় সেই সকল বিষয়ের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বিভূতি শব্দের অর্থ বিশিষ্ট স্তুতি। এই কাব্যখানি তৎস্বরূপ বলিয়া ইহার নাম বিভূতি। অপরাপর স্তুতি অপেক্ষা এই স্তুতির বিশিষ্টতা হেতু দুইটি। ১ম, এই স্তুতিটি জগৎ প্রসবিতা ভগবান্ মহেশ্বরের এবং ব্রাহ্মণগণোপাস্য ভগবান্ সবিতা শ্রীসূর্য্যদেবের সম্বন্ধীয়। ২য়, এই স্তুতিটি হইতে সর্ব্ব সাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য সুব্ বিভক্তির অর্থ সকল প্রকাশিত হইয়াছে। যে কাব্যের প্রথম শ্লোকে এই ধ্বস্তৈরাবত গর্ব্ব চূর্ণন মদ মিত্যাদি; উল্লিখিত। শ্লোকটি শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দে রচিত।

তাৎপর্য্য অংশের ব্যাখ্যা। এই শ্লোক, এবং এই শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোক এই দুইটি শ্লোক দ্বারা জগৎ প্রসবিতা ভগবান্ মহেশ্বরের শীর্ষ প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পাদ প্রদেশ পর্য্যন্ত অঙ্গ সমুদয়ের পরিচিহ্ন প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাকে কিরূপ ধ্যান করিতে হয় এই বিষয়ের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এবং এই শ্লোকে যতগুলি ক্রিয়াপদ আছে, প্রত্যেকে সকল গুলিতে যে এক একটি লম্বমান বিশেষণ পদ প্রক্ষেপ করিয়া সুদীর্ঘ ক্রিয়া বিশেষণ পদ কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার রীতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্লোকের অর্থ। যিনি শীর্ষ প্রদেশে জাহ্নবী, ঊর্দ্ধ ললাটে চন্দ্রকলা, নিম্ন ললাটে নেত্র, এবং কণ্ঠে বিষ, ধারণ করিয়াছেন। সেই দেবদেব মহাদেব আমাদের বা বিশ্বের অর্চ্চনীয় হউন। শীর্ষ প্রদেশে জাহ্নবী দেবীকে কিরূপ ধারণ করিয়াছেন। যেরূপ কঠিন ভাবে ধারণ করায় শীর্ষ প্রদেশ হইতে গঙ্গাদেবীর বহির্গমনে ইচ্ছাসত্বেও

তাহাতে অসক্ত হওয়া নিবন্ধন তাঁহার ঐরাবত গর্ব্বচূর্ণ করণ জনিত অভিমান বিধ্বস্ত হইয়াছে। ঊর্দ্ধ ললাটে চন্দ্রকলায় কিরূপ ধারণ করিয়াছেন। যেরূপ ধারণ করায় নিম্ন ললাটস্থ অগ্নিময় নেত্রের প্রদীপ্ত শিখা সম্বন্ধ বশতঃ সর্ব্ব সদ্গুণ বিশিষ্ট চন্দ্র কলার একমাত্র যে শীতলতা দোষ ছিল, তাহাও বিগলিত হইয়াছে। নিম্ন ললাটে নেত্র ধারণ করিয়াছেন কিরূপ। যেরূপ ভাবে ধারণ করায় চন্দ্র সূর্য্যময় অপর নেত্রদ্বয়ের সম্বন্ধবশতঃ জগতের দাহ ভয় উপস্থিত হওয়ায়, সেই দাহ ভয়ের উচ্ছেদের জন্য সমস্ত জগৎকে তাঁহার শ্রীপাদ পদ্মে নত হইতে হইয়াছে। কণ্ঠে কিরূপ বিষ ধারণ করিয়াছেন, যেরূপ অলক্ষ্যভাবে জগদ্ বিধ্বংসকারি সেই বিষম বিষ ধারণ করায় বিষধরগণের বিষ ধারণ নিমিত্ত অহঙ্কার বিচূর্ণিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি। (নবদ্বীপ)।

হোরা শাস্ত্রম্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অথারিষ্টভঙ্গীমাহ একোঽপিজ্ঞার্য্য শুক্রাণাং লগ্নাৎ কেন্দ্র গতো যদি। অরিষ্টং নিখিলং হন্তি তিমিরং ভাস্করো যথা॥ এক এব বলী জীবো লগ্নস্থোঽরিষ্টসঞ্চয়ম্। হন্তি পাপচয়ং ভক্ত্যা প্রণাম ইব শূলিনঃ॥ এক এব বিলগ্নেশঃ কেন্দ্রসংস্থো বলান্বিতঃ। অরিষ্টং নিখিলং হন্তি পিনাকী ত্রিপুরং যথা॥ শুক্লপক্ষে ক্ষপাজন্ম লগ্নে সৌম্য নিরীক্ষিতে। বিপরীতং কৃষ্ণপক্ষে তথারিষ্ট বিনাশনম্॥ ব্যয়স্থানে যদা সূর্য্যস্তুলা-লগ্নে তু জায়তে জীবেৎ স শতবর্ষাণি দীর্ঘায়ুর্বালকো ভবেৎ॥ গুরুভৌমৌ যদা যুক্তৌ গুরুদৃষ্টোঽথবা কুজঃ। হত্বারিষ্টমশেষঞ্চ জনন্যাঃ শুভকৃদ্ভবেৎ॥ চতুর্থদশমে পাপঃ সৌম্যমধ্যে যদা ভবেৎ। পিতুঃ সৌখ্যকরো যোগঃ শুভৈঃ কেন্দ্র ত্রিকোণগৈঃ॥ লগ্নাচ্চতুর্থে যদি পাপখেটঃ কেন্দ্র ত্রিকোণে সুররাজমন্ত্রী। কুলদ্বয়ানন্দকরঃ প্রসূতো

দীর্ঘায়ুরারোগ্য সমন্বিতশ্চ॥ সৌম্যান্তর্গতৈঃ পাপৈঃ শুভৈঃ কেন্দ্রত্রিকোণগৈঃ।
সদ্যো নাশয়তেঽরিষ্টং তদ্ভাবোত্থফলং ন তৎ॥

অরিষ্ট ভঙ্গ।

সূর্য্য যেরূপ অন্ধকার নাশ করে সেইরূপ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রের মধ্যে যে কোনও গ্রহ লগ্নে থাকিলে নিখিল অরিষ্ট নাশ হইয়া থাকে। ভক্তিপূর্ব্বক মহাদেবকে প্রণাম করিলে যেমন সমস্ত পাপ ক্ষয় হয় সেইরূপ একমাত্র বৃহস্পতি বলী হইয়া লগ্নে থাকিলে সমস্ত অরিষ্ট নাশ করে। পিনাকী যেমন ত্রিপুরাসুরকে নাশ করিয়াছিলেন সেইরূপ একমাত্র লগ্নাধিপতি বলী হইয়া কেন্দ্রে থাকিলে সমগ্র অরিষ্ট নাশ করিয়া থাকে। শুক্লপক্ষে রাত্রিতে জন্ম হইলে আর কৃষ্ণপক্ষে তাহার বিপরীত অর্থাৎ দিনে জন্ম হইলে যদি লগ্নেশুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে সর্ব্বারিষ্ট ভঙ্গ হইয়া থাকে। তুলালগ্নে জাত বালকের ব্যয়স্থানে যদি সূর্য্য থাকে তাহা হইলে সে শত বৎসর জীবিত থাকে। বৃহস্পতি মঙ্গল যুক্ত হইলে অথবা মঙ্গল বৃহস্পতি দৃষ্ট হইলে, অশেষ অরিষ্ট ভঙ্গ হইয়া জননীর শুভফলপ্রদ হয়। যদি চতুর্থ দশমস্থ পাপ-গ্রহ শুভগ্রহ মধ্যে অবস্থান করে আর কেন্দ্রে ও ত্রিকোণে শুভগ্রহ থাকে, তাহা হইলে পিতার শুভ হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে চতুর্থে যদি পাপগ্রহ থাকে আর কেন্দ্রে ও ত্রিকোণে বৃহস্পতি থাকে, তাহা হইলে জাতবালক কুলদ্বয়ের আনন্দদায়ক, দীর্ঘায়ুঃ ও আরোগ্য যুক্ত হইয়া থাকে। পাপগ্রহগণ যদি শুভমধ্যস্থ হয়, আর শুভগ্রহগণ কেন্দ্র ত্রিকোণগত হয়, তাহা হইলে সদ্য অরিষ্ট ভঙ্গ হয় ও সেই সেই ভাব জনিত ফল নষ্ট হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ভূষণ এম্‌-এ।

যক্ষাঙ্গনা কাব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দোয়েল্ বুল্‌বুল্ দোলে ললিত লতায়।
শ্যামার করুণ-রস বিরহীর প্রাণে
বাড়ায় বিরহানল—দাবানল প্রায়—
হায়! শতগুণ! কেন হেন স্থানে, কহ,
পদ্মাসনা বীণাপাণি!—পদাম্বুজে, কবি,
দেবি! করেএ মিনতি—কেন হেন স্থানে
আজি বসি ধনপতি দাস—যক্ষ ধনী?
কি দোষে প্রবাসে হায়! নিবসে এ দুঃখী?
কোথা সে মহিমা হায়! কোথা সে আকৃতি?
কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী শশী রূপী ক্ষীণ হীন।
দুরূহ বিরহে হায়! যাপে দিবা-নিশি।
ঘন ঘন শ্বাসে শ্বাস, ফেলে অশ্রু-নীর!
হস্ত হ'তে খসে পড়ে সোনার তাবিজ!
কোথা সে অলকাপুরী—যক্ষ বৈজয়ন্তী—
আলো করে শশি-কলা শঙ্করের ভালে?
মাণিকের দীপ জ্বলে স্ফটিকের হর্ম্মে—
হায়রে! কোথায় সেই অলকার আলো?
কোথা এ আঁধার-ময় রামগিরি বন?
কোথা সে মানস-সরঃ—চিত্ত মুগ্ধকারী—
যায় স্বচ্ছ জলে কেলি করে যক্ষ-বালা—
যথা স্বর্ণ অলি খেলে স্বর্ণ পদ্মবনে?
কহ হে ভারতি!—কিনা জান তুমি সতি?—
(নখ-দরপণে মাতঃ! বিশ্ব প্রতিভাত)।

কহ এ দাসেরে কৃপাকরি, কৃপাময়িণ্—
কি দোষে এ যক্ষ আজি হায়রে! বিবাসী,
বিরহিণী জায়া যার কাঁদে অলকায়
একাকিনী, পৃষ্ঠে দোলে মণি হীন ফণী—
একগ্রন্থি নিরমণি বেণী? প্রভু কার্য্যে
পরমাদে হায়! একি ঘোর পরমাদ?
একি ভাগ্য বিপর্য্যয়? কুবেরের মালী—
প্রমোদোদ্যান রক্ষক—কি কুক্ষণে যক্ষ
হারাল সে পদ!—সেই মহিমা, গৌরব?
"আয়লো স্বজনি! যাই প্রমোদ উদ্যানে
মানস সরস কূলে," কহিলা মুরজা—
কুবেরের জায়া—(ঝকমকে অলকায়
অলকার মণি, দ্যুতিমান),—সখিবরে
মধুস্বরে, (মধুস্বরে কপোতিনী যথা
কুহরে বিবরে)!—"আজি মদন-উৎসব—
পূজিব প্রাণেশে সখি! আশোক-তলায়
স্বর্ণ-বেদিকায় আমি, সাজি ফুল রাণী।
মুঞ্জরিছে কুঞ্জরাজি, গুঞ্জরিছে অলি—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, বার এট-ল।

(ক্রমশঃ)

গান।

[রচনা বৈদ্য মহোপাধ্যায় কবিরাজ—শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকর, দর্শন-নিধি]

মুণ্ডিত-কেশং গৈরিক-বেশং,
মঞ্জু-মহিমা-মণ্ডিত আস্যে।
পরিহরি বিত্তে, পুলকিত চিত্তে,
কৃপা-কণা বিতরিত হাস্যে॥
হে শাক্য-কুল চন্দ্র, তুমি হৃদয়া-নন্দ,
শোভিত তুমি পরাণ মন্দিরে।
তুমি নিত্য শুদ্ধ, বিশ্ব বিপুল বুদ্ধ,
শরণ লভি, তব চরণ বন্দিরে॥

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

মিশ্র সুরঠ—কাওয়ালী।

আস্থায়ী।

II { র্সর্সা র্সনা র্সা র্সা | নর্রা র্সণা ধা ণধপা I
{ মুন্ ডিত কে শং গৈ॰ রিক বে শং॰

I পধা পপা মমা গগা | গমা রগমপা পা -া } |
মঞ্ জুম হিমা মন্ ডিত আ॰॰॰ স্যে ॰ }

| মমা মমা মা-মগা | রগা মপা পা-পা I
পরি হরি বি ত্তে॰ পুল কিত চি ত্তে

I পধা পপা মমা গমা | রগমগা -রা রা -া II
কৃপা কণা বিত রিত হা॰॰॰ ॰ স্যে ॰

অন্তরা।

II { পধা মপাঃ-পঃ ননা | নর্সা সা -া -া I
{ হে॰ শা ক্য কুল চন্ দ্র ॰ ॰

২´ ৩
I র্সর্রা র্সর্ণা ধণা -ধপা | পধণধা পা -া -া } |
তুমি হৃদ য়া০ ০০ ন০০ন্ দ ০ ০

০ ১
| পা -র্রা র্রা র্রা | র্জ্ঞা র্রা র্সর্রা র্সনা I
শো ০ ভি ত তু মি প০ রাণ

২´ ৩
I না -র্সা ধনর্সা র্সা | র্সা -া -া -া |
ম ০ ০০ন্ দি রে ০ ০ ০

০ ১
| {র্সা র্রা না : -নঃ | র্সা -া র্সা -া I
{তু মি নি ত্য শু দ্ ধ ০

২´ ৩
I র্রর্মা-র্রা র্সনা র্সা | পর্রা র্রা -া -া } |
বি০ শ্ব বিপু ল বুদ্ ধ ০ ০

০ ১
| র্সা -র্রা র্সা ণা | ধপা া মা গা I
শ ০ র ণ লভি ৎ ত ব

২´ ৩
I রা -সা রা গা | মপা পা পা -া II
চ ০ র ণ বন্ দি রে ০

সঞ্চারী।

০ ১
I{ সরা মগা রা রা | রগা মপা মগা রা I
I{ মুন্ ডিত কে শং গৈ০ রিক বে০ শং

২´ ৩
I সরা গমা পপা ধধা | পমা মপা পা -া } |
মঞ্জ জুম হিমা মন্ ডিত আ০ স্তে

আভোগ।

০ ১
| { ননা ননা র্সা-র্সা | র্সর্রা র্সণা ধা-পা I
| { পরি হরি বি০ত্তে পুল কিত চি ত্তে

২´ ৩
I পণা ধণা পধা মপা | রগমগা -রা রা -া } IIII
কৃপা কণা বিত রিত হা০০০ ০ স্তে ০

মহাভারতীয় সারল বিরাটপর্ব্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সে সকল অপমান বসিয়া দেখিল।
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা লাগি সকলি সহিল ॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা বিনা না পারি বধিতে।
পাছে মোরা জ্ঞাত হই অজ্ঞাত কালেতে ॥
কৃষ্ণা বলে প্রাণনাথ কহি তব কাছে।
নাহিক তোমার চিন্তা কঙ্ক আজ্ঞা আছে ॥
সেই মন্দ বুদ্ধি সুত পুত্র দুরাচারে।
প্রকার করিয়া তুমি সংহার তাহারে ॥
নতুবা আমার মৃত্যু জানিহ সর্ব্বথা।
এতেক বলিয়া কান্দে দ্রৌপদের সুতা ॥
দ্রৌপদীর করুণা শুনিয়া বৃকোদর।
ভার্য্যার দেখিয়া দুঃখ তাপিত অন্তর ॥
মধুর বচনে ভীম বলেন কৃষ্ণারে।
না ভাবহ যাজ্ঞসেনী বধিব তাহারে ॥
প্রকার করিয়া দুষ্টে করিব নিধন।
আজিকার মত তুমি করহ গমন ॥
রাত্রিকালে নৃত্যশালা থাকে শূণ্যময়।
সঙ্কেত করিবা সদা হইয়া সদয় ॥
নৃত্যশালা মধ্যে দোহে করিবে বিহার।
তথা তব বেশে তারে করিব সংহার ॥
দেখিতে যেমন নাহি পারে সে আমাকে।
তুমি তথা নির্ণয় করিবে কল্য প্রাতে ॥
আর এক বাক্য তারে কহিবে দ্রৌপদী।
পঞ্চজন গন্ধর্ব্ব আছয়ে মোর পতি ॥

গন্ধর্ব্ব করিব পূজা চাই উপচার।
নানা মিষ্ট অন্ন যেন আয়োজন কর॥
বল তারে গন্ধর্ব্ব পূজায় দ্রব্য চাই।
তোমা হৈতে উদর ভরিয়া কিছু খাই॥
আর এক বাক্যদেবী শুনহ আমার।
মাগিয়া আনিব কিছু বস্ত্র অলঙ্কার॥
তব বেশ ধরিয়া যাইতে চাই আমি।
আর না থাকহ তুমি যাহ শীঘ্রগামী॥
শুনিয়া পাঞ্চালী দেবী আনন্দিত হৈয়া।
ধন্য প্রাণনাথ বলি প্রণাম করিয়া॥
হরষিতে চলি গেলা আপন আলয়।
উদয় হইল ভানু প্রভাত সময়॥
প্রাতঃকালে কীচক সারিয়া নিত্য ক্রিয়া।
সৈরিন্ধ্রী বিরহে দুষ্ট আকুল হইয়া॥
স্থির হৈতে নাহি পারি মদন হুতাসে।
সুদেষ্ণা মহলে যায় সৈরিন্ধ্রীর আসে॥
গুরুপতি গমনে চলিল দুষ্টমতি।
উত্তরিল যেথানেতে আছয়ে পার্ব্বতী॥
হাসিতে হাসিতে কহে সৌরিন্ধ্রীরে চাই।
কোথা বা রহিল তোর গন্ধর্ব্ব বড়াই॥
সভা মধ্যে তোরে লাথি করিনু প্রহার।
বিরাট নৃপতি কিবা করিল আমার॥
আমার সমান বীর নাহিক সংসারে।
সুরপুরে গন্ধর্ব্বকে মোরে ভয় করে॥
মোর পরাক্রম তুমি না জান সুন্দরী।
বাহুবলে ত্রিভুবন দলিবারে পারি॥
সহজে অবলা তুমি আমারে না জান।
এখন ভজহ তুমি হইয়া প্রসন্ন।

এই দেখ দন্তে তৃণ দাস হৈনু তোর ॥
ভজহ সৌরিন্ধ্রী তুমি ক্ষম দোষ মোর ॥
তবে যাজ্ঞসেনী দেখি কীচকেরে কয়।
নারী জাতি অবলা মুকত বুদ্ধি হয় ॥
তোমার মহিমা আমি না পারি বুঝিতে।
এতটা লঘুতা মোর আছিল ভাগ্যেতে ॥
সভা মধ্যে তুমি মোরে প্রহারিলে লাথি।
আমারে রাখিতে কারো নাহিক শকতি ॥
এবে মনে মনে আমি বুঝিলাম দড়।
তোমা হৈতে পৃথিবীতে বীর নাহি বড় ॥
বাহবার তা হইল চারা নাহি তার।
আজি হৈতে বিকাইনু চরণে তোমার ॥
শুনিয়া কীচক হৈল আনন্দে বিভোলা।
এবে কে তোমারে বলিবে অবলা ॥
আজি হৈতে হৈলে তুমি আমার জীবন।
বিলম্বেতে নাহি কাজ দেহ আলিঙ্গন ॥
শুনিয়া সৈরিন্ধ্রী কহে বুড়ি দুই কর।
বিচারে পণ্ডিত তুমি বুদ্ধির সাগর ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞাত তুমি হও মহাশয়।
দিবসে শৃঙ্গার কৈল আয়ু হয় ক্ষয় ॥
নৃত্যশালা শূন্যালয় থাকে নিশাকালে।
তোমাসনে বিহরিব তথা কুতূহলে ॥
নৃত্যশালে সুখেতে বঞ্চিব আজি রাতি।
রস কেলী করিব হে তোমার সংহতি ॥
শুনিয়া কীচক হৈল আনন্দে বিভোর।
ভাল ভাল রূপবতী যে আজ্ঞা তোমার ॥
কিন্তু এই সত্য কথা কৈলে সুবদনী।
কৃষ্ণা বলে সত্য ভিন্ন মিথ্যা নাহি জানি ॥

কিন্তু আরো এক নিবেদন মহাশয়।
পঞ্চ স্বামী গন্ধর্ব্ব যে আমার আছয়॥
তাসবারে পূজা করি ভজিব তোমারে।
নানাবিধ উপচার চাহি পূজিবারে॥
মিষ্ট অন্ন অপূপাদি উপচার যত।
নৃত্যশালা পূর্ণ করিবে রাখিবে ত্বরিত॥
কীচক বলিল ধনী তার চিন্তা নাই।
এখনি রাখিব তথা যতদ্রব্য চাই॥
নৃত্যশালা পূর্ণ করি সামগ্রী রাখিব।
পায়স পিষ্টক উপচার বহুবিধ॥
শুনিয়া দ্রৌপদী সতী বলে আরবার।
মোরে কিছু আনি দেহ বস্ত্র অলঙ্কার॥
আসিবারে চাহি আমি বেশ ভূষা করি।
শুনিয়া কীচক বলে শুনহ সুন্দরী॥
আমারে মাগহ কেন বস্ত্র অলঙ্কার।
আজি হৈতে পুর দ্বার সকলি তোমার॥
আপনি সৌরেন্দ্রী তুমি ভাণ্ডারে যাইয়া।
মনোমত দ্রব্য লহ বাছিয়া বাছিয়া॥
এত বলি আনি দিল বস্ত্র আভরণ।
নপূর কিঙ্কিণী হার কেয়ূর কঙ্কণ॥
টড়ে বাজুবন্দ আর সুবর্ণের চুড়ি।
কুণ্ডল বেসর আর ক্ষিরোদিয়া সাড়ী॥
সৌরিন্দ্রীকে তুষিয়া পাঠান দুরাচার।
কীচক যাইয়া শুয়ে গৃহে আপনার॥
আদেশ করিল দূতে সুতের নন্দন।
নৃত্যশালে রাখ গিয়া যত আয়োজন॥
মিষ্ট অন্ন অপূপাদি উপচার যত।
কর্পূর তাম্বুল আর বারিপূর্ণ জল॥

বিচিত্র পালঙ্ক আদি রাখ লৈয়া তথা।
সৈরিন্ধ্রী আইলে মোরে জানাবে সর্ব্বথা॥
এইরূপে দূতগণে কহিলে ভারতী।
আজ্ঞামাত্র দূতগণে রাখে সব তথি॥
যা বলিল সৈরিন্ধ্রী সকলি তুষ্ট কৈল।
কতক্ষণে হয় নিশি ভাবিতে লাগিল॥

স্ত্রীবেশে ভীমের নৃত্যাগারে গমন ও গন্ধর্ব্বপূজার উপচার দ্রব্যাদি ভক্ষণ ও কীচক বধ।

অস্তগত হৈল রবি আইল রজনী।
ভীমসেনে বলিতে চলিল যাজ্ঞসেনী॥
প্রণাম করিয়া কৃষ্ণা কহে বৃকোদরে।
নির্ণয় করিয়া আসিয়াছি নৃত্যাগারে॥
বিলম্বেতে আর কিছু নাহি প্রয়োজন।
দুষ্টে মারিবারে নাথ করহ গমন॥
গন্ধর্ব্ব পূজার দ্রব্য রাখিয়াছে তত্র।
শুনিয়া হইল ভীমসেন হরষিত॥
শুন প্রাণপ্রিয়া মোর এক উপদেশ।
বনাইয়া দেহ বেশ তোমার সদৃশ॥
শুনি যাজ্ঞসেনী তবে আনন্দ অন্তরে।
রমণী সদৃশ সাজাইল বৃকোদরে॥
চাঁচর চিকুরে দিল বনাইয়া বেণী।
পুরুষের বেশ গেল হইল রমণী॥

(ক্রমশঃ)

ছায়া।

তৃতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য—ইরাণী শিবির।

ক্ষয়ষ ও কুরুষ।

ক্ষয়। সখা, কেসে ব্যথা সন্ধানে জেনেছ কিছু?

কুরু। কিছুই জানিনি স্থির—পিশাচী-ডাকিনী
অহ্রিমান্ অনুচরী—নানা জনে কহে
নানা কথা। কাশ্মীর শিবিরে পাঠাইনু
গুপ্তচর; কাশ্মীর সেনারা বলে—আছে
দেবী চণ্ডিকা তাদের—আসিয়াছে সেই
নাকি নাশিতে মোদের।

ক্ষয়। যেই হ'ক্ শক্তি বটে অপূর্ব্ব বালার। পার্ব্বত্য নদীর
মত সময়ের গতি যেতেছিল ধেয়ে,
অগ্রে যাহা ছিল সব ভাঙ্গিয়া ভাসায়ে
কাশ্মীরের কালসিন্ধুপানে, কয়দিনে
ফিরাইল তায়। অজেয় অতুল বীর্য্য
ইরাণের সেনা—যেন কোন্ মায়াবলে
হারায়েছে শক্তিবল—উৎসাহ উদ্যম।
মৃতপ্রায় কাশ্মীর নিবাসী সঞ্জীবিত
হ'য়ে যেন নবীন জীবনে, পদে পদে
জিনিছে তাদের।

কুরু। তাহে সখা দিবানিশি
উদাস বিষণ্ণ ভাব হেরিয়ে তোমার,
হারায়েছে একেবারে ভরসা সাহস
তারা। এই দুঃসময়ে হেন ভাব সাজে

কি তোমার ? সেনাপতি তুমি—শিখাইবে
আপন দৃষ্টান্তে সবে—জয়ে পরাজয়ে
সমান উৎসাহ বল রাখিতে হৃদয়ে।
কভু জয় পরাজয় সুদীর্ঘ সমরে,—
উৎসাহ শকতি বীর পরাজয়ে কভু কি হারায় ?

ক্ষয়। হারাইলে বীরনাম যোগ্য
সে কভুও নয়। উন্মত্ত আপনহারা
বিজয় উল্লাসে,—বিষাদে উত্তমহীন
পরাজয়ে যেই,—বীর নহে ; পশুবলে
বলীয়ান্—হীনচেতা সেই। সখা, সত্য
বটে ঔদাস বিষণ্ণ আমি—কিন্তু সেত নয় পরাজয়ে ?

কুরু। কিসে তবে বল মোরে।
কোন লুকান ব্যথার ভাব থাকে যদি
পরাণের মাঝে, ভাগ কি দেবেনা তার
সখারে তোমায় ?

ক্ষয়। কারে তবে দেবে আর ?
প্রিয়তম বন্ধু তুমি প্রাণের দোসর।
লও কিছু ভাগ এ ভার লাঘব কর।
একা আর পা'রিনে বহিতে। বলি বলি
ক'রে এতদিন পারিনি বলিতে। আজ
বলিব সকল ? ভাঙ্গিব লজ্জার বাঁধ।

কুরু। কি সখা, লজ্জার বাঁধ মোদোহার মাঝে ?

ক্ষয়। শুনিলে বুঝিবে সব।

কুরু। বল দেখি শুনি।

ক্ষয়। অহিমান অনুচরী—পিশাচী ডাকিনী
চণ্ডিকা হিন্দুর দেবী—যাই বল সখা,
সেই বীরবালা হ'য়েছে হৃদয় মোর।

কুরু। সখা ! সখা !

ক্ষয়। কেন সখা, দূরে সরে যাও?
ডাকিনী মায়ায় মুগ্ধ অস্পৃশ্য কি আমি?
কুন্ধ। প্রভু তুমি, বন্ধু তুমি, অস্পৃশ্য কভুও
নয়, কিন্তু মুগ্ধ বট ডাকিনী মায়ায়।
ক্ষয়। ডাকিনী মায়ায় মোর নাহিক বিশ্বাস।
অহ্রিমান অনুচরী, পিশাচী, ডাকিনী
হিন্দুদের দেবতা চণ্ডিকা— অশিক্ষিত
মূর্খ সেনা যে যা বলে বলুক তারে,
বীরযোগ্য বীরাঙ্গনা বাশ। বীরতেজে
দীপ্ত সে বয়ানে রমণীর কোমলতা,—
বিজলীতে কোমল কুসুম শোভা। হেরে
মন মুহূর্ত্তে হারানু। সেইদিন হ'তে
স্বপ্নে জাগরণে সদা, অন্তরে বাহিরে
হেরি সে মূরতি। রণক্ষেত্রে মুগ্ধ হ'য়ে
তরিপানে রই চেয়ে—আঁখি ফিরাইতে
নারি; ভুলে যাই কি হেতু গিয়াছি রণে।
কুন্ধ। বিশ্বাস না কর সখা ডাকিনী মায়ায়,—
কিন্তু এ বিষম মোহমুগ্ধ করে তোমা
ঘটাতেছে - ঘটাইবে পরিণামে কি যে
সর্ব্বনাশ, বুঝিতে কি নাহি পার? সখা
পরীক্ষা করিয়া দেখ হৃদয় তোমার।
রূপের বিজলী ছটা অসতর্ক আঁখি
মোহে,—প্রাণ না পরশে সদা। তাই যদি
হয়—চিন্তা নাই কিছু। দুদিনের মোহ
নয়নের,—দুদিনেই যাবে কেটে। কিন্তু
সত্য যদি পরাণ হারায়ে থাক—
ক্ষয়। সখা, প্রাণ মম আচ্ছন্ন এ মোহে, একেবারে
অভিভূত আমি, বিচারে শকতি নাই।

প্রয়োজন কিবা বিচারের? ক্ষতি নাই
আছে মোহ থাক্। তুমিই জানিলে শুধু।
আর যেন কেহ নাহি জানে। দুদিনের
তরে সত্য যদি নয়ন মোহিয়া থাকে—
দুদিনে ফুরাবে সব। যাক্ কিছুদিন—
তারপর মন বুঝে যা হয় করিব স্থির।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। যুবরাজ সম্রাটের দূত উপস্থিত।

ক্ষয়। এখানে পাঠাও।

(প্রহরীর প্রস্থান ও দূতের প্রবেশ)

ক্ষয়। সম্রাটের কি আদেশ?

দূত। যুবরাজ, সম্রাটের আদেশ এই যে, আপনি সত্বর ছাউনি তুলে পশ্চাৎ গমন ক'রবেন। যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ তাতে রাজধানী রক্ষা করা অসম্ভব। এই অপূর্ব্ব ঘটনায় এবং পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে ইরাণী সৈন্য উৎসাহ সাহস ভরসা সবই হারিয়েছে। ওদিকে কাশ্মীর সেনারা নূতন উৎসাহবলে যুদ্ধ ক'র্ব্বে। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ করা কেবল অনর্থক বল ক্ষয়। হিন্দুরা রাজধানী অধিকারের পর রাজার অভিষেক ক'রে কিছুদিন বিশ্রাম ও আমোদ প্রমোদ করবে। এই অবসরে আমরাও নূতন বল সঞ্চয় ক'ত্তে পারবো। এদিকে সৈন্যদেরও মানষিক অবসাদ দূর হয়ে নূতন উৎসাহ লাভ হ'তে পারে। তখন পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে সকলের আশা আছে। সম্রাটের লিপি এই গ্রহণ করুন।

ক্ষয়। (পত্র পড়িয়া) আচ্ছা তাই হবে। তুমি যাও, সম্রাটকে দাসের অভিবাদন জানাইবে। আমি তাঁর আদেশ পালন করে সত্বরই তার চরণে উপস্থিত হব। (দূতের প্রস্থান)

ক্ষয়। কুরূষ যাও। সৈন্যদের অবিলম্বে ছাউনি তুলতে আদেশ কর।

(সকলের প্রস্থান)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম্-এ।

জগবন্ধু মোদক মহাশয়ের জীবনী।

এই বিশাল সংসার কর্ম্মবীরদিগের কার্য্যক্ষেত্র ; এই সংসারে কাহাকেও আপনাপন কর্ম্ম সমূহের পরিচয় দিতে হয় না ; সদসৎকার্য্য সমূহই লোকমুখে ঘোষিত হইয়া তাড়িৎ বার্ত্তার ন্যায় দিগ্ দিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। কখন কখন ভবিষ্যত জীবন ঘটিত করিতে হইলে লোকচরিত্র আলোচনা করা আবশ্যক উপলব্ধি হয়। এক্ষণে আমরা স্বজাতি বৎসল প্রবীণপণ্ডিতপরমশ্রদ্ধাস্পদ মান্যবর ৺জগবন্ধু মোদক বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্তের যৎসামান্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পণ্ডিত জগবন্ধু মোদক মহাশয় সন ১২৫৩ সালের ১৩ই ফাল্গুন বুধবার সন্ধ্যাকালে চব্বিশ পরগণা অন্তঃপাতী থানা গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী খাঁটুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৺হারাণ চন্দ্র মোদক, মাতা গোবরডাঙ্গা নিবাসী ৺সদাশিব কুণ্ড (মোদক) মহাশয়ের তৃতীয় কন্যা পুণ্যবতী, মাতা কিঞ্চিদাধিক দুই বৎসরের সন্তান জগবন্ধুকে রাখিয়া ধনুষ্টঙ্কার রোগে মানবলীলা সংবরণ করেন।

৺কালীকুমার দত্ত মহাশয়ের বাটীস্থ পাঠশালায় ৺নফর চন্দ্র সরকার গুরু মহাশয়ের নিকট ইঁহার প্রাথমিক শিক্ষা হয়। তৎপরে ইনি খাঁটুরা নিবাসী বিদ্যোৎসাহী ৺শ্রীশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের যত্নে ৺ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে "খাঁটুরা আদর্শ বিদ্যালয়ে" প্রবিষ্ট হইয়া সন ১২৬৫ সালে ৺রামসদয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে দ্বাদশ বর্ষে ছাত্রবৃত্তি পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

একদা বিদ্যালয় পরিদর্শন কালে স্থানীয় জমীদার বিদ্যানুরাগী ৺সারদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র জগবন্ধুকে অনুষ্টুভ ছন্দে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন ও তদবধি ইঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে থাকেন।

১২৭০ সালে পিতৃ বিয়োগ ঘটায় শিক্ষা ব্যয়ের অভাবে ইনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বাল্যে মাতৃ-পিতৃহীন হওয়ায় নিরাশ্রয় বালকের বিদ্যাশিক্ষার পথ রুদ্ধপ্রায় হইল বটে, কিন্তু জগৎ বন্ধু যাঁহার সহায়, যাঁহার যত্ন উদ্যম ও অধ্যবসায় আছে তাহার উন্নতির পথ কে রোধ করিতে পারে ? পিতৃবিয়োগকাতর অথচ শিক্ষা বিষয়ে নিতান্ত ইচ্ছুক উক্ত জমীদার মহাশয়ের নানা উপদেশে ও তাঁহারই পরামর্শে বিদ্যাশিক্ষার্থে কলিকাতায় যাইতে সংকল্প করেন। কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু কমলা ও বাণী পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন

থাকায় সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে অনেক বাধা উপস্থিত হয়; ইনি অধ্যবসায় প্রভাবে সেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া কোন প্রকার যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ও পাথেয় সংগ্রহ করিয়া ২৬ ক্রোশ পথ পদব্রজে আসিয়া কলিকাতায় ঘটনাচক্রে সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী উদারচেতা দানশীল ৺বংশীবদন সাঁধুখাঁ মোদক মহাশয়ের আশ্রয়ে উপস্থিত হন। সাধুখাঁ মহাশয় ইঁহাকে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে আসাই একমাত্র কারণ প্রকাশ করেন। পাঠের আনুসঙ্গিক খরচের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বালকমুখে "পরীক্ষার বৃত্তি পাইয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করিব" জ্ঞাত হইয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে শিক্ষা সাহায্য জন্য আশ্রয় দিতে প্রতিশ্রুত হন। কলিকাতায় আসিবার কালে ইঁহার চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু জুন মাস না হইলে ছাত্র গ্রহণ করা হয় না অবগত হইয়া বৃথা সময় ক্ষেপণ না করিয়া অনতিবিলম্বে কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে নিবিষ্ট হন। তিন বৎসর অধ্যয়নান্তে সন ১২৭৬ সালে মাঘ মাসে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ঐ সালের আষাঢ় মাসে কলিকাতা শ্যামবাজার গভর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত বঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন বটে কিন্তু ইঁহার জ্ঞান পিপাসার শান্তি হইল না। ঘটনাচক্রে সৌভাগ্যবশতঃ ইনি এই সময়ে সুবিজ্ঞ সুপণ্ডিত কবিরাজ ৺কালী প্রসন্ন সেন কবিরত্ন মহাশয়ের সহিত স্নেহ সূত্রে আবদ্ধ হন; তাঁহারই নিকট প্রায় দশ বৎসর ব্যাকরণ কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য সমগ্র নিদান পরিভাষা চক্রদত্ত চরকসুশ্রুতাদি গ্রন্থ পাঠ করেন। এত দিনের পর ইহার চিরভিলাষিত চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার আকাঙ্খা কিঞ্চিত প্রশমিত হইল। এই সময় ইনি পরীক্ষা দিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট হইতে বিদ্যাবিনোদ উপাধি ও চিকিৎসা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন, কিন্তু উক্ত উপাধির ব্যবহার কখনও করেন নাই পরে কয়েকজন মহামহোপাধ্যায় ও অধ্যাপক মহাশয়দিগের বিশেষ অনুরোধে এই উপাধি ব্যবহার করিতে বাধ্য হন।

ইনি মিষ্টভাষী, বিনয়ী, অধ্যবসায়ী, শ্রমশীল, পরোপকারী, বিদ্যানুরাগী ও স্বজাতি বৎসল।

গুরু দায়িত্ব পূর্ণ প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াও অবসর কালে কতিপয় এফ, এ, বি, এ, পরীক্ষার্থী ছাত্রকে সস্কৃত শিক্ষা দান করিতেন। উপযুক্ত গুরুর নিকটে বহু যত্নে চিকিৎসা বিদ্যা সুদীর্ঘকাল শিক্ষা করিয়াও এক সময়ে একই রূপ দুই জন

রোগী প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক চিকিৎসা করিলেও এক জনের মৃত্যু হওয়ায় চিকিৎসা বিদ্যা অসম্পূর্ণ জ্ঞানে তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা না করিয়া তাহা জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় রূপে গ্রহণ করিতে অসম্মত হন, এরূপ শিক্ষা দান করাই জীবনের ব্রত স্থির করেন। ৯০ জন ছাত্র লইয়া সামান্য অবস্থায় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ৪৫০ জন পর্য্যন্ত ছাত্র সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া সহজে শিক্ষা প্রণালীর সুবন্দোবস্ত ও ছাত্রদিগের প্রতি যত্নের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত বিদ্যালয়ে ৫৪ বৎসর ক্রমাগত শিক্ষকতা করিয়া ইনি কোন ছাত্রদিগের তিন পুরুষাবধি অধ্যাপনা করিয়া আমার কুলগুরু বশিষ্ঠের স্থানাধিকার করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অপত্য নির্ব্বিশেষে যত্ন ও শিক্ষার সুবন্দোবস্তের জন্য ইনি বহু জনাদৃত হইয়া আসিতেছেন ইঁহারই যত্নে উক্ত বিদ্যালয় উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। নানা দেশাগত বহু বিদ্যানুরাগী লোক এই বিদ্যালয়ের কার্য্য প্রণালী পরিদর্শন করিয়া অনেক প্রশংসা করিয়াছেন; ইঁহারই শিক্ষাগুণে বহু কৃতবিদ্য ছাত্রও জন-সমাজে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন ও সর্ব্বজনাদৃত হইয়াছেন।

বহুকাল হইতে কায়মনোবাক্যে সরস্বতী দেবীর সেবা করিয়া তাহার সেবা স্থায়ী করিবার কল্পে একটী বাণী মন্দির সংস্থাপন করিবার ইচ্ছায় কতিপয় কৃতবিদ্য ও সমৃদ্ধিশালী মহোদয় বর্গের অর্থে ও উদ্যোগে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন। পরে ১৩২০ সালে কমিটির সভ্যবর্গের অনুমোদন ক্রমে স্বহস্তে এই বাণী মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। যখন ইউরোপে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয় সেই সময়ে দ্বারে দ্বারে দান সংগ্রহ করিয়া এই বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণ করিতে ইঁহাকে যে কিরূপ কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। অনন্য-চিন্ত হইয়া অর্থ সংগ্রহে ও গৃহ নির্ম্মাণাদি কার্য্যে কয়েক বৎসরাবধি কঠিন পরিশ্রম করায় ইঁহার শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন হয়। তদবধি ইনি বৎসরে কয়েক মাস শয্যাশায়ী থাকেন। পণ্ডিত মহাশয় বার্দ্ধক্যে ভগ্ন স্বাস্থ্যে ও রুগ্ন দেহে শয্যাশায়ী থাকিয়াও কখন নিশ্চিত হইতে পারেন নাই। ইনি স্বজাতী বালক বালিকাদিগের শিক্ষার উন্নতি কল্পে ও বিপন্ন স্বজাতীয় অনাথাদিগের সাহায্য দানের স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য নিরতিশয় চিন্তিত ছিলেন। পরে সন ১৩২৫ সালে ৺যোগেন্দ্র দেব মান্না শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মান্না, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত

উপেন্দ্রনাথ বেজ, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মোদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মান্না প্রমুখ স্বজাতীয় সহৃদয় উৎসাহী মহোদয়গণের সাহায্যে বঙ্গীয় মধুমোদক সমিতির সভাপতি রূপে কি উপায়ে ইহাতে সফলকাম হইতে পারা যায় তাহার বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু সকলই সময় সাপেক্ষ; এক দিনে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না; ইনি এক দিন আগ্রহাতিশয় সহকারে ৺যোগেন্দ্র দেব মান্না মহাশয়ের হস্তধারণ করিয়া জাতীয় সমন্বয় দেখিয়া যাইবার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন; পরে ১৩২৭ সালে বহু পরিশ্রমে ও বিশেষ চেষ্টায় বঙ্গীয় মধু মোদক সমিতির বিভিন্ন সমাজস্থ বঙ্গীয় মধুমোদক বর্গের নেতৃবৃন্দকে শ্যামবাজার বঙ্গ বিদ্যালয়ের ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্দ্র মোদক (চৌধুরী) মহাশয়ের সভাপতিত্বে তিন দিবস ব্যাপী অধিবেশনে সমন্বয় কার্য্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইলে ইনি রোগ শয্যা ত্যাগ করিয়া স্বজাতীয় ভ্রাতৃবর্গকে সৌজন্যাদির দ্বারা মুগ্ধ করিয়া সকলের সহিত একত্রে পান ভোজনাদি সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। এই পীড়িত অবস্থাতেও উক্ত সমিতির পত্রিকায় ভূমিকা লিখিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। ইহার এই চেষ্টা ও উদ্যম আমাদের অনুকরণীয়।

ইনি কেবল শিক্ষকতা কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন এরূপ নহে, অবসর কালে সুকুমারমতি শিশুদিগের পাঠোপযোগী কয়েকখানি সাহিত্য ও ব্যাকরণ পুস্তকের প্রণয়ন করেন। অধ্যাপনা কালে বালকদিগকে সাহিত্য শিক্ষা দিবার বিশেষ কোন বাঙ্গালা ব্যাকরণ না থাকায় বহু পরিশ্রমে ১২৯০ সালে ইনি প্রথমে বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও ক্রমে ব্যাকরণ প্রবেশিকা প্রণয়ন করেন। পরে ১৯০৪ খৃঃ নব প্রবর্ত্তিত শিক্ষা পদ্ধতির নিয়মানুসারে সরলপাঠ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ভাগ এবং ব্যাকরণ সার নাম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহারই প্রণীত ৩য় ও ৪র্থ ভাগ নীতি পাঠ বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ ও ব্যাকরণ প্রবেশিকা বর্দ্ধমান বিভাগের ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য রূপে; ব্যাকরণ সার ছোট নাগপুর ও খুলনা জেলার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইনি মৃত্যু কালের ১ মাস পূর্ব্বেও বিদ্যালয়ে যথারীতি কার্য্য পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ২৬শে মাঘ ১৩২৮ সাল বৃহস্পতিবার প্রায় রাত্রি ৯॥০ ঘটিকার সময়ে ৭৬ বৎসর বয়সে পক্ষাবধি নিউমোনিয়া রোগে ভুগিয়া পরিবার বর্গ ও ছাত্র বৃন্দকে শোক সাগরে ভাসাইয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীক্ষেত্রভূষণ বসু।

"পৃথ্বীরাজ" ও "শিবাজী" *

———***———

(কিঞ্চিৎ সমালোচন)

ইদানীন্তন প্রখর সভ্যতালোকের যুগে মহাকাব্য প্রণয়ন হইতে পারে কি না † এ সম্বন্ধে বোধ হয় লর্ড মেকলেই প্রথম তদীয় 'মিল্টন' বিষয়ক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার তর্কবিতর্কের সমস্ত কথা এস্থলে উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক, নিম্নে কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত হইল :—

"He who in an enlightened and literary society, aspires to be a great poet, must first become a little child. He must take to pieces the whole web of his mind. He must unlearn much of that knowledge which has perhaps constituted hitherto his chief title to superiority. His very talents will be a hinderance to him. His difficulties will be proportioned to his proficiency in the pursuits which are fashionable among his contemporaries, and that proficiency will in general be proportioned to the vigour and activity of his mind. And it is well if after all his sacrifices and exertions, his works do not resemble a lisping man or a modern ruin."

পঠদ্দশায় যখন এ সকল কথা পড়িয়াছিলাম, তখন যেমন দস্তুর এ গুলিকে বেদবাক্যের ন্যায় মানিয়া নিয়াছিলাম। নাবিক সিন্দবাদের স্কন্ধে সেই আরণ্য-বৃদ্ধ যেমন চাপিয়া বসিয়াছিল, আমাদেরও কাঁধে তেমনি মেকলে প্রভৃতিরা চাপিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ভগবৎকৃপায় যখন ইংরেজীর ভূতের বোঝা কতকটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া একটু স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিলাম, তখন

---

* "সাহিত্য-সভার ত্রয়োবিংশ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী এম, এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত। এই সভায় গ্রন্থকার স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

† গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "শিবাজীর" প্রস্তাবনায় এই-কথাটার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু যথোচিত আলোচনা করেন নাই।

দেখিলাম, ইহার ন্যায় এতবড় ছেঁদো কথা আর হইতে পারে না। যে 'মিল্টন' সম্বন্ধে মেকলে এই প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন—তিনি যদি বাইবেল সাহিত্যে পরম পণ্ডিত না হইতেন, তাহা হইলে তিনি তদীয় মহাকাব্য "প্যারেডাইজ লষ্ট" লিখিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তার পর সুষ্ঠু শব্দপ্রয়োগ, অলঙ্কারের অবতারণা ইত্যাদির নিমিত্তও শব্দশাস্ত্রে ও অলঙ্কার শাস্ত্রাদিতে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে চলে না। পূর্ব্বতন সাহিত্যাদিতে সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে স্বীয় রচনার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারপূর্ব্বক দোষসংস্কারের ক্ষমতা জন্মে না। ইতিহাস বিজ্ঞান ইত্যাদিতে দখল থাকিলে ঐ সকল বিষয়াবলী হইতেও কাব্যের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া ইহার চমৎকারিত্ব সম্পাদন করা যাইতে পারে। আমাদের কালিদাস সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন—তাঁহার রঘুবংশ তাই সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহাকাব্য হইয়াছে। মাঘ ভারবি শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন ছিলেন। বাঙ্গালাভাষারও মহাকাব্য লেখকগণ—মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি—এক একজন অত্যুচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। কালিদাসের যুগ ভারতবর্ষের এক অত্যুৎকৃষ্ট যুগ ছিল—উচ্চ সভ্যতার আলোকে উহা প্রোজ্জ্বল ছিল। আর ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রখররশ্মিপাতের সময়েই মধুসূদনাদির অভ্যুদয় হইয়াছে। ফলতঃ সাহিত্যদর্পণাদিতেও 'মহাকাব্যের' যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে—তাহাতে বরং এমন সব কথা রহিয়াছে, যাহাতে সুসভ্য সময়ের সুশিক্ষিত ব্যক্তিরই এ কার্য্যে হাত দেওয়া সঙ্গত মনে হইবে—অবশ্য তাঁহার কবি প্রতিভা থাকা চাই।

অতএব শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'পৃথ্বীরাজ' ও 'শিবাজী' মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কোন অসঙ্গত কাজ করেন নাই—বরং তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আমরা যতদূর অবগত আছি, তিনি এ কার্য্যের খুবই উপযুক্ত ব্যক্তি।

পরন্তু সুযোগ্য গ্রন্থকার যোগীন্দ্র বাবু নানা প্রকারে আমাদের এমন ধারণা জন্মাইয়াছেন, যেন তাঁহার গ্রন্থকে আমরা 'কাব্য' মাত্র না ভাবি। 'পৃথ্বীরাজের' উপক্রমণিকায় তিনি বলিয়াছেন—"কবিতার রসবিতরণ এই কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য, মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।" "উপক্রমণিকা" ও "প্রস্তাবনা" লিখিয়া সুদীর্ঘ 'মুখবন্ধ' প্রদান করিয়া, ভূরি ভূরি পাদটীকা এবং নানাবিধ চিত্র * দ্বারা তিনি

* যখন এতগুলি চিত্র দিয়াছেন, তখন দুই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ঘটনাবলীর স্থান নির্দ্দেশক দুইখানি মানচিত্র দিলেই শোভন হইত।

গ্রন্থদ্বয়কে পরিশোভিত করিয়া ইহাদের এমন একটা আকার দিয়াছেন যাহাতে আমরা এগুলি পদ্যগ্রথিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ মনে করি। কবি তাঁহার কাব্য লিখিয়া যাইবেন—তাহা অবশ্যই "কান্তাসম্মিততয়া" উপদেশ প্রদায়কও হইবে। পরবর্ত্তী রসজ্ঞগণ উহার সমালোচনা লিখিবেন, টীকা করিবেন; প্রকাশকগণ চিত্রাদিদ্বারা উহার সৌষ্ঠব বিধান করিবেন। স্বয়ং কবিই যদি সব করিয়া গেলেন—তবে সমালোচকগণের জন্য থাকিল কি? বিশেষতঃ "কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ," ইহা মনে রাখিয়াও গ্রন্থকৃৎকবির টীকাটিপ্পনী হইতে বিরত থাকাই উচিত। ফলতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও কবি—ইংরেজী, বাঙ্গালা—সংস্কৃত যে কোনও ভাষায়ই গ্রন্থ লিখিয়া থাকুন—এমনটি করিয়াছেন বলিয়া তো মনে হয় না। এটা যোগীন্দ্র বাবুর একটা বিশেষত্ব, সন্দেহ নাই।

কাব্যদ্বয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়াবলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কবি-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক মনে করি—কেন না যোগীন্দ্র বাবুই মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত "মটো" (motto) রূপে "কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরো গুরুতর লাভ"—ইত্যাদি ৺বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ যোগীন্দ্র বাবুর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় হয় নাই—কোনও সাহিত্য সম্মিলনে তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহাও কবিজনোচিত বিবিক্তপ্রিয়তারই নিদর্শন, সন্দেহ নাই।

যোগীন্দ্র বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন; এবং সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হওয়া অবধি এযাবৎ মাতৃভাষার সম্যক্ চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। বহুদিন দেওঘরে হেড্‌মাষ্টারি করিয়াছিলেন;—সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যাচার্য্য স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহোদয় ঐস্থানে অবস্থান করিতেন, তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াও তদীয় সাহিত্য সেবাপ্রবৃত্তি সম্যক্ উৎসাহিত হইয়া পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে—একথা অবশ্যই আমরা ধরিয়া লইতে পারি। তখন তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কিনা জানি না; তবে তাঁহার প্রাথমিক রচনার মধ্যে "একাদশ অবতার" নামক একখানি ব্যঙ্গকাব্যের বিষয় আমরা অবগত আছি; গ্রন্থকার তাহাতে "ধূর্জ্জটি" নাম ধারণপূর্ব্বক স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ) প্রভৃতির (তদানীং "বঙ্গবাসীর" পরিপোষক দলের) উপর বিদ্রূপ

বর্ণন করিয়াছিলেন। * তারপর যোগীন্দ্রবাবু বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রম করিয়া মেঘনাদবধকাব্যের মহাকবি মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত সঙ্কলনপূর্ব্বক বঙ্গীয় সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হইয়াছেন; এই গ্রন্থে তাঁহার মৌলিকতা, গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও লিপিচাতুর্য্য সম্যক্ প্রকটিত হইয়াছে। অথচ চরিতাখ্যায়কের প্রেমান্ধতা ইহাতে নাই বলিলেই হয়। মধুসূদনের যে যে স্থলে দোষ প্রদর্শনের প্রয়োজন হইয়াছে, যোগীন্দ্র বাবু তাহা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই এবং ঐরূপ স্থলে প্রায়শঃ তাঁহার সমাজহিতৈষণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় সাধু সাধ্বীগণের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনেও যোগীন্দ্র বাবু লেখনী প্রয়োগ করিয়াছেন— 'তুকারাম চরিত,' 'অহল্যাবাইএর জীবন চরিত' এবং "পতিব্রতা গ্রন্থাবলী" তাহার ফল। আর্য্যরমণীগণের একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য ধর্ম্মের যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা পরপুরুষের ছায়াস্পর্শও সহিতে পারে না, সেই ভাবের ব্যত্যয় ঘটাইতে একদল লেখক আজকাল বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—এবং দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ এই দলের অগ্রণী। সনাতন ধর্ম্মের খাদ্যাখাদ্য, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার যেমন এখন একদল উৎপথপ্রতিপন্ন লোকে হাঁড়িরধর্ম্ম" "ছুৎমার্গ," ইত্যাদি বলিয়া আধ্যাত্মিক অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিতেছে—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিও তেমনি পাতিব্রত্যের সনাতন উচ্চ আদর্শের খর্ব্বতা বিধানে কৃতসংকল্প হইয়া নারীসমাজের অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। যোগীন্দ্র বাবু ঐ গ্রন্থাবলীতে ভারতের আদর্শ সতী-সাধ্বী-দিগের চিত্রপ্রদর্শনপূর্ব্বক মহিলাগণের মহান্ উপকার করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইহাতেও তাঁহার স্বদেশ ও স্বকীয় সমাজের হিতেচ্ছা প্রকটিত হইয়াছে। ইতোমধ্যে তিনি কবিত্বশক্তিরও অনুশীলন করিয়াছেন—তদীয় "কঠোপনিষদের পদ্যানুবাদ" বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। তাঁহার একখানি কবিতাপুস্তকও† প্রকাশিত হইয়া প্রশংসালাভ করিয়াছে।

---

* পুস্তক খানি এখন দুষ্প্রাপ্য—স্বয়ং গ্রন্থকারের নিকট চিঠি দিয়াও পাওয়া যায় নাই; বাল্যে ইহা পড়িয়াছিলাম, একটা অস্পষ্ট ধারণা মাত্র আছে। তবে ইহা যে 'সরস' জিনিষ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

† এ ছাড়া আরো পুস্তক (পদ্য এবং গদ্য) তৎকর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে—বাহুল্য বশতঃ উল্লেখ করা হইল না। সবগুলিই সুলিখিত ও সর্ব্বজনপ্রশংসিত।

ইহার মধ্য হইতে একটি কবিতা বিদ্যালয়ের বালকগণের পুরস্কার-বিতরণী সভায় বহু স্থলে আবৃত হইতে শুনিয়াছি, সেইটির নাম "মানচিত্র দর্শনে।" কবিতাটি দেশভক্তির উদ্দীপক এবং রচয়িতার মাতৃভূমির প্রতি অনাবিল প্রেমভাবের পরিচায়ক।

এইরূপে, সাহিত্যক্ষেত্রে সুলেখক, সুকবি ও স্বদেশানুরাগিরূপে প্রথিতযশা হইয়া পরিণতপ্রজ্ঞ যোগীন্দ্রবাবু 'পৃথ্বীরাজ' রচনায় প্রবৃত্ত হন। মধুসূদন দত্ত প্রথমবয়সে ইংরেজী ভাষায় 'কবিযশঃপ্রার্থী' হইয়া 'ক্যাপ্টিভ্ লেডী' লিখেন। এই 'লেডী'—পৃথ্বীরাজমহিষী 'সংযুক্তা'। মধুসূদনচরিত-লেখক যোগীন্দ্র বাবুর "পৃথ্বীরাজ" লেখনে 'ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী' কোনও অনুপ্রাণন করিয়াছে কি না, তাহা বলিতে পারি না—তবে উভয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে ঘোরতর প্রভেদ বর্ত্তমান। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' আলোচনার ফলে তদীয় চরিতকারের হৃদয়ে মহাকাব্য লিখিবার সংকল্প জাগিয়াছিল কিনা, তাহাও বলা যায় না। "পৃথ্বীরাজে" মেঘনাদের অমিত্রাক্ষরছন্দঃ ব্যবহৃত হয় নাই—বরং পরবর্ত্তী "শিবাজী" এই ছন্দে আগাগোড়া রচিত। পরন্তু 'মেঘনাদবধ' যেমন সোণার লঙ্কার পতনের ইতিহাস, 'পৃথ্বীরাজ' ও স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমির অধীনতাপাদনের ইতিবৃত্ত; উভয়েই বিষাদাত্মক কাব্য—মেঘনাদের প্রমীলার চিতারোহণ-দৃশ্যে পরিসমাপ্তি, পৃথ্বীরাজেরও শেষ দৃশ্য সংযুক্তার চিতারোহণ। তবে, মধুসূদন ঐ বিষাদাত্মক কাব্যের পরে অবসাদের প্রতিক্রিয়ার্থক অপর কোনও কাব্য লেখেন নাই—যেমন তাঁহার আদর্শকবি মিল্টন 'প্যারেডাইজ লষ্ট' লিখিবার পরে "প্যারেডাইজ রিগেইণ্ড" লিখিয়াছেন! এবিষয়ে যোগীন্দ্র বাবু মিল্টনের মত "পৃথ্বীরাজ" কাব্যের অবসাদ দূরীকরণার্থে "শিবাজী" লিখিয়া আমাদের হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন।

"পৃথ্বীরাজ" কাব্যে গ্রন্থকার হিন্দুর পতনের ইতিহাস বিবৃত করিতে গিয়া এই অধঃপতনের নিদাননির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তদুপলক্ষে তিনি তাঁহার স্বীয় বিবেকবুদ্ধি অনুসারে স্বদেশের হিত সাধনকল্পে নানাভাবে সমাজের—তথা হিন্দুধর্ম্মেরও—গলদ ঘাটিয়া, দেখাইয়াছেন। তাঁহার দেশহিতৈষণার আন্তরিকতাসম্বন্ধে আমাদের কোনও সন্দেহ নাই—এবং তজ্জন্য তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র; অথচ তিনি একজন প্রবীণ ও প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যসেবী বলিয়াও

আমাদের অশেষ সম্মানভাজন। তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার কতকগুলি কথা আমরা প্রতিবাদের যোগ্য মনে করি এবং তৎকরণার্থই এই আলোচনায় হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

জগতের সমস্ত ব্যাপারই শ্রীভগবানের নিরঙ্কুশেচ্ছায় সংঘটিত হইতেছে। এইটি সর্ব্বপ্রথম কথা। তারপর ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়—পুণ্যে বৃদ্ধি, পাপে ক্ষয়—এটাও একটা মোটা কথা। এরূপ কথাই ইংরেজীতে 'ট্রুইজম্' বলিয়া আখ্যাত হয়। যোগীন্দ্র বাবু "পৃথ্বীরাজে' ভারতের পতনের কারণ ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'শিবাজী'তে তো 'মটো'রূপে বলিয়াছেন—"পাপে ধ্বংস পুণ্যে স্থিতি বিধি বিধাতার" ইত্যাদি। ইহাতে বাদপ্রতিবাদের কোনও কথা নাই। আমরাও বলিব, সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজ কলিপ্রভাবে দিনদিন অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। একখানি পঞ্জিকা খুলিয়া দেখিলেই কলির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইবে :—

"ধর্ম্মঃ সঙ্কুচিতস্তপো বিরহিতং সত্যঞ্চ দূরং গতং
ক্ষৌণী মন্দফলা নৃপাশ্চ কুটিলাঃ শাস্ত্রেতরা ব্রাহ্মণাঃ।
লোকাঃ স্ত্রীবশগাঃ স্ত্রিয়োঽতিচপলাঃ পাপানুরক্তা জনাঃ
সাধুঃ সীদতি দুর্জ্জনঃ প্রভবতি প্রায়ঃ প্রবৃত্তে কলৌ॥"

স্থানবিশেষে জলবায়ু দূষিত হইয়াছিল বলিয়াই যেমন ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ ইত্যাদি অভিনব ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তেমনি এই কলিকলুষিত সমাজের উপপ্লবের নিমিত্ত নানা দিগ্দেশ হইতে বিভিন্ন জাতি আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কলি যদি এপ্রকারই হইল, তবে কি লোক ধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে? তা নয়;—ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দ্বারা ভূরিশঃ আক্রান্ত হইলেও লোক যেমন ঔষধ ব্যবহার করে—আক্রমণ পরিহার করিবার জন্যও যেমন সাবধান হয়, তেমনই, অধর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হইলেও আমাদিগকে তৎপ্রতিষেধক ব্যবস্থায় অধীন হইতে হইবে—সাবধানে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। বিশেষতঃ "ধর্ম্মঃ সঙ্কুচিতঃ" সন্দেহ নাই—তথাপি একপাদ ধর্ম্ম এই ঘোর কলিতেও থাকিবে—নচেৎ সংসারস্থিতি অসম্ভব, কেন না, 'ধর্ম্মই' সকলকে 'ধারণ' করিয়া রাখিয়াছে—"ধারয়তীতি ধর্ম্মঃ"। অতএব আমাদের সকলেরই এই এক চতুর্থাংশের ভিতরে

অবস্থানের জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত হওয়া উচিত। এই ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিতে পারিলে, আপাততঃ মন্দদশাপন্ন হইলেও পরিণামে কল্যাণ অনিবার্য্য। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি পর্য্যায়ক্রমে আসিতেছে যাইতেছে; কলির পর পুনরায় সত্য-যুগের আগমন সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত বিষয়। প্রকৃতির যে লীলা আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, তাহাতে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন, সায়ং, রাত্রি ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে ঘটিতেছে—আবার গ্রীষ্ম বর্ষাদিও চক্রবৎ ঘুরিতেছে। যে বৃক্ষটি আজ পুষ্প-ফলে সুশোভিত, কিয়দ্দিন পরে ইহা পত্রাদিশূন্য মৃতপ্রায় পরিলক্ষিত হইবে, পুনরায় নূতন পত্রমুকুলাদির আবির্ভাবে ইহা শ্রীসম্পন্ন হইয়া আমাদের নেত্রোৎসবের কারণ হইবে। আমাদের 'সনাতন' ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধেও ঐ কথা বলিতে পারি—এবং এই অবসাদের মধ্যে এইরূপ ভাব পোষণ করিয়াই আমরা সান্ত্বনালাভ করিয়া থাকি। স্পষ্ট কথায় বলিব যে, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা, অথবা মূর্ত্তিপূজা অথবা আচারধর্ম্ম ইত্যাদি যে সকল বিষয় সনাতনধর্ম্মের বিশেষত্ব, এগুলির উপর সেই মোসলমান আক্রমণের সময় হইতে (কেবল তাই বলি কেন, বৌদ্ধবিপ্লবের যুগ হইতেই) প্রচণ্ড আঘাত হইতেছে, মনে হয় যেন সনাতনধর্ম্মের ভিত্তিভূমি ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কিন্তু ভয় নাই। যিনি গীতায় শ্রীমুখে বলিয়াছেন "ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" তিনিই এই সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজকে রক্ষা করিবেন। এই যাহা কিছু দেখা যাইতেছে—সমস্তই কলির বিকার—কালক্রমে এই বিকার কাটিয়া যাইবে। "ভাল"র জায়গায় "মন্দ" আসিতে দেখিয়া ঈশ্বর-বিশ্বাসী ইংরেজ কবি টেনিসনের উক্তি মনে পড়ে—

Old order changeth yielding place to new
And God fulfils himself in many ways
Lest one good custom should corrupt the world.

যখন লোকের দশার মন্দ ঘটে, তখন তাহার গুণও দোষে পরিগণিত হয়; গরীব যদি বিনীতভাবেও অপরের ত্রুটি দেখাইয়া দেয়, তবে তাহার উপর "বে আদব" প্রভৃতি কটূক্তিবর্ষণ হয়; ভাগ্যবান্ যদি অন্তের দোষ প্রদর্শন করিয়া তাহার মর্ম্মপীড়াও জন্মান, তথাপি "স্পষ্টবাদীর" সুখ্যাতি লাভ করেন। তাই প্রবাদ হইয়াছে "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী"—এবং "তেজীয়সাং ন দোষায়"। হিন্দুরমণী জীবনের সারসর্ব্বস্ব পতিদেবতার অসহ্য বিয়োগযাতনা

পরিহারকল্পে তথা পরলোকে স্বামীসহ চিরসম্মিলন আকাঙ্ক্ষায় শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসপূর্ব্বক তদীয় চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়া সতীত্বের পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল, ইহার ব্যাখ্যা হইল "নৃশংস বর্ব্বর" প্রথা। কেন না, হিন্দু এখন পরপদানত ভাগ্যহীন জাতি। এদিকে রুশবিজয়ী জেনারেল নোগি সস্ত্রীক "হারিকিরি" করিয়া স্বর্গত মিকাডোর অনুগমন করিলে—জগতে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। কেননা জাপানের এখন একাদশস্থ বৃহস্পতি—জাপান সৌভাগ্যশালী! এই ভাবেই আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ—অর্থাৎ ইংরেজী-শিক্ষাদীক্ষায় যাঁহারা গঠিত, সনাতন ধর্ম্মও সমাজের ব্যবস্থাগুলির বিচার করিয়া থাকেন। বিজেতা জাতির যা' কিছু তা'ই ভাল, আর আমরা পদানত, আমাদের যা' কিছু তা'ই খারাপ, সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাদের এইটিই ধারণা। তাই হিন্দুদের বর্ণাশ্রম বিভাগকে "জাতিধর্ম্ম দ্বেষ" নামে পৃথ্বীরাজ-কবি ভূয়োভূয়ঃ অভিহিত করিয়া, ইহা আমাদের অবনতির একতর নিদানরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং" বলিয়া শ্রীভগবান্ যাহা অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন; "যেরূপ সমাজ সংগঠন পাশ্চাত্য দেশের কাউণ্ট টলষ্টয় প্রভৃতি মনীষিগণের ও সোসিয়ালিষ্টগণের জীবনের চরম স্বপ্ন; ভারতবর্ষীয় যে সমাজে—শৃঙ্খলার ফলে এখনো হিন্দু জাতির মধ্যে পাপের সংখ্যা অন্য জাতীয়গণের তুলনায় অনেক কম; ভারতবর্ষের যে পুণ্য সমাজের তুলনায় পাশ্চাত্যদেশের দারুণ জীবন সংগ্রামযুক্ত সমাজকে দাবানল বলিয়া বোধ হয়; * কেবল কাউণ্ট টলষ্টয় কেন, গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোর "রিপ্লাবিক্" এ এবং কোম্‌তের দর্শনেও যাহার ন্যায় সমাজব্যবস্থা আদর্শরূপে কথিত হইয়াছে; সেই বর্ণভেদকে এভাবে হেয়রূপে প্রতিপাদিত করা সমাজহিতৈষী যোগীন্দ্র বাবুর উচিত হয় নাই। হিন্দুর বিশ্বাস এই যে, কাল প্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্ব স্ব কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়াতেই বর্ত্তমান অধোগতি ঘটিয়াছে। যোগীন্দ্র বাবুর ন্যায় অনেকেই ইহার ভিতরে একটা "দ্বেষ" দেখেন। ইহা ব্রাহ্মণকে শূদ্রের প্রতি "তুই হীন," "তুই ছোট" বলিতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু তাঁহারা এটুকু তলাইয়া দেখেন নাই যে, জাতিভেদের সঙ্গে অপর একটা বিষয়ও আছে, তাহা "জন্মান্তর" বাদ"। ব্রাহ্মণজন্ম

* ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কৃত "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। ডাঃ রায় জাতিবিভাগের বিষম বিরোধী হইয়াও যে এটুকু স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহা আমাদের শ্লাঘ্য বটে।

যদি শ্লাঘানীয় হয়, তবে ইহা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিরই ফল; ইহজন্মে দুষ্কৃতি করিলে আবার নীচযোনিতে যাইতে হইবে। এই যদি শাস্ত্র ব্যবস্থা হয়, তবে দম্ভদ্বেষ ইত্যাদির অবসর কোথায়? একজন অন্যের হাতে না খাইলেই যদি ঘৃণাপ্রকাশ হয়, তবে সদাচার ব্রাহ্মণ যে অনুপনীত বা অমন্ত্রক প্রাণাধিক আত্মীয়ের হাতেও খান না, এটাও কি 'ঘৃণা' বশতঃ? ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে আছে, তদীয় প্রপিতামহাদেব তাঁহাকে কত স্নেহ কত আদর করিতেন, কিন্তু একদিন বালক শিবনাথ প্রপিতামহের পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ খাদ্য গ্রহণ করাতে তিনি আর সেদিন আহার করেন নাই। আমাদের পল্লীগ্রামে আমরা নাপিত ধোবা এমন কি মোসলমানকেও দাদা, কাকা, চাচা ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া সম্মান দেখাইয়াছি। তবে সহরে শুনিয়াছি সাহেবের হোটেলে গিয়া আহারে বসিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তিবিশেষকে দেখিয়া বাবু বলিয়া উঠিলেন, "বেটা উইল্‌সন্ এবার জাতটা মার্‌লে —সোণার বেণের সঙ্গে এক সাথ খেতে বসালে।" এরূপ চিত্র দেখিয়া কোনও ব্যবস্থার বিচার চলে না।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে জাতিভেদকে পতনের কারণ বলা কোনও রূপেই সঙ্গত হয় না। 'জয়চন্দ্র' ও 'পৃথ্বীরাজ' উভয়েই একজাতীয় বরং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত ইহাদের মধ্যে পরস্পর দ্বেষ তো জাতিভেদমূলক নহে। সেইরূপ মীরজাফর ও সিরাজউদ্দৌলা একই ধর্ম্মাবলম্বী, তথাপি ভেদ আসিল কোথা হইতে? পতনের মূলে একতার অভাব তাহা বর্ণভেদমূলক নহে, দুরকাঙ্খতা স্বার্থপরতা ইত্যাদিই অনৈক্যের নিদান। রাজনীতিক্ষেত্রে ইহাই সার কথা United we stand, divided we fall—

"একতায় স্থিতি আর অনৈক্যে পতণ"।

কবি রঙ্গলাল যথার্থই বলিয়াছেন—

"একতায় হিন্দুরাজগণ
সুখেতে ছিলেন সর্ব্বজন
সেভাব থাকিত যদি পার হ'য়ে সিন্ধুনদী
আসিতে কি পারিত যবন?"

অতএব জাতিবিচারের উপর দোষারোপ করা বৃথা। বরং ভিন্ন জাতীয়ের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ এবং আহার বিহার ইত্যাদি না করাতে হিন্দু বিশেষত্ব-

টুকু এত শতাব্দীর অধীনতা সত্ত্বেও বজায় আছে—নচেৎ হয়তো এই জাতি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যাইত।

যোগীন্দ্র বাবু 'পৃথ্বীরাজ' কাব্যের 'গ্রন্থাভাসে' 'দ্বিতীয় সর্গে' 'চতুর্দ্দশ সর্গে' 'পঞ্চদশ সর্গে' হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের অনেক গলদ ঘাটিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি যে ন্যায্য কথাই আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আবার কতকগুলি বিষয় গ্রন্থকারের সমাজসংস্কার বিষয়ে পক্ষপাতিতা হেতুক কাব্যে স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে 'জাতিধর্ম্মদ্বেষ' বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। সুখের বিষয় প্রতিমা পূজা সম্বন্ধে মোসলমানদের টিট্‌কারীর সুন্দর জবাব কবি তুঙ্গচার্য্যের মুখে (দশম সর্গে) দেওয়াইয়াছেন। * এছাড়া আমাদের অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী শাস্ত্র-বিশ্বাসীর মনে আঘাত লাগিতে পারে এমন কথা প্রাগুল্লিখিত অংশে রহিয়াছে—সেগুলির জবাব চলিতে পারে; তন্মধ্যে সহমরণ প্রথাসম্বন্ধেও ইতঃপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। কিন্তু অপর সকল কথার আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ অতিবিস্তৃত হইয়া যায়, তাই এস্থলে ক্ষান্ত হইলাম। বিশেষতঃ ঈদৃশ দু'একটি বিতর্কের জবাব ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার" প্রবন্ধের উত্তরে "বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি নিরাস" নামক পুস্তিকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

যেগুলি ন্যায্য বলিয়া ধরিয়া নিয়াছি সে সকল বিষয় প্রত্যেক জাতির পতনের ইতিহাসেই দেখা যায়; যথা গৃহবিবাদ মূলক অনৈক্য ইত্যাদি।

আমাদের জাতিগত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে কবি মোসলমানদের আক্রমণ ও ভারত অধিকার কল্পনা † করিয়াছেন, সে বিষয়ে তাঁহার নিজেরই উক্তি প্রতিকূল বলিয়া বোধ হয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত অর্থতো পাপের সংশোধন ও

---

* এই নিমিত্ত আমরা যোগীন্দ্রবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ; ধূর্জ্জটিরূপে যে সংস্কারে দলভুক্ততা তাঁহার সম্বন্ধে অনুমিত হইয়াছে, তাঁহারা ত মূর্ত্তিপূজাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া এটাও পতনের একটা কারণ বলিয়া থাকেন—"enervating influence of idolatry" কথাটা ইঁহাদেরই উক্তি।

† ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "সংক্ষিপ্ত জীবনী" (৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) গ্রন্থে আছে, তিনি নাকি কোনও ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন যে আমাদের স্বধর্ম্মবিদ্বেষের প্রায়শ্চিত্তার্থে এদেশে মোসলমানের আগমন হইয়াছে। ৺ভূদেব বাবুর এই অভিমত সাময়িক কল্পনা মাত্র—পরমার্থতঃ যদি তিনি এই মত পোষণ করিতেন, তবে "সামাজিক প্রবন্ধে" ইহার আলোচনা দেখিতাম—এই গ্রন্থই তাঁহার পরিণত বয়সের চিন্তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল।

দূরীকরণ ?—মোসলমান আসাতে আমাদের কোন্ পাপটা লুপ্ত হইয়াছে, কবি তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলে ভাল হইত। "পৃথ্বীরাজ" কাব্যে সমাজের যে যে দোষ কবি দেখাইয়াছেন, তাহা শিবাজীর অভ্যুত্থান সময়েও প্রায় সমস্ত বর্ত্তমান ছিল—তথাপি শিবাজীর অভ্যুদয় হইল কেন ?

"শিবাজী" কাব্যের একাদশ সর্গে রামদাসস্বামীর মুখে কবি যে সকল যুক্তিদ্বারা শিবাজীকে উৎসাহদান করিয়াছেন, তাহার অনেকটা পৃথীরাজেও খাটে এবং দু'একটা কবির কল্পনাপ্রসূতও বটে। শিবাজীর ন্যায় পৃথ্বীরাজও উৎসাহী শূর ছিলেন, একবার মোসলমানদিগকে সম্মুখ যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিতও করিয়াছিলেন। শিবাজীর যেমন 'সখীবাই' পৃথ্বীরাজেরও সংযুক্তা "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ" ইত্যাদি ছিলেন। পরন্তু পৃথীরাজের চিতোররাজের ন্যায় মিত্র ছিলেন—শিবাজীর ঈদৃশ কোনও মিত্র সহায় ছিল না। পৃথীরাজের যেমন কনোজ কাশ্মীর প্রতিপক্ষ ছিল, শিবাজীরও জয়সিংহ প্রভৃতি রাজপুত একদিকে অপরদিকে বিজাপুর প্রতিপক্ষ ছিল—অথচ মোগল তখন সম্রাটভাবে মহারাষ্ট্রের উপরও আধিপত্যসম্পন্ন ছিল, পৃথীরাজের শত্রু মোসলমানের তখন ভারতবর্ষে কোনও অধিকারই ছিল না। সমগ্র মহারাষ্ট্র যেমন শিবাজীর অনুরক্ত ছিল, আজমীর ও দিল্লী এই দুই রাজ্যের লোকও পৃথীরাজের জন্য প্রাণ দিতে সতত প্রস্তুত ছিল। শিবাজীর যেমন সাধু রামদাস গুরু ছিলেন, কবি পৃথীরাজকেও তাদৃশ একটি গুরু—তুঙ্গাচার্য্য দিয়াছেন। জাতিভেদ মহারাষ্ট্রেও ছিল, দিল্লীতেও ছিল। ধর্ম্মভেদ (শাক্ত বৈষ্ণব ইত্যাদি) দিল্লীতেও যেমন ছিল, মহারাষ্ট্রেও তেমনই ছিল। কবি যে শৈল ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের দাঙ্গা অথবা দেবমন্দিরে দেবদাসীর প্রশ্রয় অথবা চাণ্ডালের পারিয়ার প্রতি ব্রাহ্মণের ঘৃণার ভাব * ইত্যাদি (পৃথীরাজের) পঞ্চদশ স্বর্গে দেখাইয়াছেন —সেগুলিতো আধুনিক কথা, শিবাজীর অভ্যুদয়ের পরের কথা, এসকল চিত্র "শীবাজী"তেও তো (অগস্ত মুনি ইচ্ছা করিলে রামদাসকে) দেখাইতে পারিতেন— যেমন "পৃথ্বিরাজে" তুঙ্গাচার্য্যকে দেখান হইয়াছে। "পৃথ্বিরাজে" যেমন মোসলমানেরা হিন্দুদের ধর্ম্ম ও সমাজের নিন্দা করিয়াছে, "শিবাজ"তেও (পঞ্চম সর্গে

---

* পরন্তু গুণবান্ চণ্ডালের প্রতি সম্মাননার কথাও তো দেখা যায়—যথা "চাণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ" "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে" ইত্যাদি।

এবং দ্বাদশ সর্গে) তেমনই করিয়াছে—ইহাতে অন্য ধর্ম্মীর চক্ষে উভয়ের সময়েই হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজের মৌলিক বিষয়গুলি নিন্দনীয়ভাবেই প্রতিভাত হইয়াছে।

অতএব মোসলমানের আগমনে আমাদের প্রায়শ্চিত্তটা (কেবল অত্যাচার ভোগ ব্যতীত) কিরূপে হইল, তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিলাম না। কলির প্রবলতা হেতুক ধর্ম্মের সঙ্কোচবশতঃ আমরা যে পাপের ভোগ ভুগিয়াছি ও ভুগিতেছি, সেটা নিঃসন্দেহ। মোসলমান দ্বারা সংশোধনটা কোন্ ভাবে হইল তাহা বুঝা গেল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জগতের সমস্ত কার্য্যই ভগবদিচ্ছায় ঘটিতেছে, এই মোসলমান কর্ত্তৃক ভারত অধিকার অবশ্যই তাঁহারই ইচ্ছায় সংঘটিত। কবি যোগীন্দ্র বাবু ইহাতে "উদ্দেশ্য" দেখিয়াছেন এবং "শিবাজী" কাব্যের অন্তিম সর্গে রামদাস স্বামীর মুখে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন—

"দুর্জ্ঞেয় বিধির বিধি, কিন্তু লক্ষ্য তাঁর
চরম কল্যাণ। বৎস ! দেখ বুঝি তুমি,
অধর্ম্মের অসদাচারে জাতিজ্ঞাতি দ্বেষে
মগ্ন দেখি হিন্দুগণে বিশ্বপতিদেব
পাঠাইলা মুসলমানে, অভিপ্রায় তাঁর
জ্ঞানে প্রেমে ধর্ম্ম তারা করিবে প্রচার ;
হবে শিষ্য, হবে গুরু আদানে প্রদানে।
শিখিবে মাধুর্য্য প্রেম ঔদার্য্য হিন্দুর ;
শিখাইবে মানবের ত্রাতাপাতা যিনি
প্রচারিলা যাঁর কথা পূর্ব্ব ঋষিগণ
এক অদ্বিতীয় তিনি, অরূপ অব্যয়।
বুঝাইবে তাঁর কাছে চণ্ডালে ব্রাহ্মণে
নাহি ভেদ জাতি ধর্ম্মবিঘ্নকর।
কিন্তু মোহবশে ভুলি' কর্ত্তব্য-আপন
পঞ্চশত বর্ষ তারা রহি হিন্দুস্থানে
না পড়িল হিন্দুশাস্ত্রে, না লভিল জ্ঞান ;

না পারিল শিখাইতে না শিখিল নিজে ;
বিচারিল ধ্বংসে ভঙ্গে সিদ্ধ হ'বে কায।
প্রভূত্ব ঐশ্বর্য্য লভি মজিল ব্যসনে,
অবজ্ঞায় অত্যাচারে পীড়িল হিন্দুরে।
প্রচারিল জাতিভেদ জেতাজিতরূপে
শতগুণ মর্ম্মন্তুদ।—”

এখানে, ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে এই যে একটা “উদ্দেশ্য” আরোপিত হইল, কবি দেখাইলেন যে, সেই উদ্দেশ্য বিফল হইল—মোসলমানগণ না শিখাইল, না শিখিল। অর্থাৎ ভগবানের চালে ভুল হইল। যোগীন্দ্র বাবু বোধ হয় এটা ভাবিয়া দেখেন নাই—দেখিলে এরূপ লিখিতেন না। অপিচ মোসলমানের ঈশ্বর আর পূর্ব্ব ঋষিগণের 'ব্রহ্ম' (অরূপ অব্যয় দ্বারা ইহাই বোধ হয়) একই জিনিস নহে ; “নেদং যদিদমুপাসতে” আর মোসলমানের উপাস্য (সগুণ) “রহিম ও রহমান্ (দয়ালু ও ন্যায়বান্) আল্লা একবস্তু হইতেই পারে না। দুঃখের বিষয়, কবি (“পৃথ্বীরাজ” দশম সর্গ) তুঙ্গাচার্য্য দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে মোসলমান-দিগকে তর্কে নিরুত্তর করাইয়াও (তাও ভবানীভক্ত শিবাজীর গুরুমুখে) এইরূপ বলাইলেন।

কবি আরও একটি ভুল করিয়াছেন—এই “শিবাজী”রই “গ্রন্থাভাসে।” তিনি ক্ষত্রিয় বিনাশ নিমিত্ত পরশুরামকে দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছেন। পরশু-রাম ত্রেতাযুগের অবতার—ত্রেতার মধ্যভাগে তিনি “ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ” ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিয়াছিলেন। “বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্” যিনি মধ্যে মধ্যে মর্ত্ত্যে আইসেন, পরশুরাম তিনিই—তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত বা অনুতাপ—সেটাও ত্রেতা দ্বাপর কলিব্যাপী—বড়ই অশোভন হইয়াছে। প্রাণিবধে একটা পাপ আছে—বিষধর সর্প মারিলেও কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ; পরশুরাম তাদৃশ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু বলগর্ব্বিত যে দুষ্টক্ষত্রিয়গণ নিরীহ ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদের সমূলে ধ্বংস সাধন করিয়া তাঁহার অনুতপ্ত হইবার বিশেষ কারণ ছিল না। তাঁহার ক্ষত্রিয় নাশের ফলে ভারতবর্ষ ক্ষত্রিয়হীন অথবা বীর্য্যহীন হয় নাই। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং পরশুরামের পরবর্ত্তী, —এবং পরশুরামের ক্ষাত্রতেজোগর্ব্ব দূরীকরণপূর্ব্বক তাঁহাকে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ-

সম্পন্ন ব্রাহ্মণে পরিণত করিয়াছিলেন।* ইহারও বহুপরে মহাভারতের যুদ্ধ হয়—তাহাতে অসংখ্য ক্ষত্রিয় যোগদান করেন, এবং বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ভারতযুদ্ধের পর অশ্বমেধপর্ব্বেও সুবহু-ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ দেখা যায় এবং দ্বারকায় যদুবংশ তাহার পরে (মুষলপর্ব্বে) বিধ্বস্ত হয়। যোগীন্দ্র বাবু ব্রাহ্মণ পরশুরামের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া বরং ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা জ্ঞাতিবধজনিত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করাইলে শোভন হইত। তবে শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলীলা বহুদিন হইল সংবরণ করিয়া গিয়াছেন। শিবাজীর আবির্ভাবের প্রাকালে তাঁহাকে টানিয়া আনা যায় না, এই যদি আপত্তি হয়, তবে স্থানটা "সহ্যাদ্রি" স্থলে "বৈকুণ্ঠঃ" করিলেই তো ল্যাঠা চুকিয়া যাইত। যত নষ্টের মূল তো শ্রীকৃষ্ণই—কেন না অর্জ্জুন তো জ্ঞাতিবধ করিতে নারাজ হইয়া গড়িয়াছিলেন, ইনিই "যুধ্যস্ব ভারত" বলিয়া প্ররোচনা দিয়া বিপুল কুরুকুল এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু বহু ক্ষত্রিয়ের সংহারসাধন করিয়াছিলেন। ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া অশ্বমেধে হতাবশিষ্ট বহুক্ষত্রিয়ের বিনাশে সহায় হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে নিজের অতিবিশাল বংশটি নির্ম্মূল করিয়া তবে ধরাধাম পরিত্যাগ করেন। কবি বরং আরো আড়াই হাজার বৎসর পরবর্ত্তী আর একজন অবতারকে দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইতে পারিতেন—ইনি রাজ্যপাট ছাড়িয়া প্রথম যৌবনেই যতিধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" বলিয়া যে এক বাণী প্রচার করিলেন, তাহার ফলেই ভারত নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, এটা অনেকেই বলিয়া থাকেনও বটে। † সে যাহা হউক, পরশুরাম ব্রাহ্মণ বলিয়া এবং তৎকৃত ক্ষত্রিয়ধ্বংস ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাজনিত বিগ্রহ ব্যাপার বলিয়া যদি কায়স্থ কবি এই উদ্ভট দৃশ্যের অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা নাচার। তবে যোগীন্দ্র বাবু কায়স্থকে ক্ষত্রিয় মনে করেন কিনা, এবং তাঁহার ঈদৃশ জাত্যাভিমান আছে কিনা, আমরা অবগত নহি, তাঁহার কাব্যে তো জাতিধর্ম্মদ্বেষের বহুশঃ নিন্দাবাদই রহিয়াছে।

---

* ব্রাহ্মণের কুলে ক্ষাত্রতেজঃসম্পন্ন পরশুরামের জন্মরহস্য এস্থলে স্মরণযোগ্য। বাহুল্য ভয়ে সেই কাহিনী বিবৃত করা হইল না।

† "নন্দান্তং ক্ষত্রিয়কুলম্" এরূপ কথা পুরাণে আছে; তদ্দারা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের অল্প পরেই যে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হয়, তাহাই সূচিত হইতেছে।

এখন পৃথ্বীরাজের পতন এবং শিবাজীর উত্থান সম্বন্ধে যথামতি দুএকটি কথা বলা যাইতেছে।—

শৌর্য্যবীর্য্য আভিজাত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে পৃথ্বীরাজ শিবাজী অপেক্ষা শ্রেয়ান্ ছিলেন,—শিবাজী সামান্য একজন জায়গীরদারের ছেলেমাত্র, শিক্ষাদি বিষয়েও হীন ছিলেন। তথাপি শিবাজীর পরম সৌভাগ্য বশতঃ সদ্গুরু লাভ হইয়াছিল এবং তাঁহার কৃপায় 'ভবানীতে' দৃঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। "পৃথ্বীরাজে" তুঙ্গাচার্য্য কবির কল্পনামাত্র—এবং এই তুঙ্গাচার্য্যকেও কবি এক "মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি"র উপাসক করিয়াছেন—"দেবী শুভঙ্করী" দেশমাতৃকার সাকার মূর্ত্তি—৺ভূদেব বাবুর "পুষ্পাঞ্জলি"তে এইরূপ মূর্ত্তি কল্পিতা হইয়াছেন এবং ৺বঙ্কিম বাবু "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে ইঁহারই বন্দনা করিয়াছেন। কিন্তু রামদাস-শিষ্য শিবাজী এইরূপ 'কল্পিত' মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন না—তন্ত্রসম্মত জাগ্রৎ দেবীমূর্ত্তির ভক্ত ছিলেন—তাঁহার কৃপালব্ধ 'অসি' দ্বারা সমরবিজয়ী হইয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ নানাগুণসম্পন্ন হইয়াও ইন্দ্রিয়-বিজয়ী নিষ্কামব্রতাবলম্বী পুরুষ ছিলেন না—দেশের প্রতি মোসলমানদের লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন প্রণয়-ব্যাপারের প্রশ্রয় দিবার সময় নহে সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের সাক্ষাৎ মাতৃষ্বস্রেয় ভ্রাতার কন্যা—কবি এই সম্পর্কই গ্রাহ্য করিয়াছেন। শাস্ত্রতঃ এই কন্যা পরিণয়যোগ্যা নহে। তাও আবার প্রবল প্রতিপক্ষের দুহিতা। পৃথ্বীরাজের ঐদিকে সাবধান হওয়া উচিত ছিল। এদিকে শিবাজী এ সকলের অতীত ছিলেন—৺ভূদেব বাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাস "অঙ্গুরীয় বিনিময়ে" দেখা যায়, শিবাজীর নিমিত্ত একটা প্রণয়ের ফাঁদ কল্পিত হইয়াছিল, তিনি তাহাতে পতিত হন নাই। শিবাজী যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুর চরণে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ যদি একটু অভিমান ত্যাগ করিয়া জয়চন্দ্রের ছন্দানুবর্ত্তন করিতে পারিতেন,—জয়চন্দ্রের "রাজসূয়ে" যোগ দিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারতের ভাগ্যলিপি বোধ হয় অন্যরূপ লিখিত হইত। "মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ" দুর্যোধনও তো যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে উপস্থিত থাকিয়া আত্মীয়তা দেখাইতে পারিয়াছিলেন! তাহা করা দূরে থাকুক তিনি জয়চন্দ্রের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার কন্যাহরণ করিয়া বিদ্বেষবহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়াছিলেন। বিগ্রহ

ব্যাপারে—বিশেষতঃ কূটকপট্ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যেরূপ চালের প্রয়োজন ছিল, পৃথ্বীরাজ সে বিষয়ে সম্যক্ অবহিত ছিলেন না—"শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এই নীতি শিবাজী খুবই জানিতেন। তবে শিবাজী এবিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন—পূর্ব্ববর্ত্তী চারিশতাব্দী যাবৎ দেশের উপর মোসলমানদের যে শাসননীতি চলিয়াছিল, শিবাজী তাহার খোঁজ খবর রাখিয়া স্বীয় নীতি গঠন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ সদ্‌গুরুর কৃপায় এবং ভবানীর প্রতি দৃঢ়ভক্তি হেতু শিবাজীর বুদ্ধিতে নির্ম্মলতা, বাহুতে বল ও হৃদয়ে অপরিসীম উৎসাহ জন্মিয়াছিল, তাই তিনি প্রকৃত পথ দেখিতে পাইতেন—শত্রুর বলদর্প চূর্ণিত করিয়াছিলেন এবং ছত্রপতিপদাভিষিক্ত হইয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজের পতনের ও শিবাজীর অভ্যুদয়ের কাহিনী পাঠ করিয়া যাহাতে আমরা উদ্‌বুদ্ধ হই, কবির এই সাধু অভিপ্রায় প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথম জীবনের ধূর্জ্জটিত্ব অর্থাৎ সমাজসংস্কারের ঝোঁক এখনও তাঁহার যায় নাই। তাই সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে আস্থাবান্ ব্যক্তির প্রতিবাদযোগ্য অনেক কথা—অনেকটা অবস্থান্তরভাবে তদীয় কাব্যের বিষয়ীভূত হইয়াছে, আমরা ঈদৃশ দু'একটি কথার মাত্র প্রতিবাদ করিলাম। এতদতিরিক্ত কবি ও কাব্যসম্বন্ধে সামান্য কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে বটে, পরন্তু কাব্যের উৎকর্ষ বিচারে হস্তক্ষেপ কিছুমাত্রই করা হয় নাই,—তবে অপরাপর সুধীবর্গ ও সমালোচকগণ তদ্বিষয়ে যেরূপ প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, আমরা তাহাতেই যোগ দিয়া কবিকে অভিনন্দিত করিতেছি।* বর্ত্তমানে তাঁহার ধর্ম্মমত কি জানিনা, কিন্তু "শিবাজী" গ্রন্থে তিনি যেরূপ আন্তরিকতা সহকারে ভবানীস্তোত্রের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে দেবীর একজন বিশ্বাসী ভক্ত বলিয়াই মনে হয়। তাই উপসংহারে প্রার্থনা করিতেছি, আনন্দময়ী মা ভক্ত কবির জীবনের অপরাহ্নকাল আনন্দময় করুন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্-এ।

---

* কবির ভাষা ও রচনাপদ্ধতি সুন্দর; শব্দপ্রয়োগও সুষ্ঠু হইয়াছে। তবে 'প্রস্থাভাস' বোধ হয় "প্রস্থাভাষ" হইবে; "উচিৎ," 'নিশ্চিৎ,' ইত্যাদি অবশ্যই ছাপার ভুল। 'ও' এবং 'ই' [যেমন কোন (ও); তার (ই) ইত্যাদি] বন্ধনী মধ্যে দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি; তত্তৎস্থলে 'ও' 'ই' কে পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিলেই চলে, কেন না ঐ অক্ষর সর্ব্বদাই হসন্ত উচ্চারিত হইয়াছে, নচেৎ ছন্দঃপাত হইত। ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারও 'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল' লিখিয়া এবিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শন করিয়াছেন।

সাহিত্য-সভার

দ্বাবিংশ বার্ষিক পঞ্চম মাসিক অধিবেশন।

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ সাল। ইং ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯২১ খৃঃ।

রবিবার—অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

১। উপস্থিত সভ্যগণের নাম :—

১। শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় জ্যোতিভূষণ এম, এ;
২। ,, নবকৃষ্ণ ঘোষ।
৩। ,, কবিরাজ কেদারনাথ কাব্যতীর্থ।
৪। ,, ,, অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়।
৫। ,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত। জন্মভূমি সম্পাদক।
৬। ,, মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ।
৭। ,, রায় ডাঃ চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, এফ, সি, এস, ইত্যাদি
৮। ,, সুবোধচন্দ্র দত্ত।
৯। ,, কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১০। ,, মন্মথমোহন বসু এম, এ।
১১। ,, ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
১২। ,, কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর।
১৩। ,, প্রফুল্লকুমার বসু।
১৪। ,, নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু।
১৫। ,, প্রিয়নাথ দত্ত।
১৬। ,, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১৭। ,, পণ্ডিত সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ।
১৮। ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ আদিত্য।
১৯। ,, যাদবচন্দ্র সরকার।

২০। ,, রামদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায়।

২১। ,, গোবিন্দলাল মল্লিক।

২২। ,, প্রবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

২। রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি,, আই, এস ও মহাশয়ের প্রস্তাবে ও কবিরাজ, শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম-এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

(ক) সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ভূষণ এম, এ, মহাশয়—"সাহিত্য সভার" সাধারণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। অতঃপর গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত বলিয়া পরিগৃহীত হইল।

৪। দ্বিতীয় Oriental Conference এ যোগদান করিবার জন্য নিম্নলিখিত সভ্য-মহোদয়গণকে "সাহিত্য-সভা" হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হইল :—

১। শ্রীযুক্ত মহারাজা স্যার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে, সি, আই, ই।

২। মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী কে, সি, এম, এ, এল, এল, বি, বার-এট-ল।

৪। ,, মহারাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (নসীপুর)

৫। ,, ,, ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর (সুসঙ্গ)

৬। ,, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

৭। ,, রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ)।

৮। ,, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু এম, এ।

৯। ,, রায় ডাঃ চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, এফ্ সি, এস্, আই, এস, ও ইত্যাদি।

১০। ,, কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর, দর্শননিধি।

১১। ,, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

১২। ,, ,, কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন এম, এ।

১৩। ,, নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু।

১৪। ,, কিরণচন্দ্র দত্ত।

১৫। ,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল।

১৬। ,, কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।

১৭। ,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পাদক—জন্মভূমি)।

১৮। ,, কবিরাজ কালীভূষণ সেন কবিরত্ন।

১৯। ,, পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী এম, এ।

২০। ,, ,, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

২১। ,, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ।

২২। ,, অধ্যাপক অমরেশ্বর নাথ ঠাকুর এম, এ।

২৩। ,, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন, বিদ্যানিধি, এম, এ, এল, এম, এস।

২৪। ,, কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন ভিষগ্‌রত্ন।

২৫। ,, অধ্যাপক ভূদেব মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ভূষণ এম, এ।

২৬। ,, পণ্ডিত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ।

২৭। ,, ,, সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ।

২৮। ,, ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

২৯। ,, কুমার প্রকাশকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।

৩০। ,, কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন, এম, এ, এম, বি।

৩১। ,, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন (রঙ্গপুর)।

৩২। ,, মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী (দ্রাবিড়)।

৩৩। ,, অধ্যাপক রজনীকান্ত দে এম, এ বি, এল।

৩৪। ,, মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস, সি।

৩৫। ,, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

৩৬। ,, রসময় লাহা

৩৭। ,, কবিরাজ অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়।

৫। আপাততঃ শ্রীযুক্ত অধ্যাপক ভূদেব মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ভূষণ এম, এ, মহাশয় "ভারতীয় স্বাস্থ্যবিদ্যা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৬। সমালোচনা প্রসঙ্গে—শ্রীযুক্ত রায় ডাঃ চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান উপলক্ষে বলেন,—প্রবন্ধাকার

মহাশয় আয়ুর্ব্বেদ ও নানাশাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এই প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, প্রবন্ধকার মহাশয়—শীতকালে পশমি বস্ত্র পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান দেশের লোকের স্বাস্থ্য নানা কারণে এরূপ হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে পূর্ব্বপ্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। অতিরিক্ত বস্ত্র ব্যবহার না করিলে দেশবাসীর স্বাস্থ্য আরও নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাহাদিগের সহজেই নানারোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। দেশের জল নিকাশের পথ রুদ্ধ হওয়াতেই ম্যালেরিয়ায় উৎপত্তি হইয়াছে। দূষিত বদ্ধ জলে ম্যালেরিয়াবাহী মশকের বংশ বৃদ্ধি হয় এবং জঙ্গলাকীর্ণস্থানে মশকেরা দিবাভাগে বাস করিতে ভালবাসে এবং রাত্রিকালে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে দংশন করে। মশক অনেকপ্রকার তন্মধ্যে এনোফিলিস্ নামক একজাতীয় মশক ম্যালেরিয়া বীজ-বাহী। মশকের দ্বারাই যে ম্যালেরিয়ার ব্যাপ্ত হয়, তাহা বহু মনীষীগণের দ্বারা পরীক্ষা সংযোগে সপ্রমাণ হইয়াছে। এই মত বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয় নহে। প্রত্যক্ষ পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত কোন মতের এরূপ ভাবে খণ্ডন নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক বলিলে অত্যুক্তি হইবে।

৭। শ্রীযুক্ত কবিরাজ কেদারনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় বলেন, প্রবন্ধকার মহাশয় শাস্ত্রীয় মতগুলি নিঃশঙ্কোচভাবে প্রকাশ করিয়া বিশেষ সত্যবাদীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মশক দংশনই যে ম্যালেরিয়ার একমাত্র কারণ ইহা স্বীকার করা যায় না। আমার বোধ হয় ম্যালেরিয়া বিষম জ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রত্যেক জীবেরই আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ জ্ঞান আছে. সেই জ্ঞানের সাহায্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভাব অভিযোগ প্রয়োজন অপ্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারে।

৮। শ্রীযুক্ত নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন, আমরা পূর্ব্বে এত কথা জানিতাম না। কিন্তু আমরা কার্য্য করিতে জানিতাম। স্বাস্থ্যরক্ষা হইতেছে স্বার্থ রক্ষা। পূর্ব্বে লোকে বস্ত্র সংক্ষেপের জন্য কেবলমাত্র ধুতি ও উত্তরীয় পরিধান করিত, আর পাগড়ী পরিত্যাগেরও বোধ হয় ঐ কারণ। সভ্যতার যতই ক্রম বিকাশ হয় ততই লোক শ্রমবিমুখ হইয়া থাকে; আর ইহা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ সভ্যতার ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক শ্রমসাধ্য ব্যাপার অতি অল্পায়াসে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্য

জন সাধারণও কতকটা শ্রম বিমুখ হইয়া থাকে। আমি ডিস্‌রেলীর একখানি গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি যে পাশ্চাত্য দেশে এক সময়ে পরিচ্ছদ পারিপাট্যের পরিবর্ত্তন কোনও এক বিশেষ কারণ বশতঃ ঘটিয়াছে। ইউরোপের এক রাজার গলগণ্ড ছিল, তিনি সেই গলগণ্ড ঢাকা দিবার জন্য গলায় কলারের কাছে অনেকগুলি কাপড়ের ফুল ও লেস্ প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন, পরে উহা জাতীয় ফ্যাসানে পরিণত হইয়া গেল। এক কুব্জা রাণী তাঁহার কুব্জকে ঢাকিবার জন্য পীঠবস্ত্র choke mantle ব্যবহার করিতেন পরে উহা ফ্যাসানে পরিণত হইয়াছিল। স্বীয় ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস, সর্ব্বকার্য্যে সূচীতা, এবং স্বার্থ ত্যাগ না করিলে দেশের উন্নতি হইবে না। আমি প্রবন্ধ লেখক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ করিতেছি।

৯। কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয় বলেন, প্রবন্ধকার সংস্কৃত. জ্যোতিষ, দর্শন ও আর শাস্ত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। এই প্রবন্ধটী বহু তথ্য পূর্ণ ও পাণ্ডিত্য দোত্যক। অতিরিক্ত পশমী বস্ত্রের ব্যবহারে রক্ত উত্তপ্ত হইয়া থাকে ও পিত্তাধিক্য ঘটাইয়া দুষিত হয়। অতএব পশমী বস্ত্র যথাসম্ভব কম ব্যবহার করা উচিৎ। তবে একেবারেই পশমী বস্ত্র বর্জ্জন করা যাইতে পারে না। অবশ্য এই দরিদ্রের দেশে বস্ত্র বাহুল্য বর্জ্জন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশের লোক অত্যন্ত অনুকরণ প্রিয়, আমরা ইংরাজদের বস্ত্র বাহুল্যের অযথা অনুকরণ করিয়া থাকি। শীতপ্রধান দেশে বস্ত্রাধিক্যের প্রয়োজন হইতে পারে বটে, কিন্তু গ্রীষ্ম প্রধান দেশে যথাসামান্য গাত্রাবরণ হইলেই চলিবে গীতায় শ্রীভগবান্ শীত ও গ্রীষ্মে সমভাব, মান ও অপমানে সমভাব রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। সকলেরই কষ্ট-সহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন, রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি সহ্য করা উচিত, তাহা হইলে প্রাকৃতিক বিপর্য্যায় সহসা-কোন ব্যাধিতে আক্রমণ করিতে পারিবে না। তবে বর্ত্তমানে অনেকই বাল্যকাল হইতে পশমী বস্ত্রাদি ব্যবহার করে, ঐ গরম বস্ত্র ব্যবহার তাহাদের সাত্ম হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে গরমী বস্ত্র একেবারেই ব্যবহার না করিলে তাহাদের ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। প্রাচীন ভারতের স্ত্রীলোকেরা জামা ব্যবহার করিত ও সেলাই করা বস্ত্র ব্যবহার করিত। শাস্ত্রোক্ত আচার-ব্যবহার করিলে শরীরের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। "অনাগত রোগ প্রতি বৈধ নিয়ম" অধ্যায়ে যাহাতে রোগ না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা আছে। অতিরিক্ত ব্যায়াম ও বিশুদ্ধ পুষ্টিজনক আহারের অভাবে বর্ত্তমান ছাত্র

সমাজ এত দুর্ব্বল ও অল্পায়ুঃ হইয়া পড়িতেছে। দেশের জল ও বায়ু খারাপ হইয়া ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়, "জনপদ ধ্বংশনীয়" অধ্যায়ে ইহার উল্লেখ আছে। আয়ুর্ব্বেদে প্রত্যেক মাংসের গুণাগুণ বিচার আছে। উহা ভাল করিয়া দেখিয়া তবে সেই মাংস আহার করা উচিত। কাদম্বরীতে সিগারেট জাতীয় ধূম-পানের প্রচলন ছিল জানিতে পারা যায়। স্বাস্থ্যই সাহিত্যের প্রাণ—দেশের স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে, কখনও সাহিত্যের উন্নতি হয় না। সেই জন্য সাহিত্য-সভায় স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে পঠিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আমি সুপণ্ডিত প্রবন্ধকার মহাশয়কে তাঁহার সাধু চেষ্টার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

১০। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, আমি সাহিত্য-সভার পক্ষ হইতে প্রবন্ধ লেখক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। দেশ কাল পাত্র বিচারে প্রাচীন মত সর্ব্বদা গৃহীত হইতে পারে না। যদি শাস্ত্র প্রণেতা প্রাচীন ঋষিগণ বর্ত্তমান থাকিতেন তবে তাঁহারাও দেশ কাল পাত্র বিচার শাস্ত্রও নূতন করিয়া প্রণয়ন করিতেন। প্রাচীন কালেও মহর্ষিগণ যখন যে প্রথা সমাজের অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন তখনই তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন বিধি প্রণয়ন করিতেন।

১১। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত—
সহ-সম্পাদক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দেবশর্ম্মা—
সভাপতি।

সাহিত্য-সংহিতার

সন ১৩২৮ সালের মাঘ হইতে চৈত্র সংখ্যার

সূচীপত্র।

Printed by G. B. Manna at the Mitra Press.
45, Grey Street Calcutta.

সাহিত্য সংহিতার

১৩২৮ সালের বৈশাখ হইতে আষাঢ় সংখ্যার

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

মুদ্রারাক্ষস।

(পঞ্চাঙ্ক নাটক)।

(যন্ত্রস্থ)

কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজা প্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ,

কাব্যভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, আয়ুর্ব্বেদ-

রত্নাকর, দর্শননিধি মহাশয়

কর্ত্তৃক প্রণীত।

কাব্যের উপাধি পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ ও সংস্কৃত বি, এ, পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ ইহা পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

ইহা পণ্ডিত বিশাখ দত্ত প্রণীত বিখ্যাত রাজনীতি সম্বন্ধীয় সংস্কৃত নাটক "মুদ্রারাক্ষসের" অনুবাদ। অনুবাদ সম্পূর্ণ ইতিহাস সম্মত, সরস ও সরল হইয়াছে। নাটকখানিকে অভিনয়ের উপযোগী করিবার জন্য কয়েকটী কল্পিত চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

সাহিত্য-সভার দ্বাবিংশ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশন।

৩১শে বৈশাখ ১৩২৮ সাল।—ইং ১৪ই মে ১৯২১ খৃঃ।

শনিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা।

১ উপস্থিত সভ্যগণের নাম।—

১। শ্রীযুক্ত রায় ডাঃ চুন্নীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, আই, এস্, ও এফ, সি, এস, রসায়নাচার্য্য ইত্যাদি, ২। নগেন্দ্রনাথ নাগ, ৩। শ্যামলাল গোস্বামী, ৪। অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু এম, এ, ৫। যতীন্দ্র নাথ দত্ত, ৬। কিরণচন্দ্র দত্ত, ৭। অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়, ৮। কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন, বিদ্যাবিনোদ, কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ, আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর, দর্শননিধি, ৯। কবিরাজ বসন্তকুমার গুপ্ত, ১০। খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১। কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ, ১২। কবিরাজ কালীভূষণ সেন কবিরত্ন, ১৩। শতীশচন্দ্র-সেন, ১৪। ক্ষেত্রমোহন দে, ১৫। জীবনকৃষ্ণ রুদ্র, ১৬। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৭। গোবিন্দলাল মল্লিক, ১৮। প্রবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

২। রায় ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, রসায়ণাচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাবে ও কবিরাজ বসন্তকুমার চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু এম, এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

৩। অতঃপর সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

৪। নিম্নলিখিত গ্রন্থোপহারদাতা মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থের নাম।	উপহার দাতার নাম।
১। জার্ম্মনির বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি—	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ,।

৫। অতঃপর শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় "প্রাচীন ভারতীয় কথা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৬। সমালোচনা প্রসঙ্গে—শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন—বিদ্যাবিনোদ, কাব্যভূষণ মহাশয় বলেন, প্রবন্ধলিখিত অনেক বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ-লেখকের সহিত একমত নহেন। বেদ ও জেন্দাবেস্তা উভয়ই প্রাচীন গ্রন্থ। জেন্দাবেস্তা হইতে বেদ অধিকতর প্রাচীন গ্রন্থ। জেন্দাবেস্তায় অসুর শব্দ দেবতাবাচক। অনার্য্য শব্দ জাতিবাচক বলিয়াই বোধ হয়। কৈকেয়ী অনার্য্যের ন্যায় মনোবৃত্তি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে অনার্য্যা বলা হইয়াছে। শিব যে অনার্য্য এ কথা নিতান্তই হাস্যজনক। ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত ভস্ম বিলেপিত ও শ্মশানবাসী বলিয়াই শিব বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু সেইজন্য তাঁহাকে অনার্য্য বলা যায় না। শিব আর্য্য দেবতাদিগের গুরুস্থানীয়। সরস্বতীকে যদি দেবী বা মানবী কল্পনা করা যায় তাহা হইলে প্রবন্ধকারের প্রমাণ ব্যর্থ হয়। সরস্বতীকে যদি নদী কল্পনা করা যায় তাহা হইলেও বলা যায় আর্য্যগণ উত্তরকুরু বা মঙ্গোলিয়া হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর যখন আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন তখন সরস্বতীর তীরে উপনীত হইয়াছিলেন। বৈদিক মন্ত্র সকল একই সময়ে রচিত হয় নাই, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল। উত্তর কুরু হিমময়। বেদে পিতৃলোকের বর্ণনায় উত্তরকুরু ও মঙ্গোলিয়ার যথেষ্ট বর্ণনা আছে। মহামতি তিলক, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহাদের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ সকল মত বাদ খণ্ডিত হয় নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত মনীষীগণের মতবাদ খণ্ডিত না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধকারের মত গ্রহণ করিতে পারি না। বেদের অতি প্রাচীন যুগে চাতুর্ব্বর্ণ্য ও বিবাহ প্রথা ছিল না। শ্বেতকেতু তাঁহার মাতাকে পর পুরুষের সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পিতার ঠিক ছিল না বলিয়া অনেকে মাতৃ নামে পরিচিত হইত। দ্বিবর শব্দের অপভ্রংশে দেবর শব্দের সৃষ্টি। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা দেবরের সহিত বিবাহিত হইত। বেদে বিধবা বিবাহ অনুমোদিত। কোন কোন স্থলে সহমরণ গমনে নিষেধ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে কণ্ব গোত্রোৎপন্ন ঋষিদিগের নিকট অশ্বরহিত যান চালনা শিক্ষার প্রার্থনা আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

যখন রচিত হইয়াছে, তখন বঙ্গদেশ সমুদ্রগর্ভে সেই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে বঙ্গ শব্দ আছে তাহা বঙ্গদেশ নহে, তাহার অর্থ অন্য কিছু হইবে।

৭। সমালোচনা প্রসঙ্গে—রায় বাহাদুর ডাঃ চূণীলাল বসু এম, বি, রসায়নাচার্য্য মহাশয় বলেন, প্রবন্ধলেখক মহাশয় বহু গবেষণা করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমি পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা শ্রীমান গিরিজাপ্রসন্নের সমালোচনা সমর্থন করিতেছি। প্রবন্ধলেখক মহাশয় যে সকল মত প্রবন্ধ মধ্যে প্রচারিত করিয়াছেন, তাহা আমি সর্ব্বথা স্বীকার করিতে পারি না। তিনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত মহামতি তিলক, পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মত বিশেষ প্রমাণ সহকারে খণ্ডন না করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার মত আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। ভৌগলিক তত্ত্ব আলোচনা করিলেও মনে হয় যে আর্য্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন কেবলমাত্র সরস্বতী নদীর বন্দনা দেখিয়াই ভারতবর্ষ যে আর্য্যগণের আদি জন্মভূমি তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। ভূতত্ত্ববাদীদিগের মত এই যে বহু প্রাচীনকালে হিমালয়ের পদপ্রান্তস্থিত বঙ্গ প্রভৃতি দেশ সাগরগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। ঋগ্বেদের বচন হইতে সে দিন একজন লেখক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে এই গ্রন্থের সাধারণতঃ যে বয়স নির্দ্দেশ করা হয়, তাহার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহা রচিত হইয়াছিল। তিনি বলেন যে প্রাচীন আর্য্যভূমির পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রদেশ ঋগ্বেদে সমুদ্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই দুই ভূভাগ সম্পূর্ণ জল মগ্ন ছিল। হিন্দু মাত্রেই প্রাচীন ভারতের গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। ইহা যে স্বাভাবিক এবং প্রশংসনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই গৌরবের অনুভূতি অতি মাত্রায় যাইতে দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাহা আমাদের উন্নতির অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল হইবারই কথা। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যাহার কিছু জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে এবং ভবিষ্যতে হইতে পারে, তাহা সমস্তই ভারতীয় আর্য্যদিগের জানা ছিল, এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জ্ঞানের বিবিধ শাখায় যে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহাই চরম, এইরূপ গর্ব্ব করা নিরপেক্ষ

বিচারকের পক্ষে শোভনীয় নহে। এই দুরভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া একদল লোক জগতের অপর সকল জাতিকেই আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন এবং অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে পদার্থ বিজ্ঞান শাস্ত্রে যে নূতন নূতন আশ্চর্য্য আবিস্কার হইয়াছে ও হইতেছে, তাঁহারা মনে করেন যে সমস্তই আর্য্যদিগের জানা ছিল। বর্ত্তমান বিজ্ঞান জগতের নিকট আমরা যে কোনরূপে ঋণী তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। অভিমান মূলক যুক্তিহীন বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত এরূপ ভাবের পোষণ করা জাতীয় উন্নতির অনুকূল নহে। প্রবন্ধকার এই ভাবের কতকগুলি কথা প্রবন্ধ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন বলিয়া এ সম্বন্ধে নিজের মত প্রকাশ করিলাম। আর একটি বিষয়ে আমি প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের প্রতিবাদ করিতেছি তিনি প্রবন্ধের স্থানে স্থানে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন দেশমান্য কতিপয় ব্যক্তির উপর অযথা শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। ইহা সুরুচির পরিচায়ক নহে। প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের নিকট আমার প্রার্থনা যে তিনি যখন এই প্রবন্ধ মুদ্রিত করিবেন তখন যেন এই অংশগুলি পরিত্যাগ করা হয়।

৮। সভাপতি মহাশয় বলেন, প্রবন্ধপাঠক মহাশয় যে আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র সে বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি প্রবন্ধ মধ্যে যে সকল নূতন মতের অবতারণা করিয়াছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা তাঁহার সহিত এক মত হইতে পারি না। সকল দেশের লোকেই পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরবের বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্লাঘা বোধ করেন। একদল পণ্ডিতদিগের মতে, আর্য্যগণ অন্যদেশ হইতে আসিয়া ভারতীয় অনার্য্যজাতিদিগকে পরাজয় করিয়া ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাঁহারা দেশজয় করিয়াছেন, অসভ্য জাতিকে সভ্য করিয়াছেন, ইহাতেই বা অগৌরবের বিষয় কি আছে? অসুর শব্দ অনেক স্থলে দেবতাবাচক ছিল। আমাদের প্রাচীন ভারতের গৌরব আমাদের কেবল প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তদতিরিক্ত প্রমাণ দেখাইতে না পারিলে, সে গৌরবের মূল্য কোথায়? মিসর ও ব্যাবিলোনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐ সকল দেশ ও অতীত কালে উচ্চ গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল। তাহাদের সভ্যতার ধারা অনেক দেশের অনুকরনীয় ও আদর্শ ছিল।

মিসরের "মামি" (Mummy) এখনও মিসরের অতীত সভ্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এমন অনেক দেশ আছে যাহাদের অতীত লইয়া গৌরব করিবার কিছু নাই, অতীতের স্মৃতি তাহাদের অন্ধকারময়। হয়তো তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের গৌরব গাথা গান করিবার কিছুই নাই অথচ তাহারা এখন সভ্যতার উন্নত শীর্ষে আরোহণ করিয়াছে। তাহারা নিজ বাহুবলে, নিজ শক্তিবলে, নিজ প্রতিভাবলে জগতের সমক্ষে সুসভ্য জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। অতএব অতীতের কথা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইলেও জাতীয় অভ্যুদয়ের বাধা হয় না। চাই কর্ম্ম, চাই আত্ম নিয়ন্ত্রণ, চাই উন্নতির জন্য, জাতির বিকাশের জন্য প্রাণের ঐকান্তিক আকাঙ্খা—তাহা হইলেই যে কোন জাতি অচিরে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতের সমক্ষে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয়।

বেদ কেবল হিন্দুদিগের আদিগ্রন্থ নয় ইহা সমগ্র পৃথিবীর আদিগ্রন্থ। যে কোন জাতি বেদকে নিজেদের গ্রন্থ বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে। প্রবন্ধলেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে জলবায়ুর তারতম্যে অনেক আর্য্যজাতির আকার বিসদৃশ হইয়া গিয়াছে। এই মত সর্ব্বথা স্বীকার্য্য নয়। কারণ আর্য্যদের বর্ণ গৌর, দেহ উন্নত, নেত্র আকর্ণ বিস্তৃত, এবং নাসিকা উন্নত, ইহা সর্ব্বত্রই বর্ণিত হইয়াছে। জলবায়ুর তারতম্যে বর্ণের কিঞ্চিত বৈষম্য ঘটিতে পারে কিন্তু তাহাদের উন্নত নাসিকা অস্বাভাবিকরূপে ক্ষীয়মান ও স্থূল হইতে পারে না, আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র, কোটরগত হইতে পারে না। স্থূল কথা এই যে আর্য্য ও অনার্য্যের কি আকৃতিগত, কি প্রকৃতিগত বৈষম্য এত অধিক যে, প্রবন্ধলেখকের উদ্ভাবিত মত স্বীকার্য্য করিতে প্রস্তুত নহে।

৯। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করিবার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।
সহ সম্পাদক।

শ্রীবিহারীলাল সরকার
সভাপতি।

সাহিত্য-সভার দ্বাবিংশ বার্ষিক দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

১২ই আষাঢ় ১৩২৮ সাল। ইং ২৬শে জুন ১৯২১ খৃঃ।

রবিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা।

১। উপস্থিত সভ্যগণের নাম।—

১। শ্রীযুক্ত ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
২। ,, শ্যামলাল গোস্বামী।
৩। ,, পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
৪। ,, কবিরাজ অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়।
৫। ,, জগচ্চন্দ্র ভৌমিক।
৬। ,, প্রসন্নকুমার দাস।
৭। ,, কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন, বিদ্যাভূষণ, দর্শননিধি, আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকর, বিদ্যাবিনোদ, কাব্যভূষণ, ইত্যাদি।
৮। ,, আশুতোষ ঘোষ।
৯। ,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত।
১০। ,, মন্মথনাথ মৈত্র।
১১। ,, দীনবন্ধু রায়।
১২। ,, রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার, সাহিত্য-সুধাকর।
১৩। ,, সুরেন্দ্রমোহন বসু।
১৪। ,, বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।
১৫। ,, বিষ্ণুচরণ তর্কভূষণ।
১৬। ,, নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
১৭। ,, পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। ,, পণ্ডিত রাধাবল্লভ স্মৃতি, ব্যাকরণ, জ্যোতিষতীর্থ।
১৯। ,, শীতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

২০। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ নাগ।

২১। ,, কবিরাজ কমলাকান্ত রায়।

২২। ,, কুমার প্রকাশকৃষ্ণ দেববাহাদুর বি, এ,

২৩। ,, রায় ডাক্তার চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি ; আই, এস্, ও ; এফ; সি, এস্ ; রসায়নাচার্য্য।

২৪। ,, মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ কাব্যভূষণ।

২৫। ,, গোবিন্দলাল মল্লিক।

২৬। ,, প্রবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মৈত্র মহাশয়ের সমর্থনে বঙ্গবাসী সম্পাদক রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার সাহিত্য সুধাকর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। অতঃপর গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

৪। নিম্নলিখিত গ্রন্থোপহারদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

গ্রন্থের নাম।	গ্রন্থোপহার দাতার নাম।
১। গন্ধর্ব্বনন্দিনী কাব্য।	শ্রীরসিকলাল রায়।
২। ইন্দুমতী।	ঐ

৫। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির শূণ্যপদে নিম্নলিখিত ১৪ জন ভদ্রমহোদয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।—

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দ্বারিকানাথ ন্যায় শাস্ত্রী।

২। ,, ,, রামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্যবেদান্ত ন্যায়মীমাংসাতীর্থ।

৩। ,, ডাক্তার বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্,

৪। ,, পণ্ডিত সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ।

৫। ,, প্রিয়লাল দাস এম্, এ, বি, এল্,

৬। ,, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম্, এ, এল্ এম্, এস্,

৭। ,, শরচ্চন্দ্র মিত্র বি, এ, (Ward Commissioner)।

৮। ,, ফণীন্দ্রলাল দে। M. L. C.

৯। ,, অমরেশ্বর নাথ ঠাকুর। এম, এ।

১০। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মৈত্র ;

১১। ,, যতীন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, বি, এল, এটর্ণী, এম্, এল্, সি।

১২। ,, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তত্ত্বনিধি, বি, এ।

১৩। ,, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

১৪। ,, ,, আশুতোষ শাস্ত্রী। এম, এ,

৬। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় "ভাষার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৭। সমালোচনা প্রসঙ্গে—রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু এম, বি, এফ্, আর সি, এস্, আই, এস্, ও, রসায়নাচার্য্য মহাশয় বলেন যে, বিদ্যারত্ন মহাশয় বেদজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ভাষাতত্ত্বের অনুসন্ধান বিশেষ প্রশংসনীয়। বিদ্যারত্ন মহাশয় অন্যান্য ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষায় যেখানে যেখানে সাদৃশ্য দেখিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া উহা যে সংস্কৃত ভাষা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রমাণ সম্বন্ধে সকল বিষয়ে তাঁহার সাধু উদ্যমের জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বেদ "পৌরুষেয়" কি "অপৌরুষেয়" ইহা লইয়া এ দেশের পণ্ডিতগণের মধ্যে বিশেষ মত ভেদ দৃষ্ট হয়। বেদ "অপৌরুষেয়" বলিয়া বিবেচিত হইলে ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিদ্যারত্ন মহাশয় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমর্থন করা দুরূহ হইয়া উঠে। শ্রদ্ধেয় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে ভাল হইত। আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত বিস্তৃত, মাত্র একটী বক্তৃতাতে ইহার সম্পূর্ণ আলোচনা হইতে পারে না। ধারাবাহিকরূপে উপর্য্যুপরী কয়েটী বক্তৃতা দিলে তবে ইহার সম্যক্ আলোচনা হয়। ইহার উত্তরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন যে বেদ পৌরুষেয় কারণ বেদের সকল মন্ত্রগুলিই ঋষিদিগের দ্বারাপ্রণীত। এ সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে একদিন আলোচনা করিবার তাঁহার ইচ্ছা রহিল।

৮। সভাপতি মহাশয় বলেন—আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে বেদ "অপৌরুষেয়" এবং স্বর্গগত বেদজ্ঞ সত্যব্রত সামশ্রমী প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত মহোদয়গণের ও মত যে বেদ অপৌরুষেয়। বিদ্যারত্ন মহাশয় যে বেদকে পৌরুষেয় বলিতেছেন তাহা আমার বিবেচনায় ঠিক নহে। বিদ্যারত্ন

মহাশয় পুরাণগুলির মতকে সর্ব্বথা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন কিন্তু আমরা শাস্ত্র বিশ্বাসী হিন্দু, আমরা পুরাণের প্রত্যেক বচনকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি। পুরাণে যে প্রতিমাপূজার কথা আছে পুরাণকারেরা বলেন যে উহা বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় বেদ মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আমার বিবেচনায় সর্ব্বত্রই যে ঠিক তাহা মনে হয় না। এ সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যা অন্যরূপও হইতে পারে। বিদ্যারত্ন মহাশয় যে একজন অসাধারণ পণ্ডিত; সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই এবং তাঁহার মতে সংস্কৃত ভাষাই যে জগতের সকল ভাষার জননী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

৯। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করিবার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচুণীলাল বসু।
সম্পাদক।

শ্রীমন্মথ মোহন বসু।
সভাপতি।

সাহিত্য সভার

১৩২৮ সালের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ।

সভাপতি।—

শ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে, সি, আই।

সহ সভাপতিগণ।—

১। শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, কে. টি, সি, এস্, আই, এম, এ, ডি, এল্, ইত্যাদি। ২। শ্রীযুক্ত মাননীয় স্যার আশুতোষ চৌধুরী কে, টি, এম, এ, এল্, এল্, বি, বার-এট্-ল, ৩। শ্রীযুক্ত কুমার প্রফুল্ল কৃষ্ণদেব বাহাদুর এম, এ, ৪। শ্রীযুক্ত মহারাজ ভুপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বাহাদুর বি, এ, (নসীপুরাধিপতি) ৫। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়

কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, ৬। শ্রীযুক্ত রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, ৭। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু এম, এ, ৮। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ৯। শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ, ১০। শ্রীযুক্ত নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু, ১১। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, ১২। শ্রীযুক্ত মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর বি, এ, (সুসঙ্গাধিপতি)।

সভ্যগণ।—

১। শ্রীযুক্ত কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ, ২। রজনীকান্ত দে এম, এ, বি, এস্, সি, ৩। অধ্যাপক জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ৪। কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন ভিষগরত্ন, ৫। সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এল, ৬। ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ এম, বি, ৭। কিরণচন্দ্র দত্ত, ৮। শ্যামলাল গোস্বামী, ৯। পণ্ডিত কৈলাশচন্দ্র জ্যোতিবার্ণব, ১০। ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এল, এম্, এস্. ১১। কবিরাজ, কালীভূষণ সেন কবিরত্ন, ১২। পণ্ডিত দ্বারিকানাথ ন্যায় শাস্ত্রী, ১৩। রামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, ১৪। ডাক্তার বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্, ১৫। পণ্ডিত সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ, ১৬। প্রিয়লাল দাস এম, এ, বি, এল, ১৭। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম, এ, এল, এম, এস, ১৮। শরচ্চন্দ্র মিত্র বি, এ, (Ward Commissioner) ১৯। ফণীন্দ্রলাল দে, ২০। অধ্যাপক অমরেশ্বর নাথ ঠাকুর এম, এ, ২১। মন্মথনাথ মৈত্র, ২২। যতীন্দ্রনাথ বসু, ২৩। ক্ষিতীন্দ্র-নাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ, ২৪। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী এম, এ, ।

অবৈতনিক সম্পাদক।—

শ্রীযুক্ত রায় ডাঃ চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, এফ, সি, এস, আই, এস্,ও, রসায়নাচার্য্য।

সহযোগী সম্পাদকগণ।—

১। শ্রীযুক্ত কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ, ২। কুমার প্রকাশকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ, ৩। যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

সহকারী সম্পাদক।—

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস, সি,।

ধনাধ্যক্ষ্য।—

শ্রীযুক্ত কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ,

সাহিত্য-সংহিতার সম্পাদকদ্বয়।—

১। শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, কাব্য-ভূষণ, আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর, দর্শননিধি; ২। শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ,।

পুস্তকালয়াধ্যক্ষ।—

শ্রীযুক্ত ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আয় ব্যয় পরীক্ষক।—

শ্রীযুক্ত রসময় লাহা।

সাহিত্য সভার

১৩২৮ সালের শাখা-সমিতি।

(১) প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস সমিতি।

সভাপতি।—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী এম, এ,।

সভ্যগণ।—

১। শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, সি, আই, ই, ২। দ্বারকা নাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, ৩। কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এম, এ, ৪। কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ, ৫। চারুচন্দ্র বসু, পুরাতত্ত্বভূষণ ৬। কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ৭। সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ, ৮। অক্ষয়কুমার মৈত্র সি, আই, ই, ৯। রমাপ্রসাদ চন্দ এম, এ, ১০। কবিরাজ মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ, ১১। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, এম, এ, ১২।

অধ্যাপক অমরেশ্বর নাথ ঠাকুর এম, এ, ১৩। কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর, দর্শননিধি, কাব্যরত্ন, ১৪। ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; ১৪। যতীন্দ্রনাথ দত্ত (জন্মভূমি সম্পাদক)।

সম্পাদক।—

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

(২) গণিত ও বিজ্ঞান সমিতি।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কে টি, এম, এ, ডি, এল, সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি।

সভ্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত মাননীয় স্যার আশুতোষ চৌধুরী কেটি, এম, এ, এল; এল, বি, বার—এট—ল। ২। ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী স্কোয়ার বার—এট—ল, ৩। কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম, এ, এম, বি, ৫। ডাক্তার বিপিন বিহারি ঘোষ এম, বি, ৬। ডাক্তার যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ এল, এম; এস, ৭। অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বসু এম, এ, ৮। অধ্যাপক রজনী কান্ত দে এম, এ বি, এস, সি, ৯। অধ্যাপক মন্মথ নাথ বন্দোপাধ্যায় এম, এস, সি, ১০। ডাঃ অমিয় মাধব মল্লিক এম, বি, ১১। পণ্ডিত রাধাবল্লভ,ব্যাকরণ স্মৃতিজ্যোতিষতীর্থ, ১২। পণ্ডিত সাতকড়ি সিদ্ধান্ত ভূষণ, ১৩। কুমুদ বিহারী বসু এম, এ,বি, এল, বি, এস, সি।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, এম, বি, এফ, সি এস, আই, এস, ও, রসায়নাচার্য্য ইত্যাদি।

(৩) পারিভাষিক সমিতি।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় প্রমথ নাথ তর্কভূষণ।

সভ্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ, ২। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ. এল, এম, এস, ৩ রায় ডাঃ চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, এফ, সি, এস, রসায়নাচার্য্য ৪। কুমার প্রমোদ কৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ, ৫। কবিরাজ যামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন এম. এ, এম, বি, ৬। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, ৭ পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী এম, এ, ৮। অধ্যাপক অমরেশ্বর নাথ ঠাকুর এম, এ, ৯। কবিরাজ গিরিজা প্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর, দর্শননিধি ইত্যাদি।

সম্পাদক :—

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এস, সি।

৪। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য

সভাপতি।—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

সভ্যগণ :—

১। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দোপাধ্যায় এম, এস, সি, ২। কিরণচন্দ্র দে স্কোয়ার সি, আই, ই, আই, সি, এস, ৩ নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু, ৪। পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব. ৫। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ, এল, এম. এস ৬। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ, ৭। অধ্যাপক অমরেশ্বর নাথ ঠাকুর এম, এ ৮। ডাঃ খগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ৯। কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ, ১০ যতীন্দ্র নাথ দত্ত (জন্মভূমি সম্পাদক) ১১।কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ, ১২। সরোজ রঞ্জন বন্দোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ, ১৩। পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় বি, এ, সাহিত্যাচার্য্য, ১৪। কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন ভিষগরত্ন,

১৫। মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, ১৬। পণ্ডিত রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ, স্মৃতিতীর্থ, ১৭। চণ্ডী চরণ মিত্র, ১৮ কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাবিনোদ, কাব্যভূষণ, আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর, দর্শননিধি, বিদ্যাভূষণ, ১৯। রসময় লাহা।

সম্পাদক :—

শ্রীযুক্ত রায় ডাঃ চুনীলাল বসু বাহাদুর, এম, বি, এফ, সি, এস, আই, এস্, ও, রসায়নাচার্য্য।

(৫) সংস্কৃত ভাষা সমিতি।

সভাপতি :—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

সভ্যগণ :—

১। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ, ২। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি, এম, এ, এল, এম, এস. ৩। ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ, ৪ কবিরাজ যামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন এম. এ, এম, বি ৫ পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন, ৬ সরোজ রঞ্জন বন্দোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ, ৭ মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, ৮ পণ্ডিত রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ, ৯। মহামহাধ্যাপক কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি, শিরোমণি ১০ পণ্ডিত দক্ষিনাচরণ স্মৃতিতীর্থ, ১১। পণ্ডিত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ. ১২ পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, ১৩। পণ্ডিত বহুবল্লভ শাস্ত্রী, ১৪ পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ. ১৫ কবিরাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন; ১৬ কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন ভিষগরত্ন, ১৭। কবিরাজ কালীভূষণ সেন কবিরত্ন, ১৮। কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, আয়ুর্ব্বেদরত্নাকর, দর্শননিধি ১৯। মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী (দ্রাবিড়), ২০। পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী এম, এ, ২১। অমরেশ্বর নাথ ঠাকুর এম, এ,।

সম্পাদক :—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

(৬) দর্শন সমিতি।

সভাপতি ঃ—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

সভ্যগণ ঃ—

১। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাজ কবিসম্রাট যাদবেশ্বর তর্করত্ন, ২। পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী (দ্রাবিড়) ৪। মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ, এল, এম, এস, ।৫ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী স্কোয়ার এম, এ, বার—এট—ল, ৬। অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দোপাধ্যায় এম, এস, সি, ৭। মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, ৮। কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ বিদ্যাবিনোদ আয়ুর্ব্বেদরত্নাকর দর্শননিধি।

সম্পাদক ঃ—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

---

(৭) ইংরাজি সাহিত্য সমিতি।

সভাপতি।—

শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী, কেটি, এম, এ, ডি, এল, ইত্যাদি।

সভ্যগণ।—

১। শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, সি, এস, ২। কিরণচন্দ্র দে স্কোয়ার সি আই, ই, আই, সি, এস, ৩। রাজা গোপেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এম, এ, বি, এল, ৪। রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম, এ, বি, এল, ৫। মাননীয় স্যার আশুতোষ চৌধুরী কেটি, এম, এ, এল, এল, বি বার—এট—ল ৬। ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী স্কোয়ার বার—এট—ল ৭। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ, এল, এম, এস, ৮। কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এম, এ, ৯। কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

বি, এ, ১০। কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ, ১১। মাননীয় ভূপেন্দ্র নাথ বসু এম, এ, বি, এল, ১২। অতুলচন্দ্র ঘোষ বি, এল, ১৩। প্রিয়লাল দাস এম, এ, বি, এল ১৪। সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এল, ১৫। কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ১৬। শরচ্চন্দ্র মিত্র বি, এ, ১৭। রায় সুরেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুর ১৮। দ্বিজেন্দ্র নাথ বসু স্কোয়ার বার—এট্—ল ১৯। রায় মতিলাল হালদার বাহাদুর ২০। অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম, এ, ২ । নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু স্কোয়ার বার এট—ল ২২। শীতল প্রসাদ ঘোষ বি, এল, ২৩। কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ, ২৪। দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল।

সম্পাদক।—

শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন, এম, এ।

---

(৮) পত্রিকা সমিতি।

সভাপতি :—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

সভ্যগণ :—

১। শ্রীযুক্ত রায় ডাঃ চুনী লাল বসু বাহাদুর এম, বি এফ, সি, এস, আই, এস, ও, রসায়নাচার্য্য ২। কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি এ ৩। কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি এ ৪। যতীন্দ্র নাথ দত্ত ৫। কবিরাজ গিরিজা প্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ বিদ্যাবিনোদ আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর দর্শননিধি।

সম্পাদকদ্বয় :—

শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন, বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর, দর্শননিধি।

শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ন এম, এ।

সাহিত্য-সভার দ্বাবিংশ বার্ষিক তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

৫ই ভাদ্র ১৩২৮ সাল। ইং ২১শে আগষ্ট ১৯২১ খৃঃ।

রবিবার আপরাহ্ন ৬ ঘটিকা।

উপস্থিত সভ্যগণের নাম ঃ—

১। শ্রীযুক্ত রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার।
২। ,, দুর্গাদাস লাহিড়ী।
৩। ,, পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
৪। ,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত।
৫। ,, কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর দর্শন-নিধি।
৬। ,, পণ্ডিত সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ।
৭। ,, রায় ডাঃ চুনীলাল বসু বাহাদুর, এম, বি, এফ্, সি, এস্, আই, এস্, ও রসায়নাচার্য্য।
৮। ,, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, এম্, এ।
৯। ,, মন্মথনাথ মিত্র।
১০। ,, নগেন্দ্রনাথ নাগ।
১১। ,, অধ্যাপক রজনীকান্ত দে এম, এ, বি, এস্, সি।
১২। ,, মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ।
১৩। ,, কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৪। ,, নগেন্দ্রনাথ রায়।
১৫। ,, কবিরাজ নৃত্যগোপাল বিদ্যারত্ন।
১৬। ,, নৃসিংহ দেব ভট্টাচার্য্য।
১৭। ,, শচীন্দ্রনাথ রুদ্র।
১৮। ,, নীরোদবরণ রায় এম, এ, বি, এল্।
১৯। ,, কবিরাজ কমলাকান্ত রায়।
২০। ,, ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
২১। ,, অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়।
২২। ,, পণ্ডিত রাধাবল্লভ কাব্য ব্যাকরণ স্মৃতি জ্যোতিস্তীর্থ।
২৩। ,, সুবোধচন্দ্র দত্ত।
২৪। ,, মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বিদ্যারত্ন এম, এ।

২৫। ,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম, এ, বি, এল।
২৬। ,, গোবিন্দলাল মল্লিক।
২৭। ,, প্রবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

২। কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু এম, বি, আই, এস, ও, এফ, সি, এস্ রসায়ণাচার্য্য মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। অতঃপর গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

৪। গ্রন্থোপহার দাতা মহাশয়গণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

	গ্রন্থের নাম।	গ্রন্থোপহার দাতার নাম।
(ক)	Grammar of Colloquaial Tibetan.	The Bengal Secretariate Books Depot.
(খ)	হেথা।	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ।
(গ)	স্বাস্থ্যতত্ত্ব।	কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন।
(ঘ)	বংশপরিচয়	,, ,, গিরিজাপ্রসন্ন সেন।

৫। বঙ্গবাসী সম্পাদক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের রচিত "মেঘদূত গীতি" নামক গান শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক গীত হইল।

৬। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই মহাশয় কর্ত্তৃক অঙ্কিত "বিরহী যক্ষের" চিত্র প্রদর্শন।

৭। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক "কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন" শীর্ষক তৃতীয় প্রবন্ধ পাঠ।

৮। সমালোচনা প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু এম, বি, মহাশয় বলেন—অস্থকার প্রবন্ধে কালিদাসকে বাঙ্গালী প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা তাদৃশ যুক্তিসহ নহে। উহা অধিকাংশই কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি আজকে রঘুর পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন না। অথচ রঘুবংশে ইহা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। যাহা হউক, কাব্যতীর্থ মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন সন্দেহ নাই কিন্তু প্রমাণ গুলি দৃঢ় ও বিচার সহ হয় নাই। প্রবন্ধ লেখক মহাশয়কে তাঁহার সদিচ্ছা ও অধ্যবসায়ের জন্য আমি ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

৯। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু মহাশয় যে বলিলেন যে উহা কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত আমিও উহার

সমর্থন করিতেছি। জনশ্রুতির মধ্যে কিছু না কিছু সত্য আছেই। শৃঙ্গারে মধুরোদগারে কালিদাসাত্রয়োমতাঃ"। শৃঙ্গার রসে ও মধুর রাসে তিন কালিদাস গ্রন্থ লিখিয়াছেন। "মালবিকাগ্নিমিত্র" ও "বিক্রমোর্ব্বশী" এই দুই গ্রন্থ দুই স্বতন্ত্র কালিদাস দ্বারা বিরচিত। ইহাদের মধ্যে কোন একজন উজ্জয়িনী রাজ-সভায় ছিলেন। অপরাপর গ্রন্থ তৃতীয় কালিদাস লিখিয়াছেন। এই তৃতীয় কালিদাস বাঙ্গালী ও বৈদ্য ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে ইনিই মাতৃগুপ্ত নামে সংগৃহীত হইয়াছেন। কালিদাস, বোপদেব, জয়দেব ইহারা বৈদ্য ছিলেন।

বৃহৎ সংহিতায় "নেপাল" শব্দ আছে। প্রাচীন গ্রন্থে "নেপাল" শব্দের উল্লেখ নাই। বায়ুপুরাণে নেপাল চীন দেশ বলিয়া কথিত। এথান হইতে ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় চীনগণ জনলোকে যাইয়া ঐ স্থানকে চীন নামে অভিহিত করেন। ভাউদাজী যে কালিদাসকে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন তিনি বাঙ্গালী কালিদাস। কালিদাস, বোপদেব, জয়দেব, বাণভট্ট, ভবভূতি ইহাদিগকে আমি বৈদ্য কবি বলিয়া মনে করি। ইহাঁদের সকলেই কবিরাজ ছিলেন। কবিরাজ উপাধি বঙ্গদেশের বৈদ্য জাতির একচেটিয়া। দক্ষিণানিল ও পরিণাম রমণীয়া দিবসাঃ এবং তালিবন শ্যাম ইহা বঙ্গদেশের নিজস্ব। মেঘদূতে শ্রীকৃষ্ণের যে গোপবেশ হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের একমাত্র সম্পত্তি। জয়দেব ও কালিদাসের যে কোমল কান্ত পদাবলী ইহা বাঙ্গালীর হৃদয় কন্দর হইতে বিনিস্থৃত ও শশ্যশ্যামলা বঙ্গ ভূমি হইতেই উদ্ভুত।

১০। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, মহাশয় বলেন—ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আমাদের অনুযোগ দেন, তোমরা গবেষণা করিতে জান না। অথচ ঐ সকল ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃতের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া শব্দের বিকৃতার্থ করিয়া গবেষণা করেন। অদ্যকার বক্তা মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। প্রত্নতত্ত্ব সকলের আলোচনা করা উচিত কিন্তু উহা পেত্নীতত্ত্বে পরিণত না হয় তাহা লক্ষ্য করা উচিৎ। "বঙ্গার লুৎখায় তরস্নাঃ নৌ সাধনোদ্যতাম্" এই শ্লোকের দ্বারা কালিদাস বঙ্গের কিঞ্চিৎ নিন্দাই করিয়াছেন। তিনি যদি বাঙ্গালী হইতেন, তবে ইহা লিখিতেন না। দক্ষিণানিল সর্ব্বত্রই আছে "ত্রয়ঃ কালিদাসঃ এই শ্লোকের অর্থ আমার বোধ হয় কালিদাসের লেখা এত বিভিন্ন প্রকারের

যে বাঙ্গালী ছিলেন না ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। দশপুর শব্দ কালিদাসের বহু গ্রন্থেই আছে দশপুর (Mandasore) উজ্জয়নীর নিকট। ৪৭৩ খৃষ্টাব্দে দশপুরে সূর্য্য মন্দিরে যে দশটী শ্লোক আছে উহা মন্দাক্রান্তা ছন্দে লিখিত, মেঘদূতের ছন্দও মন্দক্রান্তা।

১১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ বি, এল শ্রীকণ্ঠ মহাশয় বলেন— অদ্যকার বক্তা মহাশয় যে সকল প্রমাণ দিলেন ইহা অধিকাংশই কল্পনা প্রসূত ইহাতে "বিনিগমক হেতু" নাই। তাঁহার আলোচনা প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন, এজন্য আমি বক্তা মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন জর্ম্মণ দেশে গিয়াছিলেন সেই সময় তথাকার এক রঙ্গালয়ে এক জর্ম্মন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আপনি "শকুন্তলা" পাঠ করিয়াছেন কি না? তাহার উত্তরে সেই জর্ম্মণ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, যে জর্ম্মন শকুন্তলা পাঠ না করিয়াছেন সে পণ্ডিত ব্যক্তিই নয়। শকুন্তলা পাঠ না করা তাহারা অপমান বোধ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব শকুন্তলা পাঠ করিতেন। ভারতীয় বিদ্বৎবৃন্দের একত্র সমাবেশে একটী "কালিদাস সমিতি" গঠিত হওয়া উচিত, তথায় এই প্রবন্ধোক্ত মতবাদ লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করিলে প্রকৃত সত্য নির্ণয় হইবার আশা করা যায়।

১২। সভাপতি মহাশয় বলেন যে, এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে সহসা কোন মন্তব্য প্রকাশ বা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিৎ নহে। প্রবন্ধ পাঠক মহাশয়ের অসাধারণ উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়। প্রবন্ধ পাঠক মহাশয় আভ্যন্তরিক প্রমাণ ও বাহ্য প্রমাণ উভয় প্রমাণই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে সকল প্রমাণ দিয়াছেন উহার অধিকাংশই জনপ্রবাদ ও উদ্ভট শ্লোক। কোন বিষয়ে গবেষণা করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার লইয়া আলোচনা করা উচিৎ নয়। ভৌগলিক সংস্থায় দেখা যায় মলয়ানিল দক্ষিণানিল দক্ষিণ সমুদ্র হইতে আসে এবং উহা যে পরিণাম রমণীয় হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কালিদাস বাঙ্গালী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে বাঙ্গালীর পক্ষে যে গৌরব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কালিদাস যে কোন জাতি বা যে কোন দেশবাসীই হউন না কেন, যতদিন সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য থাকিবে ততদিন কালিদাস প্রতিভার পূজা পাইবেন এবং অমর কবি বলিয়া স্বীকৃত হইবেন। সংস্কৃত কাব্য ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

১৩। অতঃপর সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীচুনিলাল বসু। শ্রীঅখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক। সভাপতি।
১৩।১১।২১

সাহিত্য-সভার দ্বাবিংশ বার্ষিক চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

২৭শে কার্ত্তিক ১৩২৮ সাল। ১৩ই নবেম্বর ১৯২১ খৃষ্টাব্দ।

রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা।

১। উপস্থিত সভ্যগণের নাম :—

১। শ্রীযুক্ত নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু।
২। „ অধ্যাপক ভূদেব মুখোপাধ্যায় এম, এ, জ্যোতির্ভূষণ।
৩। „ রায় ডাঃ চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি ; আই, এস, ও এফ্, সি, এস ; রসয়নাচার্য্য।
৪। „ কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, দর্শন-নিধি আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর।
৫। „ প্রফুল্লকুমার বসু।
৬। „ অমৃতলাল-চট্টোপাধ্যায়।
৭। „ কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।
৮। „ নগেন্দ্রনাথ নাগ।
৯। „ মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।
১০। „ অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।
১১। „ মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ।
১২। „ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
১৩। „ রসময় লাহা।
১৪। „ দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য।
১৫। „ যতীন্দ্রনাথ দত্ত।
১৬। „ কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল।
১৭। „ উপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কাব্যতীর্থ।
১৮। „ নৃপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।
১৯। „ নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

২০। „ কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।

২১। „ প্রকাশ কৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ।

২২। „ কিরণচন্দ্র দত্ত।

২৩। „ অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু এম, এ।

২৪। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি-এল শ্রীকণ্ঠ।

২৫। „ অধ্যাপক রজনীকান্ত দে এম-এ, বি, এস্, সি।

২৬। „ হরলাল দাস।

২৭। „ উপেন্দ্রনাথ দাস কবিরাজ কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ।

২৮। „ পণ্ডিত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ।

২৯। „ প্রিয়নাথ দত্ত।

৩০। „ রাধাবিনোদ রায়।

৩১। „ ডাঃ হীরালাল সিংহ।

৩২। „ ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এল, এম্, এস্।

৩৩। „ গোবিন্দলাল মল্লিক।

৩৪। „ প্রবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

২। রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু এম, বি, আই, এস্, ও, এফ্, সি, এস্, রসায়নাচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাবে ও কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি-এল্, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। অতঃপর গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

৪। নিম্নলিখিত গ্রন্থোপহার দাতা মহাশয়গণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

গ্রন্থের নাম।	উপহার দাতার নাম।
১। গন্ধর্ব্বনন্দিনী কাব্য দ্বিতীয় ভাগ।	শ্রীযুক্ত রসিক চন্দ্র রায় কাব্যতীর্থ।
২। বিধবা-বিবাহ ও হিন্দুধর্ম্ম।	গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।
৩। Conrad And Leonara, (an opera)	Profullakumar Bose,

৫। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাজ কবি সম্রাট যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের লিখিত "কালিদাস বাঙ্গালী কি না তাহার সমালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, বি, এল, মহাশয়ের দ্বারা পঠিত হইল।

৬। অতঃপর সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ, মহাশয় বলেন—মহামহোপাধ্যায় মহাশয় অদ্যকার প্রবন্ধে যে সকল বৃক্ষাদির নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে ঐ সকল বৃক্ষাদি কেবল বঙ্গদেশেই জন্মে কিন্তু আমাদের মনে হয় ঐ সকল বৃক্ষাদি অন্যান্য দেশেও জন্মে। অন্যান্য আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও বলা যায় যে ঐ সকল আচার ব্যবহার বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশেও প্রচলিত আছে। কালিদাস যদি বাঙ্গালী হইতেন তবে তাঁহার গ্রন্থাদিতে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে সবিশেষ উল্লেখ থাকিত। শ্রদ্ধেয় তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধটীও অধিকাংশই কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

৭। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন, মহামহোপাধ্যায় তর্করত্ন মহাশয় কেবল পণ্ডিত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের প্রবন্ধের অনুমোদনই করেন নাই অনেক স্থলে প্রতিবাদও করিয়াছেন। তিনি এই প্রবন্ধটী লিখিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধোক্ত মতবাদ সহসা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে হইলে প্রতিবাদ-কারীকেও যথেষ্ট অনুসন্ধান ও গবেষণা করিতে হইবে।

৮। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু মহাশয় বলেন যে, আজকাল কালিদাস বাঙ্গালী কি না, এই বিষয়ে আমাদের দেশে খুব তর্কবিতর্ক চলিতেছে। অবশ্য আমরা প্রত্নতত্ত্বের খুব সমর্থন করি এবং ইচ্ছা করি যে এদেশে প্রত্নতত্ত্বের খুব চর্চ্চা হয়, কিন্তু ইহা সম্যকরূপে সত্যের পথ অবলম্বন করিয়া চর্চ্চা করা উচিৎ।

আমরা কালিদাসের কবিতায় বাঙ্গালা সম্বন্ধে খুব কমই লেখা দেখিতে পাই। কালিদাস যদি বাঙ্গালী হইতেন, তাহা হইলে তিনি বাঙ্গালা সম্বন্ধে অধিকতর লিখিতেন। কালিদাসের লেখায় আমরা এমন কিছু দেখিতে পাই না যাহাতে বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার কাব্যাবলীতে উজ্জয়নীর সম্বন্ধে তিনি যে রূপ ভাব লিখিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যেন উজ্জয়নী কিংবা তাহার নিকটস্থ কোন স্থান তাঁহার জন্মভূমি ছিল। প্রবন্ধ লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে কালিদাসের কবিতায় যে সমস্ত ভাব আছে, তাহা বাঙ্গালীরই বলিয়া

বোধ হয়। জগতে মহাকবিদিগের ভাব প্রায় সর্ব্ব দেশেই সমান, হোমার, সেক্সপীয়ার, মিলটন্ প্রভৃতি কবিগণের মধ্যে যে সমস্ত ভাব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি ও মধুসূদন দত্তের মধ্যেও সেই সমস্ত ভাব দেখা যায়। কালিদাসের কবিতার মধ্যে এমন কোন বিশেষ ভাব পরিলক্ষিত হয় না যাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। শ্রদ্ধেয় তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন যে, কালিদাস যে সমস্ত গাছপালা বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেক গাছপালা কেবল মাত্র বাঙ্গালা দেশেই জন্মিয়া থাকে, অতএব ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন। একথা আমার মনে যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

এই সমস্ত গাছপালা বঙ্গ দেশ ব্যতীত ও অন্যান্য দেশেও জন্মায়। অথবা কালিদাস বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিয়া উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয়ের মতে কালিদাসের ভাষার সহিত বঙ্গ ভাষার সাদৃশ্য আছে। কালিদাসের ভাষার সহিত বঙ্গভাষার বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। তবে যেহেতু বঙ্গভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন, সে হেতু কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিতে পারে। তর্করত্ন মহাশয় বলেন, কালিদাসের কাব্যে বঙ্গদেশীয় আচার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালীগণ আর্য্য জাতি। কালিদাস আর্য্য জাতির আচার ব্যবহার উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশস্থ আর্য্যজাতিগণের মধ্যে ঐ সকল আচার ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে না যে কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন। কালিদাস বাঙ্গালী বলিয়া প্রমাণিত হইলে, বাঙ্গালী জাতির গৌরবের বিষয় বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যকে দমন করিয়া কেবল কল্পনার উপর কালিদাসকে জোর করিয়া বাঙ্গালী করিলে তাহা গৌরবের বিষয় হইবে না।

৯। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় বলেন—কালিদাস বাঙ্গালী হইলে আমাদের সেটা আনন্দের কথা কারণ তাহা হইলে মহাকবিকে নিজেদের ঘরের লোক বলিয়া গর্ব্বে যেটুকু সুখ পাওয়া সম্ভব তাহা পাইব। কিন্তু প্রবন্ধকার যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থাপন করিয়া তাহাকে বাঙ্গালী বলিতে চাহিতেছেন আমার মনে হয় সে সমস্ত প্রমাণের ভিত্তি তেমন দৃঢ় নহে। আধুনিক বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষা ও আচার প্রতিচ্ছবি কালিদাসের গ্রন্থাবলীতে বহুশঃ দৃষ্ট হয় তাই কালিদাস বাঙ্গালী। বাঙ্গালায় বিবাহের সময় বরবধূর প্রথম চারিচক্ষুর মিলনাত্মিকা মুখ-চন্দ্রিকা আছে অন্য কোথাও তাহা নাই, অথচ কালিদাসের রঘুবংশে ও কুমার

সম্ভবে আছে তাই কালিদাস বাঙ্গালী এরূপ বলার মধ্যে তেমন যৌক্তিকতা কিছুই নাই। প্রথমতঃ এরূপ প্রথা যে কেবল বঙ্গ দেশেই আছে, অন্যত্র নাই একথা তিনি বেশ জোর করিয়া বলিতে পারেন কি? আর যদি এ সকল বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পদই হয় তবেও বলিতে পারি যে কালিদাস হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমগ্র তাৎকালিক ভারতবর্ষ ভ্রমণ এবং তদানীন্তন প্রধান স্থান সমূহ উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ছিলেন, মহাকবির মেঘদূতই তাহার প্রমাণ। সেরূপ প্রমাণ যে আজও না পাইতেছি এমন নহে আজ কাল Mount Everest Expidition চলিতেছে, তাহাতে গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গের যেরূপ বিবরণ পাই, কালিদাসের হিমালয় বর্ণনার সহিত তাহা মিলাইয়া পাঠ করিলে মনে হয় কালিদাস হিমালয়েও অনেককাল ছিলেন। আজ পণ্ডিত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় মহাকবির নাকি যখন সন্ন্যাসাশ্রম অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহার একটী fac. Simile Photo আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। আজ কবি সন্ন্যাসী হইয়া গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ আবিষ্কার সময়েই গৌরীশঙ্করে গৌরীর তপশ্চর্য্যা স্মরণ করিয়া শেষ ধরনে কুমার সম্ভব লিখিয়াছেন। তাহার পর কবি যে কিরূপ বস্তুতান্ত্রিক এবং প্রকৃতির রহস্যজ্ঞ ছিলেন তাহা আপনারা সেদিন প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয়ের মেঘদূতে পক্ষিতত্ত্ব পাঠ করিলেও বুঝিবেন ময়ূয়ের সুখের সময় ও দুঃখের সময় তাহার অপাঙ্গ প্রসৃত সূক্ষ্ম ঝিল্লিটীর পর্য্যন্ত কি পরিবর্ত্তন হয় কবি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাহা পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়াছেন, যাহার Nature Study এত অধিক তিনি স্বদেশ ব্যতীত অন্যও কোথাও যদি মুখচন্দ্রিকা প্রভৃতির ন্যায় কবিত্বের পোষক ২।১টী উপাদান লইয়া থাকেন তাহা হইলে কি তাহা গ্রহণ করেন নাই। মহাকবির লক্ষণও যেস্থানে যাহা ভাল পাওয়া যায় তাহা সংগ্রহ কেবল সংগ্রহ নয় digest করা। মহাকবি যে এ বিষয়ে পেটরোগা ছিলেন তাহা বলিয়াতো মনে হয় না। তাঁহার ভাষা আধুনিক বাঙ্গালার ভাষা অথবা ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা ভাষা উভয়ে কত পার্থক্য। বর্ত্তমান বাঙ্গালা অনুস্মার বিসর্গহীন সংস্কৃত কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা সর্ব্বতোভাবে তাহাই কি? অন্ততঃ তাহা সংস্কৃতাত্মিকাময় ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন। যদি ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বের ও বর্ত্তমান বাঙ্গালার মধ্যস্থ এত পার্থক্য হয় তবে কালিদাসের সময়ের বাঙ্গালা—অর্থাৎ ৬০০ শত খৃষ্টাব্দ হইতে Bhite inscriptionএর পরিপোষকদিগের মতে ১০০ খৃষ্টাব্দ

পূর্ব্বে অর্থাৎ ২০০০ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা কিরূপ ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। সে সময় বাঙ্গালা দেশেরই কি অবস্থা ছিল বৌদ্ধ বাঙ্গালা ও তান্ত্রিক বাঙ্গালার বিশেষজ্ঞগণই তাহার প্রমাণ। আর উজ্জয়িনীর সভ্যতাই যে কালে কালে বাঙ্গালা প্রভৃতিতে অল্প বিস্তার করেন নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে। তাহার পর কালিদাসের বৃক্ষবিজ্ঞান ও প্রাণি বিজ্ঞান ইত্যাদি। দুঃখের মধ্যে মহাকবি যে সমস্ত বৃক্ষ বা প্রাণীর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রায় সর্ব্বত্রেই মিলে। যদি তিনি হিজলগাছ—বা নরভোজী কর্কটের উল্লেখ করিতেন তাহা হইলে বা ঠিক করিতাম যে তিনি হয় পূর্ব্ববঙ্গে নতুবা Pacific Ocean এর দ্বীপ বিশেষে জন্মগ্রণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাহা করেন নাই। পরম পূজ্যপাদ পণ্ডিতরাজ কবি সম্রাট মহামহোপাধ্যায় মহাশয় একটু ব্যঙ্গ করিয়াই মহাকবিকে বাগ দ্বারাতে স্থাপন করিতে চাহিতেছেন, কিন্তু আমার মনে হয় মহাকবি পূর্ব্ববঙ্গে বরিশালান্তর্গত বাগদা গ্রামে ছিলেন কারণ মহাকবির সমুদ্র বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয় তিনি সমুদ্র দর্শন করিয়াছিলেন পূর্ব্বকালে সমুদ্র ঐ স্থানের নিতান্ত সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। বিশেষতঃ সেই স্থানের মহাপীঠের অন্যতম তারাদেবীর মন্দির অবস্থিত। দেশটিও শাক্ত বহুল হয়ত এইজন্য কালিদাস্ নাম। স্থানটী বৈদ্য বহুল বটে, কালিদাস কবি কিন্তু বৈদ্যগণ কবিরাজত বটেই তাহার উপর আবার কবিরত্ন প্রভৃতি। তবে হয়ত বা তাহার পূর্ব্ব নাম ছিল কবিরাজ কালিদাস কবিরত্ন ইত্যাদি, অঙ্গুলী বোয়ালাক্ষতাং প্রভৃতি বহু স্থানে তাহার আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞান বেশ সমুজ্জল। আবার বাগদ্বাল বা বাগধাগ্রামে তাহার স্মৃতিমন্দির স্থাপন করিলে হয় না? এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মনে করি, মোট কথা কালিদাস বাঙ্গালী বা মদ্রদেশীয় বা যাহা ইচ্ছা হউন তাহাতে আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞান শকুন্তলার একটী অনুস্বার বা বিসর্গেরও পরিবর্ত্তন হইবে না তবে এ বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে যেমন বৃহৎ বটবৃক্ষের মূলানুসন্ধান করিতে হইলে অধিক মাটী ওলট পালট করিতে হয় তেমনই সে সময়ের বঙ্গ কেবলে বঙ্গ নহে ভারতের সমগ্র প্রদেশের ভাষা আচার ব্যবহার ইত্যাদি ইতিহাসেরও যথাযথ আলোচনা প্রয়োজন। নতুবা এরূপ চেষ্টায় প্রকৃত ফললাভের আশা অতি অল্প বলিয়াই বোধ হয়।

১০। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন, ইতিহাসও অনেক কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন দেশ হইতে প্রকাশিত পৃথক পৃথক পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে পরস্পর পরস্পরের সহিত যথেষ্ট অমিল রহিয়াছে। গোড়ামী ব্যতীত কোন জাতি উন্নতির উচ্চ স্তরে উন্নীত হয় নাই। কালিদাসকে বাঙ্গালী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীর আন্তরিক চেষ্টা করা উচিত। আমি এই চেষ্টার জন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবি সম্রাট শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়কে ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বাস্তবিক এমন সুন্দর মধুর কান্ত পদাবলী যে বাঙ্গালী কবি ভিন্ন অপর কেহ লিখিতে পারে ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

১১। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্, শ্রীকণ্ঠ মহাশয় বলেন, ইতিহাসের আলোচনায় গোড়ামীর প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। তবে গোড়ামী না থাকিলেও কোন কাজ হয় না। কবিদের কাব্যেও সর্ব্বদেশের কি জাতিগত, কি ভাষাগত, কি ভাবগত, বিবরণ থাকিতে পারে কিন্তু কবির কাব্যে তাহার নিজের জাতীয়ত্বের ভাব কিছু না কিছু প্রকাশ হইবেই হইবে। সেক্সপীয়রের গ্রন্থে যখন রাজনীতি সম্বন্ধে—আলোচনা দেখিতে পাই তখন মনে হয় তিনি বিস্মার্ক, গ্ল্যাড্ষ্টোন প্রভৃতির ন্যায় একজন অসাধারণ রাজনীতিক ছিলেন। আবার যখন সমাজ সম্বন্ধে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে আলোচনা দেখিতে পাই তখন মনে হয় তিনি উচ্চ দরের সমাজনীতিক মহাকবিও সর্ব্বদিগদর্শিয় কবি ছিলেন। তাঁহার কাব্যে সার্ব্বজনীন ভাব ও বহুদর্শিতা এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্য দৃষ্ট হয়।

১২। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল মহাশয় বলেন—শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় মহাশয় অথবা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বা সর্ব্বজন গ্রাহ্য না হইতে পারে কিন্তু তাঁহাদের অসাধারণ উদ্যম ও নূতন বিষয়ের আলোচনা জন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করা উচিৎ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের লেখার প্রতিবাদ করিতে হইলে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য, ভূয়োদর্শন লব্ধজ্ঞান ও তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন।

১৩। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন মাননীয় সভ্য মহোদয়গণ—অদ্যকার প্রবন্ধ, প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অনুরূপই হইয়াছে—তবে প্রবন্ধটী

dogmatic assertionএ পরিপূর্ণ। শব্দ বিশেষের প্রয়োগ, কোনও বিশেষ সামাজিক আচার ব্যবহার, কোনও পুষ্প, বৃক্ষ বা লতা কেবলমাত্র বাঙ্গালা দেশেই আছে অন্যত্র কুত্রাপি নাই ইহা বলা বড় কঠিন সুতরাং কেবল উহার উপর নির্ভর করিয়া কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া নিতান্ত সাহসের কার্য্য। ইহার ভিত্তি বড়ই দুর্ব্বল। প্রবন্ধ লেখক মহাশয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত তাঁহার বাক্য আপ্তবাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে স্বতন্ত্র কথা। শ্রদ্ধাস্পদ অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিয়াছেন গোঁড়ামি ভিন্ন কোনও জাতি বড় হয় নাই অতএব প্রমাণ প্রয়োগের অপেক্ষা না করিয়া আমরা কালিদাসকে বাঙ্গালী বলিব। তাহাই যদি হয় তবে আর বাদ বিতণ্ডার আবশ্যকতা কি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেই হয়। কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন এ কথা ভাবিতেও যে বাঙ্গালীর গৌরব তাহা কে না স্বীকার করিবেন। তবে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় হিসাবে এ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করাও আবশ্যক। কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন কি না এই বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তা স্রোত প্রবর্ত্তিত করার জন্য শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় আমাদের ধন্যবাদের পাত্র ইহাতে তাঁহার মৌলিকত্ব আছে। মহাকবির জন্মস্থান লইয়া বিপ্রতিপত্তি আজ নূতন নহে। সাতটী গ্রীক নগরী মহাকবি হোমারের জন্মস্থান বলিয়া দাবি করে। কালিদাস জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ দেশকে পবিত্র করেন—তিনি দেখিতে কিরূপ ছিলেন—সুন্দর কি কাল, লম্বা কি বেঁটে—এই সমস্ত বিষয় জানিবার কৌতূহল স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইতিহাসের অভাবে এই সমস্ত বিষয় সূচিভেদ্য তমসাচ্ছন্ন। ভারতে দর্শন সাহিত্য জ্যোতিষ প্রভৃতি সবই ছিল কিন্তু ইতিহাসের চর্চ্চা ছিল না। আবার কোনও প্রত্নতত্ত্ব বিদের হাতে পড়িয়া আভ্যন্তরিক প্রমাণের দুর্দ্দশা দেখিয়া—হাস্য সংবরণ করিতে পারা যায় না। আসমুদ্র ক্ষিতীশানাম্ এই শ্লোকে সমুদ্র যদি সমুদ্র গুপ্ত হইতে পারে তাহা হইলে বলিতে পারা যায়—কালিদাস বামন অর্থাৎ খর্ব্বাকৃতি ছিলেন এ সম্বন্ধে আভ্যন্তরিক প্রমাণ আছে যথা—প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ। আবার কালক্রমে হয়ত প্রত্নতত্ত্বের এরূপ ঢেউ উঠিতে পারে যেমন সেক্সপীয়ার সম্বন্ধে এক সম্প্রদায়ের মত আছে যে কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন কি না ইহা নির্ণয় করিতে যাওয়া কাকদন্ত অনুসন্ধানের ন্যায় নিষ্ফল যেহেতু কালিদাস একটী pseudonyam বা কল্পিত নাম মাত্র কালিদাস বলিয়া কোনও ব্যক্তিই

ছিলেন না। আসল কথা এই সকল বিষয় নিঃসংশয় রূপে নিনীত হইবার উপায় নাই—যিনি যে মতের পক্ষপাতী তিনি সেই মতের পোষকে যুক্তি ও গবেষণা দ্বারা স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া থাকেন মাত্র। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিয়া আর কিছু বুঝা যাউক বা নাই যাউক তবে এ কথা ঠিক যে বিক্রমাদিত্য এবং উজ্জয়িনীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট এবং অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। অভিজ্ঞান শকুন্তলার সপ্তম অঙ্কে "বৎস শকুন্তলাবনং পশ্য" এই শব্দ শ্লেষ দ্বারা কবি দুষ্মন্তের হৃদয়ে যেরূপ শকুন্তলার স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছিলেন সেইরূপ রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে রঘুকে আদিত্যের সহিত তুলনা করিয়া এবং বিক্রম প্রতাপ ও আদিত্য বাচক শব্দের ভূরি প্রয়োগ দ্বারা কবি জানাইয়াছেন যে বিক্রমাদিত্যের আদর্শ লক্ষ্য করিয়াই তিনি রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা করিয়াছেন কারণ রঘু কর্ত্তৃক হূনদিগের পরাজয় বাল্মীকির রামায়ণে নাই—উহা কবির কল্পনা প্রসূত হইতে পারে না—কবি সময় প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়াই উহা লিখিত হইয়াছিল। আর উজ্জয়িনীর কথা বলিতে কবি আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন—তাঁহার হৃদয়ে স্বদেশ প্রেমের উৎস বহিয়া গিয়াছে। মেঘ রামগিরি হইতে অলকাপুরী যাইবার পথে উজ্জয়িনী পড়ে না—তথাপি একটু দক্ষিণে পশ্চিম অভিমুখে বাঁকিয়া শ্রীবিশালা বিশাল নগরী দেখিয়া যাইবার জন্য মেঘকে অনুরোধ করা হইয়াছে। তৎ তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়োজনঃ—যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার সবই সুন্দর উজ্জয়িনীকে কবি ভালবাসেন তাই উজ্জয়িনীর সবই সুন্দর—উজ্জয়িনীর জল সুন্দর, মাটি সুন্দর, বায়ু সুন্দর, সৌধরাজি সুন্দর, অঙ্গনাগণ সুন্দর—তাই উজ্জয়িনীর নামে কবির হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠে তাই উজ্জয়িনীকে না দেখিলে মেঘের জন্মই বৃথা। মেঘদূত পাঠ করিয়া আমার মনে হয় কবি যক্ষের অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার সেই স্বর্গাৎ অপি গরীয়সী জন্মভূমির চরণোদ্দেশে কবি হৃদয়ে প্রেমভরা ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। কালিদাস universal কবি ছিলেন, ভারতবর্ষের কুমারিকা হইতে হিমালয় এবং আরব্য সাগর হইতে প্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপ তাঁহার নখদর্পণ ছিল। কবি প্রতিভার বলে wordsworth যাহাকে vision and the faculty divine বলিয়াছেন তিনি যেখানে যে জিনিষটী ভাল দেখিয়াছেন তাহাই নিজস্ব করিয়া কাব্যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাই বলিয়া তাঁহাকে সেই স্থানের লোক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে

যাওয়া আমার মতে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় নাই। তাহা হইলে Dr. bhaodaijর মতে কালিদাস কাশ্মীরের লোক, এই মতই বা কি অপরাধ করিল কোনও দেশ বিশেষের বৃক্ষলতা পুষ্প নদী বা পর্ব্বতের উল্লেখ দেখিয়া যদি তাহার জন্মস্থান স্থির হয় তাহা হইলে সমগ্র ভারতবর্ষ কালিদাসের জন্মস্থান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কালিদাসের বাস্তব জগৎ বর্ণনা করিবার উৎকর্ষ মহিমা ও চাতুর্য্য দেখিয়াই আমি আমার প্রণীত Kalidasa His Poetry and Mind নামক পুস্তকে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে সেক্সপীয়ারের অন্তর্জগৎ বা Subjective worldএর কবি ছিলেন এবং কালিদাস বহির্জগৎ বা objective worldএর কবি। যাহাই হউক কালিদাসকে বাঙ্গালী বলিলে আমার বিবেচনায় তাঁহার ব্যাপকত্বের সঙ্কোচ করা হয়—লাঘব করা হয়। তিনি ভারতের—তিনি সমগ্র হিন্দুজাতির—তিনি উজ্জয়িনীর অধিবাসী ছিলেন। এই উজ্জয়িনী বর্দ্ধমানের অন্তর্গত উজানি গ্রাম নহে—অবন্তীর রাজধানী বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী। কবিই বলিয়াছেন—ত্বদধ্যাসিতং অর্হন্তি শুদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষতে - কালিদাস উজ্জয়িনীতে বাস করিতেন—সুতরাং উজ্জয়িনী আমাদের নিকট মহাতীর্থ।

১৪। পরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বলেন, কালিদাসের অসাধারণ কবিত্বের মহিমায় আমরা মুগ্ধ। তাঁহার জন্মস্থান লইয়া আলোচনায় আমাদের কোন ফল নাই। তিনি বাঙ্গালীই হউন বা যে কোন দেশবাসীই হউন, তিনি আমাদের নমস্য ও পূজ্য। যতদিন সংস্কৃত-ভাষা থাকিবে ততদিন কালিদাস আমাদের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি পাইবেন।

১৫। অতঃপর কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয় সাহিত্য সভার পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়কে, প্রবন্ধপাঠক মহাশয়কে এবং সমবেত সুধীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীচুণীলাল বসু—
সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু—
সভাপতি।